যুগমানব।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত, এম, এ, বি, এল।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আষাঢ়, ১৩৪৮

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল,
সিদ্ধেশ্বর প্রেস
২৯ নং নন্দকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা।

যুগ-মানব।

"কি এনেছ ধন মান! তাহা যে চাহে না প্রাণ;
চাহি না চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,
তাহা ল'য়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—
আমি সে সুখ চাহি না!

যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর
আর কিছু চাহি না চাহি না!"

রবীন্দ্রনাথ।

"Happily our civilization possesses two great advantages over past times: Scientific Knowledge and the Scientific Spirit. To us have been revealed secrets of life our forebears never knew. And to us has been vouchsafed a passion for *truth* such as the world has never seen. Other ages have sought truth from the lips of seers and prophets: our age seeks it from scientific *proof*. Other ages have had their saints and martyrs—dauntless souls who clung to their faith with unshakable constancy. Yet our age has also its saints and martyrs—heroes who can not only face death for their faith but who can also *scrap* their faith when facts have proved it wrong. There indeed is courage! And therein lies our hope."

The Revolt against Civilization
by L. STODDARD.

ভূমিকা।

আমার অন্তরঙ্গ-বন্ধু বিজনবিহারীর কিছুদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। তাঁর দেহান্তের পর, তাঁর স্ত্রী আমাকে 'হৃদয়-বাণী' নামে লেখা তাঁর এই ডায়েরীখানা ছাপাইতে দিয়াছিলেন। এর মধ্যে তাঁর জীবনের প্রায় তের বছরের নিগূঢ় ইতিহাস লিপিবদ্ধ। বন্ধুবরের ইচ্ছা ছিল, 'যুগ-মানব' নামে এর নামকরণ করিবেন; তাই সে নামেই প্রকাশিত হইল। নিজ-চিত্তবিনোদন ও নিজেকে বুঝিবার জন্যই এই ডায়েরী লিখিত। বাহিরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বোধ হয় তাঁর ছিল না। এ-ক্ষেত্রে তাঁর অভাবে, তাঁর জীবন-সঙ্গিনীর আজ্ঞাই আমাকে বহন করিতে হইয়াছে; জন-সাধারণের মধ্যে এই অন্তর-কাহিনী প্রকাশ করা সমীচীন হইল কি না, সে-সম্বন্ধে আমি সন্দিহান।

[illegible]-বাণী

চাঁ—১৫·৬·১৩।—যার যে শক্তি, তার স্ফূর্ত্তিতেই তার আনন্দ, এতেই জীবনের পরম-পরিণতি। ইহার পূর্ণতা-সাধন করিবার চেষ্টা করাই তার উচিত; অন্য দিকে হাত বাড়ানো বোকামি। জোর করিয়া ফুল ফুটানো যায় না, মানুষও তেমনি গড়া যায় না।

আমার ভিতর যা কিছু শক্তি আছে negative ধরণের। আমি এগিয়ে নিজ-হ'তে কোন কাজই যেন করিতে পারি না, অথচ কেহ কিছু হাতে তুলিয়া দিলে, এক প্রকার ভালই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাকে বলে driving force চালাইবার ক্ষমতা—তা' আমার নাই। এ বড় মস্ত ক্ষমতা, ইহার অধিকারীদের মধ্য হ'তেই বিশ্ব-বিজয়ী চেঙ্গিজ-খাঁ, এ্যালেক্‌-জেণ্ডারের আবির্ভাব হয়।

এমন কি, আমি ভাল করিয়া একটা গল্পও বলিয়া উঠিতে পারি না। একজনের অধিক দু'জন হ'লেই যেন আমি গোলাইয়া যাই, মনের পাপ্‌ড়ি-গুলিও তখন আপনা হ'তে কেমন বুজিয়া আসে।

দরকারই বা কি অন্যের কাছে বাহাদুরী নেবার চেষ্টায়?

লোক সকলকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—এক-জন সকল কাজে অগ্রগামী, সাহসী, লজ্জাশূন্য, সদা-ব্যস্ত; অন্য-জন অহঙ্কারশূন্য, অল্পবাক্, নীরবতার উপাসক, নিজ ভাবে বিভোর। উভয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে। শেষোক্তটী vacuum-brake, সে না থাকিলে দ্রুতগমনশীল দিগ্বিদিক্‌শূন্য

সমাজ-রথ না জানি কোন্ সময় কোন্ গর্ত্তে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইত। একদিক গোলমালের দিক, প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাকার নীচে পড়িয়া সেখানে কতজন ক্ষতবিক্ষত-দেহ হইতেছে ; অন্যটী শান্তি-অভিমুখী।

কে বড়—সমর-সিংহ নেপোলিয়ান, আর দরিদ্র নিরভিলাষী স্পাইনোজা ?

আমি শান্তির দিক হ'তেই সুখকে পাইব।

১৬·৬·১৩।—বুদ্ধদেব, এমিয়েল, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই দেখিতেছি চিন্তাশীলতার পক্ষপাতী। চিন্তা-জলে মনোভূমি ধৌত ও সরস হ'লে, তবে সেখানে কবিত্বের বিকাশ হয় ; বিনা-চিন্তায় সাধু ধার্ম্মিক হওয়া যায় না ; দার্শনিক-পদবী-লাভ অসম্ভব।

গল্প-গুজবে প্রাণের একাগ্রতা দূর করে, শক্তি বিক্ষিপ্ত হয় ;

প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে হইলে, বুদ্ধদেব বারবার বলিয়াছেন,—নির্জ্জনে থাক, নির্জ্জনে থাক।

একাকী থাক, অল্পভাষী হও, জীবন-সমস্যা চিন্তা কর, জগৎ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হও।

নীরবতা! নির্জ্জনতা! আমি তোমাদের বরণ করিতেছি, আমায় আবরিয়া রাখ। তোমাদেরই ভিতর কবিত্ব, সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব—জীবনকে তোমরাই দেবত্ব দান কর।

১৯·৬·১৩।—মনো···গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে আসিয়াছিল, পরদিন রাত্রিতে চলিয়া গেল। তার একটা কথা বেশ লাগিল—'ছেলেদের সঙ্গে এমন ধীর স্থির মিষ্টি-ভাবে ব্যবহার করতে হবে, যেন তারা বাবাকে দেবতা ব'লে মনে করতে পারে।' রাগ, বিরক্তি, কটুবাক্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বাবার সান্নিধ্যে আসিলে, একজন ভালবাসা-ভরা

শান্ত-সুধীর দেবতার নিকট আসিলাম, যাঁর দর্শনে আপনা হ'তেই হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ ও নির্ম্মলতার আবির্ভাব হয়, যাঁর আশ্রয় পাইয়া সমস্ত সন্দেহ ভয় নৈরাশ্য দূর হইয়া যায়, শ্রদ্ধায় ভালবাসায় প্রাণ ভরিয়া উঠে—এমন ভাব যাতে সন্তানের মনে স্থান পায়, সেরূপ চলিতে হইবে।

পরিবারের সকলের প্রতি এমন ব্যবহার করিতে পারিলে, আদর্শ গৃহী হওয়া যায়। ঝগড়া, রাগ, বিদ্বেষ—লক্ষ্মী, শান্তিপ্রিয়া, এদের দর্শনেই ত্বরিত-পদে দূরে সরিয়া যান।

২২·৬·১৩, প্রাতে।—এই জীবনটা কি ও এই জীবনকে লইয়া কি করিতে হইবে—এই দুটী প্রশ্ন পূর্ব্বাপর মানব-মনকে আলোড়ন-বিলোড়ন করিতেছে।

ভারতবাসী প্রশ্ন দুটীর সমাধান লইয়া পূর্ব্বাপর ব্যস্ত। সমাধান নিতান্ত কঠিন—কখনো সম্ভবপর কি? সে চায়, জীবন জিনিষটা কি, বুঝিয়া শেষে কাজ করিতে। প্রশ্নের উত্তর হয় না, কাজেও মন যায় না; ভাবিতে ভাবিতেই ক্ষুদ্র-জীবন ফুরাইয়া যায়।

ইংরাজ এ সকল প্রশ্নের বড় ধার ধারে না। জীবনটাকে, এ জগৎ-টাকে তারা নিতান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে—এ সম্বন্ধে খুব জল্পনা কল্পনার যে বিশেষ দরকার, তা' তাদের মনে তেমন স্থান পায় না। এর উন্নতি-সাধন, কাজ-কর্ম্ম দ্বারা একে পরিপুষ্ট করা—ইহাই তাদের একমাত্র কাম্য।

উপরোক্ত কারণেই কর্ম্মজগতে ভারতবাসী অপেক্ষা ইংরাজ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ভাবজগতে, মনোরাজ্যের তত্ত্বান্বেষণে, তার কাছেও সে আসিতে পারে না।

ইংরাজের ভিতর, ইয়ুরোপীয়দের ভিতর, চিন্তাশীল দার্শনিক বলিয়া;

যাঁদের খ্যাতি,—আমাদের দেশের সে-শ্রেণীর লোকের তুলনায় নিতান্ত খাটো নন কি তাঁরা? কোথায় তুলনা বুদ্ধদেবের, কোথায় তুলনা ব্যাস, শঙ্করাচার্য্যের?

ভাব, কর্ম্ম অপেক্ষা মূলতঃ অধিকতর শক্তিশালী,—কর্ম্মের উৎস। তাই, কর্ম্মবহুল ইয়ুরোপীয়-সমাজ যুগে যুগে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। পক্ষান্তরে জীবন-পথে বাহির হইয়া আসিতে প্রারম্ভেই কি এক অমৃতের সন্ধান ভারত পাইয়াছিল, ভৃঙ্গের ন্যায় তার পেছনে পেছনেই এ যাবৎ সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অজর, অমর, বৃদ্ধ ভারত! সংসারের ধন-মান পসার-প্রতিপত্তি কিছুই তো তাকে আর আকর্ষণ করিতে পারিল না; আজও সে জীবন-প্রহেলিকার নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অর্দ্ধ-নিদ্রিত-নেত্রে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

অনেকেরই বিশ্বাস সদা-ব্যস্ত ইংরাজের সহযোগে আসিয়া ভাব-প্রবণ ভারত কর্ম্মপ্রধান নূতন জীবন ধারণ করিবে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি এই ধারণা? ভারতবাসীর পক্ষে দেশ, সমাজ, জাতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া অধিক দিন জীবন কাটানো অসম্ভব। এ সব তো বালকের, যুবকের ক্রীড়ার সামগ্রী—জ্ঞানবৃদ্ধের চোখে কোনও মূল্য নাই। সংসার, তার ধন-বিত্ত যশ, জলবুদ্বুদের মত অসার, অনিত্য; কোন্ বুদ্ধিমান তার পেছনে দৌড়াইয়া অবশেষে হতাশ্বাস হইবে? ভারতবাসীর দৃষ্টি চিরকালই সংসারের উর্দ্ধে কিসের দিকে যেন আবদ্ধ; সমাজের ভিতর যিনিই একটু বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই ধীরে ধীরে অনিত্যতার স্বরূপে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং সার-সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া উঠেন। নিজ অস্তিত্বেই তিনি কালে একপ্রকার আস্থাহীন হইয়া দাঁড়ান; পরের জন্য চিন্তা করাকে তখন অসার, নিতান্ত অসার বলিয়া মনে হয়; দেশ, সমাজ, জাতি তো দূরের কথা।

মূলতঃও উপরের দিক হ'তে দেখিতে গেলে—দেশ, জাতি কি? এ-সব ভাবের তাড়নায় জগতের উন্নতি হইয়াছে যথেষ্ট; কিন্তু অবনতিও যা হইয়াছে, তার কথা ভাবিতে গেলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা কোথায় গেল? এ সকল ভাবের জন্য মানুষ মানুষের শত্রু, একে অন্যের গলা কাটিয়াও আপনাকে মহা-কৃতী মনে করিতেছে। ভারতবাসী কর্ম্মী হইয়া উঠুক বা না উঠুক, ভাব-প্রাণ ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া বুঝি বা কালে ইংরাজকে কর্ম্মে আসক্তি-বিহীন হইয়া পড়িতে হয়। এশিয়ার সংঘর্ষে আসিয়া এ্যালেক-জেণ্ডারের এমন বিশাল রাজ্য আকাশে শব্দের ন্যায় কেমন নিঃশেষ হইয়া গল! সে অবশ্য অন্য কারণে। এক্ষেত্রেও বুঝি এশিয়ার কাছে কালে ইয়ুরোপকে পরাস্ত মানিতে হইবে—শেষ পর্য্যন্ত ভাবেরই যে জয়।

* * * *

বৈকাল, ৫টা।—রবীন্দ্রনাথের কবি-যশ এখন জগৎ ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় তাঁর সুখ্যাতি ধরে না। সে-দিন বড়লাট লর্ড হার্ডিং শিমলাতে সভা করিয়া তাঁর সম্বন্ধে দিল্লী-কলেজের প্রফেসার এ্যাণ্ড্রুজের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। হার্ডিং তাঁকে Poet-Laureate of Asia এশিয়ার রাজ-কবি, এই গৌরব-সূচক আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান ফরাসী কিম্বা জার্ম্মেণ সাহিত্যের বিষয় বলা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত, ইংল্যাণ্ডে এক্ষণে তাঁর মত কবি নাই। তিনি শেলী, কিট্‌স, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন্, ব্রাউনিং—যাঁদের লেখার ভিতরই ইংরাজের কাব্য-লক্ষ্মীর মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও নয়ন-নন্দনরূপে ফুটিয়াছে—ধরণের কবি; তাঁদের সকলের সমন্বয়-বিশেষ, এবং তারও বুঝি উপরে।

কলেজে পড়ার দিনে তাঁর সম্বন্ধে যা ভাবিয়াছিলাম, তা' যে ঠিক

হ'তে চলিল, এতে বড়ই আনন্দ হইতেছে। এফ, এ পাশের পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথের কোনও লেখার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয় নাই। মনে পড়ে, যখন কলিকাতায় বি, এ পড়ি, তখন 'সাহিত্য' পত্রিকায়, তাঁর 'মানসী' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ (বোধ হয় প্রিয়নাথ সেনের লেখা) আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাতে সমালোচক স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিয়াছিলেন, যে 'মানসী'র মত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছের সমাবেশ জগতের অন্য কোনও বইতে আছে কি না সন্দেহ। তখন তা' অত্যুক্তি ভাবিয়াছিলাম। তারপর 'সোনার তরীর' সুখ্যাতি পড়ি—সেও 'সাহিত্যে'। বি, এ ক্লাসে উঠিয়াই কু—থাকিতে 'প্রভাত-সঙ্গীত' ও 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' আনাইয়াছিলাম। বোধ হয় আমাদের গ্রামের তা···দাদার প্ররোচনায়। কিন্তু তখন ভাল লাগে নাই ; কারণ, কিছুই বুঝি নাই।

'সোনার তরী' ও 'মানসী' পড়িয়াও প্রথম প্রথম ভাল লাগে নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা,—আর তাঁর কবিতা কেন, সকল শ্রেষ্ঠ কবিতাই—ধীরে ধীরে ভাবিয়া চিন্তিয়া পড়িতে হয়। মৃগনাভি-কস্তুরী, যত ঘষিবে ততই তার সুগন্ধ বৃদ্ধি পাইবে ; রবীন্দ্রনাথের কবিতাও বারবার যত পড়িবে ও নিগূঢ়-ভাবে তার সঙ্গে পরিচিত হইবে, ততই আনন্দ-রসে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমাদের কাব্য ও সাহিত্যে শব্দের, ভাষার জটিলতা যথেষ্ট আছে—তার কঠিন আবরণ কোন প্রকারে ভেদ করিতে পারিলে ভাবটী আপনা হ'তেই ফুটিয়া ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরকমে নূতন ধরণের পাশ্চাত্য-ভাবের পূর্ণ-সম্পদ-সম্পন্ন কবি ; তাঁর জটিলতা ভাষায় যত নয়, ভাবে,—তাঁর শক্তিও ধরিতে গেলে এখানেই। ভাব ও ভাষারই বা কি অপূর্ব্ব-সহযোগ—একে অন্যকে কেমন সুন্দর-রূপ দান করিয়াছে ! বাঙ্গালার মত অপরিচিত, অবজ্ঞাত, বৃহত্তর জগতের সহিত সম্পর্কবিহীন স্থানে রবীন্দ্র-নাথের আবির্ভাব অলৌকিক ঘটনা-বিশেষ। তবে, পঙ্কিল-সরোবরে নাকি

পদ্মফুল ফোটে ভাল ; তাই বুঝি সে-নিয়মানুসারে আধ-মরা নিশ্চল বঙ্গে রবীন্দ্র-পদ্মের উৎপত্তি। নূতন বলিয়াই, তাঁকে বুঝিতে আমাদের এত বিলম্ব লাগিতেছে ; আমি তো দেখিতেছি, ভাবরাজ্যে পূর্ব্বাপর তিনি অন্ততঃ আমাদের দশ-বছর আগে আগে চলিতেছেন। এ-সব কারণেই এখনো, যাঁরা ইংরাজী জানেন না বা ইংরাজী শ্রেষ্ঠ-সাহিত্যের ভাবের আবহাওয়া যাঁদের গায়ে লাগে নাই, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করেন না ; না বুঝিয়া, ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া গায়ের জ্বালা মিটান।

বি, এ পরীক্ষার শেষে বন্ধুবর ল…র সঙ্গে আমার জৈ…রে দেখা হয়। তার সাহিত্যের প্রতি পূর্ব্বাপর বেশ একটু টান্। সে-ই আমাকে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করায়। আমরা দুজনে মিলিয়া 'সোনার তরী' ও 'মানসী' বারংবার পড়ি। কেমন বিমল আনন্দ, সুখ! তারপর 'ক্ষণিকা' পাঠ। সবই কেমন সুন্দর! Abstract অশরীরী-ভাবকে এমন মোহন concrete রূপে মনের কাছে ধরিয়া দিবার এমন শক্তি আর কোন্ কবির আছে ? আমার নজরে তো পড়িতেছে না।

এই সময়েই তাঁর 'ছোট-গল্পের' সঙ্গে পরিচয় হয়। সে-সব যেন আরো ভাল। তাঁর কবিতা শ্রেষ্ঠ বা এই-গল্পগুচ্ছ শ্রেষ্ঠ—অনেক সময় বলা কঠিন। সে দিনও মনো…র সঙ্গে এই আলাপই হইতেছিল—তারও সেই মত। তাঁর 'ক্ষুধিত-পাষাণ, কে বলিবে গদ্যে লেখা ? সত্যই মনো… বলিতেছিল, যে 'ক্ষুধিত-পাষাণ' পড়িতে পড়িতে মনে হয়, ভাষারও যেন প্রাণ আছে, প্রতি শব্দ হ'তে যেন সঙ্গীতের গুঞ্জন, নৃত্যের নূপুর-নিক্কণ, রমণীর অপরূপ সৌন্দর্য্য-গরিমা, পরিচ্ছদের অতুল-শোভা ক্ষরিয়া পড়িতেছে। সৌন্দর্য্যে যেন ভাষা ঝক্ ঝক্ করিতেছে এবং তান-লয়ে কথা বলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ছোট-গল্পের' তুলনা নাই।

সে-দিন হ'তে রবীন্দ্রনাথ আমার উপাস্য কবি। যতই দিন গিয়াছে,

ততই তাঁর প্রতি আমার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর তুল্য কেহ নাই। কালিদাসে অবশ্য প্রেমের কথা, প্রকৃতি ও চরিত্র-বর্ণনা যথেষ্ট আছে, বোধ হয় তাদের বর্ণনায় স্থান-বিশেষে কালিদাস রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি এত দূরে, যে তাঁর কাব্য-রশ্মি আমাদের হৃদয়ে আর তেমন আলো প্রদান করিতে পারিতেছে না। জীবনের জটিল সমস্যাসমূহ—তা লইয়া কালিদাস তেমন কিছুই লেখেন নাই; সেকালের সরল অনাড়ম্বর জীবনের ভিতর এমন কোনও সমস্যার আবির্ভাব হইবার সুযোগও হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও দার্শনিক; বস্তুতঃও যে লেখার ভিতর একটু দর্শনের স্পর্শ না থাকে, তা' তেমন শ্রেষ্ঠ ধরণেরও নয়। বর্ত্তমান যুগের মানবের প্রাণের ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষা, idealismর ভাব—রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে যেমন অভিব্যক্ত হইয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাই না।

আর একটী বিষয় সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে যা' ভাবিয়াছিলাম, তা' হ'তে চলিল। তাঁর প্রেমের কবিতা পড়িতে পড়িতে আমার প্রায়ই মনে হইত, এ তো শুধু-প্রেম নয়, সামান্য-ভালবাসা নয়; ইহাই তো ভক্তের কাম্য—ভক্তি, ধর্ম্ম-ব্যাকুলতা, ধর্ম্ম।

তখন ভাবিতাম, এমন দিন আসিবে, যখন এই মানব-প্রেম কালে ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হইয়া তার পথেই রবীন্দ্রনাথকে মহাযোগীর আসনে নিয়া পৌঁছাইয়া দিবে; ফুলের ন্যায় নির্ম্মল-মধুর তাঁর লেখা যে আদি-মধুরতা ও নির্ম্মলতার উৎসের দিকেই অনুক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। তখন আমি দু' এক সময় বন্ধুবিশেষকে বলিয়াছি, দেখিবেন, কালে রবীন্দ্রনাথও তাঁর পিতৃদেবের পদানুসরণ করিবেন। এখনই তো রবীন্দ্রনাথ ঋষিনামে অভিহিত হইতেছেন।

ভা—থাকিতে আমি কথা-প্রসঙ্গে বন্ধুবর জা…ও শ্রী…বাবুকে বলিয়া-

ছিলাম, রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কিট্‌স ও শেলী তিনটীর সমষ্টির তুলনায়ও শ্রেষ্ঠ। এ কি অত্যুক্তি? মিছা স্বদেশ-প্রীতি কি আমাকে ভুল বুঝাইয়াছে?

২৩.৬.১৩।—ইহুদীদের ভিতর একটা ভাল নিয়ম আছে, যে তারা সাধারণ লেখা-পড়া ছাড়াও জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য বাল্যকাল হ'তে আর একটা অর্থকরী-বিদ্যা শিক্ষা করে—যেমন ছুতারের কাজ, কামারের কাজ।

আমাদের ছেলেদেরও এই প্রকার অন্য কিছু একটা শিক্ষা করা উচিত—যেমন সর্টহ্যাণ্ড, বুক-কিপিং, ফটোগ্রাফি, সঙ্গীত, মিস্ত্রীর কাজ ইত্যাদি। এ সব খেয়ালের চর্চ্চা জীবনে সুখ আনে, লোকের উপর প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ উপস্থিত করে এবং বিপদের দিনে অর্থোপার্জ্জনের জন্য একটা উপায় হাতের কাছে ধরিয়া দেয়।

কি হইবে ছেলেরা? তারা সচ্চরিত্র, জ্ঞানবান্‌, বলবান্‌ দেশ-সেবক হোক্‌। আমার ইচ্ছা, তারা খুব বড় বিদ্বান হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করুক—তাদের দ্বারা দেশের গৌরব জগৎ-সভায় প্রচারিত হোক্‌। জ্ঞান চর্চ্চাই যে এদেশের পূর্ব্বাপর বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র—এঁদের মত একটা কিছু হোক্‌। বংশ, মিল স্পেন্‌সার ডারউইন্‌ কেলভিন্‌ ম্যাক্সমূলারে পূর্ণ হ'য়ে উঠুক্‌—কেবল চাকরী করিয়া সামান্য কয়েকটা টাকা রোজগারে কি হইবে? সে জীবন কি মানুষের পক্ষে adequate যথেষ্ট-পূর্ণাঙ্গ জীবন?

অথবা, তারা বড় বড় সওদাগর হোক্‌—যেমন মর্‌গ্যান্‌, কার্ণেজি, রকফেলার—যেমন অভূতপূর্ব্ব ধনার্জ্জন, তেমন অতুল্য-উদার দানশীল প্রশস্ত প্রাণ! এ শ্রেণীর লোকের এ-দেশের বিশেষ দরকার। টাটার মত অনুকরণ-যোগ্য ব্যক্তি বর্ত্তমান ভারতের যুবকদের কাছে কা'কেও

দেখিতেছি না। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা expediency, বার্কের দিন হ'তে ইংরাজের রাজনীতির মূলসূত্র। আমাদের বর্ত্তমান দীন-দশায় কারবার করিয়া যাঁরা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁরাই প্রকৃত স্বদেশ-সেবক। চাকর servan তে ঘৃণ্য কুকুর; পরের কাছে যে টাকার জন্য জন্মের মত নিজেকে বলদের মত বিক্রী করিয়াছে, সে হ্যাট্‌কোটই পরুক্ বা জুড়ী-গাড়ীই হাঁকাক্—সেও একটা ধর্ত্তব্যের জিনিষ? তার মনুষ্য-জন্ম বৃথাই গেল।

২৫-৬-১৩।—সেদিন ছো···দাদার একটা কথা প্রাণে যেন হঠাৎ যাইয়া বাজিল। কথাটার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই, তবে সময়-বিশেষে দু-একটা জিনিষ ঠক্ করিয়া যেন মনের ভিতর কেমন করিয়া যাইয়া লাগে।

তিনি বলিতেছিলেন, শরীরটা ভাল নয়, তাই মনটা ভাল লাগিতেছে না। আমার মনে হইতেছিল—শরীর ও মন কি একই জিনিষের অঙ্গ? যদি তা না হইবে, তবে এমন ভাবে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ হয় কেন? আমাদের দেশীয় বিজ্ঞান-মতে মনও দেহের একটা ইন্দ্রিয়। পাশ্চাত্য-দেশে মনকে জড় বলে না। কোন্ অনুমান সত্য?

মন কি, আত্মা কি,—আমিই বা কি?

আমার মনের উপর বিচার করিবার যে আর একটী কেহ আমারি মধ্যে আছে, তা' যেন বেশ বুঝা যায়। ডালের উপরে অধিষ্ঠিত পাখী দুটীর সঙ্গে যে উপনিষদে আত্মা ও পরামাত্মার তুলনা রহিয়াছে, অনেক সময় তা' ঠিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে এও মনে হয়, এক আত্মা অন্য আত্মার যেন বিচার করিতেছে; একের পেছনে আর এক—এমনি ভাবে অসংখ্য আত্মার সমাবেশ আমারি ভিতর। এ সকল লইয়াই—'আমি'।

মৃত্যুর পরেও নাকি সময়-বিশেষে মৃতব্যক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় (অবশ্য আমি পাই নাই কিম্বা অন্য কা'কেও পাইতে দেখি নাই); তা' হ'তেও 'আত্মাতে' কিছু বিশ্বাস হয়। জগতের ভিতর যদি কোনও একটি অবিনশ্বর শক্তি, সত্য না থাকিবে, তা' হ'লে বা তা' কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে ?

কিন্তু আবার যখন দেখিতেছি, সবই পরিবর্ত্তিত হইতেছে—মুহূর্ত্তেরও বিরাম নাই, তখন মনে হয় নিত্য কিছুই নাই, 'আত্মা' কবির কল্পনা, illusion ভ্রান্তি—দুঃখ-পীড়িত পিঞ্জরাবদ্ধ মানব-বিহঙ্গের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার ঘন-অবস্থা।

'আত্মা' নাই। আর 'আমি' ? 'আমিই' কি আছি ?

'ঠাকুর-পরিবারের' সবদিকে এমন উন্নতির কারণ কি ? ধন ও culturea সমাবেশ, তার উপর একাগ্রতা। যিনি যাতে লাগেন, উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'মাতাল হ'য়ে পাতাল পানে ধাওয়া'। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত এমন শক্তিশালী অমিতব্যয়ী দিল-দরিয়া লোক কেহ ছিল না; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মানুসরণ করিতে যাইয়া বিষয়ে জলাঞ্জলি দিলেন; বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের ন্যায় সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রে কে এমন বিভোর ? বেশ তাঁদের জীবন; এক একটী যেন জীবন্ত-সাধনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রাঁচির মোরাবাদি পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত গৃহে বেড়াইতে যাইয়া সেখানে অতিবাহিত তাঁর বর্ত্তমান জীবনের দিকে লক্ষ্য করিয়া সে-দিন বিহারের ছোটলাট সার চার্লস্ বেলী বলিয়াছিলেন, Babu ! I envy you, I envy you ! সত্যই, ঈর্ষার বিষয় !

বোলপুরের 'শান্তি-নিকেতনে' রবীন্দ্রনাথ ছাত্র ও শিষ্য পরিবৃত হইয়া যে শান্তিময় জ্ঞান-তাপসের জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তা পূর্ব্ব-কালের মুনি-ঋষিদের তপোবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইয়ুরোপে এর একমাত্র তুলনা—ভুবন-বিখ্যাত হেকেডেমাসের উদ্যানাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত প্লেটোর এ্যাকাডেমী। সেই বাগান নানা প্রকারের উঁচুগাছ, মন্দির ও মূর্ত্তিতে সাজানো ছিল, মৃদুগতি একটী স্রোতস্বতী ক্ষীণ শব্দ তুলিয়া ভিতর দিয়া বহিয়া যাইত। নির্জ্জন চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবারই উপযুক্ত স্থান; পরবর্ত্তী-কালে কত লোকের আকাঙ্ক্ষা কত সময় এর চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত অসংখ্য স্মৃতির সহিত ইহা জড়িত হইয়া আছে। কবি ইহার উদ্দেশ্যে গান রচনা করিয়াছেন, দার্শনিক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। নানা-দেশ-ভ্রমণের শেষে প্রশস্ত-ললাট চিন্তাশীল প্লেটো এথেন্সের নগরপ্রান্তে স্থাপিত এই উদ্যানের ভিতর তাঁর জ্ঞানমন্দিরে দর্শন-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। এই জ্ঞানচর্চ্চাতেই তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ব্যয়িত হয়। উত্তরকালে 'শান্তিনিকেতনের' দিকে চাহিয়াও এমনি ভাবে কত কবি কাব্য রচনা করিবেন, রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় জীবনের স্মৃতিকে ঘিরিয়া কত কল্পনা ঘুরিয়া বেড়াইবে!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ দুই ভাই-ই ভাবের উপাসক, ললিত-কলার একনিষ্ঠ-সেবক। এই তো জীবন! রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বাপর কি আদর্শ-জীবনই না যাপন করিয়া গেলেন!

অর্থের সদ্ব্যবহার বাঙ্গালায় এমন আর কোথাও হয় নাই—যেমন 'ঠাকুর-বাড়ীতে'। দেবেন্দ্রনাথ পরিবার-মধ্যে মানুষ-রচনার জন্য যে অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন, তার কল্যাণে আজ অতুল-শোভা নানা-মূর্ত্তিতে বংশ ভরিয়া উঠিয়াছে। ভাবের, আদর্শের উৎস ঠাকুর-বাড়ী—বাঙ্গালার মহা-গৌরবের জিনিষ।

১·৭·১৭।—বহির্জগতের কাজ-কর্ম্ম সহজে চালাইবার জন্য যেমন ইংরাজ কতকগুলি নিয়ম, আইন (rules and laws) প্রণয়ন করে, অন্তর্জগৎ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ভাবসমূহকে কার্য্যকরী করিবার জন্যও তারা কতকগুলি principlesর অধীনে আনিয়া লয়। তাদের গ্রন্থসকল principles ও laws এই দুই বাক্যে পরিপূর্ণ। এদের অধীনে আসিয়া, তাদের কাজ-কর্ম্ম কলের মত চলে—কোন প্রকার গোলমালই হয় না। কা'র কি কাজ করিতে হইবে, কি ভাবে চলিতে হইবে—সবই নিয়মাবদ্ধ। পরের মেজাজের দিকে চাহিয়াও কাহাকে চলিতে হয় না। এই নিয়ম-মানিয়া-চলাই ইংরাজের এমন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল কারণ।

* * * *

পাপ পুণ্য লইয়া পূর্ব্বাপর কত না জল্পনা চলিয়াছে! কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, এ-সব কি? মানুষের কল্পনা-প্রসূত ভাব নয় কি? মানুষ নিজ সমাজ চালাইবার জন্য ধীরে ধীরে কতকগুলি নিয়ম করিয়া লইয়াছে; তার বিরুদ্ধে কাজ করিলেই এখন পাপ। লোক-সংহার মহাপাপের কাজ; কিন্তু দেশের জন্য করিলে মহা-পুণ্যের। রাজদূতের একটী প্রধান কার্য্যই বৈদেশিক রাজ-দরবারে মিথ্যা, চাতুরী, ছলনা দ্বারা নিজ-দেশেব হিতসাধন, অথচ তাঁর মত সম্মানিত ব্যক্তি ক'জন? রাজ্যের প্রধান নরহন্তা—রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সেনাপতি। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

'রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি
কোন ভেদ নাহি উভয়ে।'

মোটের উপর, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম কিছুই নয়, সার-সত্য এদের ভিতর কিছুই নাই। তবে যদি বলা যায়, সমস্ত জগৎ ভরিয়া এতকাল ধরিয়া মানুষ এ-সব সম্বন্ধে প্রায় একই ভাবে জল্পনা-কল্পনা করিয়া আসিতেছে কেন, তার উত্তর—অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস প্রভৃতি শারীরিক

ব্যবস্থা physiological conditions সব মানুষেরই এমন একই প্রকারে রচিত, যে তারা এক-ধারায় না ভাবিয়া পারে না, যা কিছু পার্থক্য জল-বায়ু স্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব হেতু।

কুকুর সর্ব্বত্রই একই ভাবে চীৎকার করে কেন? কারণ তার কণ্ঠনালীই এমন ভাবে গঠিত, যে অন্যভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব। অন্যান্য জীব-জন্তু ও পদার্থ সম্বন্ধে যে নিয়ম, মানুষ সম্বন্ধেও তাই। সকলেই নিজ নিজ জীবন-যাপন-সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিতেছে, জন্মগ্রহণ করিতেছে, বড় হইতেছে, যৌবন-প্রাপ্ত হইতেছে, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছে, মরিয়া বাতাসে মাটীতে মিশিয়া অন্য মূর্ত্তি-গঠনের মাল-মসলা জুটাইতেছে। মানুষ মরিয়া বৃক্ষ-দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে, লতা মরিয়া গাভীর উদর-তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে, জল স্থলে পরিণত হইতেছে, স্থল জলে মিশিতেছে, অবিনশ্বর কিছু নাই, অথচ নশ্বরও কিছু নাই। পাপও নাই, পুণ্যও নাই,—আছে এক মহা-নিয়ম, যার চক্রঘূর্ণনে অনন্তকাল ধরিয়া এক মহা-পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে।

অনেক দিনের কথা—একটা হাঁস কাটা হইতেছিল। গলাটী ছিন্ন হ'তেই, দেহটা সজোরে উড়িয়া কতকটা দূরে যাইয়া পড়িল। প্র···বাবু বলিতেছিলেন, কি পাপের কাজ! আমি কিন্তু পাপের কোনও কারণই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। আমি দেখিতেছিলাম, কতকটা শক্তি energy একস্থানে আবদ্ধ ছিল, গ্রীবা-দেশ কাটার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। একটা বৈজ্ঞানিক সত্য—scientific truth; পাপ পুণ্যের সঙ্গে কোনও সংস্রব নাই এর। বাঘ মারিলেও এমন হয়, ডাকাত বা সাধু মারিলেও এমন হয়, লতা ছিঁড়িলেও এমন হয়, হাঁড়ি ভাঙ্গিলেও এমন হয়। আমার প্রতি-নিশ্বাসে প্রতি-পদক্ষেপে লক্ষ লক্ষ প্রাণী মরিতেছে—কই তাতে তো পাপ হইতেছে না।

কাজ—কাজ, চিরনির্ম্মল; পাপ বা পুণ্যের দাগ তাতে বসে না। প্রকৃত ভাবুকের চোখে সার কিছুতেই নাই, অসারও নাই—পাপও নাই, পুণ্যও নাই,—শুধু, শুধু মিছা কল্পনার সমষ্টি।

২.৭.১০।—একাকী থাকার অভ্যাস করাটা ভাল, তা হ'লে আর লোক-সঙ্গের জন্য ব্যাকুল হ'তে হয় না। আমি কেন যেন একাকী সময় কাটাইতে পারি না; অল্পকাল মধ্যেই কেমন ছট্‌ফটানি দেখা দেয়। আবার লোকের ভিতরও যেন আমার প্রাণের চারিদিক বদ্ধ হইয়া আসে। বেশী লোকের মাঝে, মন খুলিয়া আমার পক্ষে কথা বলা অসম্ভব; অথচ আমার বন্ধুসংখ্যা নিতান্ত কম নয়। যার সঙ্গে আমার মনের মিলন হয়, আমার চিরজীবনের বন্ধু হইয়া থাকে। প্রখর তেজোবিশিষ্ট লোকের কাছে আমি যেন ভুমড়িয়া আসি। নিজের জন্য আমি যেমন ধীর স্থির প্রকৃতির অভিলাষী, আমার বন্ধু-মধ্যেও শান্তপ্রকৃতির লোকই তেমন অধিক।

এখনো আমি নির্জ্জনতার সম্পূর্ণরূপে উপাসক হ'তে পারিলাম না। নির্জ্জন-জীবন আমার পূর্ব্বে একেবারেই ভাল লাগিত না, এখন একটু বেশী ভাল লাগে। মাঝে মাঝে দেখিয়াছি, কারো উপর রাগ করিলে বা কারো সঙ্গে ঝগড়া করিলে বা অন্য কোনও কারণে মন খারাপ হ'লে, অদৃশ্য কাঁটার খোঁচার মত যখন কি যেন প্রাণে যাইয়া বিদ্ধ হ'তে থাকে, তখন একাকী কতকক্ষণ বেড়াইয়া আসিলে, মনটা অনেকটা পূর্ব্বের সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ-সব-সময়ে নির্জ্জনতা অনেকটা শীতল প্রলেপের কাজ করে।

বেশী সময় কিন্তু নির্জ্জনে কাটাইলে, ক্রমে মন কেমন একটা উদাস ও দুঃখভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বৃদ্ধি হ'লে নির্জ্জন-জীবন সুখের হয়। যখন পাখী, লতা-পাতা, ফুল-ফল, নীল আকাশ, তারকা, চন্দ্র, নদী, পর্ব্বত, সব,—চোখে আপনা হ'তেই সুন্দর ঠেকিবে, যখন তাদের দিকে চাহিতেই আপনা হ'তে আনন্দের উদ্রেক হইবে,—তখন একাকী থাকিলেও একাকী বোধ হইবে না। ক্ষুদ্র প্রজাপতিটী হ'তে অনন্ত-নক্ষত্রখচিত আকাশ, সকলি তখন সজীব বলিয়া বোধ হইবে, প্রতিমুহূর্ত্ত তারা আনন্দের বার্ত্তা বহিয়া আনিবে। ভাগ্যবান্, মহা ভাগ্যবান্ তাঁরা, যাঁদের ভিতর এ সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে, তাঁরা নিতান্তই ভাগ্যবান্—জন্ম হ'তেই এ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন ; তাঁরাই কবি, চিত্রকর। চেষ্টা-দ্বারা যে এ জ্ঞানের কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ না করা যায় এমন নয়, তবে ঘষিয়া মাজিয়া রূপের ন্যায় তেমন রং ধরে না। Botany, Biology, Zoology, Astronomy পাঠে এ জ্ঞানের কিছু উন্মেষ হ'তে পারে। যে জীবনে প্রকৃত সুখের আস্বাদ পাইতে চায়, তায় এ বিষয়ে যত্নপর হওয়া উচিত। আমার তো মনে হয়, যার জীবনে কবিতার প্রভাব নাই, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই—হোক্ না সে মহাজ্ঞানী, হোক্ না সে মহাধনী, মহাশক্তি-ধর—প্রকৃত সুখের তত্ত্ব সে পায় নাই।

নির্জ্জনতার ভিতরই যে সৌন্দর্য্যের বাস। আমি কেমন করিয়া নির্জ্জনতার নির্ম্মলতায় প্রাণ ধৌত করিয়া লইয়া সুন্দরতমের অধিষ্ঠান করাইব ?

৩.৭.১৩।—বিনা বাক্যব্যয়ে কাজ করিয়া যাও ; অত দয়ামায়ার, ভবিষ্যতের কল্পনার দরকার নাই। যদি কখনো ভুল হয়, কাঠিন্যের দিকেই যেন হয়, কোমলতার দিকে নয়। নিজে যা আদর্শ মনে কর, অবিচলিত-চিত্তে তার অনুসরণ কর—কালে তোমার-যোগ্য-স্থানে তুমি প্রতিষ্ঠিত

হইবে। সস্তা যশ, যা আজ হয়, কালই ধোঁয়ার মত অদৃশ্য হইয়া যায়, সে তোমার জন্য নয়। যে যশের কথা বলিলাম, প্রকৃত সুযশ—জ্ঞানী ভক্তের অন্তরাত্মা হ'তে স্বতোত্থিত হইয়া যা উপাস্য-দেবতার দিকে ধাবিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

৪.৭.১৩।—ইতিমধ্যে বেশ দুখানি বই পড়িয়াছি।

একখানা চন্দ্রশেখর করের 'অনাথ বালক'—বোধ হয় তাঁর আত্ম-জীবনীর কিয়দংশ লইয়া বিবৃত; আর একখানা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'রমাসুন্দরী'। দুখানিই গার্হস্থ্য উপন্যাস—সুন্দর, তবে একের সহিত অন্যের তুলনা হয় না।

'অনাথ বালকের' মত এমন একখানা মনোরম গল্পের বই যে বাঙ্গালা-ভাষার কলেবর শোভা করিয়া আছে, জানিতাম না। দুঃখের কাহিনীতে পূর্ণ—তাও বেশ মিঠা বই। সৌন্দর্য্য,—তা দুঃখের মলিন পরিচ্ছদ পরিয়াই দেখা দিক্, বা সুখ-সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণই তাকে প্রকাশ করুক্—চির-চিত্তমোহন। 'স্বর্ণলতার' ন্যায় অত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত না হইলেও, বইখানা 'ক'নে-বৌ', 'রায়-পরিবার,' 'সুরুচীর কুটীর' প্রভৃতি স্ত্রী-পাঠ্য অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক ভাল। তবে লেখকের কোন নূতন ভাব নাই। মামুলি যা, তাই ভাল,—নূতন সব বদ্। স্ত্রীলোকের কথা উঠিতে না উঠিতেই, তার চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ-সংযুক্ত কিছু না বলিতে পারিলে, বাঙ্গালার লেখক অস্থির হইয়া পড়েন। তা ছাড়া যেন উপন্যাসই জমে না। তাই, 'জ্ঞানদার' চরিত্র-কলঙ্কের বর্ণনায় সুন্দর বইখানা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে দুই অধ্যায় বাদ দিলে কোনও ক্ষতি হইত না, অথচ ইহা একখানা মধুর স্ত্রী-পাঠ্য কিম্বা বালক-বালিকার পাঠ্যগ্রন্থে পরিণত হইত।

'রত্নাসুন্দরী'র গভীরতা কম, কিন্তু বেশ ঝরঝরে বই। নবগোপাল ছেলেটী বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন ধরণের। সবল, সাহসী, প্রফুল্ল যুবক—মন প্রথম হ'তেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। 'রমা' আরও মনোরম। বিশেষ করিয়া ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালী-সমাজে এই বীরত্ব-ব্যঞ্জক হাতে-বন্দুক সাহসী সুন্দরী বালিকাটী আপনা হ'তেই প্রাণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। নবগোপালের মা কমলা দেবী মাতৃপ্রেম-রসে স্নিগ্ধ অমৃতময়ী মূর্ত্তি। প্রভাতকুমারের একটী গুণ, কোনও নৈরাশ্য, সন্দেহ বা দুঃখ তাঁর লেখাতে স্থান পায় না, যেখান-সেখান হ'তে অকস্মাৎ হাসির ফোয়ারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে—বিশেষতঃ, শেষটা সকলের শুভ-সম্মিলনের আনন্দের ভিতর শেষ হয়। বিয়োগান্ত উপন্যাস-পাঠে দুঃখভারে অবসন্ন-প্রাণ বাঙ্গালীর কাছে প্রভাতকুমারের হাস্য-প্রীতিময় গল্প লাগে বড়ই উপাদেয়। প্রতি কথায় যেন একখানা সরল উজ্জ্বল বাঁধনা-ছাড়া প্রাণ স্বচ্ছ ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে।

তবে, যাঁরা উপন্যাস পড়িয়া জীবনের কোনও গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইতে চান, তাঁরা তাঁর গ্রন্থ পাঠে হতাশ হইবেন। অল্প জলের মাছের মত; প্রাণের উপরের ভাগ লইয়াই তিনি খেলা করেন, ভিতরে প্রবেশের শক্তি নাই। তাঁর লেখা আনন্দের নির্ঝর—নির্দ্দোষ আমোদ দান করিয়া জীবনকে সরস ও মধুর করাই তার কাজ; তেমন কোনও ঘটনার সমাবেশ নাই—শুধু একটু সরল নির্ম্মল হাসি। শুধু 'অকারণ পুলক'—আর কিছু নাই, ক্ষণিক-দিনের ক্ষণিক কাহিনী, কোন প্রকার জটিলতা দ্বারা সামান্য রকমেও ভারাক্রান্ত নয়। জীবন-সংগ্রামে পরাজিত, ক্লিষ্ট, তাপিত, শান্তিশূন্য বাঙ্গালীর প্রাণের পক্ষে এ-আনন্দের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

* * * *

কাল হ'তে মনে একটী প্রশ্ন জাগিতেছে—অন্ধকার না আলো আগে।

বই পড়িয়া মনে ধারণা হইয়াছে—পূর্ব্বে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, শেষে আলো দেখা দিয়াছে।

অন্ধকার ও আলো কি দুটী ভিন্ন জিনিষ? যদি তাই হয়, তা হ'লে অন্ধকার হ'তে আলো আসিল কেমন করিয়া? না—দুই এক? একের ভিতর অন্যটী নিহিত? অন্ধকার কি আলোরই ঘনাবস্থা?

৫.৭.১৩।—কালের ভিতর বর্ষাকালটী, বিশেষ করিয়া তার প্রথম-ভাগটী, সব চেয়ে আমার ভাল লাগে। এটী বাঙ্গালা-প্রকৃতির বিশেষত্ব। বর্ষার ঘন-মেঘে ঢাকা আকাশ, সারাদিন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, মাঝে মাঝে হু হু করিয়া বাতাসের ঝাপ্‌টা উঠিয়া বহিয়া যাইতেছে—এ সব সময় ঘরের বারান্দায় বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইতে কেমন একটী আনন্দের ভাবে আমার প্রাণ নাচিয়া ওঠে।

তার চেয়েও বুঝি আর একটী সুন্দর দৃশ্য আছে। সেটী বৈশাখের বৈকালিক ঝড়। সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে, আকাশ কালো-মেঘে ভরিয়া গিয়াছে, মেঘের পাছে মেঘ ছুটিয়াছে, আরো মেঘ, আরো মেঘ, আরো মেঘ,—পিছনে আরো মেঘ, মেঘের নীচ দিয়া সাদা বকের শ্রেণী উড়িয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে মেঘের ভিতর বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, গুড়্ গুড়্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বজ্র-নিনাদ হইতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, বায়ুবেগে গাছপালার আগাডালগুলি যেন দুলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপী কি এক তোলপাড় পড়িয়া গিয়াছে—দৃশ্যটী ভয়ঙ্কর, কিন্তু কেমন চিত্তাকর্ষক! এ-সব সময় আমার প্রাণে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ন্যায় কি যে এক ভয়-বিস্ময়-আনন্দ-মিশ্রিত ভাব ক্রীড়া করিতে থাকে, তা বলিবার নয়। তখন, আমার অন্তরস্থ পাখীটীও যেন সেই উদ্দাম ঝড়ের ন্যায় বন্ধন-বিমুক্ত অবস্থায় ডানা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বে

ছুটিয়া বেড়াইবার জন্য আকুল হইয়া ওঠে। বাল্যকাল হ'তেই প্রকৃতির এই ভৈরব-সুন্দর দৃশ্যটী আমার নিকট মনোমোহন।

৬.৭.১৩।—সকল ধর্ম্মই বলে, নিজেকে চিন, নিজ আত্মাকে চিন। Know thyself—ইহাই নাকি ধর্ম্মজীবনের সার উপদেশ। আমি কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না—নিজে নিজেকে জানিবে কি প্রকারে? চিনি, চিনি খাইবে কেমন করিয়া? চক্ষু, চক্ষুকে দেখিবে কেমন করিয়া? 'আমির' অন্ত নাই, তাই এক 'আমি' অন্য 'আমিকে' দেখিতেছে এবং তার সহিত অন্যের আত্মার তুলনা করিতেছে, কিন্তু 'আমির' ভিতর মূল সার যদি কিছু থাকিয়া থাকে—তা' নিজেকে কেমন করিয়া চিনিবে, বিচার করিবে? 'চিনি' বলিতেই দুটী জিনিষের দরকার, একটী—যে চিনে; আর একটী—যাকে চিনে। যে-স্থানে বলা হয়, নিজেকে নিজে চিনিয়া লও, সেখানে নিজেকে মনোমধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়—তার এক ভাগ অন্য ভাগকে চিনে। প্রকৃত 'আমি' চিরকাল দুর্জ্জ্ঞেয়,—'আমি' তাকে চিনে না, চিনিবার উপায়ও নাই।

* * * *

পরিবার হ'তে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাঝে মাঝে একাকী নির্জ্জনে থাকা প্রয়োজন। ব্যবধানে তাদের প্রতি ভালবাসা বাড়ে; জীবনও অন্য প্রকারে মধুর ও পুষ্ট হইয়া ওঠে।

একাকী, লোক-চোখের অন্তরালে ক্ষুদ্র লতাটী পাতায়-ফুলে আপন-ভাবে ফুটিয়া উঠিবার যেমন সুযোগ পায়—আজ এই তন্তুটী বাহির হয়, আর একদিন কলিকাটী দেখা দেয়,—সেই প্রকার নির্জ্জনতার ভিতর মানুষের জীবনটীও ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। একাকী জীবন কাটানো বেশ সুখেরই বটে—যদি প্রবৃত্তি-তাড়না কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি লাভ

করিয়া থাকে, যদি গ্রন্থ-চর্চ্চা জীবনের সুখোৎপাদন-বিষয়ে প্রধান উপায়ে পরিণত হইয়া থাকে, উপযুক্ত পরিমাণে মনোমত অজস্র গ্রন্থ-সমাবেশ থাকে, আর যদি মানুষ প্রকৃতির হৃদয়-ভিতরে প্রবেশ করিয়া তার সৌন্দর্য্য-সম্ভার উপভোগ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া থাকে, এবং ভাবনা, ধীর স্থির স্নিগ্ধ, জীবন-সমস্যা সাধন-বিষয়ে মনের প্রধান অঙ্গে পরিণত হইয়া থাকে।

৭.৭.১৩।—নবীনচন্দ্রের 'আত্মজীবনী' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পড়া গেল। লেখায় বেশ সরলতা, বাঙ্গালাটী ঝক্‌ঝকে—পড়িতে উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক। সেকালের বাঙ্গালী সমাজের চাকরী-জীবনের বেশ একটী চিত্র। কিন্তু যেমন নবীনচন্দ্রের কবিতা, তেমন তাঁর এই জীবনী, দুই-ই একরকম; ভাবের কোন প্রকার গভীরতা, ভাব-ব্যঞ্জকতা নাই; কোনটাই প্রাণের উপর তেমন কোনও দাগ রাখিয়া যায় না। তাঁর জ্ঞান-রাজ্যের বিস্তৃতি নিতান্তই সীমাবদ্ধ; কবিপ্রতিভা ছিল; কিন্তু তেমন ভাবে চর্চ্চা দ্বারা তার বিকাশ করিতে পারেন নাই।

জীবন-চরিতখানা পড়িতে পড়িতে কেমন একটা ঘৃণার ভাব আসিয়া দেখা দেয়! কি আত্মম্ভরিতা, কি পরনিন্দা—কি ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ! তিনি যা করিয়াছেন, সবই ভাল; যদি কেহ বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইল, তা হ'লেই সে মন্দ, অসৎ হইয়া দাঁড়াইল।

তাঁর জীবনীতে মাত্র দুটী লোকের প্রশংসা দেখিলাম—একজন রবীন্দ্র-নাথ, আর একজন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর সঙ্গে আলাপের সময় বুঝিতাম, রবীন্দ্রনাথকে তিনি মনে মনে ঈর্ষা করিতেন। কবি-প্রতিভায় যে তিনি তাঁর অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তা সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর স্তুতিবাদ, নিতান্ত স্বতোত্থিত নয়; তা দুর্ব্বলের নিকট হ'তে

সবলের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার আদায়। লোকের কাছে নিজেকে নিতান্ত উদার দেখাইবার ইচ্ছাও এর মূলে রহিয়াছে।

হীরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অন্য কথা। তাঁকে নবীনচন্দ্র প্রসন্নবদন সৌম্য-মূর্ত্তি ধীর জ্ঞান-গম্ভীর প্রাচীনকালের ঋষির সহিত তুলনা করিয়াছেন। এটর্ণির সঙ্গে ঋষির তুলনা! নিতান্তই অত্যুক্তি! হীরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রধান সমালোচক, তাঁর কবিত্ব-মহিমার প্রধান প্রচারক ও উপাসক। তাঁর মতে নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও মধুসূদন উভয় হ'তেই শ্রেষ্ঠ। এমন স্তুতিবাদ যিনি করিতে পারেন, ও বিশেষতঃ সে-ব্যক্তির কথা যদি সমাজে মূল্যবান্ বলিয়া গ্রহণীয় হয়, তা হ'লে তাঁর স্তুতি আপনা হ'তেই মুখে আসিয়া দেখা দেয়। নবীন ও হেম—কে শ্রেষ্ঠ, নির্ণয় করা সমস্যার বিষয়। উভয়েই তো মরিতে বসিয়াছে। নবীনচন্দ্রের 'পলাশী যুদ্ধের' কিয়দংশ ছাড়া যে কিছু বাঁচিবে, মনে তো হয় না। হেমচন্দ্রেরও কতটা বাঁচিবে, এবং কিছু বাঁচিবে কি না, মহা-কালই বলিতে পারে। তাঁর লেখা প্রায়ই অপাঠ্য —'বৃত্রসংহার' পড়িতে যাইয়া অনেক সময়েই মনে হয়, যেন শক্ত মটর ও বুট ভাজা একত্র করিয়া চিবাইতেছি। রস নাই বলিলেই চলে, বলিবার ভঙ্গীও নিতান্তই নিকৃষ্ট রকমের ; কিন্তু বুট-ভাজারও মূল্য আছে,— পুষ্টিকর খাদ্য ; সে হিসাবে হেমচন্দ্রও ফেলিবার জিনিষ নয়। পক্ষান্তরে, নবীনচন্দ্রের লেখায় মিষ্টত্ব আছে, কবিতার ধ্বনি আছে, কিন্তু নিতান্তই মেরুদণ্ড-ভাঙ্গা লোকের মত, নিজের ভরে নিজে যেন দাঁড়াইতেই পারে না। অনাবশ্যক লম্ফ ঝম্ফ—অনাবশ্যক হা হুতাশ। সে যা হোক্, 'মেঘনাদবধের' কবির উপরে নবীনচন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ করা, নিতান্তই সমালোচক-পদের অপব্যবহার। নবীনচন্দ্র নিজেকে হেমচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি মনে করিতেন এবং জনসাধারণ যে তাঁকে নীচে স্থান দিত, তা তাঁর অসহ্য ছিল, কিন্তু মধুসূদন অপেক্ষা যে তিনি শ্রেষ্ঠ, তা তিনি নিজেও মনে করিতেন না।

নবীনচন্দ্রের চরিত্র, যা এই জীবনীতে তাঁর নিজ কলমের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাতে সৌন্দর্য্যের তিলটুকুও নাই; যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ঘৃণা ও লজ্জায় নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া আসে।

কিন্তু এমন দিনও শেষে হয় তো আসিবে, যখন তাঁর এ-কাহিনী সরলতার আদর্শস্বরূপ গৃহীত হইবে ও তাঁর বিরুদ্ধ-মত-প্রকাশক অন্য কোনও গ্রন্থের অভাবে তাঁর লিখিত সব কথাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। এই প্রকারেই অনেক সময় ইতিহাসের উপকরণের সৃষ্টি হয়।

৮.৭.১৩।—ইংরাজের আদর্শ সারাজীবন পরিশ্রম করা, কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থাকা। ব্যায়ামে যেমন দেহের পুষ্টিসাধন ও উৎকর্ষ হয়, সেই প্রকার কাজে মনের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও প্রফুল্লতা আনয়ন করে। শেষ পর্য্যন্ত খাটিয়া মরা—ইহাই তাদের কাম্য, to die in harness.

এ-দেশের আদর্শ ছিল অন্য রকমের। শিশুকাল হ'তে যৌবনারম্ভ পর্য্যন্ত লেখা পড়া, পরে গৃহস্থ হইয়া সংসারে প্রবেশ করা, তার পর হ'তে মৃত্যুর অতীত যে জীবন রহিয়াছে, তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তোলা এবং সর্ব্বশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া বনের ভিতর প্রকৃতির কোলে জীবনের অবশিষ্টকাল ভগবৎ-চিন্তায় কাটানো—ইহাই আমাদের আদর্শ জীবন। পূর্ব্বকালে যখন প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল, তখন এ আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবন একরকম চলিয়া যাইত মন্দ নয়। কিন্তু এখনকার দিনে এমন ভাবে চলিবার কারো অবকাশ নাই; চলিলে অনাহারে মৃত্যু সুনিশ্চিত। চিন্তাশীলতা মানব-চরিত্রের মহাগুণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু অত্যধিক চিন্তায় মানুষের কার্য্য-শক্তি কমিয়া যায়, অসারতা ও অনাসক্তির

ভাব দেখা দেয়। বিশেষতঃ, চক্ষু বুজিয়া জঙ্গলের ভিতর নির্জ্জনে বিনা কাজে সময় কাটানো—এ আদর্শ তো আমার চোখে নিতান্তই সার-হীন বোধ হয়। আমরা এক্ষণে আমাদের আদর্শের প্রভাবে আর ভাবুকও নই—আমাদেরই দেশের রোমন্থন-প্রিয় সুবিখ্যাত জন্তুটীর ন্যায় উৎসাহ-উদ্দমশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছি। নানা কারণে আমরা এক্ষণে জগতের অস্পৃশ্য জাতি-বিশেষে পরিণত হইয়াছি, helots.

৯·৭·১৩।—রবীন্দ্রনাথকে অনেক দিন হইল একবার ঢাকা কন্‌ফারেন্সের সময় দেখিয়াছিলাম। সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি! মনে হইত, কোনও নিপুণ বিশ্ব-শিল্পী অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এ-মূর্ত্তি খুঁদিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ, অল্পভাষিতা। কথা তিনি প্রায় একপ্রকার বলিতেনই না, কিন্তু যখনই বলিতেন, এত মধুর লাগিত, যে সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া যাইত না। দেখিতাম, নানা জনে নানা কথা বলিতেছে, এমন সময় যেই রবীন্দ্রনাথ একটী কথা বলিলেম, অমনি সকলে চুপ করিল এবং কান খাড়া করিয়া তাঁর কথা শুনিতে লাগিল। সেবার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কন্‌ফারেন্সে আসিয়াছিলেন। প্রথম জন সদাব্যস্ত, সর্ব্বক্ষণই খইয়ের মত মুখে কথা ফুটিতেছে; কালীচরণ সভাপতি ছিলেন, তাঁর অপেক্ষা অনেক কম কথা বলিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা কথা কম বলিতেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতাম, তাঁর সেই দুটী বাক্য শুনিবার জন্য লোকে যেমন আগ্রহ প্রকাশ করিত, এমন আর কারো কথা শুনিবার জন্য নয়। এমন কি, সুরেন্দ্রনাথও যেন রবীন্দ্রনাথের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। তিনি যে সে-স্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, সকলের উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত, তা সকলেই যেন মনে মনে অনুভব করিতেন।

রবিবাবুর সঙ্গে আমার কখনো আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু তাঁকে দেখিলেই আমার প্রাণে কেমন এক বিমল আনন্দ উপস্থিত হইত। বুড়ী-গঙ্গার ধারে তখনকার পরিত্যক্ত সিভিল-সার্জ্জনের বাটীতে তাঁরা থাকিতেন। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় দেখিতাম, তিনি শয়নকক্ষ হ'তে বাহির হইয়া দ্বিতলের কাঠের উন্মুক্ত সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া নদীর দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। ঋজু সুদীর্ঘ মূর্ত্তি, পরিধানে ঢিলা রেশমী কাপড়ের পায়জামা, জড়ি-করা নাগরী জুতা পায়, গায়ে রেশমের ঢিলা লম্বা পাঞ্জাবী ধরণের পিরাণ—তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ দেহের সঙ্গে রেশমের সোনালি রং মিশিয়া কেমন এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছে! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট প্রশান্তোজ্জ্বল তাঁর চক্ষু দুটী। চাহিলে মনে হইত, না জানি জীবনের কত গূঢ় সমস্যার বিষয়, কত প্রীতি-প্রেমে-মাখা ভাব প্রাণে বিরাজ করিতেছে! নবীনচন্দ্র তাঁর মূর্ত্তির সহিত যীশু-খ্রীষ্টের মূর্ত্তির তুলনা করিয়াছেন। উপমাটী বড়ই যেন মিলিয়াছে। আমিও অনেক দিন খুঁজিতেছিলাম—রবীন্দ্রনাথের মত আর কাকে যেন দেখিয়াছি। নবীনচন্দ্রের 'আত্মজীবনী' পাঠের শেষে আমারই পাঠ-কক্ষে ক্রুশে-বিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের মূর্ত্তির সহিত তুলনা করিয়া সে সংশয় দূর হইল। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাধারণ লোকের পার্থক্যই এ-সব স্থানে; নবীনচন্দ্র অনায়াসে যা ধরিয়াছেন, আমি অনেক খুঁজিয়াও তার সন্ধান পাই নাই।

সকল সময়ই যেন রবীন্দ্রনাথ ভাব-রাজ্যে খেলা করিতেছেন, ইহা তাঁর প্রকৃতিগত গুণ। এর কল্যাণেই তিনি প্রধান্ কবি। তাঁর কাছে প্রকৃতি নীরব নয়, সর্ব্বক্ষণই তাঁর মনের দ্বারে আসিয়া কত নূতন তত্ত্ব শুনাইয়া যাইতেছে। সে অমৃত-বাণী যার কানে একবার পৌঁছিয়াছে, তাঁর কাছে সাধারণ লোকের কথাবার্ত্তা ভাল লাগিবে কেন? এই জন্যই

বুঝি তিনি লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বা তাদের সঙ্গে অধিক মিশিতে নারাজ।

বন্ধুবর জ্ঞা···বাবু ভা—থাকিতে একদিন বলিয়াছিলেন, যে তিনি রবি বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁর পড়াশুনা যে বড় বেশী, এমন নয়। তিনি এমনও বলিলেন, যে ধরিতে গেলে তিনিও রবিবাবু হ'তে অনেক অধিক বই পড়িয়াছেন। কিন্তু হ'লে কি হয়? জ্ঞা···বাবু নিজেই বলিলেন, যে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনের ভিতরই এত ভাব জমিয়া রহিয়াছে, যে তাহাই পরকে বিলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না; পর-হ'তে তিনি আর নূতন কি গ্রহণ করিবেন?

সকল শ্রেষ্ঠ লেখক সম্বন্ধেই এই কথা। চিন্তা দ্বারা মানব-সমাজ চালিত হইতেছে। যারা সংসারে প্রকৃত সুখ চায়, প্রাধান্য চায়—তারা চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করুক্।

১০·৭·২৩।—ভগবান সম্বন্ধে মনের যে ভাব, তা পরিবর্ত্তন কর; দেখিবে, সমস্ত জীবনই নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে।

যতদিন ভগবান-বিশ্বাসী ছিলাম, ততদিন মনের ভিতরটা বড়ই যেন দুর্ব্বল ছিল। এখন সর্ব্বক্ষণই মনে হয়, যা করিতে হইবে, সহিতে হইবে, সবই নিজের। ভগবান কি অন্য কেউ নাই, যাঁর দিকে বিপদের দিনে চাহিতে পারি। এখন, গৃহে কারো ব্যারাম হ'লে, মনে করি না যে ভগবানকে কাতর-স্বরে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলে, তিনি দয়াপরবশ হইয়া রোগমুক্ত করিয়া দিবেন। এখন, সকল কাজেই, সকল অবস্থাতেই নিজের উপর ভর করিয়া চলিতে হয়। সম্পদে কি বিপদে মানুষের নিজের প্রধান সহায় নিজে, অন্য কেহ নয়।

এ-সকল কারণেই বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী আমার বড় ভাল লাগে।

আনন্দও তাঁর অন্যান্য শিষ্যের নিকট কথিত তাঁর শেষ কথাগুলি আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে—"নিজ-মুক্তি নিজ-চেষ্টায় সাধন কর, নিজ-পথের আলো নিজে হইও।" সত্য কথা, আমাকে ছাড়া, আমাকে সাহায্য করিবার কে আছে ?

ভগবান, ভক্তি, তাঁর প্রতি দাস্য সৌখ্য শান্ত প্রভৃতি ভাব মনকে নিতান্ত হীনাবস্থায় আনিয়া ফেলে। সকল কাজেই ভক্ত অন্য একজনের দিকে চাহিয়া আছে, যেন নিজের কোনও স্বাধীন অস্তিত্বই নাই। যে সমাজে বৈষ্ণবের প্রাধান্য, সে সমাজ হ'তে শক্তি, সাহস, বীর্য্য, মানুষের প্রধান গুণগুলি, অন্তর্হিত হয়। বীর গ্রীক্‌জাতির সাহিত্যেই Prometheus র মত চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়।

আর ভগবান! কে তাঁকে দেখিয়াছে? মানুষের কল্পিত কিম্ভূত কিমাকার সৃষ্টি এই ভগবান। এঁর নাকি চোখ নাই, তথাপি দেখেন; কান নাই, তাও শোনেন; নাক নাই, তবুও ঘ্রাণশক্তি বিদ্যমান; নির্গুণ, কিন্তু ভালবাসেন; নির্ব্বিকার, অথচ সময়-বিশেষে ক্রোধান্বিত; একাধারে নিরাকার ও সাকার। কিন্তু এঁর শেষের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। মনে পড়ে, বহুদিন পূর্ব্বে 'নববৃন্দাবন' নাটকে পড়িয়াছিলাম, নাটকের নায়ক মদে বিভোর হইয়া স্ত্রীকে বলিতেছে—"শোন নি, বিলাত হ'তে টেলি এসেছে, ভগবান বুড়ো হ'য়েছিল, মারা গেছে।" সত্যি কথা, ভগবান বুড়াই হইয়াছেন; মারা কিন্তু এখনও যান নাই, তবে অধিক দিন বাকী নাই। টেলিগ্রাম ইয়ুরোপ হ'তেই আসিবে—সেখানকার Science laboratory হ'তে।

রামমোহন রায়ের জনৈক আত্মীয় বলিতেন, দাদামশায় তেত্রিশ-কোটী দেবতা দূর ক'রে এক দেবতা রেখেছিলেন, আমি সেটাকেও তাড়িয়েছি। আমরা, কলেজের ছাত্র, তাঁর কথা লইয়া তখন হাসিতামাসা করিতাম,

কেহ কেহ তাঁকে পাগল বলিতেও ক্রটী করিত না। এখন দেখিতেছি, পাগল যা বলিয়াছিলেন, তার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। ভগবান আছেন, সকল বিষয়ে তিনিই কর্ত্তা, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য যা কিছু, তাঁহা হ'তে প্রাপ্ত—এই প্রকার একটা গুরুভাররূপ অসত্য-ভাব সমস্ত মানবমণ্ডলীর মনের উপর বহুকাল হ'তে চাপিয়া রহিয়াছে। এরই জন্য মানুষ ঠিক আপনার প্রকৃতিদত্ত পূর্ণ আকার (stature) লাভ করিতে পারিতেছে না, খর্ব্বাকার বামনরূপেই সে তৃপ্ত। যে-দিন মানুষ ভগবানে পূর্ণ-অবিশ্বাসী হইয়া, শুধু নিজ শক্তিতে ভর করিয়া জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইবে, সে দিন তার ক্ষমতাদর্শনে জগৎ কম্পিত ও বিস্মিত হইবে। তার ভিতর, কি বীর সুপ্ত-অবস্থায় বাস করিতেছে, তার সন্ধান সে এখনও পায় নাই,—মিছা বৃথা-ক্ষেত্রে সে শক্তির অপচয় করিতেছে।

১১.৭.১৩।—সারাজীবন জল্পনা-কল্পনাতেই গেল—কাজ কিছুই হইল না! কিছুই হইল না! ভাবিতে ভাবিতে কি যেন এক তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ ভরিয়া উঠিল। এ কিসের ক্ষুধা? প্রাণ যেন কি করিতে চায়, আকুল-নেত্রে হাত বাড়াইতেছে, কিন্তু কিছুই যেন করিয়া উঠিতে পারে না; মনে হয়, সমস্ত বিশ্ব করতলগত হ'লেও এ ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবার নয়। প্রাণের যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে যাইয়া, নেপোলিয়ান শেষে বন্দীভাবে প্রাণ হারাইয়াছিলেন—এ সে ক্ষুধা। ইচ্ছা করে, এমন একটা কিছু করি, যাতে প্রাণের এ-তীব্র পিপাসার শান্তি হয়। সঙ্গে সঙ্গে....কি হয়? কিছুই বুঝি না! প্রাণ কি যেন চায়,—কিন্তু কি চায়, কিছুই যে বুঝি না!

ওগো! তোমরা যদি কেউ থাক, আমায় তোমাদের কাজে লাগাও। ভগবান! তুমি কি আছ? যদি থাকিবেই, তা হ'লে মানুষের এ জীবনব্যাপী ক্ষুধা এ পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইল না কেন? কি অনন্ত জ্বালা জ্বালাইয়া দিয়াছ

মানুষের প্রাণে? আসৃষ্টি মানুষ কাঁদিয়া কাটিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা তো তার মিটিল না। কখনো মিটিবে কি? সমস্ত বিশ্বব্যাপী এই অতৃপ্তি—মানুষ কি যেন চাহিতেছে, অথচ কি যেন পাইতেছে না। কে বলিবে, কোথা হ'তে তার এ-ক্ষুদ্র প্রাণের ভিতর এই অফুরন্ত অতৃপ্তির ভাব আসিল, কেমন করিয়া বা তার নিবৃত্তি হইবে? হইবে কি কখনো? অতীতের ইতিহাস বলিতেছে—না। চারিদিক হ'তে এই বাণীর প্রতিধ্বনিই যে কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

১২.৭.১৩।—Goetheর মতে মানব-জীবন-যাপনও একটী art কলা-বিশেষ। আদর্শ জীবন-যাপন—মানুষের একটী প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। মানুষ বহির্জগৎ লইয়াই আগাগোড়া ব্যস্ত; নিজ জীবনটী কি, কেমন করিয়া চলিলে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে আলোচনায় তেমন মনোযোগ দেয় নাই। অবশ্য, জীবনাদর্শ নানা ভাবে নানা-সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি দেখা যাইবে, এমন কতকগুলি গুণ ও শক্তি মানুষের ভিতর স্থায়ীভাবে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, যে তার উৎকর্ষ ও সামঞ্জস্য কি প্রকারে করিলে, জীবন সর্ব্বাপেক্ষা সুখপ্রদ ও ফলপ্রদ হয়, তার অনুসন্ধান করা মানুষের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। ঠিক মনোবিজ্ঞান Psychology বা দর্শন Ethics দ্বারা এ-কাজ সাধিত হইতেছে না। তাই Science of Life জীবন-বিজ্ঞান নামে এক নূতন শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য, দেশানুসারে এই Science কিছু কিছু ভিন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করিবে। যে সমাজে যে আদর্শ, সে সমাজে সে আদর্শের কাছে পৌঁছিবার চেষ্টাই এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইবে। শেষটা অবশ্য দেখা যাইবে, সমস্ত সমাজের ভিতরই কতকগুলি সত্য ক্রীড়া করিতেছে, যা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। সেই সার

সত্য-সমূহকে পুষ্ট ও সমাজকে তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যত্ন করিলে, জীবনটা কিছু পরিমাণেও সম্ভোগের জিনিষ করা যায়।

১৩.৭.১৩।—দার্শনিক তারস্বরে বলিতেছেন, জগৎ matter and mind জড় ও আত্মার এই দুই সত্বার ক্রীড়াভূমি।

আত্মা mind, spirit বলিয়া সত্য ভিন্ন কিছু আছে কি ? উহা জড়েরই একটা স্ফুরণ-বিশেষ। যা আছে, তা জড় physical, matter না হইয়া পারে না। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, তাকে জড়রূপে স্বীকার করিতে হইবে। জড়ের নানা অংশ, নানা মূর্ত্তি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তাকেই আমরা জড় আখ্যা দিই ; যে অংশ হয় না, তাকেই আত্মা বলি। আত্মা একটা লোকের ভ্রান্ত-সংস্কার, পৃথক্ এমন কিছুই নাই।

১৪.৭.২৩।—গত রবিবার Captain Cli···নামক কলিকাতা হ'তে আগত একটী সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, লোকটী পূর্ব্বে সৈনিক-বিভাগে কাজ করিতেন। এক্ষণে পেনসন্ লইয়া Society for the Protection of Children নামে কলিকাতায় নূতন স্থাপিত একটী সমিতির সম্পর্কে কাজ করিতেছেন। পূর্ব্বে লোক-সংহার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ; এক্ষণে জীবন-সায়াহ্নে লোক-রক্ষারূপ মহৎ-কার্য্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন।

এই তো মানুষ! এই তো পুরুষসিংহ! বৃদ্ধ হইয়াছেন, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তথাপি কি উৎসাহ, কি স্ফূর্ত্তি, কি তেজ! হাতে কাজ ছিল না, তাই গায়ে পড়িয়া কাজ জুটাইয়া নিয়াছেন। বাঙ্গালী

পেনসনের পর, কয়েক বছর ঝিমাইয়া ঘুমাইয়া শেষে হাত পা পেট ফুলিয়া মরিয়া যায়। যারা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে, তারাও অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কোনও প্রকারে জীবন-যাপন করে মাত্র। মানুষের মত ক'জন প্রাণ-ধারণ করে?

কাপ্তান-সাহেব ছেলেদের সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। বক্তৃতাটী ছোট, কিন্তু বেশ সুন্দর সুন্দর কথায় ও ভাবে পূর্ণ ছিল। প্রতি কথা হ'তে যেন উৎসাহ ও আশা ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, এক্ষণে সভ্য-জগতের লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছে, যে কোন পরিবার অথবা সমাজই হোক, সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার চেয়ে, সন্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য তাহা ব্যয় করিলে, কালে অধিকতর লাভ হয়। কথাটী বড়ই ঠিক, কিন্তু দেশের ক'জন এ সার সত্য অনুধাবন করিতে পারিয়াছে? তিনি বলিলেন, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সমস্ত সভ্যদেশেই গত বিশ বছরের মধ্যে শিশুদের পালন ও শিক্ষা-সম্বন্ধে যত আইন প্রচলিত হইয়াছে, গত শতাব্দীর বাকী বৎসর সমূহের ভিতরও তা হয় নাই। এতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যাইতেছে, সকল দেশের লোকেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, যে শিশুরূপ সম্পদের মত জাতির এমন মূল্যবান্ সম্পদ আর নাই। যে সমাজে ও দেশে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই সমাজ ও সেই দেশই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও ক্ষমতাপন্ন। তার দৃষ্টান্ত জার্ম্মেণি, তার দৃষ্টান্ত ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা।

সমস্ত সভ্যমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন, আপনারা কি আপনাদের সন্তানদের প্রতি আপনাদের যে কর্ত্তব্য duty রহিয়াছে, তা পালন করিয়াছেন, কি এক্ষণে করিতেছেন? আপনারা কি তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, সময়োপযোগী আহার ও পরিচ্ছদ দিয়া থাকেন? কি শয্যায় শয়ন করিলে, কতক্ষণ

ঘুমাইলে, কি ভাবে জীবন যাপন করিলে, শিক্ষা পাইলে তারা ভবিষ্যতে সুপুরুষ হইবে, বিদ্বান্ হইবে, দেহ ও মনের বলে শক্তিশালী হ'তে পারিবে, বংশের ও দেশের গৌরব হইবে, তার সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন ? আপনাদের কন্যাদের লেখাপড়ারই বা আপনারা কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন ?

সত্য বটে, আমরা দরিদ্র এবং দারিদ্র্যের দরুণ অনেক কাজ মনোমত করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু আমরা দরিদ্র কেন এবং কি করিলে এই ভয়াবহ দারিদ্র্য দূর হয়, তা তেমন ভাবে চিন্তা করি কি ? আমরা অর্থ অপেক্ষাও ভাবে এবং কার্য্যকরী ক্ষমতায় অধিক দরিদ্র। আমরা নিজেরা তো দরিদ্রই রহিয়া গেলাম। ভবিষ্যতের সন্তান যে মানুষ হইয়া দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইবে, তার চেষ্টা কি করিতেছি ? সন্তানের পিতা হ'তে বড়ই অভিলাষী আমরা, কিন্তু জন্মগ্রহণ করার কিছু পরেই, আমাদের অমনোযোগীতাবশতঃ তাদের অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যারা বাঁচিয়া থাকে, তারা অর্দ্ধাহার ও অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ভিতর কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। মানুষের মত মানুষ হইয়া ওঠে ক'জন ?

লজ্জার, দুঃখের কথা ! একটী বৃদ্ধ ইংরাজ আমাদের ছেলেপেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন, আর আমরা নিশ্চিন্ত-মনে ঘুমাইতেছি। পরের সমাজের দোষ ধরিতে আমরা বড়ই মজবুত, কিন্তু নিজেরা যে সংসারের সকল জাতির অধম, তার প্রতি দৃষ্টি নাই। কেন, বিদেশীরা আমাদের দরিদ্র অসহায় শিশুদের রাস্তা হ'তে কুড়াইয়া, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মানুষ করার চেষ্টা করিতেছে, আমরাও কি প্রতি সহরে অনেকটা এই ভাবের সমিতি স্থাপন করিতে পারি না ?

সহরের যত সন্তানের অভিভাবক এই সমিতির সভ্য থাকিবেন ; ছেলে-

মেয়েরা কে কি প্রকার শিক্ষা পাইতেছে, কি অভাব অভিযোগ তাদের, কি প্রকারে চালিত হ'লে তারা সুস্থ, সবলকায় ও সুশিক্ষিত হ'তে পারে—কত বিষয়ই না সমিতির বিবেচ্য হ'তে পারে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় এমন অনেক সমিতি রহিয়াছে; এদেশে তার নামও শোনা যায় না।

ক্যাপ্‌টেন ক্লি···র বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে প্রাণের ভিতর আমি বড়ই উৎসাহের স্পন্দন অনুভব করিতেছিলাম। আমারও তাঁর মত কোন একটা সৎকাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করিয়া দিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছিল। লোকটী আমার হৃদয়ের মূল ধরিয়া যেন তাঁর দিকে টানিতেছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবনে এমন উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হয় নাই।

১৫·৭·১৩।—Duty ও Silence এই দুটী কথার ঠিক্ মনোমত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? কারণ—এ সকল ভাবের চর্চ্চা আমরা করিয়াছি কিছু কমই। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর সাহিত্যে silence শব্দটী চিত্তের যে ভাব প্রকাশ করে, তার প্রশংসা-সূচক বাক্য পাওয়ার আশা করা অন্যায়। বাঙ্গালার উপন্যাসে নায়ক নায়িকাদের বক্তৃতার জ্বালায় কান ঝালাপালা হইয়া ওঠে। মনে পড়ে না, বাঙ্গলার কোনও গ্রন্থে তেমন কোনও চরিত্রের বর্ণনা দেখিয়াছি, যে কথা তেমন না বলিয়া ধীরে নির্জ্জনে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে। শকুন্তলার বর্ণিত কণ্বমুনি অথবা Les Miserablesর Good Bishopর ন্যায় চরিত্রের সহিত বাঙ্গালীর সাহিত্যে দর্শন-লাভ একপ্রকার অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে একটী মাত্র আছে, যা অনেকটা এদের ধরণের,—চন্দ্রশেখর। কিন্তু শেষটা সেও বক্তৃতাবাগীশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে তার যে চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ, তুলনায়

তার শেষের চিত্র কেমন ম্লান! ইয়ুরোপীয় ঔপন্যাসিকের হস্তে ধীর স্থির সমাহিত-চিত্ত পুরুষ স্বরূপে এই চরিত্র ফুটিয়া উঠিত।

চিরকালই কথা অপেক্ষা কাজের গৌরব অধিক। এমন কি, মনে হয়, যত কথা বেশী বলা যায়, ততই যেন মানুষের মহত্ত্বে আঘাত পড়ে। মুনি-ঋষিরা বৃথা-বাক্যে শক্তি ও সময়ের অপচয় করিতেন না। ইংরাজও জানে, যিনি চুপ করিয়া নিজের ভাবে নিজ কাজ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মানুষ। Babbler বাচালের তাদের সমাজে স্থান নাই; আমাদের সমাজে এমন লোক সমাজদার প্রভৃতি গৌরব আখ্যায় ভূষিত। এ জন্যই সে সব দেশে William the Silent এর silent উপাধি মহাগৌরব-সূচক।

আর Dutyর কথা কি বলিব? ইংরাজ মুখে ভগবানের নাম করে; উহা একটা কথার কথা-বিশেষ, অর্থশূন্য। তাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, এই Duty। প্রথম Duty দেশের প্রতি, তারপর সমাজের প্রতি, তারপর নিজ পরিবারের প্রতি। Trafalgarএর যুদ্ধে আসন্ন-মৃত্যু দেশভক্ত মহাপ্রাণ বীরবর Nelsonএর শেষ-বাণী 'England expects every man to do his duty.' সর্ব্বক্ষণ ইংরাজ-চিত্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আর আমরা! Duty বলিয়া কোনও জিনিষ আমাদের আছে কি?

১৬·৭·১৩।—অনেক দিন হয়, ইটালিয়ান্ লেখক Leo. G. Sera লিখিত On the Tracks of life নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম, ইংরাজ, জার্ম্মেণ প্রভৃতি উত্তর প্রদেশের লোক সকল স্বভাবতঃই sexually-cold, প্রবৃত্তি-পরিচালন-সম্বন্ধে মৃদু-প্রকৃতি। সে সকল দেশের কোনও জিনিষই শীতের তাড়নায় হঠাৎ বাড়িয়া উঠিতে পারে না। কি কীট-পতঙ্গ, কি পশু-পক্ষী, কি বৃক্ষ-লতা, কি মানুষ, সকলকেই শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। অচল হইয়া বসিয়া থাকিলে, সেখানে

মৃত্যু সুনিশ্চিত। এজন্য সে-সকল দেশের লোক বিষম সাহসী, অক্লান্ত-কর্ম্মা।

এশিয়ার উষ্ণ-বায়ুতে, সবই বাড়েও সকালে, মরেও সকালে। রহিয়া সহিয়া তারা কিছু করিতে জানে না। পনর বছরে পা দিতে না দিতেই, এশিয়ার বালিকা পূর্ণ যৌবন-শোভায় ফুটিয়া ওঠে, বিশ-বছর যাইতে না যাইতেই, ম্লান হইয়া পড়ে। গাছ, পাতা, লতা, ফল, ফুল, সবই মহাতেজো-ব্যঞ্জক, সৌন্দর্য্যে-ভরা, কিন্তু কোনটীই অধিককাল স্থায়ী নহে।

এমন সূর্য্যের প্রখর তেজ, এমন সুনীল-সুন্দর আকাশ, এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী ইয়ুরোপে দেখা যায় না। এশিয়া কবিত্বের দেশ, সঙ্গীতের দেশ, সৌন্দর্য্যের দেশ। ইয়ুরোপের দক্ষিণভাগও অনেকটা এশিয়ার ন্যায়; ইটালী ও গ্রীস ইয়ুরোপের কবিতার লীলাভূমি।

কিন্তু ইয়ুরোপেরও উত্তরাংশের কাছে দিন দিন দক্ষিণাংশ হটিয়া যাইতেছে। তার কারণ, সেখানে প্রবৃত্তির তেমন উগ্র তাড়না নাই। সেখানকার লোক সকল sexually-cold; তারা নারীর সঙ্গে মিশে অপ্রতিহতভাবে, কিন্তু সে তুলনায় চরিত্রগত দোষ কম। অর্থ ও রমণী, এই দুটীর সম্বন্ধে সমাজে কি ব্যবস্থা করে, তা দিয়াই জাতির শক্তি, বুদ্ধি ও সামর্থ্য বুঝা যায়। রমণীর পদতলে, এ্যালেকজেণ্ডারের সাম্রাজ্য, রোমান্ সাম্রাজ্য, মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। প্রবৃত্তি-তাড়নায়, অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে মহাসম্পদশালী এশিয়া, জীবন-সংগ্রামে হটিয়া গিয়াছে।

প্রবৃত্তিকে দমন করার প্রধান উপায়—সুশিক্ষা, সু-আচার। ইয়ুরোপের অপেক্ষা এশিয়াকে শিক্ষা প্রচারের জন্য শতগুণ চেষ্টা করা উচিত।

১৭.৭.১৩।—হৃদয়ের ভিতর বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। শক্তির মূল—সর্ব্ব-নিম্নস্তরে। সেখান হ'তেই শক্তি বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে।

এ অবস্থা তার ক্ষয়ের অবস্থা, পতন-অবস্থা। নীরবতার ভিতর শক্তি বাস করে। যতই কথা বলা যায়, ততই যেন শক্তি মূল উৎস হ'তে বিচ্ছুরিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং উৎস ক্রমে ক্রমে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। এমন কি, দেখিয়াছি, নিজের ডায়েরীতেও যদি মনের অভিলাষ প্রকাশ করা যায়, তখন হ'তেই যেন কার্য্য-সম্পাদন করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। যতদিন গোপনে চুপে চুপে কাজ করা যায়, ততদিনই অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; যেমন কথা বলা, অমনি যেন তা বাতাসে উড়িয়া যায়। দেখ না আগ্নেয়গিরি, যতদিন তার erruption নিস্রাব না হয়, ততদিন তার ভিতর কি শক্তিই না নিহিত থাকে। দিনে দিনে, অন্ধকারের ভিতর শক্তি পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে, শেষে বহুবৎসরের পর একদিন তা ভীষণ-মূর্ত্তিতে গলিতস্রাবরূপে বাহির হইয়া নগর জনপদ মানুষ পশুপক্ষী বৃক্ষ সংহার করিয়া থাকে। লোকে ভাবে, আগ্নেয়গিরির এই অগ্ন্যুৎপাতের অবস্থাই তার সর্ব্বাপেক্ষা সামর্থ্যজ্ঞাপক অবস্থা; তা নয়, ইহা তার শক্তির অপচয় অবস্থা।

ভাব জমাট্ অবস্থা, কার্য্য খণ্ডাবস্থা, বাক্য গলিত অবস্থা। যে ভাব পূর্ব্বেই কথায় বাহির হইয়া পড়ে, তা বড় কাজে আসে না। ভাব যখন কার্য্যে প্রকাশিত হয়, তখনই তা লোকের উপকারে আসে।

বাঙ্গালী চিরকাল কথা অধিক বলে, বোধ হয় জলবায়ুর দোষ, তাই তেমন কার্য্যক্ষমও নহে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বাঙ্গালীর তেমন স্থান কৈ? ইংরাজ জার্ম্মেণ অল্পবাক্, তারাই জগতের পরাক্রমশালী দুর্দ্ধর্ষ জাতি।

বেশী কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ কর, তা হ'লে তুমিও মানুষ হইবে।

* * * *

পরিবারের ভিতর তুমি কেমন হইবে? না, মণি-মালার সূতার ন্যায়।

মা, ভাই, ভ্রাতুস্পুত্র, স্ত্রী-পুত্রাদি ও আত্মীয়স্বজন সকলকে তুমি একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিবে; সে সূত্র ভালবাসার সূত্র। তোমার কল্যাণে তোমার চেষ্টায় সকলেই সুখী হইবে, তোমার চেষ্টায় সমস্ত পরিবারটী জ্ঞানী, ধনী ও চরিত্রবান্ পরিবারে পরিণত হইবে। জানিও, এমন একটী পরিবার রচনা করিয়া যাইতে পারিলে, তুমি দেশের মহামঙ্গল সাধন করিয়া গেলে।

১৮.৭.১৩।—Public spirit বলিয়া একটা জিনিষ আমাদের ভিতর নাই বলিলেই চলে। সকলেই যার যার পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জীবন কাটাইতে ইচ্ছুক। পরের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য কে সাধ করিয়া খাটিতে চায়?

ইয়ুরোপে রাজ-শক্তি প্রতি-নিয়ত প্রজাদের উন্নতি ও সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তা অপেক্ষাও প্রজা-সাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সকল সৎকাজের অনুষ্ঠান করে, তা হ'তেই বুঝি বা দেশের অধিকতর উপকার হয়। কেহই বসিয়া নাই, সকলেই একটা না একটা কিছু লইয়া আছে। কেহ Municipality, কেহ Local Board, কেহ শিক্ষা, কেহ স্বাস্থ্য, নানা বিষয় লইয়া ব্যস্ত। কেহ শ্রম-জীবিদের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, কেহ ছেলেদের অভিভাবকদের সঙ্গে মিলিয়া তাদের মানুষ করিবার যত্ন করিতেছে, কেহ আসন্ন-প্রসবা জননীর আহার ও সংস্থানের যোগাড়ে ব্যাপৃত, কেহ দরিদ্রদের বাসোপযোগী গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্যে রত, কেহ পতিতা রমণীদের উদ্ধাররূপ মহাকার্য্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, কেহ গৃহসমূহের পিছনদিকে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া যাতে গৃহবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তার চেষ্টায় রত, কেহ মদ্যপান-নিবারণী সভার সহিত সংশ্লিষ্ট, কেহ জেল হ'তে মুক্ত কয়েদীদের ভবিষ্য আহার-সংস্থান-যোগাড়ে লিপ্ত—কত না কাজে যে লোকগুলি নিজ হ'তে

নিজেদের লিপ্ত রাখিয়াছে, বলিয়া শেষ করা যায় না। সকলেই কিছু না কিছু দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য করিতেছে; না থাকিলে, কাজ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতেছে। এই জন্যই ইয়ুরোপীয় জাতিদের এই প্রকার সকল বিষয়ে উন্নতি।

আমাদের শিক্ষাই অন্য রকমের। দেশ বলিয়া যে একটা কিছু আছে, যার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, যার গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করা যায়, প্রয়োজন হ'লে যার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দেওয়া যায়, এমন আমরা কিছু শিখি নাই। বাল্যকাল হ'তে শিখিয়াছি—সংসার অসার, ভগবানই একমাত্র সার, এ-জীবন ক্ষণভঙ্গুর, পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় কখন আছে কখন নাই—আর শিখিয়াছি জাত। এই জাতের জ্বালায় এখন জগৎ-সমাজে আমরা জাতি হারাইতে বসিয়াছি।

এতদিন পর্য্যন্ত তাও এ ভাবে একরকম জীবন চালানো গিয়াছে। এখন চারিদিক হ'তে কেবলই যেন দেখিতে পাইতেছি, আর চলে না। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী—দিন দিনই যে সংখ্যায় আমরা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের অপেক্ষা যারা অধঃপতিত ছিল, যাদের অজ্ঞ অসভ্য ব'লে একদিন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছি, তারাও আমাদের পিছনে ফেলিয়া কতদূর না অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমে ক্রমে আমরাই জগতের অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছি [দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর]। এমন অবস্থায়, জীবনাদর্শ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া, অন্য আদর্শ না ধরিলে উপায় কোথায়? সংসারে থাকিয়া সংসার অসার ভাবিলে, দেশে থাকিয়া দেশের কথা না ভাবিলে, সমাজে থাকিয়া সমাজের উন্নতির চেষ্টা না করিলে, মৃত্যু অনিবার্য্য। মানুষ হও, মানুষ হও; ইংরাজের অনুসরণ কর, দেশের জন্য ভাব, দশের জন্য ভাব, সমাজের জন্য ভাব; সাহসী হও, শক্তিমান্ হও, দৃঢ়চিত্ত হও—নবজীবনের ভিতর প্রবেশ কর।

১৯.৭.১৩।—জার্ম্মেণির দর্শনশাস্ত্ররূপ আকাশে দুটী উজ্জ্বল নক্ষত্র—ক্যাণ্ট ও হেগেল। ভাবের গভীরতায়, হৃদয়ের তন্ময়তায় এঁদের সমকক্ষ লোক ইয়ুরোপে বিরল।

হেগেল অনেকটা দুর্ব্বোধ্য। কথিত আছে, তিনি যখন দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে জেনা ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিতেন, তাঁর শ্রোতা ছিল মাত্র চারিজন—উত্তরকালে এঁরা ক'জনই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইয়াছিলেন; দুর্ব্বোধ্য বলিয়া অন্য সকলকেই তাঁর ক্লাস ছাড়িতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। কিন্তু হ'লে কি হয়, ভাবের নূতনত্ব ও গভীরতা-গুণে আজ পর্য্যন্ত হেগেল-দর্শন সর্ব্বত্রই বরণীয়।

চিরস্মরণীয় জেনা-যুদ্ধের রাত্রিতে হেগেল তাঁর Phenomology গ্রন্থ-লেখা শেষ করেন। অদূরে কামানের গর্জ্জন হইতেছে, নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ প্রাসিয়ানদের সঙ্গে ভীষণ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত—এমন সময় নিবিষ্টমনে হেগেল তাঁর গৃহে একাকী বসিয়া লিখিতেছেন। বাহিরে যে মহাপ্রলয় ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তার বিষয় তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এমনভাবে মনের ভিতরে ডুবিয়া না যাইতে পারিলে, কি কোনও সার-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়?

ক্যাণ্টের জীবনে অনাবশ্যক ভাবের আবেগের তেমন কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। কনিগ্‌জবার্গ নগরেই তিনি তাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। বাগ্দেবীর সেবায় ও তত্ত্বচিন্তায় তাঁর সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়াছে। ঝগড়া, বিবাদ বিসম্বাদ জানিতেন না। এমন শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতেন, যে তাঁর সময়-নিষ্ঠা প্রবচনে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যহ এক সময়ে উঠিতেন, একসময়ে ধূমপান করিতেন, কাফি খাইতেন, ক্লাসে ছেলেদের কাছে বক্তৃতা করিতেন এবং একসময়ে বেড়াইতে বাহির হইতেন। লোকে বলিত, কনিগজবার্গের গির্জ্জার ঘড়ীও ক্যাণ্টের মত সময় মানিয়া চলিত না।

ইয়ুরোপের দর্শনশাস্ত্রের সহিত পরিচিত হ'তে যাইয়া আর একটী মহানুভব চরিত্রের সাক্ষাৎ হয়—মহাজ্ঞানী, দরিদ্র স্পাইনোজা। ভাব-সেবা এমন, কম লোকেই করিয়াছে। তাঁর মত চরিত্র,—জগতে, বিশেষতঃ ইয়ুরোপে দুর্লভ। সুখে সম্পদে জীবন অতিবাহিত করিবার তাঁর কত না সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু সমস্তই ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিলেন। জাতিতে তিনি ইহুদী। দর্শনের সেবা, সত্যের সেবা করিতে যাইয়া যৌবন-প্রারম্ভেই তিনি সমাজ হ'তে বিতাড়িত হইলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁর বৈমাত্রেয় ভগ্নীর স্বামী ঠকাইয়া তাঁর বিষয় আশয় যা ছিল লইয়া চলিয়া গেল, মোকদ্দমায় জয়ী হইলেন, কিন্তু অবশেষে শয্যার সামান্যমাত্র কিছু সরঞ্জাম লইয়া সব ত্যাগ করিলেন। হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অযাচিতভাবে প্রফেসারের কাজ পাইলেন, কিন্তু পাছে সে কাজ করিতে যাইয়া নিজ স্বাধীনতা হারাইতে হয়, তাই তা গ্রহণ করিলেন না। ফ্রান্সের ভুবন-বিখ্যাত রাজা চতুর্দ্দশ লুই, তাঁর নামে স্পাইনোজার কোনও গ্রন্থ উৎসর্গিত হইলে, তাঁকে বিশেষরূপে পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু তিনি অত্যাচারী রাজার নামের সঙ্গে তাঁর গ্রন্থ সংযোজিত করার প্রস্তাব ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিলেন। একাকী অতিকষ্টে পরগৃহে তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, অথচ একটী পয়সার জন্য পরমুখাপেক্ষী হন নাই।

আজ ইয়ুরোপের দর্শন-রাজ্যে তাঁর স্থান বোধ হয় সকলের উপরে। তাঁর শিষ্যানুশিষ্যের অভাব নাই। তিনি চশমার পাথর lens প্রস্তুত করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। বর্ত্তমানে ইয়ুরোপের অনেক দার্শনিকই তাঁর দর্শনের চশমা চোখে ধারণ করিয়া চাহিতেছেন।

তাঁর দর্শনের সঙ্গে তাঁর চরিত্র মিলিত হইয়া তাঁকে এক অপূর্ব্ব মহত্ত্বে ভূষিত করিয়াছে। তাই তো দার্শনিক সাধু শ্লেয়ারমেচার তাঁকে উদ্দেশ

করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার মৃত্যু-অন্তে আমার দেহের সঙ্গে আমার একগুচ্ছ কেশ প্রত্যাখ্যাত সাধু স্পাইনোজার আত্মার উদ্দেশে অর্পণ করিও।

২০.৭.১৩।—সকল সময়ই মনে হয়, প্রাণের মত একটী কাজ করিতে পারিলেই—সমস্ত ক্ষুধা, জ্বালা নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু কি যে সে কাজ, তা পরিষ্কার যেন বুঝিয়া উঠিতে পারি না; কেবলমাত্র এই বুঝি যে, তা এমন একটী কাজ, যার ভিতর দিয়া আমার যা কিছু শক্তি, ভাব, আকাঙ্ক্ষা, আশা, তা যেন নিঃশেষরূপে ফুটিয়া উঠে, যার শেষে আমি নিজ সত্ত্বার গৌরবে নিজের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি। লোক-প্রশংসা—হ'লে, খুব ভাল; না হয়, তেমন ক্ষতি নাই। আমার প্রাণ যদি বোঝে, যে সে কাজটীতে তার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছে, তা হ'লেই যথেষ্ট।

কিছুই করিলাম না আমি, কিছুই না! এই তো আটত্রিশ বছর বয়স। আরো বছর কুড়ি, হয় তো তা অপেক্ষা কিছু বেশী, তারপর কোন আঁধারের ভিতর ডুবিয়া যাইব! সারাটী জীবন কেবল জল্পনা কল্পনাই করা গেল—কিছুই করিতে পারিলাম না। কেন?

প্রাণে আমার বল নাই বলিলেই চলে, কোন কাজেই একাগ্রতার সহিত অধিকদিন নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। শিক্ষারও দোষ। তার ফলে তেমন কোনও আদর্শ ideal সম্মুখে রাখিয়া চলিতে শিখি নাই।

শেষ কথা—জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব সব সময়েই অনুভব করিতেছি। কোন একটা কাজ জোর করিয়া মুঠার ভিতর ধরিতে গেলে, তখনি মনে হয়—কেন, কেন এ চেষ্টা, এ পরিশ্রম? এ-জগৎ কি, সংসার কি, বাঙ্গালা কি, বাঙ্গালী কি, আমি কি, আমার কৃত কার্য্য কি, সাফল্য কি,

বিফলতাই বা কি—সবই তো সমান! আর ক'দিন, ক'দিন? তোমার কাজের দ্বারা কার কি উপকার হইবে; জগৎ চলিতেছে, চলিবে; কেন বৃথা তুমি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া মরিবে? তখনি মুঠা শিথিল হইয়া আসে, কাজ করিতে আর মন যায় না।

জানি, এ-ভাব যার জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, তার কপালে সুখ নাই। ইংরাজ—এ সবের ধার ধারে না। তাদের অন্তরের দৃষ্টি-শক্তি যেন অতি কম, জগৎ ছাড়িয়া মৃত্যুর ওপার পর্য্যন্ত যেন তা পৌঁছায় না। তাই, সংসার লইয়া তারা পাগল, লোক-প্রশংসা, সমাজে প্রতিষ্ঠা মহাকাম্য। আছেও তারা মহানন্দে; সর্ব্বদাই কার্য্যতৎপর, ভাবিবার অবসর নাই।

আমি কি করিব? অসারতার বিষে যে আমার দেহ-মন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। আদালত-গৃহে উকীলের প্রশ্নের উত্তরে যখন সাক্ষী মৃত ব্যক্তির জমীতে সত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে থাকে, তখন প্রায়ই মনে হয়, সাক্ষী! তুমিই বা ক'দিনের? বাদী বিবাদী! কি লইয়া মারামারি করিতেছ? মাটী আগেরই মত পড়িয়া থাকিবে, দুদিন পরে তোমরাও মৃতের তালিকাভুক্ত হইবে! প্রাচীন রায় হাতে লইতেই মনে হয়, বিচারক! তোমার মৃত্যু অন্তে তোমার লিখিত রায় লইয়াও এমনি কতজন বাদানুবাদ করিবে! নদীতীরে বেড়াইতে গেলে, পাল-ভরে দ্রুতগমনশীল নৌকাগুলির দিকে দৃষ্টি করিয়া মন কেমন এক বিষাদে পূর্ণ হইয়া ওঠে। এমনি কত নৌকা, বছরের পর বছর নদীবক্ষ আলোড়িত করিয়া চলিয়া গিয়াছে; যে-নদী, সেই নদীই আছে, কিন্তু সেই সব তরণী ও প্রফুল্লচিত্ত আরোহী সকল? হায়! কেহ নাই! সবই চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! সুন্দরী যুবতীর দিকে দৃষ্টি করিলে মনে একটা আনন্দ ও চাঞ্চল্যের ভাব আসে, কিন্তু ক্ষণিক তা—আবাব সেই মুহূর্ত্তেই মনে হয়, আর ক'দিন? এমন সুন্দরী, কালে বৃদ্ধা হইবে, চর্ম্ম লোল

হইবে, কাল কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিবে, কেমন কদাকার হইয়া দাঁড়াইবে সে। জগতের নিয়মই এই; এইমাত্র আসন্ন-যৌবনা মনোহারিণী গাভীটি যেমন কালে কুৎসিত বৃদ্ধত্ব উপগত হইতেছে, মানুষও সেই প্রকার। বাঁচিয়া থাকিলে জরা আসিয়া সকলকেই একই ভাবে আক্রমণ করিবে—কি মানুষ, কি অন্যান্য প্রাণী, কি বৃক্ষ-লতা সকলেই যে একই নিয়মের অধীন। অবিনশ্বর কিছুই নাই। মৃত্যুরূপ জ্বলন্ত কটাহের ভিতর জীবজন্তু, লতা-পাতা, মানুষ ও তার সুখদুঃখ, কীর্ত্তি অকীর্ত্তি, পাপপুণ্য সব—সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। কেন তবে মনুষ্যত্ব, শৌর্য্যবীর্য্য লইয়া আস্ফালন? জ্ঞানীর চোখে সবই মিছা।

কিন্তু কেমন করিয়া বলিব, কিছু না করিয়াও যে রক্ষা নাই। ভিতর হ'তে সর্ব্বক্ষণই কিসে যেন তাড়া দিতেছে—কিছু কর, কিছু কর সময় থাকিতে; আঁধার রাত্রি ডানা মেলিয়া আসিতেছে, শীঘ্রই যা কিছু কর। কিন্তু কি করিব? সাধারণ লোকে যা লিখে বা যা করে, তেমন কিছুর দ্বারা তো আমার প্রাণ-ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে না। এতদিন ধরিয়া কি যেন কার দত্ত অমৃতসুধাপানে আমার মন যে অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে, অভিনব লাবণ্য-বসনে যে আমার আত্মা নূতনরূপ ধারণ করিয়াছে। আমি সঙ্গিহীন, লোকমাঝে অপরিচিত—সাধারণ লোকের খাদ্যে যে আমার ক্ষুধা মিটে না; তারা যা পাইয়া উৎফুল্ল হয়, আমার কাছে যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঠেকে। আমি যা লিখিব বা করিব, আমার আদর্শানুযায়ী হইবে। আমাকেই আমায় ভোগ করিতে হইবে; সে উদ্দেশ্যেই তাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। শুধু নিজের জন্যই এ-লেখা, নিজ সুখের জন্য। আদর্শের অনুরূপ কিছুই হইল না, তাই আমি লিখিতে পারিলাম না।

এই প্রসঙ্গে ফরাসী-লেখক এডমাণ্ড সেরারের Edmund Scherer-র

motto মটোর কথা মনে হইতেছে—Take thyself as you are, নিজের যা শক্তি আছে, তাতে সন্তুষ্ট হইয়া তার উন্মেষের চেষ্টা কর। যারা এভাবে কাজ করে, তারাই পিছনে কিছু রাখিয়া যায়, তারাই যা কিছু শান্তি অর্জ্জন করে। আমি কোন্ অনির্দ্দিষ্ট আলেয়ার পাছে নিষ্ফল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ?

২১.৭.১৩।—মানব-সমাজ 'আত্মা', 'আত্মা' করিয়া পাগল। তার কারণ, এই সদা-পরিবর্ত্তনশীল, ধ্বংসশীল জগতের মধ্যে অবিনশ্বর কিছুই সে খুঁজিয়া পায় না, তাই অশরীরী অদৃশ্য আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া মনকে সে কোন প্রকারে প্রবোধ দেয়।

বেদান্তের 'আত্মা' জিনিষটা কি, দুর্ব্বোধ্য। তর্কস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য কিছুই নাই, সকলই নশ্বর, মায়া-পটের উপর সব পরিবর্ত্তিত হইতেছে, একমাত্র 'আত্মা' ছাড়া নিত্য কিছুই নাই, সমস্তই তাঁর লীলা, আমিই সেই আত্মা। কার্য্যস্থলে, বক্তৃতায় কিন্তু ভাল হও, সৎ হও, দীন-সেবা কর, দরিদ্রকে ধন দান কর—উপদেশে কান ঝালাপালা হইয়া উঠে। আত্মোন্নতি কর, আত্মাকে চিন—এসব উপদেশেরও অভাব নাই। এমন বুজ্রুকি-ধর্ম্ম দুটী নাই, এমন কথার কাটাকাটি কোন ধর্ম্মে নাই।

সব ফাঁকি, সব মিছা। লোকগুলি নিজেরা কিছু বোঝে না, অথচ পরকে বুঝাইবার, দলে আনিবার সাধ আছে যথেষ্ট।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাড়নায়, বিশেষতঃ ইংরাজী-শিক্ষা ও বিজ্ঞানের কল্যাণে, পুতুল-পূজা দিন দিন কমিতেছে। শেষ দুর্গ বেদান্ত এখন আশ্রয়স্থল। কবে এই মাটীর ঢিপি ভাঙ্গিবে, কবে মানুষ বুদ্ধিমানের মত চলিতে শিখিবে ? মনে তো হয় না, শীঘ্র সেদিন আসিবে।

বৌদ্ধমতে 'আত্মা' বলিয়া অবিনশ্বর কিছুই নাই, কিন্তু মানুষের উন্নতি

অবনতি আছে, পাপ করিলে অবনতি হয়, পুণ্যে উন্নতি। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের মতেও পুণ্য করিলে তার সুফল পাওয়া যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের কথায় বুঝা যায় যে, আমাদের কৃত কার্য্যদ্বারা আমাদের মৃত্যুর ওপারের ভবিষ্য-জীবন ঠিক হইয়া থাকে। যে বুদ্ধি আমাদের সুপথ দেখাইয়া দেয়, তার নাম বিবেক। পাগলের বিবেক কি? শিশুরই বা কি? তারা কি করিতেছে, নিজেরাই তো জানে না। এই দেহ বিনাশের পর তাদের আত্মার কি অবস্থা দাঁড়ায়, উন্নতি না অবনতি? না তারা stagnant গতিবিহীন?

আমার শরীর যখন পীড়াগ্রস্ত বা জরাগ্রস্ত হয়, তখন আমার বিবেকও যেন পীড়াগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত হইয়া উঠে—যেমন বুড়া হ'লে গাছের ত্বক্‌, কাঠ, পাতা সবই এক-কালে শুষ্ক হ'তে থাকে, কিছুই অবশেষে আর আগের মত থাকে না। বার্দ্ধক্যে উপনীত হ'লে, দেহের সঙ্গে বিবেকও যে নিতান্তই অক্ষম হইয়া পড়ে; উপায়ান্তরও নাই তার, দেহ-বৃক্ষেরই যে অংশ সে। বৃদ্ধ ও বালকের বুদ্ধি, তাই মানুষের ভাষায় প্রায় একই সংজ্ঞা-ভুক্ত। মনে হয়, যেন বালকের আত্মা কিছুকালের জন্য উন্নত হইয়া বার্দ্ধক্যের হিম-স্পর্শে থার্মমিটারের পারদের ন্যায় আবার পূর্ব্বাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়। না, আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়? তা হ'লেই বা এ আত্মার কি প্রয়োজন? মোট কথা আত্মা নাই; তার স্ফুরণ বিবেকও নাই। আছে মন, আছে দেহ, আর আছে এক অনন্ত-মহা-পরিবর্ত্তন। মনেরই নানা ভাগ; একভাগ অন্য ভাগের বিচারকরূপে কাজ করিতেছে। অথবা, এই শক্তিটীকে মনের উপর প্রতিষ্ঠিত আর একটী শক্তি বলিয়া পরিকল্পনা করিতে পার। কিন্তু মনের ন্যায় ইহারও অস্তিত্ব দেহের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে—একই প্রবাহের অঙ্গে যে সব। কা'রো মতে [যদিও তার বিশেষ কোনও বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই] মৃত্যু-অন্তে

মানুষ না কি সূক্ষ্ম প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। একান্তই যদি তাই হয়, তা হ'লে এই শক্তি দেহের সূক্ষ্মাংশ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকে, মনও থাকে। কিন্তু পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া তখনও চলিতে থাকে। সে চাকার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে ভবিষ্যতে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে—শেষে অনন্তকাল পরে কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়, কে বলিবে? সংসারে অবিনশ্বর কিছুই নাই, নশ্বরও কিছুই নাই। সবেরই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইতেছে—চিরকালই এমন হইতেছে, হইবে। কে বলিবে, কি অবলম্বন করিয়া এই মহা-পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে? কিছু অবলম্বন করিয়া হইতেছে কি না, তাই বা কে জানে? সে মহা-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিবে—এমন জ্ঞান-চক্ষু কা'র? উন্নতি আর অবনতি, তাই বা কি? আঁধারের ভিতর হাত পা আছড়াইয়া মানুষ অন্তর্হিত হয়, ইহাই তার জীবন-ইতিহাস।

২২.৭.১৩।—সত্যই, মানুষের শেষ-লোভনীয় জিনিষ যশ, the last infirmity of noble minds। মুখে যিনি যতই কেন বলুন না, লোকের নিকট হ'তে যত কেন না দূরে থাকুন,—লোক-চোখে কেমন দেখায় এটাই কাজের মূল উৎস। অবশ্য দু একজন সন্ন্যাসীকে বাদ দিলেও দেওয়া যাইতে পারে; তাদের সম্বন্ধেও মনে হয়, যে নির্জ্জন গহ্বরে বসিয়াও সংসারের লোক তাঁদের কি ভাবে দেখিতেছে, সে-কথা যে তাঁদের মনে একেবারেই স্থান পায় না, এমন নয়। কবি কাব্য লিখেন, ভাল; কিন্তু বাহিরে না জানাইতে পারিলে সুখ কই? সাধু নাকি গভীর রাত্রিতে গোপনে ভগবানের সঙ্গ-লাভ করিয়া কৃতার্থ হন, কিন্তু ঢাকে-ঢোলে সে সংবাদ লোকের নিকট প্রচার না করিতে পারিলে শান্তি নাই; গায়ক একাকী নির্জ্জনে গাহিয়া শান্তি পান না। গোপনে কোন কাজ করিয়া শোয়াস্তি নাই, লোকের কাছে তা ধরিয়া দিতে হইবেই

এবং তাদের প্রশংসার ছাপ যেমন করিয়া হোক্ যোগাড় করিতেই হইবে। কুঁড়ির যেমন জীবন-গতির বিরাম নাই, প্রস্ফুটিত ফুলরূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিতেই হইবে, মানুষেরও তেমনি যেমন করিয়া হোক্ আপনাকে—তা সে সুশ্রী হোক্, কদর্য্য হোক্—প্রচার করিতেই হইবে। এমন কি, মনের নিতান্ত গূঢ়ভাব, পরিবার প্রিয়জনের প্রতি আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, গোপনীয় ডায়েরী, চিঠির তোড়া—সবই লোকের কাছে খুলিয়া দেখাইতে হইবে। পরের চোখের কাছে সাজাইয়া গোছাইয়া নিজ-জীবনকে ধরিয়া দিতে হইবে; সূর্য্য-কিরণে স্রোতস্বতীর মত পরের জন্য চক্ চক্ করিয়া চলিতে হইবে; পর-মুখের দিকে চাহিয়া কাজ করিতে হইবে, লিখিতে হইবে। লোকে আমাকে কেমন দেখিতেছে, লোকের ভিতর কেমন যশ প্রচার হইতেছে—ইহাই ভাবনা, একমাত্র ভাবনা।

কিন্তু ভাবিয়া দেখে না লোক একবার—কি এ যশ? কি এ আনন্দ? ক'দিনের? জগৎ কোন চিহ্নই অধিক দিন বুকে ধরিয়া রাখিতে জানে না—তা কি সুখ, কি দুঃখ, পিচ্ছিল পাথরে কোন দাগই বসিয়াও বসে না। বসন্তের কচি সবুজ পাতার মাঝে আধ-লুকানো ক্ষুদ্র-কলেবর হলদে পাখীটী—কেমন সুন্দর! পূর্ণিমা রাত্রির রজতধারাসিক্ত তটিনীর বক্ষ—কেমন মধুর! কিন্তু কতক্ষণ স্থায়ী এ দৃশ্য? জগৎ সবই মুছিয়া ফেলে; স্মৃতি, সেই বা ক'দিন থাকে? আমিও এমনি ভাবে শিশির বিন্দুর মত মুছিয়া যাইব; দুবছর, চারিবছর, জোর চল্লিশ পঞ্চাশ কি একশ' বছর, তারপর আমার নামও কেহ উল্লেখ করিবে না। যাঁরা আমার অপেক্ষা ভাগ্যবান্, তাঁদের নাম হয় তো দুচা'র হাজার বছর বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু তার পর? কোন্ অনন্ত আঁধারের গায়ে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এমন কি, এমন যে বিশাল পৃথিবী, এমন যে তেজঃপুঞ্জ মহাশক্তিশালী সূর্য্য—কালে তারাই কি থাকিবে?

তবে কেন? কেন যশ যশ করিয়া প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা? প্রভাতের একটী সুখ-স্বপ্ন জীবন—তার পর সবই যে আঁধার!

এমন আমি—আমাকে সকলেই কালে ভুলিয়া যাইবে; তাদেরও আবার লোকে ভুলিবে; এক ঢেউয়ের পিছনে হা হা করিতে করিতে আর এক ঢেউ, ক্রমাগত অনন্ত-নিশ্চল কাল-সাগরে মিশিয়া যাইতেছে। আমিও যে আমাকে ভুলিতে বসিয়াছি। বাল্যকালের সে আমি—তার সম্বন্ধে ভাল করিয়া কিছুই তো মনে নাই। যুবক আমি, বার্দ্ধক্যে তার কথা কতটা মনে থাকিবে? পরে ভুলিবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? শেষে এমন দিনও হয় তো আসিতে পারে, যখন আমি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ভুলিয়া যাইব।

যশ, আত্মপ্রতিষ্ঠা—এদের মূল্য কি? কি মূল্য? তার পাছে দৌড়াদৌড়ি না করিয়া নিজেকে ভোগ করিবার চেষ্টা কর—তাতেই যা কিছু সুখ।

২৩.৭.১৩।—গতকল্য পত্রিকায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউমের কথা পড়িতেছিলাম। হিউমের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—excelsior, উন্নততর, আরও ভাল। এই motto মটো হ'তে লোকটী কি প্রকার ছিল, বুঝা যায়। চিরকালই একটা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, সকল কাজই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে সম্পন্ন করা, ইহাই তাঁর আজন্ম চেষ্টা ছিল। ভারতবাসীকে তিনি যা দিয়া গিয়াছেন, কোন ভারতবাসীও ভারতবর্ষের জন্য তেমন কিছু করে নাই। অক্লান্ত পরিশ্রমী, যে কাজে হাত দিতেন, সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন।

আমাদের কারো কোন motto মটো আছে কি?

Motto সামান্য একটী শব্দ, কিন্তু ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে

ইহার ক্ষমতা জীবনে অসীম। সমুদ্রবক্ষে জাহাজের পক্ষে কম্পাসের কাঁটার ন্যায়—ইহা জীবনকে কি পথে চালাইতে হইবে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, মানুষটীকে তার সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তি একদিকে চালিত করিতে উদ্বোধিত করে, তা না হ'লে শক্তি নানা ভাবে নানা উদ্দেশ্যের দিকে চালিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তেমন কার্য্যকরী হয় না। এখনকার অসংখ্য জানিবার ও জানাইবার জিনিষের দিনে, তুমি যদি কোনও বিষয়-বিশেষে specialise না কর, একটা বিষয়কে আগাগোড়া ধরিয়া রাখিতে না পার, তা হ'লে তোমার অস্তিত্বসম্বন্ধে কাকে কিছু জানাইতে পারিবে—এমন দুরাশা মনে স্থানও দিও না।

অবশ্য, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মটোর প্রয়োজন। সমস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে উপযোগী আমি দু একটী মটো দেখিতেছি—সাহস, শক্তি, system, silence নীরবতা।

২৯·৭·১৩।—যেমন দেশ, যেমন জাতি,—তেমন ধর্ম্ম। বীর শিখদের ধর্ম্মগুরু গোবিন্দ সিংহ। তাদের ধর্ম্ম—যোদ্ধার ধর্ম্ম, বীর-ধর্ম্ম। কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম্মজগতে, গোবিন্দ সিংহই একমাত্র হিরো hero, যে প্রাণের পূর্ণ অর্ঘ্য পাইবার উপযুক্ত। কোন কপটতা তাঁর ভিতর নাই। তাঁর শিক্ষায় ও আদর্শে পাঞ্জাবের হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া নূতন শিখজাতির সৃষ্টি। কি অভিনব শক্তি, কি অদম্য উৎসাহ ও তেজ তিনি সে-জাতির ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন! পঞ্চনদের বীরদেহে নানকের নিষ্কাম ভক্তি-ধর্ম্ম তেমন ফুটিয়া উঠিতে ছিল না, গুরু গোবিন্দ সিংহই তাকে দেশোপযোগী করিয়া জাতি-রচনার সহায়করূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আর, মরা-বাঙ্গালীর দেশে মুক্ত-কচ্ছ, নেড়া-মাথা, তিলক-কাটা, নিরামিশ-

ভোজী চৈতন্যের আবির্ভাব। তাঁর ধর্ম্ম তো স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, পুরুষ-রূপী নারী বাঙ্গালীর উপযোগী—তিনিও নিজেকে রাধিকাই মনে করিতেন। সংসারে যার কেউ নাই, পরপদসেবী, সেই অমন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ করিয়া নিস্ফল বুক চাপড়াক্। বাঙ্গালীর ধর্ম্মই বাঙ্গালীকে অ-মানুষ করিতেছে। এমন জাতি-ভেদের-মায়া-বিভোর ব্রাহ্মণ ও ভীরু বৈরাগীর রাজত্বে মানুষের মনুষ্যত্ব রাখা অসম্ভব।

গোবিন্দ সিংহের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতাটীর কথা মনে হইতেছে। কেমন সুন্দর ভাবে ধ্যান-মগ্ন আদর্শ-অনুসরণকারী গোবিন্দের মূর্ত্তিটী বর্ণিত হইয়াছে!

শেষদিকের দুই ছত্র,

আমার জীবনে লভিয়া জীবন,

জাগরে সকল দেশ।

সাধনা সিদ্ধি সম্বন্ধে তাঁরই মত তন্ময় হইতে হইবে। নিজে মানুষ না হ'লে, পরকে মানুষ করিবে কেমন করিয়া? বিশ-বৎসরব্যাপী তপস্যায় লব্ধ যে মহামূল্য চরিত্র ও ভাবসম্পদ গোবিন্দ শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন, তারই ফলে আজ পর্য্যন্ত শিখ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরজাতি।

*

মানব-সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাতে পুরুষের শিক্ষা অপেক্ষাও স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতির অধিকতর যত্নবান্ হওয়া প্রয়োজন। বিশেষতঃ, আমাদের মত সমাজের পক্ষে, যেখানে সমস্ত রমণী একপ্রকার অশিক্ষিতা—তার তো কথাই নাই। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর আগাগোড়া অত্যাচারই করিয়া আসিতেছে। জীবনের সুখ যা, সেই ভোগ করিয়াছে, নারীকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেই একপ্রকার দেয় নাই—তারই একটী

ক্রীড়াসামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। ফলে, সমাজে যত বর্ব্বরোচিত ভাবেরই—হিংসা, দ্বেষ, কাটাকাটি, মারামারি—অধিকতর বিকাশ হইয়াছে; দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, পবিত্রতা, কোমলতা, মধুরতা, সৌন্দর্য্য—রমণী-চরিত্রের যা ভূষণ ও বিশেষত্ব—তা'র উন্মেষ ভাল করিয়া হতেই পারে নাই।

মোটের উপর, সমাজ বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ, মানুষের কি দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে! একসময় ছিল, যখন স্ত্রীলোকের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। এখন সকলেরই চক্ষু খুলিয়াছে—বাদে আমাদের। সকলেই দেখিতেছে, সমাজের অর্থ—কেবল পুরুষ নহে, পরন্তু পুরুষ ও স্ত্রীর সমষ্টি। কিন্তু তথাপি পুরুষের শিক্ষার জন্য যে প্রকার খরচ হয়, তা'র অর্দ্ধেকও রমণীর জন্য হয় না। যে সমাজে রমণীদের শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় হইবে, আমার বিশ্বাস, কালে তা' সকল সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। এতদিন যেমন আমরা স্ত্রীলোকদের বিদ্যালাভ করিতে দিই নিই, এক্ষণ তেমনই তা'দের শিক্ষার জন্য, পুরুষের শিক্ষার অপেক্ষাও অধিকতর যত্নবান্ হওয়া উচিত। যে সমাজে, যে গৃহে, স্ত্রী শিক্ষিতা, বিদুষী,—সে গৃহে, সে সমাজে, পুরুষ অশিক্ষিত থাকিতে পারে না। শিক্ষিত পিতার মূর্খপুত্র দেখা যায় অনেক, কিন্তু শিক্ষিতা মাতার মূর্খসন্তান ক'জন?

সমস্ত বঙ্গদেশ অজ্ঞানতার আঁধারে নিমজ্জিত দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হয়। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বালিকাদের জন্য, স্ত্রীলোকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হোক্, কলেজ স্থাপিত হোক্, গৃহে থাকিয়া পড়িবার নানাপ্রকার বন্দোবস্ত হোক্, যেখানে পুরুষের শিক্ষায় এক টাকা ব্যয় হইতেছে, সেখানে স্ত্রীলোকের জন্য দু'টাকা ব্যয় হোক্—তা' হ'লে বাঙ্গলার মুখশ্রী ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। পুরুষের শিক্ষার জন্য দশ লক্ষ, আর স্ত্রীলোকদের জন্য দশ হাজার, এভাবে চলিলে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন একশ' বছরেও হইবে না। আমাদের দেশে যখন অবরোধ-প্রথা,

বাল্যবিবাহ প্রভৃতি পাঠের অন্তরায়স্বরূপ নানা-প্রথা বিদ্যমান, তখন অন্যদেশে পুরুষের শিক্ষার অনুপাতে স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য যদি অর্দ্ধেক টাকা ব্যয় হয়, তা' হ'লে আমাদের অন্ততঃ চারিগুণ ব্যয় করা উচিত। যেমন করিয়া হোক্, প্রত্যেক স্ত্রীলোককে শিক্ষা, সুশিক্ষা দিতেই হইবে—দিতেই হইবে। তা' না হ'লে, হে সমাজ-সংস্কারক! হে রাজনৈতিক! সমস্ত শ্রম—পণ্ডশ্রম!

৩০.৭.১৩।—কাজ! মানুষে কাজ করে, বাচাল গল্প করিয়া সময় কাটায়। ইংরাজের মত কম কথা কেহ বলে না, কিন্তু জগৎজোড়া তা'র রাজত্ব। লোকগুলি দেখিতে ব্যাকুবের মত, লম্বা লম্বা হাত পা, মস্ত বড় দেহটা, চক্ষুর ভিতর বুদ্ধির তেমন কোনও চিহ্ন নাই, মিন্ মিন্ করিয়া কথা কয়, কিন্তু কাজে সকলের প্রথম, তখন তার বুদ্ধি, তার তৎপরতা দেখিয়া অবাক্ হতে হয়। বাক্যনিপুণ ফরাসীও নীরব silent ইংরাজ—উভয়ে কত পার্থক্য! ইংরাজের মত রোমান্‌রাও নাকি কম কথা বলিত। রোমান্‌দের ন্যায় তারাও তাদের মহাকাব্য কোনও কাগজে লিখিবার তেমন চেষ্টা করে নাই, জগতের পৃষ্ঠায় তা অক্ষয়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, কেনেডা, মিসর, নিউজিলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, কত নাম করিব, সর্ব্বত্রই তাদের কীর্ত্তি ব্যাপ্ত—পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ স্থানের লোক তাদের পদতলে মাথা নোয়াইয়া আছে।

বুদ্ধি অপেক্ষা চরিত্রের ক্ষমতা অধিক। তাই, প্লেটো ও ক্যাণ্টের মত দার্শনিক থাকিতেও, ইয়ুরোপের কোটী কোটী লোক আজও ধীবর-পুত্রের চরণপূজা করিয়া ধন্য হইতেছে। লোক চিরকালই শক্তির উপাসক। চরিত্র-বলে আজ ইংরাজ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি।

ইংরাজদের আদর্শ মহাপুরুষ hero, Sir John Drake,—স্বকার্য্য-সাধনায় তৎপর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দয়া-মায়া-শূন্য নির্ভীক মৌনী নাবিক। তাঁর ও তাঁর সঙ্গীগণের আদর্শে গঠিত ইংরাজ-জাতির ঘরে ঘরে তাঁর মত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, স্বদেশভক্ত বীর সকল বিদ্যমান। রাণী এলিজাবেথের সময় হতে, ইংরাজের জাতীয় অভ্যুদয়। তা'র পর, প্রায় পাঁচশ বছর চলিয়া গিয়াছে। এর ভিতর ইংরাজ কয়টী বক্তৃতা করিয়াছে? বক্তৃতা তেমন করে নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে অসীম অধ্যবসায়, অভূতপূর্ব্ব সাহস, ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে জগতের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে।

ইংরাজ কথা বলে না; কাজ করে। মিছা দয়ামায়া জানে না; তার হাতে দয়া দৌর্ব্বল্যে পারিণত হয় নাই। সে শক্তির উপাসক, নীরবতার উপাসক, সে কাজের উপাসক।

তোমার মত সুন্দর পুরুষ, তোমার অপেক্ষা সুন্দর পুরুষ, তোমার অপেক্ষা অনেক-সুন্দর পুরুষ অনেক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, করিবে; কই তাদের কে সংবাদ রাখে? তোমার কাজ দিয়াই, তোমাকে লোকে দেখিতে চায়। তুমি বড়, যদি তোমার কাজ বড় হয়।

কাজ কর। নিজ মনে কাজ কর, দেখিবে তোমারও যশ জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। ইংরাজের অনুসরণ কর। নীরবতার উপাসক হও, মানুষ হও।

৩১.৭.১৩।—এই তিন দিন যাবৎ সোপেনহরের Schopenhauer's Essays পড়িতেছি। পূর্ব্বাপরই তাঁর নাম শুনিয়া আসিতেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে ক'জন দার্শনিক ইয়ুরোপে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁদের একজন। নব্যদলের উপর তাঁর এক সময় অসীম প্রভাব ছিল।

বড় আশা করিয়া, একটু ভয়েরও সহিত, বইখানি খুলিয়াছিলাম। কিম্ভূত কিমাকার সব খামখেয়ালি ভাবের আড্ডা ও অনাবশ্যকরূপে দুর্ব্বোধ্য ভাষার সমাবেশ—সব দার্শনিকের লেখাই আমার প্রাণে চিরকাল ভীতির সঞ্চার করে। দু'তিনটী রচনা চিবান গেল—স্বাদ তেমন কিছুই পাইলাম না। Emptiness of Existence 'জীবনের শূন্যতা' প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল, সমস্ত ভাবই ভারতের দর্শন, বিশেষতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হতে গ্রহণ করা। Nothing being. all is becoming কিছুই নাই, সকলই হইতেছে, পরিবর্ত্তনশীল, এ তো বুদ্ধের ধর্ম্মেরই মূল ভাব। জীবন অসার, জগৎ অনিত্য, এ-সকল ভাব কর্ম্মক্লান্ত সুখমত্ত ইয়ুরোপের নিকট নূতন বাণী বলিয়া গৃহীত হতে পারে, আমাদের কাছে নয়। এ-সব ভাবের প্রভাবেই তো আমরা আফিংখোর চীনাদের সামিল হইয়া রহিয়াছি, বা তাদেরও নীচে পড়িয়া আছি।

Thinking for one seelf, On Reading of Books সম্বন্ধে দুটী প্রবন্ধ বরং একটু ভাল লাগিল—যদি চ অতি সাধারণ ধরণের লেখা। অধিকাংশ তথাকথিত বড় লেখকই কি সব সাধারণ কথা ও ভাব কোনও প্রকারে সাজাইয়া গোছাইয়া লোকের কাছে ধরিয়া বাহাবা পায়! সোপেনহরের মতে, অধিক পড়া ভাল নয়, তাতে পরের চিন্তার চাপে পড়িয়া নিজ-চিন্তা দুর্ব্বল হইয়া আসে ও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। আমার নিজ-সম্বন্ধেই ইহা অনেকটা খাটে। পড়িয়াছি আমি নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু চিন্তা বড় একটা করি নাই। তাই আমি কিছু করিতেও পারিলাম না, কেবল পরের ভাবের বোঝাই বহন করিয়া গেলাম, চিনির বলদই হইয়া রহিলাম। আরো একটী কথা। নিজ চিন্তা-ধারাকে line of thought অন্য হ'তে সংগৃহীত ভাব দ্বারা পুষ্ট না করিতে পারিলে, মিছা পড়িয়া কিছু লাভ নাই। সোপেনহরের মতে স্বাধীন চিন্তাই সর্ব্বাগ্রে দরকার;

যখন মনে অবসাদ আসে, তখনি শুধু পাঠের প্রয়োজন। আমি মনে করি, পাঠ, চিন্তা, পর্য্যাবেক্ষণ—তিনটীরই দরকার; একে অন্যের উপর আলো দান করিয়া সত্য-সন্ধানের প্রকৃত দিকে লোককে লইয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে চিন্তাশীল লেখক, তাঁর সমকক্ষ কেহ নাই। তিনিও পড়েন কম, ভাবেনই বেশী, অথবা ভাব তাঁর শারীরিক অঙ্গবিশেষ—নিতান্ত সহজ অবস্থা। শিলাইদহে বাস করা কালীন এমন সময়ও নাকি তাঁর গিয়াছে, যখন তিনি মাসেকের মধ্যে ভাল করিয়া কারো সঙ্গে একটী কথাও বলেন নাই, অথচ লোকজন কাছেই থাকিত।

সোপেনহর সত্যই বলিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ভাবুক, যাঁর পক্ষে ভাবনা-করা আয়াসসাধ্য নয়, দেহের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় মনের স্বাভাবিক অবস্থা। এ সকল লোকই সমাজের উপর প্রাধান্য স্থাপন করে। কথাটা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কেমন খাটে! প্রকৃতির বুকে ডুবিয়া যে সকল ভাব-রত্ন তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তা'তেই জগতের ভাব-রাজ্য সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, পরের নিকট হ'তে ধার-করা মেকী-টাকা চালাইবার চেষ্টা করেন নাই।

একটী উপমা সুন্দর লাগিল,—ভাবুকের পক্ষে একটী নূতন ভাব, প্রণয়িনীর মত মধুর, কিন্তু বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করাইতে পারিলে প্রেয়সীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তেমনি কোনও ভাব মনে দেখা দিলে, তা' লিপিবদ্ধ না হ'লে, অনেক সময় জন্মের মত নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। এ-ভাবে যদি চলিতাম, তা' হ'লে কত সুন্দর সব ভাবেই আমার নোট-বুক ভরিয়া উঠিত।

সোপেনহর পড়িয়া সুখী হ'তে পারিতেছি না। দার্শনিক অর্থে আমরা বুঝি, ধীর স্থির প্রশান্ত নির্ব্বিকার পুরুষ, সংশয়জাল সম্পূর্ণরূপে

যিনি ছিন্ন করিয়াছেন ও সত্যের মৃদু আলোকে যাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত। কিন্তু, সোপেনহর মহাদাম্ভিক, কোপন-স্বভাব, বিশ্বনিন্দুক। তাঁর লেখাতেও নূতন কথা, গভীর চিন্তা কিছুই পাইতেছি না।

সোপেনহরের Philosophy, ইয়ুরোপের দার্শনিকদের কাট্যাং মাট্যাং, কথার কচকচানি, আমি বুঝি না, ভালও লাগে না। এ-সব বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান যেন নিতান্ত limited সীমাবদ্ধ।

১০৮০১৩।—কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'মা না মহাশক্তি'। এমন অসার বই অনেকদিন হাতে পড়ে নাই।

বইখানা চর্ব্বিত-চর্ব্বণে পূর্ণ। স্পেন্সার, হাক্স্লি হ'তে ভাব গ্রহণের যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তা' বইর অন্যান্য অংশের সঙ্গে থাপ খায় নাই।

তাঁর ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তা' প্রতিভাবানের মত নয়। জ্ঞানের প্রসারতা তেমন ছিল না, কিন্তু খুব পড়াশুনা আছে, এ-রকমের বাহাদুরী নেবার খুব ইচ্ছা ছিল। বক্তৃতা দিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল। সাধু ওজস্বিনী বাঙ্গালাভাষায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিতে পারিতেন, কিন্তু ভাষার দিকে, বিশেষতঃ সমান-যোজনার দিকে সব সময়ই এতটা দৃষ্টি থাকিত, যে, ভাবের টান পড়িয়া যাইত। একবার নারায়ণগঞ্জে, একবার হেমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে কলিকাতায় ও ঢাকায় বারকয়েক তাঁর বক্তৃতা শুনিয়াছি। প্রতিবারই, তাঁর ভাষার দখল দেখিয়া ও বলিবার ক্ষমতার দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়াছি, কিন্তু কোনও নূতন ভাবের দ্বারা যে সঞ্জীবিত হইয়াছি, মনে পড়ে না।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে লেখা খাঁটী মৌলিক, তা' ছাড়া অন্য কিছু চলে না; তাই তাঁর লেখাও তেমন চলিল না। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—নিভৃত-চিন্তা,

নিশীথ-চিন্তা, প্রভাত-চিন্তা। ভাষা গম্ভীর ও পুরুষোচিত, সবল—এইটীই তাঁর বিশেষত্ব, এজন্য তিনি অনুকরণযোগ্য, কিন্তু ভাব,—অনেক তুষ ঘাঁটাইলে দু-একটুকু ক্ষুদের কণার মত চোখে পড়ে কি না পড়ে।

প্রতিভাশীল লেখক, আর পরিশ্রম করিয়া জোর করিয়া লেখক—এদের ভিতর এই পার্থক্য; একজন বিনা ক্লেশে বিনা বিজ্ঞাপনে আপনার প্রতিপত্তি বিস্তার করে, আর একজনকে শত চেষ্টায়ও বাঁচাইয়া রাখা যায় না। কালই প্রকৃত বিচারক; চিরকাল সে অসারতার চিহ্ন জগতের পৃষ্ঠা হ'তে মুছিয়া ফেলিতেছে। Survival of the fittest কথাটী সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষরূপ প্রযোজ্য।

১৪.৮.১৩।—'ভারত-গৌরব গ্রন্থাবলীভুক্ত' কেশবচন্দ্রের জীবন-চরিত পাঠ করা গেল। এ সকল ছোট পুস্তকের ভিতরই জীবন-চরিত খোলে ভাল। বড় বড় জীবনীতে অনর্থক বাগাড়ম্বরের নীচে আসল মানুষটীর স্বরূপ যেন চাপা পড়িয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশে যে কয়েকজন শক্তিশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাঁদের একজন। রামমোহন একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ অসামান্য উৎসাহ ও ঐকান্তিকতাগুণে লোক-সমাজে তার ভাব ছড়াইয়া দেন, কেশবচন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমা-পূজা দিন দিন অপসারণ বিষয়ে লোকমতের সাহায্য করিতেছে। বস্তুতঃ; কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসাধারণের ভিতর তেমন প্রচারিত হয় নাই।

বিশেষতঃ, জাতিভেদরূপ মহাপাপ দূর করিতে, তাঁর মত কেহ চেষ্টা করেন নাই। রামমোহন কিম্বা দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের

প্রাধান্য রক্ষা করিবার চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই, যদিচ শেষোক্তজন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ব্রাহ্মণ, সব ভুলিলেও, কোনও অবস্থাতেই যেন জাত্যাভিমান ভুলিতে পারে না; ওটী তার মজ্জাগত সংস্কার। দেবেন্দ্রনাথের মত চলিলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কালে পূর্ণরূপে হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা-স্বরূপে পরিণত হইত। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম হ'তে জাতিভেদ সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া, তাকে বৈশিষ্ট্য দান করেন।

তাঁর অন্য কীর্ত্তি, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার। তিনিই প্রথম স্ত্রীলোকদের প্রকাশ্যভাবে পুরুষের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতে অনুমতি দেন। তিনি অবরোধ প্রথার বিপক্ষপাতী ছিলেন। আজ যে স্ত্রীলোকদের সকল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনতা, তার মূলে কেশবচন্দ্রের প্রভাব কতদূর, তা অনেকেই জানেন না।

কেশবচন্দ্রের জীবনের মহাকলঙ্ক, কুচবিহার-বিবাহ। তাঁর জীবন-চরিত পাঠে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, তিনি ইয়ুরোপীয় কায়দায় ধার্ম্মিক ছিলেন, অর্থাৎ ধার্ম্মিক অপেক্ষা politicianই ছিলেন বড়। ঝুঠা শেষটায় ধরা পড়িয়া গেল—তাই 'নব-বিধান' চলিল না। একই কারণে, দেবেন্দ্রনাথের অলন্ত উৎসাহ সত্বেও, 'আদি-ব্রাহ্মসমাজ' আর নিজগৃহের কোটর ছাড়িয়া বাহিরে ডানা মেলিয়া দেখা দিতে পারিল না। দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিতেন, অথচ বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যকে বসিতে আপত্তি করিতেন। এসব ফাঁকি-বাজী—ক'দিন চলে? কেশবচন্দ্র বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইন করাইলেন, অথচ নিজ কন্যাকেই রাজপুত্র জামাই প্রাপ্তির আশায় অপ্রাপ্ত-বয়সে হিন্দুমতে বিবাহ দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা অন্তর্হিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁরই ঐকান্তিকতায় ভারতময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার বর্ত্তমান অর্দ্ধমৃত অবস্থা।

তথাপি বলিতে হইবে, কেশবচন্দ্র মহা-শক্তিশালী পুরুষ। তাঁকে বাদ দিতে গেলে, বাঙ্গালার নবযুগের ইতিহাসের একাংশ শূন্য রাখিয়া দিতে হয়।

১·৮·২৩।—দাদাভাই নারোজী এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, নিত্য নূতনভাবে প্রাণ পূর্ণ করুক সে; দীর্ঘায়ু যে চায়, সেও তাই করুক। সত্যই, সে-জীবনই প্রকৃত জীবন, প্রতি প্রভাতে যা নূতন নূতন ভাব-রসে পুষ্ট হইতেছে। যার জীবনে তা হয় না, সে তো মরিতে বসিয়াছে, মরিয়াছে—প্রস্তরখণ্ড।

১৫·৮·১৩।—আমরা ভুলিয়া যাই, আমাদের শক্তি নিতান্ত নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, চায় সমস্ত জগৎকে জলদান করিতে; তাই, অযথা নানাভাবে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, মরুভূমির ভিতর অকালে অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। মোটের উপর ফলে দাঁড়ায়, আমিও মানুষ হতে পারিলাম না, আত্মীয় স্বজনও সুখী হইলেন না।

সংসারীর পক্ষে কতকটা স্বার্থপর হওয়া দরকার। স্বার্থপরতা, তার বাঁচিবার. বড় হইবার দুর্গ। সংসারে, ধনমানে বড় হয় কে? যে নিজ স্বার্থের দিকে আগাগোড়া চোখ রাখিয়া চলিয়াছে। এই নীতির অনুসরণ করিয়া, ইংরাজ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। নিজ অর্থ ও শক্তির পরিমাণ মাপিয়া, পরের সাহায্যে অগ্রসর হইবে।

* * * *

যে যা বলে, তাতেই আমাদের—হাঁ। মনটেগ্ Montaigne বলিয়াছেন, 'না' শব্দের প্রয়োগ না শিক্ষা করার দরুণই এশিয়ার যত দুর্গতি। ঠিক কথা।

২৮.৮.১৩।—Indian Review পত্রিকায় জাপানী-চরিত্র Japanese character সম্বন্ধে অকাকুরা লিখিত একখানা পত্র পড়িলাম।

তাঁর মতে জাপানীর progressive and unprogressive ছু' রকম গুণেরই অধিকারী। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা বলেন, এশিয়ার লোকের ভিতর progressive অর্থাৎ যা জাতিকে নূতন উন্নতির পথে লইয়া যায়, গুণাবলীর নিতান্তই অভাব ; unprogressive রক্ষণশীল গুলিকেই তারা অধিকতর আয়ত্ব করিয়াছে—যথা, দয়া, ভালবাসা, ধৈর্য্য ও বিনা প্রতিবাদে দুঃখ ক্লেশ বহন করা। এশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থায় কে এই কথার সত্যতা অস্বীকার করিবে ?

জাপানীরা এ সব বিষয়ে এশিয়ার অন্যান্য জাতির তুলনায় বিভিন্ন-প্রকৃতি। অসীম তাদের ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগ। আত্মগৌরব ও আত্মমাহাত্ম্য প্রচারে পরাঙ্মুখ, কিন্তু তারা সময়ের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হ'তে জানে। তাদের চরিত্রের মূল ভিত্তি দেশপ্রেম। সেই এক কেন্দ্র হ'তে ঝরণার মত যে সঞ্জীবনী-সুধা বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা পানে পুষ্ট হইয়া জাতি মহা বলবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ। দেশের জন্য যে স্বার্থত্যাগ তারা করিয়াছে, যে বীর্য্য-শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখা যায় নাই। তার সহিত তুলনায় প্রাচীন গ্রীস, রোম ও আরবের ইতিহাসও ম্লান হইয়া পড়ে।

দেশের উন্নতির মুখে, যুগযুগান্তরের যত বাধা বিঘ্ন নদীর স্রোতে খড়কুটার মত কোথায় এক মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গেল। প্রাচীন feudalism প্রথা অন্তর্হিত হইল, সামুরাই বীরগণ তাঁদের সমস্ত সত্ব রাজার হাতে সঁপিয়া দিলেন, দলে দলে যুবক বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে গমন করিতে লাগিল, রাজা হ'তে নিতান্ত দরিদ্র পর্য্যন্ত জ্ঞানাহরণের জন্য সকলে অস্থির হইয়া উঠিল। তারই ফলে, আজ

জাপানীরা এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। জাতি মহোৎসাহে পূর্ণ, কি নৈতিক বা শারীরিক বলে সমকক্ষহীন।

অকাকুরা বলিতেছেন, আমরা ভাবকে ভালবাসিতে জানি ও তার জন্য মরিতে প্রস্তুত। দেশের হিতার্থে লক্ষ লোককে নিতান্ত ভয়াবহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে সকল সময়েই প্রস্তুত দেখা যাইবে। আমরা একাগ্রচিত্তে কাজ করিতে জানি; we fight splendidly and die brilliantly, আমরা গোপনে কার্য্যপ্রণালী ঠিক করি, কারণ নীরবতা silence সমস্ত গভীর ভাবের সম্যক্ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয়। নীরবতার আধ্যাত্মিক ভাবের অর্থ spiritual significance বুঝি বলিয়াই পত্রিকাস্তম্ভে আমাদের মিকাডোর প্রশংসা গাহিয়া বেড়াই না, আমাদের সৈন্য বা নাবিকদের বীর্য্যকাহিনীর পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া লোকের বিরক্তি উৎপাদন করি না। আমরা বিষম passionate কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বাক্ deeply taciturn জাতি, অনাবশ্যক ভাব-ব্যঞ্জনা আমাদের ঘৃণনীয়।

আর আমরা?

*   *   *   *

মন-বাগান কত আগাছাতেই না ভরিয়া উঠিয়াছে! তাই, তার শোভা নাই। আজ সবই উঠাইয়া ফেলি। জড়তা, অলসতা, বেশী-বলার-প্রবৃত্তি, সর্ব্বাগ্রে তোমরা যাও; নীচতা, পরশ্রীকাতরতা—তোমরাও যাও। তৎ-পরিবর্ত্তে সন্তোষ, জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য-সাধনে তৎপরতা, দৃঢ়তা, অল্প-ভাষিতা, নির্জ্জন-প্রিয়তার ভাবে প্রাণ পূর্ণ করি। নানা ফুল-সুগন্ধে জীবন আমোদিত হইয়া উঠুক্, মনুষ্য-জীবন-যাপন স্বার্থক হোক্।

১.৯.১৩।—ইয়ুরোপীয় ও এ-দেশের রমণী—তুলনায় কত পার্থক্য! প্রাতে গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেলে, প্রজাপতির মত নানাবিধ

রং বেরংএর সাজ-সজ্জায় শোভিত অশ্বারোহিনীদের দিকে দৃষ্টি করিলে, স্বতঃই আমার মনে হয়, যেন কোথাকার কোন্ অজানা স্বর্গপুরীর পরীর দল প্রভাতে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে ধরাপৃষ্ঠে নামিয়া আসিয়াছে। কেমন প্রীতি-প্রফুল্লা—কথার লহরে, যৌবনচ্ছটায়, হাসির লহরীতে যেন চারিদিকে আনন্দ-রশ্মি ছড়াইয়া পড়িতেছে!

আর বাঙ্গালার গৃহাবদ্ধা নারী! নাই শিক্ষা, নাই স্বাধীনতা, নাই স্ফূর্ত্তি, নাই আনন্দ; আঁধারের শিউলি ফুল, পূর্ণরূপে ফুটিবার সামান্য অবকাশও না পাইয়া আঁধারে ঝরিয়া পড়িয়া যাইতেছে! কে তাদের জীবনের পথে আনিয়া দাঁড় করাইবে? জাতির অর্দ্ধেক অংশই কয়েদ-খানায়—এ জাতি মানুষ হইবে কেমন করিয়া?

তাও যেন অনেক সময় বাঙ্গালী-রমণী নিকট-দৃষ্টিতে অধিকতর চিত্তা-কর্ষক। ইয়ুরোপীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষের ভিতর প্রকৃতিগত ও অনেকাংশে আকৃতিগত পার্থক্য যেন দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। গোঁফদাড়িশূন্য চশমাধারী পুরুষ ও প্যান্ট্‌পরা চুরট্‌মুখী বিবিতে বিভিন্নতা নির্ণয় করা সব সময় সহজ নয়। যে কোমলতা ও মাধুর্য্য রমণী-দেহের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার, যার সাহায্যে তারা আবহমানকাল জগৎ-চিত্ত মুগ্ধ করিতেছে, দিন দিন তা' তারা হারাইতেছে। স্বাধীনতার ফলে এবং একের সঙ্গে অন্যের অবাধ সম্মিলনে স্ত্রী পুরুষে এবং পুরুষ স্ত্রীতে পরিণত হইতেছে।

আমাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা একেবারেই নাই; ওদের স্বাধীনতা যথেষ্ট। স্ত্রী-পুরুষের ঠিক্ মিলনের সীমা কোথায়? ইহা একটী eternal problem অনন্ত-সমস্যা। এ পর্য্যন্ত এ সমস্যা পূরণ হইল না; কোথাও আদর্শ মানব-সমাজও সৃষ্ট হইল না।

একজন ইংরাজ চিত্রকর সে-দিন দুঃখ করিতেছিলেন, টেনিস, ব্যাডমিন্টন

গল্‌ফ প্রভৃতি ক্রীড়ায় রতা রমণীদের ভিতর আদর্শ-সুন্দরী model খুঁজিয়া পাওয়া দিন দিনই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর, বর্ত্তমান কালের ইয়ুরোপের শিক্ষিতা নারীকে অনেক সময় নারী বলিয়া গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। 'বুক-ভরা মধু বঙ্গের বধূর' তুলনা যে জগতে নাই; 'বিনা-বঙ্গ-কুসুমে' 'সরস মধুও' বা পাওয়া যাইবে কোথায়?

আবার মনে হইতেছে, আমি ভুল বুঝিয়াছি। কেবল কি পুরুষের জন্য, তার জলি-বোট Jolly-boat রূপে সঙ্গে-বাঁধা খেলার-বস্তু হইয়া চলিবার জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি? স্বতন্ত্র সত্ত্বা বলিয়া তার কি কিছু থাকিতে নাই? কেবল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের চর্চ্চা করিয়া তো জীবন চালানো যায় না; গৌরবেরও নয় সে জীবন। এই ভয়াবহ জীবন-সংগ্রামের যুগে, তাকেও ঘরের বাহিরে আসিয়া কাজে যোগ দিতে হইবে, নিজ আহার পরিচ্ছদ যোগাড় করিতে হইবে। লজ্জাবতী লতার দিন আর নাই। আর, শুধু পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিলে, স্ত্রী-জীবনের পূর্ণ বিকাশই বা হইবে কেমন করিয়া, সে ভাবে চলিয়া তো সে শুধু পুরুষের প্রবৃত্তি-পুতুল হইয়া আছে। ইয়ুরোপীয়েরাই ঠিক পথে চলিয়াছে।

২.৯.১৩।—শিক্ষা ছাড়া মানুষ? পশু।

ছেলে সম্বন্ধে এ তত্ত্বটা আমরা বেশ বুঝি, মেয়ে বা স্ত্রী সম্বন্ধে নয়। সে-কথা উঠিলেই আমাদের বুদ্ধি উল্টাইয়া যায়; সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সতীত্ব, সতীদাহ লইয়া তখন কত বাদ-বিতণ্ডাই না আরম্ভ করিয়া দিই।

এ-দেশ naked খোলা ভাবের দেশ, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক কম। তাই, যখন যে ভাবটা একবার ঘাড়ে চাপিয়া বসে, তার শ্রাদ্ধ না হ'য়ে যায় না। সংসারে তা খাটুক্ আর নাই খাটুক্, চলুক্ বা না চলুক্, তব

একটাবারও চিন্তা করা নাই। পিতৃভক্তি, সত্যব্রত-পালন, ভাল কথা; কিন্তু সেজন্য পুত্রকে চৌদ্দবছরের জন্য জঙ্গলে পাঠাইতে হইবে, প্রাণান্ত হ'য়েও তাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—এ কি বিসদৃশ ব্যবস্থা! দান, মহা-পুণ্যের কাজ, কিন্তু তজ্জন্য বিষয়-আশয় স্ত্রী-পুত্রকে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বস্বহারা হইয়া নিজেকেও শেষে ক্রীতদাস-রূপে বিক্রয় করিতে হইবে—এ কি কাণ্ড! অতিথির প্রতি ভদ্র ব্যবহার কর, কিন্তু তার প্রীত্যর্থে স্ত্রীকে তার ভোগার্থে দান করিয়া পুণ্য-সঞ্চয়ের চেষ্টা—এ দেশেই সম্ভব।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও এমনি বিচার। তাদের চরিত্র ভাল হওয়া পুরুষের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। কিন্তু কি জানি, লেখাপড়া শিখিলে তারা স্বাধীনতা-প্রয়াসী হয়ে দাঁড়ায়, অতএব চিরকাল তাদের মূর্খ করিয়া রাখা যাক্—ইহাই আমাদের সমাজপতিদের ব্যবস্থা। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী-চরিত্র কলুষিত হইবে, এও যে অসহ্য; তাই তো সহমরণের ব্যবস্থা। রামমোহন ও ইংরাজ-রাজের জ্বালায় এতটা চলিল না; তথাপি এখনো যে চির-বৈধব্য প্রথা প্রচলিত আছে, নৃশংসতায় বর্ব্বরতায় তার তুলনা কোথায়? দুর্ব্বলা, নিঃসহায়া রমণী! পূর্ব্বাপর তোমাদের উপর কি পাশবিক অত্যাচারই না হইয়া আসিতেছে!

স্বার্থান্ধ পুরুষ! যদি মানুষ হ'তে চাও, বংশে মানুষ দেখিতে চাও, তা হ'লে গৃহের কন্যা ও স্ত্রীকে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা দাও। এখন হ'তে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা কর, যেখানে ছেলের শিক্ষার জন্য এক টাকা ব্যয় করিবে, স্ত্রীকন্যার শিক্ষার জন্য তার দ্বিগুণ ব্যয় করিবে। তাদের কাছে তুমি যুগযুগান্তরের ঋণী; সাধ্যমত সে ঋণ পরিশোধ কর। হাতে হাতে ফলও পাইবে; দেখিবে, বছর কয়েক যাইতে না যাইতেই, গৃহ নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে, আবর্জ্জনা, অবসাদ দূর হইয়াছে, বংশে প্রকৃত মানুষ দেখা দিতেছে, আশা আকাঙ্ক্ষায় নবার্জ্জিত শক্তির আনন্দে উৎসাহে

গৃহবাসীদের দেহ মন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আত্মশক্তি ভগবতীকে জোর করিয়া দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছ, তাই তো এ-পঙ্গুভাব।

৪.৯.১৩।—জীবনটী চলিবে কলের মত। নিয়মমত ওঠা, পড়া, বেড়ান, খাওয়া, শোয়া—যেন কোনও বিষয়েরই ব্যতিক্রম না হয়। এ-সকলের উপরে থাকিবে—অভেদ্য নীরবতা।

কার্লাইল বলিয়াছেন, সে ভাগ্যবান, জীবনের কর্ত্তব্যের খোঁজ যে পাইয়াছে, অন্য কিছু খোঁজের তার দরকার নাই। সমস্ত বাধা বিঘ্ন আঁধার আলোর ভিতর দিয়া সেই কেন্দ্রের দিকেই জীবনকে চালাইতে হইবে, বন্দরে পৌছান চাই-ই। তবেই তো মুক্তি, শান্তি, আনন্দ।

উদ্দেশ্যের সন্ধান তো আমি পাইয়াছি, কিন্তু ব্রত-উদ্‌যাপনের যত্ন কই? ত্যাগ কই? সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা কই, যার দাহনে সমস্ত বন্ধন পুড়িয়া ক্ষয় হইয়া যাইবে? শেষ জাহাজখানা পোড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হ'তে না পারিলে কি জয়ী হওয়া যায়? জল্পনা কল্পনাতেই আমার জীবন চলিয়া গেল! আমি লেখক হইলাম কৈ? আমার মানবাদর্শ হ'তে কত নীচে আমি!

* * * *

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী রকফেলার সে-দিন তার চুয়ান্ন বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, নির্ম্মল বায়ু, সুপাচ্য সহজ simple খাদ্য, ব্যায়াম, মানসিক শান্তি এবং একটী কি দুটী মনোমত বন্ধু—ইহাই জীবনের যৌবন-ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম।

নির্ম্মল বায়ু ও প্রভাতের আলো! এদের ভিতর স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে।

ব্যায়ামের বিষয় আর কি বলিব? আমরা ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া যে-সময় অসার গল্পে জীবন ক্ষয় করি, ইংরাজ সে-সময় নানাবিধ ক্রীড়ায়

মত্ত থাকিয়া দেহকে পুষ্ট করিয়া তোলে। খেলার দিকে পূর্ব্বাপর এমন টান্ রহিয়াছে বলিয়াই এমন বলিষ্ঠ তারা, স্ফূর্ত্তিতে-ভরা, কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান্ জাতি। গ্রীসের মত অমন ক্ষুদ্র দেশে কোথাও আর এত-অধিক-উৎকৃষ্ট-মনুষ্যের উদ্ভব দেখা যায় নাই—যেমন নরনারীর সুন্দর সুগঠিত দেহ, তেমন জ্ঞান-চর্চ্চা। গ্রীসের অলিম্পিক্ গেইমস্ Olympic Games যে মানুষ-রচনা সম্বন্ধে তার মহা-সহায় স্বরূপে বিদ্যমান ছিল—তা' অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এদেশেও কি ব্যায়াম-চর্চ্চা বাধ্যতামূলক করা চলে না? কতটা শক্তি তা' হ'লে জাতির ভিতর বিকাশ পাইবে।

ইচ্ছা করিলেই, মানসিক শান্তি পাওয়া যায় না। তবে চেষ্টা করিয়া, সন্তোষের একটা ভাবকে অনেকটা আনা যায়। অবশ্য, যা' আছে শুধু তা'তেই যেন চিরকাল সন্তুষ্ট না হ'য়ে থাকি, সে তো মৃত কাঠের স্বভাব। তবে যতদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিতে পারি, ততদিন যেন বৃথা হাত-পা আছড়াইয়া বর্ত্তমানকে আরো যন্ত্রণাময় করিয়া না তুলি। দুঃখ কষ্ট যদি আসিয়াই পড়ে, নীরবতার প্রলেপে যেন তার উপশম করিয়া তুলিতে পারি। গৃহ শান্তির মন্দির হইবে; সেখানে মানস-দেবীর সেবায় যেন আমার শান্তিময় জীবন অতিবাহিত হয়। আমার স্ত্রী, আমার পুত্রগণ, আমার লোকজন—সকলেই যেন আমার সান্নিধ্য হ'তে শান্তির বাণী শুনিয়া শান্ত-আনন্দের জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। রাগ যেন কার উপর না করি, বদ্-মেজাজ to loose temper যে অসভ্যতার লক্ষণ; কটু কথা, দুর্ব্বাক্য যেন কাকেও না বলি; ধীরে স্থিরভাবে উৎসাহের ভিতর যেন আমার সমস্ত কাজ চলিয়া যায়। এই তো বর্ত্তমানের আদর্শ গৃহ-ঋষির জীবন।

বন্ধু! যার দু'একজন বন্ধু আছে, সেই শুধু বন্ধু পাইয়াছে। আমারও এমন বন্ধু রহিয়াছে—যার জন্য এক সময় আমি আত্মহারা ছিলাম। স্কুলের

সে-জীবন! বন্ধু মনো...! এখন দেখিতেছি—শুধু স্বপ্ন দিয়া সে জীবন রচিত ছিল, কিন্তু সে স্বপ্নের ভিতর যে সুখ ছিল, তার স্বাদ তো আর যেন পাইলাম না। আর সমস্ত জীবনটা! সেও তো স্বপ্নেরই সমষ্টি; বাস্তব বলিয়া যাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি, কতটুকু সত্য রহিয়াছে তারই ভিতর?

মনো...ও আমায় এখন কত পার্থক্য! সংসারের ছোট বড় ঢেউয়ের সংঘাতে কে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! সে ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাসী; আমি অবিশ্বাসী, সন্দেহবাদী। জাতিভেদের আমি মহাবিদ্বেষী, সে তেমন নয়। কিন্তু তাও তার ভিতর যে দৃষ্টি-প্রসারতা, মনের সরসতা, চরিত্রবল এবং প্রকৃত-প্রাণের পরিচয় পাই—এমন কোথায়? তার তুলনায় যে সকল সাধুর গুণবর্ণনায় পত্রিকা ও গ্রন্থ মুখর, তারা তো আমার কাছে নিতান্তই নগণ্য বোধ হয়।

খাদ্য! দৃষ্টিশক্তির অপ্রসারতা বশতঃ, কতকটা বা জ্ঞানের অভাবের জন্য, প্রয়োজন মত খাদ্য আমরা আহার করি না।

কিন্তু এ সকলই কি সব? নূতন ভাব-রসের আমদানি না হ'লে প্রাণ ক'দিন সজীব থাকে? তাই, সর্ব্বোপরি গ্রন্থ-চর্চ্চা ও কোন মহৎ উদ্দেশ্যে— যা' জীবনকে আগাগোড়া বড়র দিকে লইয়া যাইবে—মজিয়া থাকিতে হইবে। যার দেহে স্বাস্থ্য, প্রাণ নবনবভাবে পুষ্ট হইতেছে—তার বৃদ্ধত্ব বহু দূরে; সে-ই তো মনুষ্য-জীবন যাপন করিতেছে।

৯.৯.১৩।—আসৃষ্টি মানুষ রমণী-রূপ-বিভোর। নিখিল-সোহাগিনী রমণী; চিরকাল পুরুষ তার পূজা করিয়া আসিতেছে। বাইরে যতই কেন না সে বীরদর্পে বসুন্ধরাকে কাঁপাইয়া তুলুক্—আজন্ম নারীর পদতলে ক্রীতদাস সে।

পূজারি ছোট বড় সকলেই। তবে, সেই ভাগ্যবান্ যার আরাধনার দেবী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, সুশীলা—সর্ব্বোপরি স্নেহময়ী। হতভাগ্য সে, যে এমন রত্ন-হারা হইয়াছে। তার মত এমন মন-প্রাণহারিণী আর কেহ আমার চোখে পড়ে নাই, পড়িবেও না। সর্ব্বাঙ্গ পবিত্রতা-মাখা—কেমন মিষ্টি প্রাণটী, কোমল চোখ দু'টী ও তার সে হাসিটী। আমি যা হারাইয়াছি, এমন ক'জনে হারায়? স্বর্গের দ্বার খুলিয়া সে আসিয়াছিল; স্বর্গের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে সে আবার। কেন আমার ভাগ্যে এ দশা ঘটিল?

১১.৯.১৩।—কে বলে মিছা কথা বলা পাপ, কুকার্য্য? মিছা আসিল কোথা হ'তে! পুণ্যের আধার ভগবান হ'তে, না অন্য কোথাও হ'তে? পাপ পুণ্য—কতকগুলি কথার প্যাঁচ মাত্র, ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট সমাজের মন-গড়া দু'দিনের জন্য তৈয়ারী।

এ জাতির সাংসারিক practical জ্ঞানটা চিরকালই কম, ভাবের নেশাতেই সে বিভোর। তাই কতকগুলি বিষয়কে খাটী সত্য absolute truth বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে। ঠিক করিয়াছে সে, 'সত্যমেব জয়তে'; ঠিক করিয়াছে, 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়'। সকল সময়ই—কি স্বগৃহে, কি অন্যত্র—এই নীতিদ্বয়ের অনুসরণ করিয়া সে সদা গর্ব্ব অনুভব করে। ফলে লাভ হয়, অন্যে সব কথা তার জানিয়া নেয় এবং যখন সে তাদের উপর সরল বিশ্বাসে বসিয়া থাকে, তারা তার সর্ব্বনাশ সাধন করে। এমন ভাবে চলিয়াই তো সে দুর্দ্দশাকে চিরকালের জন্য বরণ করিয়া নিয়াছে।

ইয়ুরোপীয়েরাই সার বুঝিয়াছে। তারা জানে—সত্যের প্রয়োজন আছে, মিথ্যার তার অপেক্ষাও বেশী। সময় ও পাত্র বুঝিয়া এই নীতির প্রয়োগ করিতে পারে বলিয়াই তারা বড়, expediency তাদের বীজমন্ত্র।

পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, কবির কল্পনা বই কিছুই নয়

২-১১-১৩।—এলা হুইলার উইলকক্স Ella Wheeler Wilcox নামধারিণী আমেরিকার বিখ্যাত কবি লিখিত The Heart of the New Thought পড়িতেছি। বেশ বই। শ্রীমতী উইলকক্স আশা-উৎসাহের কবি; অসার সংসার, অনিত্য দুঃখময় জীবন,—এ সবের তাঁর লেখার ত্রিসীমানার ভিতর স্থান পাইবার উপায় নাই।

কেমন করিয়া জীবন কাটাইতে হয়, সংসারকে ভোগ করিতে হয়, তা আমেরিকাবাসীরাই জানে। অর্থ অনর্থের মূল ভাবিয়া সংসার-বিতৃষ্ণ হয়ে তারা বনে গমন করে না, বিপদে ধৈর্য্য-হারা হয় না, মৃত্যু দেখা দিলে সাহসে ভর করিয়া হাস্য-মুখে তাকে আলিঙ্গন করে। এমন অনুর্ব্বর দেশ, অথচ যত্ন চেষ্টায় কেমন অমরাবতীতে পরিণত হইয়াছে।

মানুষ যে মহাশক্তিমান্, অসাধ্য বলিতে যে তার কিছুই নাই—এই সত্য ভারতে বহুবৎসর পূর্ব্বে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। যোগশাস্ত্রই তার প্রমাণ। কিন্তু এমন অক্লান্ত অধ্যবসায়ে আহৃত জ্ঞানের আমরা সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। বনে জঙ্গলে নিঃশ্বাস-বদ্ধ অবস্থায় অনর্থক চোখ বুজিয়া বসিয়া বসিয়া ভগবান্ ভগবান্ করিয়া শক্তি অপব্যয়িত হইয়াছে।

ইয়ুরোপ, আমেরিকা এই সে-দিন মাত্র এ-জ্ঞানের সামান্য আভাস পাইয়াছে। Practical জাতি,—এর ভিতরই সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে তা নিয়োজিত করিয়া, কত ভাবে তার মঙ্গল-সাধন করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছে। Hypnotism, Mesmerism, Clairvoyance, Telepathy, Faith-Healing—এই চিন্তা-বিজ্ঞানেরই নানা শাখা-প্রশাখা।

Thought চিন্তার যে কি শক্তি, দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যে অভিভূত

হইতেছে। Psychology মনোবিজ্ঞান এখন সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং যে প্রকার দেখা যাইতেছে, কালে ইহার দ্বারা মানুষের অশেষ মঙ্গল-সাধন হইবে—নূতন শক্তিধর মানুষ-গঠনে এ-জ্ঞান হ'তে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

শিক্ষা, এখনকার দিনের নূতন শাস্ত্র। প্রকৃত মানুষ তৈয়ের করিতে হলে, সর্ব্বপ্রথমেই তার চিন্তা-শক্তিকে, মনোবৃত্তি সমূহকে সুপথে উদ্বোধিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইবে—ইহা তার মূল সূত্র। বস্তুতঃ, এই চিন্তা-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ এক নূতন অনাবিষ্কৃত রাজ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশলাভ করিতেছে।

শ্রীমতী উইলকক্সের মতে সকল কাজেই উৎসাহ চাই, আগ্রহ চাই, প্রশস্ত হৃদয় চাই। যারা অত্যধিক হিসাবী, সকল বিষয়েই আগ-পাছ দেখিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া চলে, তাদের দ্বারা জগতের বড় কোন কাজই সাধিত হয় নাই। যেমন আমরা—বড়ই বুদ্ধিমান! বড়ই মিতব্যয়ী! আকাঙ্ক্ষাও এ-কারণে নিতান্ত ছোট। সাধারণ, অতি সাধারণ রকম,—অন্যদেশের চাষাভূষারাও যা পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করে—এমন যৎসামান্য কিছু কাপড়চোপড়, এবং নিকৃষ্ট রকমের যা-কিছু খাদ্য—ইহা হ'লেই আমরা সন্তুষ্ট। মোটা ভাত, মোটা কাপড়—এই পর্য্যন্ত আমাদের আকাঙ্ক্ষার দৌড়; এ নীতির ব্যাখ্যাই বা কত, এর জন্য বাহাদুরী নেওয়াই বা কত! ভিক্ষুক যে দেশের সমাজপতি, অন্য ব্যবস্থা সেখানে হইবে কেমন করিয়া? শরীরকেও খাইতে দিই না, মনও পায় না তার আহার—চিরক্ষুধাতুর। এ জন্যই সকল বিষয়ে আমরা পঙ্গু হইয়া আছি। থার্ড ক্লাস আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ—তাই তো এ দেশের থার্ড ক্লাসের এমন সুব্যবস্থা। জগতের সর্ব্বত্রই ও সকল ব্যাপারেই আমরা থার্ড ক্লাসে।

না, না—এমন নয়। মন হইবে প্রশস্ত, আকাঙ্ক্ষা জগৎব্যাপী, খরচ যা করিবে, কি সামান্য পয়সাটী, কি টাকা, অম্লান-বদনে। টাকা খুব রোজগার করিতে হইবে। অর্থ না হ'লে এখনকার দিনে বনে বাস করাও যে অসম্ভব, জ্ঞান-চর্চ্চাই বা হইবে কি প্রকারে? ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণের প্রবর্ত্তিত সভ্যতার অন্ত হইয়াছে, তার চিতা-ভস্ম হ'তে শেষ-ধূম উদ্গীরণ হইতেছে। এখন, নূতন আশা, নূতন বল লইয়া—নূতন পথে চলিতে হইবে।

উইলকক্সের উপদেশ—বছরের শেষে পুরানো পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, বর্ষারম্ভে নূতন বেশ ধারণ করিবে। এত অর্থ কোথায় জুটিবে? জুটিবে, নিশ্চয়ই জুটিবে,—চলিয়াই দেখ না তুমি। প্রতি বছর যেমন গাছ-লতা নূতন পাতায় ভূষিত হয়, তেমন তাঁর মতে মানুষেরও উচিত নববর্ষে নূতন পোষাক পরিচ্ছদে নূতন উৎসাহ-উদ্যমে সংসারে অবতীর্ণ হওয়া। সত্যই, ছেঁড়া কাপড় চোপড়, পুরানো মলিন জীর্ণ সার্ট-কোট গায় দিলে মনও সঙ্গে সঙ্গে কেমন ছোট হইয়া আসে—কাজে আসক্তি কমিয়া যায়। নোংরা-জাতির আর জগতে স্থা ননাই; নোংরা উলঙ্গ সন্ন্যাসীর জীবনও আর কাম্য নয়—সভ্যতার সে phase স্বরূপ চিরকালের জন্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইংরাজ, জার্ম্মেণ, আমেরিকান, বিশেষ করিয়া এশিয়াবাসী জাপানী, বর্ত্তমান জগতে যারা সকলকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়াছে—সবই কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!

উইলকক্সের মত—একাগ্র-মনে যা ইচ্ছা করিবে—জ্ঞান, অর্থ, স্বাস্থ্য, মান, যশ—যা চাহিবে, পাইবে। মনের গতি রোধ করিবে—কার সাধ্য? কিন্তু কেমন করিয়া পাইব, কেন যে পাইব—তা তিনি বলিতে পারেন না। চিন্তার শক্তি দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন, কিন্তু কোথা হ'তে এ-শক্তির আবির্ভাব হয়, কোথায় এর পরিণতি, সীমা,

তার বিশ্লেষণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যেমন দেখা যাইতেছে, কালে এমন দিন আসিবে, যখন এই thought-forceএর সাহায্যে মানুষ অসাধ্য সাধন করিবে; চিন্তা-শক্তির তুলনায় তড়িৎশক্তিও ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইবে; যোগ-বিদ্যা সকল বিদ্যার সার বিদ্যায় পরিণত হইবে।

২০.১১.১৩।—খানকয়েক বই আছে, যা পাঠে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখ ও আনন্দ পাই।

সর্ব্বপ্রথমে, এমিয়েলের জার্ণেল Amiel's Journal। ইহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, বোধ হয় ১৯০২ সনে। সেবার মনো...দের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলে, তার নিকট হ'তে পড়িবার জন্য পাই।

কতবার যে বইখানা পড়িলাম, তথাপি পুরানো হইল না, হইবেও না। এ যে আমারই জীবন-ডায়েরী, যে অনিত্য সংসারে কিছুতেই মন বসাইতে পারিতেছে না, কিছুতে দাঁত বসাইতে যার মন যায়ও না, কোনও অমৃতেরই যে সন্ধান পাইল না। এমিয়েলের কথাগুলি আমার প্রাণের সঙ্গে কেমন মিশিয়া যায়! নশ্বর সংসার, যশ, সম্পদ, সব তুচ্ছ—এই ভাবনা তাঁর অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল, অসারতা-বিষে জর্জ্জরিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, তাই এমন পাণ্ডিত্য-সত্ত্বেও কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। কেন বৃথা পরিশ্রম, আর কি মূল্যই বা মানুষের কাজের, মৃত্যুর আগুনে সবই যে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছে—সব, তার শৌর্য্য বীর্য্য, বুদ্ধি, শক্তি, যশ মান; দু'দিন, তারপর অনন্ত আঁধার! কিছুই করিয়া যান নাই? তাঁর প্রাণের দীর্ঘকালব্যাপী দৈনন্দিন ইতিহাস যা রাখিয়া গিয়াছেন, তার তুলনা জগতে নাই, প্রত্যেক জ্ঞানযোগী সংশয়বাদীর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্য গ্রন্থ। কি প্রাণস্পর্শী ভাষায় অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় কথাগুলি লেখা! কেমন ভাষা, প্রকৃতির পরিচয়! একবার ভগবানে বিশ্বাস-হারা হইয়া

চারিদিক আঁধার দেখিতেছেন, আবার ক্ষীণ ভক্তির আলোকে চিত্ত আলোকিত হইয়া উঠিতেছে ; ম্লান-মধুর, দুঃখজ্ঞাপক, কেমন চিত্তাকর্ষক ! এমন বই আর নাই, হইবারও উপায় নাই। দ্বিতীয় এমিয়েল জুটিবে কোথায়—এমন জ্ঞানী, ভাবুক, ভক্ত সংশয়বাদী ?

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ; আমার প্রতি-রজনীর সহচর। তাঁর লেখার ভিতর এমন একটী সতেজ, পবিত্র মধুর ভাব আছে, যে পড়িতে পড়িতে ক্রমে নির্ম্মল উচ্চভাবে প্রাণ পরিপূর্ণ না হইয়া যায় না। তাঁর কবিতা পড়িতে যাইয়া প্রায়ই আমার মনে হয়, যেন আমার প্রাণের নিতান্ত গোপনীয় আকাঙ্ক্ষা, যা আমি ক্ষণেক বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত হয় তো কথনো অনু ভব করিয়াছি বা না করিয়াছি, অথবা যা প্রস্ফুটরূপে ধরা দেয় নাই, তা যেন অতি সহজভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কেমন স্বচ্ছ নির্ম্মল ভাষা ! কেমন তার স্বাধীন অনায়াস-লভ্য সচঞ্চল গতি ও ধ্বনি—যেন পাহাড়ের গা দিয়া রামধনুর নানা রংএ নিশ্রিত হইয়া বর্ষার অবিরাম-গতি স্রোতস্বতীর উজ্জ্বল জল বিনা আয়াসে বাহির হইয়া আসিতেছে ! কেমন উচ্চ ভাব ! তরুলতায়-ঘেরা ছায়া-সুনিবিড় শান্তির-নীড় বাঙ্গালার গ্রাম ও তার বাহুল্যবর্জ্জিত জীবন, পূর্ব্বকালের জ্ঞানে-সমুজ্জ্বল সন্তোষে-সরল বস্তুভার-হীনমন মুনি-ঋষিদের তপোবন—সবই কেমন নিঁখুত বর্ণনার মুখে অতুল্য সহজ শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে ! তাঁর লেখা পাঠে আমার প্রাণে কেমন এক ব্যাকুলতার ভাব আসে, কা'কে কিসেকে পাইবার জন্য কেমন এক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে—সংসারে যা দেখিয়াছি তা, অথচ তা নয় তা, কেমন এক অনন্তমুখী তা—কেমন সুন্দর ! বুঝিতেছি, অথচ আমি যে তা ভাষায় বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সে আনন্দের, ভাবের উৎস আমার অন্তরের নিতান্ত অন্তরে, ভাষার দৃষ্টির ততটা পর্য্যন্ত পৌঁছিবার যে ক্ষমতা নাই। তবে এটুকুমাত্র বুঝি, এ আনন্দধারায় যখন আমি অভিষিক্ত হই,

তখনই মনে হয়, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত যাপন করিতেছি। বর্ত্তমান যুগের ভগবান-বিশ্বাসী অনন্ত-প্রয়াসী মানবাত্মার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, দুঃখ, ক্রন্দন সমস্তই রবীন্দ্রনাথের লেখায় কেমন জমাট্ হইয়া আছে! মানুষের হাতে এমন অপূর্ব্ব-সুন্দর সামগ্রী এপর্য্যন্ত খুব কমই রচিত।

তৃতীয়তঃ, জার্ম্মেণ-পণ্ডিত পল ডেল্‌কি Paul Dalhke লিখিত Budhist Essays ও বুদ্ধদেবের কথা-প্রসঙ্গ Dialogues of the Budha। আমার মত যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, অথচ সংসারে ডুবিয়া আছেন—তাঁর পক্ষে বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ শান্তিবারি। তিনিই একমাত্র ধর্ম্মপ্রচারক, যাঁর জ্ঞানের গভীরতা, সুনিপুণ চিকিৎসকের মত মানবাত্মার প্রকৃত-পীড়া নির্ণয়ের ক্ষমতা, ও তার প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারের অক্লান্ত চেষ্টার দিকে চাহিয়া, বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আমার চিত্ত আপনা হ'তে পদতলে নোয়াইয়া পড়ে। কেমন সৌম্য তাঁর মূর্ত্তি, মৈত্রীর ভাবে সমস্ত বিশ্বের মানুষ, পশু, পক্ষী সকলের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ প্রাণ! ডেল্‌কির লেখায় তাঁর অনুপম জীবনী, ও অশেষ যত্নে লব্ধ তাঁর উপদেশ সব, কেমন মনোরম ভাবেই না বিবৃত হইয়াছে! অপমানে ব্যথিত, ও হিংসা-বিষে জ্বলিয়া, অর্থতাড়নায় বিব্রত, শোকে দগ্ধপ্রাণ হইয়া যখনই বুদ্ধদেবের অমৃতবাণী-ভাণ্ডে মুখ দিয়াছি, তখনি প্রাণে যৎসামান্য শান্তির কণা পাইলেও পাইয়াছি। তাঁর মতে 'আমি' বলিয়া কিছুই নাই, মাত্র ভ্রান্তি-সংস্কার; তবে কিসের দুঃখ, কিসের অপমান? তাঁর সান্নিধ্যে ভয় দূরে যায়, মান-যশের চিন্তায় ক্লিষ্ট হতে হয় না, অপমানের প্রতিশোধ নেবার বাসনা, হিংসা, রাগ থাকে না; সমস্ত নৈরাশ্য উদ্বেগ দূর হইয়া বিমল শান্তির ভাবে চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বুদ্ধদেবের জীবন ও তাঁর

উপদেশাবলী, প্রকৃত জ্ঞানই যার মূল এবং দুঃখী জীবের প্রতি ভালবাসা যার বর্ণে বর্ণে মিশিয়া রহিয়াছে।

ইদানীং, আর এক শ্রেণীর লেখাও আমার ভাল লাগিতেছে—New Thought Movement রূপ ভাবের প্রচার উদ্দেশ্যে যে সকল বইর প্রচার হইতেছে—যেমন Marsden, Trine, James Allen, Wilcox প্রভৃতির লেখা। এঁরা শক্তির উপাসক, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এঁদের উদ্দেশ্য। মানুষ চিন্তা করুক্‌ ও কাজ করুক্‌, নির্ভীক নিশ্চিন্ত মনে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হোক্‌, ভবিষ্যতের চিন্তায় পা জড়িত হ'তে দেওয়া নাই কিছুতেই—এই এঁদের মূলমন্ত্র। বইগুলি অনেকটা tonicর মত কাজ করে; পড়িলেই আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না, নিজ-শক্তির উপর বিশ্বাস দেখা দেয়। বেশ সব বই, কিন্তু shallow অগভীর। যে দার্শনিক তত্ত্বের উপর এঁদের নূতন movement প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ মন ও চিন্তার অসীম অপ্রতিহত ক্ষমতা, কোথা হ'তে এ ক্ষমতার উদ্ভব ও কেমন করিয়া উদ্ভব হয়—তা এঁরা নিজেরাই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যদি কখনো পারেন, তখন এঁদের শিষ্যসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইবে। যতদিন তা না হয়, জ্ঞানীর সভায় এঁদের নব-ধর্ম্মের আদর হইবার সম্ভাবনা কম। তথাপি, এঁরা এই মত প্রচার করিয়া মহামঙ্গল-সাধন করিতেছেন।

২১.১১.১৩।—Daily Newsএ বেশ একটা কথা পাওয়া গেল। একজন প্রশ্ন করিয়াছেন, পৃথিবীর লোকসংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে। এত নূতন 'আত্মার' কোথা হ'তে সৃষ্টি হইতেছে?

যে দেশের স্বাস্থ্য ভাল, লোকজন খায়-দায় পরে ভাল—দেখা যায় সে দেশেরই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তা হ'লে কি ভাল খাওয়া-পরার

সঙ্গে 'আত্মা-সৃষ্টির' বিশেষ সম্বন্ধ আছে? গো-মহিষও যে এমন অবস্থায় সংখ্যায় বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়; ভাল সার দেওয়া চাষী জমীতেও ধান, সরিষা, কলাই, সবই যে জন্মায় ভাল ও বেশী। পার্থক্য কোথায়?

২৩.১১.১৩।—বড়ই সুসংবাদ! এমন সুখবর বাঙ্গালীর কানে (বঙ্গভঙ্গ-রদ সংবাদ ব্যতীত) কখনো পৌঁছে নাই। রবীন্দ্রনাথ Nobel Prize পাইয়াছেন, মূল্য একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা।

রবীন্দ্রনাথ তো যথেষ্ট সম্মান পাইলেন, বাঙ্গালী এমন গৌরব কখনো পায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমরা, তাঁর দেশবাসীও, এ গৌরব-সাগরে স্নান করিয়া ধন্য হইলাম। ধন্য বাঙ্গালা! ধন্য বাঙ্গালা ভাষা! ধন্য আমি!

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উপাসক আমি কলেজের দিন হ'তে। এমন ভাবের লেখা—একাধারে কাব্য, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব—কই, কোথাও তো পাই না। ইংরাজ-কবিদের মধ্যে শেলীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়। তার কারণ বোধ হয়, উভয়েরই কবি-যোগ্য সুন্দর মূর্ত্তি; উভয়েরই লেখায় বাস্তব অপেক্ষা ভাবের প্রাবাল্য অধিক, অনেকটা shadowy না-আলো, না-আঁধার, আবছায়ার মত কথঞ্চিৎ অস্পষ্ট; উভয়েই অশরীরী abstract ভাবকে বাস্তব-মূর্ত্তি দান করিয়া জীবন্তরূপে চোখের কাছে ধরিয়া দেন। কিন্তু, এই পর্য্যন্তই। শেলী শান্তির অপেক্ষা অশান্তিরই অধিক উদ্রেক করেন; তিনি বিদ্রোহের কবি, অগভীর অশান্ত-বক্ষ চঞ্চল নদী; রবীন্দ্রনাথ অতলস্পর্শ শান্ত-সাগর। শেলীর লেখাও অনেকটা unequal অ-সমান, দুচারি লাইন খুব উঁচু রকমের, পরেই পতন। রবীন্দ্রনাথের পাশে শেলী—বালকবিশেষ। অধিক বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে, শেলীর পরিণতি কি দাঁড়াইত বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন 'সুদূরের' দিকে মনকে লইয়া যায়, যেমন অনন্তের

নিস্তব্ধতার মাধুর্য্য ও শান্তি মনে আনিয়া দেয়—যাহাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্যের লক্ষণ—এমন আর কার লেখায় হয় ?

বরং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত তাঁর তুলনা মানায় ভাল ; কিন্তু সে কথা আজ থাক্‌ ।

কোন কোন বিষয়ে বরং শেলী অপেক্ষা ব্রাউনিংএর সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। উভয়ের তুলিকা-পাতেই প্রেম ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে ; সে প্রেম পাপ-স্পর্শশূন্য, পাপের দাগ তাতে বসিতে পারে না ; উভয়েরই কবিতা পড়িতে পড়িতে শেষে চারিদিকে প্রেমের খেলাই চোখের কাছে ভাসিতে থাকে, তার আনুসঙ্গিক সঙ্গীত ও চিত্র ; কিন্তু ব্রাউনিংএর expression বলিবার ভঙ্গী সুন্দর নয়। রচনার ভিতর যথেষ্ট শক্তি ও তেজ, কিন্তু সে অনুপাতে সৌন্দর্য্যের বড়ই অভাব, সময়-বিশেষে নিতান্তই কঠোর, কর্কশ। তা ছাড়া idealism ভাবুকতা, অনন্তের ভাব, spiritualism আধ্যাত্মিকতা, অত্যধিকরূপে সংসার-জ্ঞানী ইয়ুরোপীয় কবিদের লেখার ভিতর কমই দৃষ্ট হয়। হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প। উপনিষদের ধর্ম্মে পুষ্ট, বৈষ্ণব-পদাবলীর রসে-মজা রবীন্দ্রনাথের লেখা, এ সকল ভাবে পরিপূর্ণ ; আর তাঁর বলিবার নিয়ম—কেমন সহজ, অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য !

৬.১২.১৩।—আমরা এত দরিদ্র কেন ? এর কারণ দরিদ্রতাকেই আমরা ভালবাসি। সর্ব্বস্ব-ত্যাগী সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী, আমাদের জীবনাদর্শ। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, পুঁথি-পুস্তকে—সর্ব্বত্রই সন্ন্যাসীর পূজা। আমরা সংসারে, ধনে কিংবা পরাক্রমে বড় হ'তে চাই নাই, বড় তাই হইও নাই। পৃথিবীর ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-জাতি হইয়াও আমরা সকলের পদতলে পতিত !

অল্পেই আমরা সন্তুষ্ট—অভাব নিতান্ত কম। একমুঠা চা'ল ও একখানা পরিধানের কাপড় হ'লেই আমাদের চিন্তা একপ্রকার দূর হয়; এর ফলে, আমাদের উৎসাহ উদ্যমের নিতান্ত অভাব।

আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। সংসার অসার, জীবন অনিত্য, ধন মান যশ সম্পদ সর্ব্বৈব মিথ্যা, বাল্যকাল হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বাণী শুনিতে শুনিতে সত্যই আমরা কার্য্যের স্পৃহা হারাইয়া ফেলি। সংসার যে অসার, অনিত্য—তা কে না দেখে? প্রতিদিন মৃত্যু কত আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত অপরিচিত লোককে অপসারিত করিতেছে। এই সত্য, সময়ে অসময়ে প্রচার করিয়া লাভ নাই; ক্ষতি বরং যথেষ্ট, শুধু মনে অবসাদ ও দুর্ব্বলতা আনে।

নিতান্ত দরিদ্র আমরা, দু'একটা পয়সা যা পাই—তার বড়ই হিসাব করিয়া চলি। তাই, আমরা উৎসাহ-উদ্যমশূন্য। যদি দু-একটী টাকা কোথাও পাই—জমাইয়া রাখি, পাছে কোনও নূতন কাজে হাত দিয়া খোয়াইয়া ফেলি।

এত হিসাব, এত জমাইবার প্রবৃত্তি ভাল নয়। আমি কৃপণ অপেক্ষা বরং অমিতব্যয়ীকে পছন্দ করি। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক হ'তে মাঝে মাঝে মহাবীরের মহাকর্ম্মীর আবির্ভাব হয়। ফরাসী জাতি মহা হিসাবী, ইংরাজ তেমন নয়। কিন্তু ইংরাজ সাহসী অধিক। তাই, ইংরাজের কাছে ফরাসী পরাস্ত।

আমরা যখন এখনকার অপেক্ষা ভাল খাইতে ভাল পরিতে শিখিব, standard of living বাড়িবে, তখন আমাদেরও অবস্থার উন্নতি হইবে। পূর্ব্বকালের ঋষির ন্যায় খালি গায় খালি পায় থাকা ও একবেলা আহার করা যদি এখনও জীবনাদর্শ হয়, তবে মৃত্যু অনিবার্য্য। ইংরাজীতে যে Plain Living and High Thinking এর

কথা আছে, তা আমাদের মত আলুভাতে-ভাত খাওয়া ও কম্বাশয্যা নয়।

১১.১২.১৩।—সমালোচক-রাজ Saint Beuve সম্বন্ধে পড়িতেছিলাম। মর্লের মতে, এক Saint Beuveর সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্যই ফরাসী ভাষা শিক্ষার দরকার—তাঁর সমালোচনা এক পরমানন্দ ও জ্ঞানের উৎস। কি অধ্যবসায়! সিদ্ধি-সাধনে কি পরিশ্রম! laboremus—পরিশ্রমই, তাঁর জীবনের motto ছিল।

১৮৪৯ সনের অক্টোবরের প্রথম তারিখ হ'তে আরম্ভ করিয়া বাইশ বছর ক্রমান্বয়ে প্রতি সোমবার বিশ হ'তে ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর-লেখা একটী করিয়া সাহিত্য-সমালোচনা প্রকাশিত হইত। ক্বচিৎ হয় তো এ নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে। এ সকল সমালোচনা লিখিতে কত না বইই পড়িতে হইয়াছে, কত না খাটিতে হইয়াছে। এ-সকল লেখার জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচকের পদে প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্যভাবে তিনি অধিষ্ঠিত।

কি ভাবে তিনি কাজ করিতেন, নিজে তা বর্ণনা করিয়াছেন—'আমি একদিনের জন্যও কাজে বিরত হই না। সোমবার অনুমান ত্বপুরবেলা আমি আমার মস্তক উত্তোলন করি এবং ঘণ্টাখানেকের জন্য মুক্তভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি। তার পরেই দরজা আবার বন্ধ হইয়া যায় এবং এক সপ্তাহের জন্য আমি জেলখানা-বাসী হই।

১৯.১২.১৩।—যাঁদের বক্তৃতা করা পেশা, তাঁরা বক্তৃতা করুন; অন্যের পক্ষে কথা বলা, শক্তির অপচয়।

বেশী-কথার-লোককে, অন্যে মান্য করে না, ভয় করে না; কাজে

তার মন বসে না। কথা বেশী বলিলে যে মনে আমি শান্তি পাই না, ভিতরটা যেন কেমন এলোমেলো হইয়া উঠিল বলিয়া বোধ হয়।

চিত্তমধ্যে কি যে এক শক্তি বিরাজ করিতেছে, নির্জ্জনতার ভিতরই যার সম্যক্ পরিপুষ্টি হয়। তেমন দুঃখও নীরবে সহ্য করিবার চেষ্টা করিলে আয়ত্ত্বাধীন হইয়া আসে; দুঃখের কাহিনী লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইলে বাতাসে আগুনের মত যেন দপ্ দপ্ করিয়া বাড়িয়া যায়।

নির্জ্জনতার ভিতর কাজ করিবে, বিশেষতঃ যে লেখক। দেবীর সঙ্গে ভক্তের দেখা, নির্জ্জনেই হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আদর্শ-সাহিত্যিক-জীবন রবীন্দ্রনাথের চলন-পদ্ধতি :—

'জান ত ভাই, আমি হ'চ্ছি জলচরের জাত,
আপনার মনে সাঁতারে বেড়াই, ভাসি দিন রাত।
রোদ পোহাতে ডাঙ্গায় উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাজে এগোই, তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখ্‌লে আবার ডুবি অগাধ-জলে,
এমনি করেই দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে।'

'আমারে ডেকো না আজি এ নহে সময়,
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত-হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন।
মানবের মাঝে এ যে ছাড়া পায়
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধমুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।'

জীবন-লক্ষ্য লাভ করিতে প্রয়াসী যাঁরা, তাঁদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মহত্তর উপদেশ নাই। লোকের সঙ্গে মিশিতে যাইয়া, তাদের সন্তুষ্ট করিতে ও তাদের গল্প-গুজবের খোরাক জুটাইতে যাইয়া আদর্শের সন্ধান শেষটায় হারাইতে হয় ও মনের ভিতরকার মানুষটী দিনের দিন বামনত্ব প্রাপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজ-জীবনে তাঁর কথার স্বার্থকতা দেখাইয়াছেন। আবাল্য তিনি কবিতা-দেবীর নীরব সাধক। তাঁকে প্রীত করিতে যাইয়া পদ-মর্য্যাদা, সম্মানের দিকে কখনো সামান্য দৃষ্টি করেন নাই; তাই, তিনিও ভক্তকে এতদিন পরে গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিলেন। আজ রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গালার ন'ন, শুধু ভারতবর্ষের ন'ন—সমস্ত জগতের বরেণ্য শ্রেষ্ঠ কবি।

চুপ্! কারো সঙ্গ নয়। সাধারণ লোক, তা সে ধনীই হোক্ বা প্রতাপশালী হোক্, সে তো পোকা-মাকড়,—কোনটী ছোট, কোনটা বা বড়। জীবনে যার Idealism ভাবের আবেশ নাই—সেও মানুষ? দূরে, দূরে—দূরে।

*

প্রায় মাসেক হ'ল, রবীন্দ্রনাথ Nobel Prize পাইয়াছেন। সমস্ত বাঙ্গালা ভরিয়া আনন্দ-স্রোত বহিতেছে; বাঙ্গালী অনেকদিন এমন আনন্দ ভোগ করে নাই।

বহু বৎসর হ'ল রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে' বঙ্গ কবিকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

'উঠ বঙ্গ-কবি মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষেরে দেও প্রাণ;
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।

চাহিবে মোদের মায়ের বদনে

ভাসিবে নয়ন-জলে ;

বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে

মায়ের চরণ-তলে।

বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে

কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি ;

গান গেয়ে কবি জগতের তলে

স্থান কিনে দাও তুমি।'

সাধনা এতদিন পরে সফলতায় ভূষিত হইয়াছে। এই প্রথম বাঙ্গালীর মুখ-নিঃসৃত ভাষা জগৎ-সভায় অন্যান্য ভাষার সঙ্গে স্থান পাইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের সহিত এও মনে হইতেছে, কবির অন্য আশা এখনও পূর্ণ হইল না ; 'বঙ্গ-ভাষার' বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই হইল, কিন্তু 'বঙ্গভূমির' তো হইল না। কবে হইবে? জীবনের সে সাধ পূর্ণ হইবে কি? মরিবার পূর্ব্বে সে দৃশ্য দর্শনে চোখ সার্থক হইবে কি?

* * * *

রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন করিবার জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক, জনকয়েক মহিলা ও ইংরাজ বোলপুরে গিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হ'তে তাঁদের যথোচিত ভাবে গ্রহণ করিবার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। বিশেষতঃ, জগদীশচন্দ্রের সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে, এতদিন তিনি দেশবাসীর হস্তে নিন্দা ও কটূক্তিই লাভ করিয়াছেন, এবং পশ্চিমেই তাঁর সর্ব্বপ্রথম সম্যক্ আদর দেখান হইয়াছে—এ ভাবের কথায় তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারে সকলেই যারপর নাই বিরক্ত হইয়াছে।

দু'এক স্থানে সভা-সমিতি করিয়া পর্য্যন্ত তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন। তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে বছর দুই হ'ল, সভা করিয়া সমস্ত বাঙ্গালার পক্ষ হ'তে তাঁকে অভিনন্দন করা হইয়াছিল। এমন সম্মান বাঙ্গালী, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বা হেমচন্দ্র কা'কেও দেখায় নাই।

রবীন্দ্রনাথকে বিশেষরূপে নিন্দা করিয়াছেন কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, তাঁর 'মিঠা কড়া' নামক পুস্তিকায়। আর ইদানীং করিতে-ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'সাহিত্যে'। 'মিঠা কড়া' দিনকয়েক অর্দ্ধ-শিক্ষিত ছাত্রমহলে হাসির তরঙ্গ উঠাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। 'সাহিত্যের' সেই বিদ্বেষাত্মক সমালোচনারই বা কে সংবাদ নেয়? বাঙ্গালার যুবকদের মধ্যে অনেকেই কলেজের দিন হ'তে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত-শিষ্য। তাঁর অনুকরণে তারা নানাভাবে নানাসময়ে চুল কাটিয়াছে, চশমা পরিধান করিয়াছে, মিহি মেয়েলি সুরে গান গাহিয়াছে, কথা কহিয়াছে, প্রেম-কবিতা লিখিয়া বন্ধুদের বিরক্ত করিয়াছে। তাঁর রচিত গান না হ'লে কোন সখের মজলিসই জমিয়া উঠে না। বাঙ্গালার কোন্ কবির ভাগ্যে এতটা জুটিয়াছে? তাও, রবীন্দ্রনাথ যে তেমন সর্ব্বজন-প্রিয় কবি ন'ন,—তার কারণ অনেকটা তিনি নিজেই। লেখায় প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইংরাজী-ধরণ অনুসরণ করিয়াছেন, ভাষা অনেকাংশে ভাবের আব্ছায়ায় ঢাকা, বলিবার ভঙ্গী, বর্ণিত-বিষয়—সমস্তই এদেশের পক্ষে নূতন। তাই, জনসাধারণের—যাদের প্রায়ই অর্দ্ধশিক্ষিত—কাছে, তাঁর তেমন সম্মান নাই। এমন কি, তিনি নোবেল-প্রাইজ পাইয়াছেন, এ সত্ত্বেও অনেকে তাঁকে নবীনচন্দ্রের সমকক্ষ বলিতেও কুণ্ঠিত। কিন্তু তাঁর লেখা যে তাদেরও প্রাণের ভিতর যাইয়া পূর্ব্বাপর খোঁচা দিতেছে এবং তাঁর

প্রভাবের বেষ্টন এড়ান যে দুঃসাধ্য, তার প্রকৃষ্টপ্রমাণ এই শ্রেণীর লোক হতে যেখানে সেখানে ঠাট্টাবিদ্রূপ। তাদের মতামতের মূল্যই বা কি? এর জন্য অভিনন্দনের উত্তরে এ-ভাবে কটূক্তি-বর্ষণ!

যেমন অসংযত জিহ্বা, তেমন অসংযত লেখনী—উভয়েই কেমন বিশ্রী জিনিষ! দু'চারিটী অনাবশ্যক কথার দোষে, এমন একটী সুন্দর ব্যাপার, আনন্দের মিলন, কেমন নষ্ট মলিন হইয়া গেল! বড়ই দুঃখের বিষয়! আমাদের দুর্ভাগ্য!

কথা উঠিয়াছে, লেখকের চরিত্র বা পারিবারিক জীবনের সংবাদের কোনও দরকার নাই; তাঁর লেখাই যে শুধু উপভোগের জিনিষ। আমি কিন্তু এ মতে সায় দিতে পারি না।

যাঁর জীবন-কাহিনী অজ্ঞাত, শুধু লেখাই তাঁর বিচার্য্য, কিন্তু যাঁর সম্বন্ধে তা জানা আছে (আর, বর্ত্তমানে কারো জীবন-কথা কি গোপন থাকার উপায় আছে?), তাঁর লেখা ও জীবন উভয়েই বিশ্লেষণের জিনিষ। পাতা যেমন পুষ্প-গুচ্ছের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বা শুষ্কতাবশতঃ তার হানি করে, তেমনি নিজ-জীবনের পরিপুষ্টতা বা হীনতা লেখকের লেখাকে উজ্জ্বল বা মলিন করিয়া তোলে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শেলীর লেখা এমন উপভোগ্য, তার অনেকটা কারণ, তাঁর স্বাধীন কপটতাবিহীন ভাব-প্রবল জীবন; সে জীবনেরই যেন প্রতিবিম্ব তাঁর রচনা। কিট্‌স ইংরাজী-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবি, বিশেষ করিয়া তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য; সে করুণ-কাহিনীর কথা মনে হলেই, তাঁর লেখার দিকে আপনা হতেই আকৃষ্ট হতে হয়। ড্যাণ্টি ও পেট্রার্কের প্রেম, তাঁদের গ্রন্থোপরি এক বিমল সৌন্দর্য্যরশ্মি ছড়াইয়া রাখিয়াছে। ওমার খাইয়ম ও

তাঁর শাখীর কাহিনী, তাঁর কবিতাকে এক চিরমধুর নবীনতার স্বাদে ভরিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাপতি ও লছিমা দেবীর প্রেমোপাখ্যান, মিছা জানিয়াও লোকে ইচ্ছা করিয়া ভুলিতেছে না। চণ্ডীদাস ও রজককন্যা নিরক্ষরা রামী, কৃষ্ণ-রাধিকার সব-ভোলা-প্রেমের কথা মনে করাইয়া দিয়া, তাঁর লেখাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনটীও পূর্ব্বাপর কেমন সুন্দর! তাঁর কবিতারই অনুরূপ। কালে, তাঁর কাব্যোপাসকের সঙ্গে তাঁর জীবন-যাপন প্রণালীর স্তুতিবাদকও কত দেখা দিবে। কবির কাব্য বুঝিতে হলে,—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের মত কবি, হৃদয়-বৃত্তি বিশ্লেষণই যাঁর কাব্যের প্রধান উপকরণ,—তাঁর জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। ছোট বড় সকল লেখক সম্বন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য। তাই, মূল-জীবনের উপর কলঙ্কের আঁচড় পড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে লেখার উপরও অলক্ষিতে কেমন কালিমা আসিয়া পড়ে; কবিহৃদয়ের স্বতোত্থিত ভাব নয়, artificial কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। অসত্যের প্রতি মনের কেমন একটা স্বাভাবিক ঘৃণা রহিয়াছে, কৃত্রিম তাই শ্রদ্ধা আকর্ষণে অপারগ হইয়া উঠে। কবি-জীবন যতটা কাব্যানুরূপী হয়, ততটাই মঙ্গল।

২১.১২.১৩.।—Hero শব্দের প্রচলিত বাঙ্লা প্রতিভাষা, বীর। কিন্তু Hero and Hero-worship কথা দুটি যে ভাবে ইংরাজীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাতে শুধু বীর শব্দে hero শব্দের ভাবপ্রকাশ হয় না। বরং heroর প্রতিশব্দ ভাব-বীর করিলেই ঠিক হয়। যে কেহ আন্তরিকতার সহিত ভাবের উপাসনা করে, তাকেই hero বলা যায়। কেবল যোদ্ধা হলেই hero হয় না। রাবণ মহাবীর ছিলেন, কিন্তু hero ন'ন। রামচন্দ্র পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, রাজ-

জীবনের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন এবং এ-সব আদর্শের পদে নিজ সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাই তিনি hero। সেই প্রকার, ভ্রাতৃ ভালবাসার আদর্শ, লক্ষণ—hero। মানসিংহ মহাবীর, কিন্তু hero ন'ন ; hero স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবনপণ প্রতাপসিংহ। ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলেই ধনী বা মহাযোদ্ধা হওয়া যায় না কিন্তু heio হওয়া, ছোট বা বড় প্রত্যেকেরই আয়ত্বাধীন। ভাব ও চরিত্র-কাঠিন্যই এদের জীবনের মূল ভিত্তি, ভাঙ্গে এরা কিন্তু দোলেনা। যে জীবনের ভিতর এই heroর ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণেও নাই, সে জীবন জীবনই নয় ; তা কখনো আমার ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে না।

১৮.১.১৪.।—লেখক হইবে? আদর্শ-লেখক রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ কর। লোকের সঙ্গে তিনি মিশেন কম, পারতে কারও সহিত কথা বলেন না। স্থির-সরোবর বক্ষেই যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে ভাল ও ঠিক রূপে। বাক্য-ঝঞ্ঝনা কাব্য-লক্ষ্মীর চির-অসহনীয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে লইয়া বিভোর, অথচ চোখের কাছে যা পড়িতেছে, ফটোর মত হৃদয়ে আঁকিয়া যাইতেছে। বিলাতে, নিমন্ত্রণে, ভোজে, সভা সমিতিতে, তাঁর এ-প্রকার নিশ্চল নীরব-ভাবে উপবিষ্ট অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া লোকে আশ্চর্য্যাভিভূত হইয়া পড়িত। সকলেই কথা বলিতেছে, কিচির মিচির শব্দে, হাস্যধ্বনিতে গৃহ তরঙ্গায়িত ; তিনিই শুধু নির্ব্বাক্। বিশেষ দরকার হলে, দু চারিটী কথা বলিতেন ; একজন সমালোচক বলিয়াছেন, তা' যেন স্বর্গের বাণী বলিয়া বোধ হইত। তাঁর মুখ-নিঃসৃত কথা যাঁর কানে কখনো পৌঁছিয়াছে, তিনিই এ-বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে সায় দিবেন। স্বর্গের দেবদূতের মত তাঁর মুর্ত্তি, তারই যোগ্য কণ্ঠ-

স্বর। এক অপূর্ব্ব বস্তু, এই রবীন্দ্রনাথ। কথার-লহরীতে লোক চমকাইতে তিনি কোনও প্রকার চেষ্টা করেন নাই, অথচ চরিত্রোৎকর্ষের জন্য যে পূজা পাইয়াছেন, তা ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তাঁর সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তির সঙ্গে যীশুখ্রীষ্ট ও ইলাইজা প্রভৃতি ইহুদী প্রফেটদের prophet মূর্ত্তির তুলনা হইতেছে। ভারতবর্ষ হতে কত বাক্য-বীর তো সে দেশে গিয়াছেন, কে তাঁদের প্রতি এমন শ্রদ্ধা-প্রীতি দেখাইয়াছে?

১৯.১.১৪.।—গতকল্য Hall Caineর Manxman উপন্যাস পাঠ শেষ করা গেল।

যে সকল বই পড়ার শেষে, চিত্তে একটা ভাবের কম্পন উপস্থিত হয়, শীঘ্র যা থামে না,—ইহা সে শ্রেণীর উপন্যাস।

গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র Pete, প্রকৃত বীর। যে বালিকাকে সে আবাল্য আরাধনা করিয়া আসিয়াছে, যাকে পাইবার জন্য বিদেশে সে পাঁচ বছর ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অর্থসঞ্চয়ে নিযুক্ত ছিল, যাকে লাভ করিয়া সে ধরাকে স্বর্গ জ্ঞান করিয়াছিল, কালে যখন জানিতে পারিল, তার এত আদরের স্ত্রী Kate তার নয়, তারই প্রিয় বন্ধু Philipএর সঙ্গে কলুষিত-চরিত্রা হইয়াছে, যখন দেখিল কন্যাজ্ঞানে যে শিশুকে বুকে তুলিয়া এত আদর করিতেছিল, সে তার নয়, Philipএর কন্যা—তখনকার দুঃখবিদারিত তার হৃদয়ের চিত্র গ্রন্থকারের ভাষায় কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু এত দুঃখ-যাতনার ভিতরও Pete সরল প্রকৃতি বালকটির ন্যায় হাস্যামোদী। বড়ই করুণ সুন্দর চিত্র!

সমাজের নিয়ম ভাঙ্গিলে যে কি মানসিক যাতনা ও শাস্তি বহন করিতে হয়, তার দৃষ্টান্ত Philip ও Kate। Philipএর চরিত্র মহানুভাবতায় পূর্ণ। আর Kateর ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা, বাধা বিঘ্ন বলিয়া যার

কাছে কিছুই নাই। এক প্রেমাস্পদ-রূপ সূর্য্যালোকেই তার সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ, অন্যের অস্তিত্বের তাতে স্থান নাই।

ইংরাজ ঔপন্যাসিকদের গুণ, যে তারা প্রধান চরিত্রের সঙ্গে এতগুলি ক্ষুদ্র চরিত্র ফুটাইয়া তোলেন ও ঘটনার সমাবেশ করেন, যে উপন্যাসের কার্য্যস্থল Theatre of action লোকজন যেন চোখের কাছে ভাসিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মূল চরিত্রগুলি এদের হতে আলো পাইয়া আরো চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। আমাদের ঔপন্যাসিক গুটীকয়েক ফুল ফুটাইতেই চেষ্টা করেন, তাদের বেষ্টনী,—পত্র পল্লবও—যে তাদের সৌন্দর্য্যের সম্যক প্রস্ফুটনের জন্য প্রয়োজন, তার সংবাদ তিনি রাখেন না। Manxman উপন্যাস পড়িতে পড়িতে Isle of Man ও তার লোকজন সম্বন্ধে কেমন একটী মনোরম চিত্র চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে!

বইখানা বেশ।

অনেকটা এই প্রকার ঘটনামূলক আরো দু একখানা উপন্যাস পড়িয়াছি। এ-ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ টলষ্টয়ের Anna Karenina। এ-সকল গ্রন্থপাঠে ইহাই বুঝা যায়, ইয়ুরোপীয় সমাজ ক্রমে ক্রমেই Free Lover পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে; সতীত্বরূপ ভূতের bugbearর হাত হতে তারা দিন দিন মুক্ত হইতেছে। বিবাহের এত বাঁধাবাঁধি কঠোর নিয়মের আর তারা তেমন ভক্ত নয়। তাদেরই মত ঠিক। বর্ত্তমানেও সমাজের একাঙ্গ, পুরুষের, বাঁধনা-ছাড়া স্বাধীনতা; নিয়মের শিকল শুধু অসহায়া দুর্ব্বলা স্ত্রীলোকের জন্য, পুরুষের সুবিধার জন্য। সমাজকে বেশী-বেশী নিয়মের দড়িতে বুকে পিঠে বাঁধিতে গেলে, অচল হইয়া দাঁড়াইবেই সে, যেমন আমাদেরটী।

যে সকল নারী সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কুলটা-শ্রেণী ভুক্ত হইতেছে, তাদের আমরা কি করিব এবং তাদের সন্তানেরাই বা দাঁড়াইবে কোথায়? বিষাক্ত অঙ্গকে কাটিয়া ফেলিয়া দেবার ন্যায়, সমাজ হ'তে এদের বিতাড়িত করিয়া দিয়াই, অবস্থা-উচিত কার্য্য হইল বলিয়া সমাজ নিশ্চিন্ত। কিন্তু তারা তো মরে না; ভাসিতে ভাসিতে সমাজের সঙ্গেই—যাকে বলা হয় নিম্নস্তর—আসিয়া আবার জোড়া লাগে। ফলে, যে অংশে প্রধান ক্ষত, পাপ, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য, অকাল-মৃত্যু, নিঃসহায়তা যার অঙ্গ, তার সঙ্গে মিশিয়া তার আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিতেছে। একি ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা? কুলটাকে শাস্তি দিতে হয় দাও, কিন্তু তার সন্তান, সে যে তোমারই সন্তানের মত পবিত্র, নির্ম্মল, জন্মকালে সেও যে হাসিমুখে স্বর্গের সমাচার বহন করিয়া আনে, শিক্ষা পাইলে সেও যে অন্য দশজনের মত শিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে। জন্ম হ'তে তার কপালে বৃথা কলঙ্কের দাগ লাগাইয়া তা'কে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দাও কেন? সমাজের নিম্নস্তরে ফেলিয়া তা'কে তার অঙ্গ দুষ্ট করিতে দাও কেন?

Manxmanর প্রধান চরিত্র Pete ঈদৃশ নারীর সন্তান। সমাজে তার তেমন উচ্চ স্থান ছিল না, কিন্তু তথাপি সে দশজনের একজন ছিল এবং কালক্রমে একটী ভদ্র গৃহস্থ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। আমাদের সমাজ হ'লে, তা'কে নফরী বা গোলামী করিয়া জীবন কাটাইতে হইত।

রমণীদের সম্বন্ধে আমাদের ব্যবস্থা পূর্ণ বর্ব্বরতা। কুলটার কোন সমাজে স্থান নাই; কেন যে নাই, তারও কোন বিশেষ কারণ খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। কু-পুরুষের যখন সমাজে মহাগর্ব্বে থাকিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, কুলটারই বা কেন হইবে না? কোন প্রকারে পদস্খলন হ'লেই যে তাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে, একি ভীষণ ব্যবস্থা! অথচ, ইহা নিশ্চয়, পুরুষের দৌরাত্ম্যেই স্ত্রীলোক গৃহত্যাগী হয়। সর্ব্বস্ব লইয়া, কত

আশা বুকে ভরিয়া, অভাগিনী অজানা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে—দু'চারিদিন, তার পর কোথায় অন্তর্হিত হয় তার প্রেমিক! ইহাই তো কৃষ্ণ-রাধিকার কাহিনী। আসৃষ্টি সর্ব্বত্রই এই লীলারই অভিনয় হইতেছে। অথচ, প্রাণের ব্যাকুলতায়, প্রেমের গভীরতায়, মনুষ্যত্বের উচ্চতায়—রাধিকার তুলনায় কৃষ্ণ! তার পাশে দাঁড়াইবারও উপযুক্ত নয়। চিরকাল তাও রাধিকাকেই লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া আসিতে হইতেছে—সে যে নিতান্ত দুর্ব্বলা, উপায়-বিহীনা! কখনো কি তার প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা হইবে? পুরুষের হাতে তো নই-ই। হইবে, যদি তারা নিজ দুঃখ নিজে অপসারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, পায়ের বেড়ী ভাঙ্গিয়া সাহসে ভর করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

২১.১.১৪।—ছেলেদের কেমন করিয়া মানুষ করিতে হয়, সে বিদ্যা আমরা শিক্ষাই করি নাই।

পূর্ব্বকালে ছেলেরা ছিল পিতার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। পিতা ছিলেন যম-রূপী দেবতা। ভালবাসা অপেক্ষা সে দেবতা ভীতিই অধিকতর উৎপাদন করিতেন। তাই, কালে অনেক গৃহে পিতা, 'কর্ত্তা' নামে পুত্র কর্ত্তৃক অভিহিত হইতেন। তাঁর ত্রিসীমানায়ও পুত্র যাইত না; ভয়, কখন কোন্ বিপদ আসিয়া পড়ে।

ইংরাজী শিক্ষার কল্যাণে ফল বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। এখন পিতা অনেক স্থলে ইয়ার-বিশেষ। একটু বেশী বয়সের হ'লে ও পুত্র যদি কলেজে পড়ে, তা' হ'লে তো তিনি অনেকটা দয়ারই পাত্রস্বরূপ।

অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অধিকতর মধুর হইয়াছে এবং যেখানে পুত্র চরিত্রবান্ ও বিদ্বান্, সেখানে তা' বড়ই সুখের হইয়া থাকে। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

এই যে পুত্রকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে দেওয়া, ইহা ইংরাজী রীতি-নীতির বিকৃত অনুকরণ। সন্তান কেমন করিয়া মানুষ করিতে হয়, তা তারাই জানে। ইংরাজ পরিবারে স্বাধীনতা যথেষ্ট। বাপ-মার সঙ্গে ছেলেমেয়ে স্বাধীনভাবে অহরহঃ মিলিতেছে অথচ সন্তান সকল সময়ই জানে এ স্বাধীনতার সীমা আছে। ইংরাজ পরিবারের প্রধান দেবতা Dutyর নিকট সকলই নতজানু। পিতার যেমন কর্ত্তব্য রহিয়াছে, পুত্রেরও সেই প্রকার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য রহিয়াছে, যা' তাকে অবনত মস্তকে, বিনাবাক্যব্যয়ে, পালন করিতে হইবে। তাকে, পিতামাতাকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে, যে আজ্ঞা তাঁরা দিবেন, অম্লান-বদনে মানিতে হইবে, তাঁদের নিকট সংযতবাক্, সংযতব্যবহার হইতে হইবে।

ইংরাজ পরিবারে ভালবাসা আছে কিন্তু বৃথা দয়া নাই। যেমন ইংরাজ-জাতি নিয়মের দাস, আইনের দাস, সেই প্রকার প্রত্যেক পরিবারেই বাঁধাবাঁধি নিয়ম-সকল রহিয়াছে, তা' মানিয়া চলিতে হইবেই। Implicit obedience বিনা-বাক্যব্যয়ে-আজ্ঞা-পালন ইহাদের প্রধান সূত্র।

আমরা সন্তানের চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে ইংরাজী অনুকরণে যে ভাবে চলিতেছি, তা'তে তেমন কিছুই লাভ হইতেছে না। পূর্ব্বে ছেলেদের সঙ্গে পিতা মিশিতেন না; এখন এত মিশেন, যে পুত্রের উপর শাসন-সংরক্ষণ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতেছে, অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

সন্তানের শিক্ষায় ভালবাসা থাকিবে কিন্তু মিছা আদর থাকিবে না। কঠিনপ্রাণ হইতে হইবে, প্রয়োজন হ'লে শাস্তি দিতে যেন ত্রুটী না হয়। তাদের সঙ্গে মিশিবে, কিন্তু সংযতভাবে। বিনা-বাক্যব্যয়ে আজ্ঞা মানিয়া চলে কিনা, সর্ব্বাগ্রে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাদের শরীর যাতে বলবান্ হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে। লাইকার-

গ্যাস যে সকল কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া, স্পার্টায় ভবিষ্য শ্রেষ্ঠ-পুরুষ সকলের সৃষ্টির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন, আমাদেরও যথাসম্ভব সেই প্রকাপ কঠোর নিয়ম গ্রহণ করিতে হইবে। এখন যে ভাবে শিক্ষা চলিতেছে, তা'তে সন্তান দিন দিনই soft কোমল-প্রাণ, দুর্ব্বল-চিত্ত হইতেছে; তাদের শিক্ষার ভিতর কঠোরতা প্রবেশ করাইতে হইবে।

সন্তান—বংশের, জাতির প্রধান ধন। তাদের অপচয়, চিন্তার বিষয়। যাঁরা সন্তানের পিতা, তাঁদের এ-সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। সন্তান যাতে সুস্থ, সবল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভয়ী ও বুদ্ধিমান্ হইয়া কালে বংশের, দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে, সকলকেই সে-দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙ্গালীর মহিমা ও গৌরব যাতে একদিন সর্ব্ববিষয়ে ভারত ছাড়িয়া সমস্ত জগৎ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কন্যা-পুত্রকে শিক্ষা দিতে হইবে।

২৩.১.১৪.।—ব্রাহ্মণদের ভিতর আমার অনেক বন্ধু আছেন, যাঁদের উদার মতের দিকে চাহিয়া আমি মুগ্ধ; তাও, মনের সহিত আমি যদি কিছু ঘৃণা করি,—'ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত জাতিভেদ ও আচার পদ্ধতি।

কি আত্মম্ভরিতা! কত মিথ্যাই না তারা প্রচার করিয়াছে! ব্রাহ্মণ না কি ব্রহ্মার মুখ হতে নির্গত! জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা! সময় বিশেষে ব্রহ্মা হতেও অধিক ক্ষমতাপন্ন!

এত মিছা কথা এতদিন ধরিয়া আর কোথাও প্রচারিত হয় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ, কাব্য, দর্শন সমস্ত গ্রন্থই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য-বর্ণনে পরিপূর্ণ, এক গণ্ডূষে তারা সাত সমুদ্রের জল পান করিতেছে, যাকে তাকে শাপে ভস্মীভূত করিতেছে, মন্ত্রবলে প্রাণ দিতেছে—কত কি

আজগুবি গল্প! হাজার হাজার বছর ধরিয়া শুনিতে শুনিতে অন্য বর্ণেরও এ সকল কথায় এমন বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে, যে ব্রাহ্মণের সামান্য অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়েও তারা শিহরিয়া উঠে। ব্রাহ্মণ সকলের মাথায় পা'র ধূলা দিয়া বেড়াইতেছে; ব্রাহ্মণের মাথায় পা'র ধূলা দিবার কারো সাহসে কুলাইতেছে না। মানুষের কি অধঃপতন! মনুষ্যত্ব যে নাই-ই এ দেশে হাজার হাজার বছর হতে!

'মনু' পড়িলে মনে হয়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য লোক যেন লোকই নয়। শূদ্রের প্রতি লোকটীর কি ঘৃণা! অথচ তাঁর নামে শূদ্রেরা অবনতমস্তক। ক্রীতদাসের অবস্থা সর্ব্বত্রই যে একরূপ। কি সকল মিথ্যা বোলচাল চালাইয়া তিন হাজার বছরেরও অধিক কাল সমস্ত দেশটাকে এমন পদানত করিয়া রাখা হইয়াছে। মনোরাজ্যের উপর এমন প্রভাব কোন দেশে কোন জাতি এ পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে পারে নাই। ইতিহাস সর্ব্বত্রই মিছার সমষ্টি-বিশেষ; তার মধ্যে আবার এমন মিথ্যার-পুঞ্জ আর কোথাও দেখা যায় নাই।

২৫.১.১৪।—Saint Beuve লিখিত Balzac ও Montaigne সম্বন্ধে সমালোচনা পড়িলাম।

কলেজের দিন হতেই এ-দুজন লেখকের নাম শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁদের কিছুই পড়া হয় নাই। Balzac ফরাসী দেশের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, কারো মতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। সমসাময়িক কালে তাঁর অপরিসীম প্রভাব ছিল। এমন কি, পড়িতেও আশ্চর্য্য বোধ হয়, ভেনিসে জনকয়েক পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রানুকরণে জীবন-যাপন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিল। কম ক্ষমতার কথা নয়।

যে শক্তির গুণে Balzac চরিত্র-চিত্রণে ও রচনায়, এমন নৈপুণ্য

লাভ করিয়াছিলেন, তা তিনি প্রকৃতি হতে অনায়াসে লাভ করেন নাই। অতি কষ্টে তিল তিল করিয়া তাঁকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। তাঁর নিজের কথায়, কেবল আমোদ প্রমোদ ও সুখ-স্বপ্নে মজিয়া থাকিয়া কেহ কখনো যশোলাভ করে নাই; যশ অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পুরস্কার। তোমার মাথায় নানা প্রকার ভাব খেলা করিতেছে, আমারও তেমন কত ভাব রহিয়াছে; কিন্তু এ সকল যদি কোন কাজেই না আসিল, তা হলে শুধু মাথার মধ্যে বহন করিয়া কি লাভ?……শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বা শ্রেষ্ঠ কবি, ক্রেতার প্রতীক্ষায় হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে না; আজ, কাল তাঁরা সকল সময়েই কাজে লিপ্ত।

এ সকল বাণী শুনিলে, প্রাণে বল আসে ও উৎসাহে তা পূর্ণ হইয়া উঠে।

Montaigne ভিন্ন প্রকৃতির লোক। ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল দার্শনিক ও কবি। তাঁর চরিত্রটী বড়ই মধুর-কাহিনী পড়িতেই তাঁর দিকে মন আপনা হতেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তিনি অর্থ অপেক্ষা শান্তি ও সুখের উপাসক ছিলেন। অল্প বয়সেই সংসারের কাজ কর্ম্ম হতে অবসর গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন ও আত্মচিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মাঝে বছর কয়েক জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে ও রাজ-আজ্ঞায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কখনো চেষ্টা করেন নাই। তাঁর মতে, যে কাজ বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায়। নির্জ্জনে নিস্তব্ধতার ভিতর একাকী-অতিবাহিত শান্ত-জীবনই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ জীবন, 'For my part, I commend a gliding, solitary and silent life'। তাঁর কথা পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে শান্তি আসে।

২৬.১০১৪.।—অনেক দিন হ'ল, Montaigne's Essays কিনিয়াছি; একবার পড়িতেও আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কতকটুক পরে বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। তার কারণ এখন যা বুঝিতেছি, Florio's Translationর ইংরাজীটা কতকটা Elizabethan ধরণের, অনেকটা দুর্ব্বোধ্য।

কাল Saint Beuveর সমালোচনা পাঠে, মন্‌টেগের প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বিকালে তাঁর Solitariness নির্জ্জন-জীবন সম্বন্ধে রচনা পড়িলাম। বুঝিতে পারিলাম, কেন সেক্‌সপিয়ার হতে আরম্ভ করিয়া ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের ছোট বড় সকল লেখকই তাঁর উপাসক। মনোরাজ্যের একটি স্থান আছে, যেখানে সংসারের গঞ্জনা, হর্ষ-কোলাহল, যশ, মান, যুদ্ধ-বিগ্রহের সামান্য শব্দটীও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; হৃদয়-দেবতা সেখানে বসিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন। মানুষের চির-আরাধ্য এই দেবতার পদে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ ধন্য হইয়া যায়, তার জন্যই তার প্রাণপাখী চিরকাল ডানা আছড়াইয়া মরিতেছে। এ প্রদেশের সংবাদ যে কেহ দিয়া থাকেন, তাঁকেই দেবতার স্থানে বসাইয়া লোকে পূজা করিয়া থাকে। মন্‌টেগের লেখার উপর দিয়া এখানকার শান্তি-হিল্লোল বহিতেছে, তাঁর স্তাবকেরও তাই অভাব নাই।

কি সুন্দর ভাব! মধুর বলিবার নিয়ম! কোন প্রকার আড়ম্বর নাই, অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় নিতান্ত জটিল ও গুরু বিষয় সম্বন্ধে মন খুলিয়া সহজভাবে বলিয়া যাইতেছেন।

তাঁর মতে যে প্রকৃত সুখ-প্রয়াসী, লোক-সঙ্গের তার প্রয়োজন নাই। অন্যের করতলধ্বনি, অন্যের প্রশংসার দিক হতে তাকে মুখ ফিরাইতে হইবে। পরের দিকে, কে কি বলিবে তার দিকে, চাহিয়াই আমরা

অনেক কাজ করি। তিনি বলেন, আমি এবং আর একটী লোক হলেই যথেষ্ট, অথবা নিজের দর্শক নিজে হলেই যথেষ্ট। বন্য-জন্তু যেমন গহ্বরের দ্বারদেশ হতে পদচিহ্ন লোপ করিয়া তাতে প্রবেশ করে, মানুষকেও সেইরূপ সংসার হতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। তখন হতে, জগৎ তোমার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে কি না, সে সম্বন্ধে আর কোন সন্ধান নিবে না, তোমার আত্মার কাছে তুমি কি বলিতেছ, সে দিকেই দৃষ্টি রাখিবে। আত্মার মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া দাও, সদ্‌ভাবে হৃদয় পূর্ণ কর, সৎ-দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া চল,—ইহাই প্রকৃত জীবন, সুখ-জীবন।

(আমি) 'আজকে হতে সুখে রব
কিছুই না নিয়ে,
আপন হতে আপন মনে,
সুধা ছানিয়ে'।

'The harvest of a quiet eye
That broods and sleeps on his own heart'.

মন্‌টেগ নিজেও এই আদর্শ-অনুরূপে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

আটত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর জীবন নানাবিধ আমোদ প্রমোদ ব্যসনের ভিতর অতিবাহিত হয়। সেই বৎসর তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁর দেয়ালের গায় এই প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেন ঃ—

'আজ ১৫৭১ সালের শেষভাগে, তাঁর আটত্রিশ বার্ষিক জন্মদিনে, মাইকেল মন্‌টেগ রাজদরবার ও রাজকীয় কাজের দাসত্বে বহুদিন হতে বিরক্ত হইয়া, জ্ঞান-দেবীর হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য

বিষয় অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি জীবনের বাকী অংশ যা আছে (এবং যার অর্দ্ধেকের অধিক ইতিপূর্ব্বেই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে), তা এ-স্থানেই অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এ-জন্য আনন্দদায়ক ও শান্তিপূর্ণ এই নিকেতন, যা তিনি তাঁর পূর্ব্বপুরুষ হতে পাইয়াছেন, শান্তি ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলেন।'

তাঁর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। একমাত্র ফ্রান্সের রাজার বিশেষ আজ্ঞাবশতঃ তাঁকে বোর্ডো সহরের মেয়র-রূপে আরো চারি বছর কাটাইতে হইয়াছিল। জীবনের বাকী সমস্ত অংশটুকুই তিনি শান্তিতে গ্রন্থ-চর্চ্চা ও আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তারই ফল, এই অমৃতময় রচনারাজি, যা এই তিনশ' বছরেরও অধিক কাল ধরিয়া একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে এবং যা পাঠে আজ আমি প্রকৃত-জীবন-যাপনের এমন একটা সুন্দর সহজ পথ চোখের কাছে উন্মুক্ত দেখিতেছি।

রাজ—, ২৯.১.১৪।—মাঘ মাসের মাঝামাঝি। দিনের বেলায় এখন আর তেমন শীত বোধ হয় না। রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু রাত্রিতে অনেকটা আগেরই মত খুব শীত।

শীতকালটা, বিশেষতঃ খড়ের ঘরে (যেমন এখন আমি আছি), আমার ভাল লাগে না, এক প্রকার অসহ্য। কার্ত্তিকের শেষ-ভাগে, যখন শীত প্রথম নামিয়া আসে, বিকালের দিকে চারিদিক কেমন একটি ম্লান শ্যাম-রূপ ধারণ করে, বেশ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এখন যে বড় শীত।

আর কয়েকটা দিন, তার পরেই শীত যাইবে। বসন্তের অগ্রদূত সব দেখা দিতেছে। পরশু হ'তে শেষরাত্রিতে ও বিকালের দিকে কোকিলের

ডাক শুনিতে পাইতেছি। কত আলোর, ফুলের, আনন্দ-আশার স্মৃতি সে বহন করিয়া আনিতেছে। আমাদের বাসার চারিদিকের ঝোপ-ঝাড়ের মাঝেও নূতন নূতন পাখী সব দেখা দিতেছে। আজ বিকালে বেড়াইতে যাইয়া দেখিলাম, শীতের প্রকোপে অনেক গাছই, বিশেষতঃ পথের ধারের কড়ই-গাছগুলি, পাতাশূন্য অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একটু মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিতেই দেখিতে পাইলাম, একদিকে যেমন ভাঙ্গার কাজ চলিয়াছে, অন্যদিকে তেমন গড়ার কাজও আরম্ভ হইয়াছে। শুক্‌নো ডালের মাথায় মাথায় কচি কচি পল্লব দেখা দিয়াছে। বিশ্ব-শিল্পী এমনি ভাবেই গড়েন, কিছু পুরানো কিছু নূতন লইয়া তিনি কাজ করেন না। এমনি; গড়িতে হইলে আগে ভাঙ্গিতে হইবে। দিন কয়েকের মধ্যেই কোমল পাতায় গাছগুলি ভরিয়া উঠিবে ও সবুজ সুধারাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। সে দিন মাঠে বেড়াইতে যাইয়া দেখিলাম, একটি সজিনা-গাছ, পাতা একটুকু নাই, কিন্তু ফুলে ভরা। আমগাছে মুকুল দেখা দিয়াছে, বেশ দেখায়। পৃথিবী যেন এতদিন মরিয়া ছিল, এখন কা'র স্পর্শে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে নানাভাবে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে; সূর্য্য তেজস্কর হইতেছে, রাত্রি অধিকতর জ্যোৎস্নাশালিনী হইতেছে, মানুষের দেহও নূতন স্ফূর্ত্তির স্পন্দন অনুভব করিতেছে। আর কয়েকদিন, তারপরই ঋতুরাজ বসন্ত দেখা দিবে।

* * * *

কি যে খারাপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই যেন আনন্দ পাই না। এ যে কোন নূতন ব্যারাম, তা নয়। এর আক্রমণ কাঁ—তে যখন ছিলাম, তখন হ'তেই পরিষ্কার বুঝিতেছি। আমি যা করি, যা দেখি, সমস্তই নশ্বরতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। এতে লাভ হইয়াছে, সুখভোগ

আমার হয় না; দুঃখ কিন্তু এজন্য কখনো কম বলিয়া মনে হয় না। দুঃখের তীব্রতা পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে, মাঝ হ'তে সুখে যে আনন্দ পাইতাম, তা হারাইয়াছি।

বাইবেল বলে, ইভের জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদনের পর হ'তে তার সন্তানদের স্বর্গচ্যুতি ঘটিয়াছে। অতি প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই রূপক। যে একবার জ্ঞান-বৃক্ষের ফল মুখে দিয়াছে, তার আর শেষ পর্য্যন্ত সুখ নাই। তার অপেক্ষা অসভ্য অশিক্ষিত বর্ব্বর, প্রতি কাজে যে ধমনীতে জীবনস্পন্দন অনুভব করিতেছে, সে অনেক সৌভাগ্যবান্। কবি Grayর কলমের মুখে বড়ই একটী সত্য বাহির হইয়াছে—

'Where ignorance is bliss,
It is folly to be wise.'

অজ্ঞতাই যে ক্ষেত্রে সুখ, সেখানে জ্ঞানী হওয়া নির্বুদ্ধিতা।

এমন দিন ছিল, যখন এ-সব জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ভগবান, আত্মা, অনাত্মা, কার্য্য-কারণ প্রভৃতি জটিল প্রশ্ন আমার শান্তি হরণ করিত না। মনে পড়ে, যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন বন্ধু বি···ও মনো···র কাছে, সংসার অসার, এই বাক্যটী প্রায়ই শুনিতে পাইতাম। তারা খুবই ভগবানের নাম করিত, তাঁর কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে কাঁদিয়া ফেলিত। বি···র দুর্ব্বলচিত্ত, আমার প্রাণ তার প্রতি তেমন আকৃষ্ট হইত না। কিন্তু মনো···সম্বন্ধে অন্যরূপ। তার চরিত্র, মাধুর্য্যে ও দৃঢ়তায় পূর্ণ ছিল। সে আমার নিকট নররূপে দেবতা ছিল, তাকে অনুসরণ করিতে কতই না চেষ্টা করিতাম! তার মত ভগবানের নামে চোখে জল দেখা দিত না বলিয়া মনে কত না ধিক্কার হইত; সমস্তই নশ্বর, এ ভাব প্রাণে স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল করিবার জন্য কত না চেষ্টা করিতাম! ভগবানকে লাভ

করিবার জন্যই না কত যত্ন নিয়াছি! নির্জ্জন নদীতীরে অথবা বন্ধ-দ্বার কক্ষের ভিতর বসিয়া নানাদিন নানাভাবে তাঁকে ডাকিয়াছি, কিন্তু বালকের হৃদয়-ক্রন্দনের কোন মূল্য নাই বলিয়াই হোক্ বা আমার আয়াসের ক্ষীণতাবশতঃই হোক্, ভগবান তখন আমাকে দেখা দেন নাই, পরেও কখনো দেন নাই—আমি তাঁকে পাই নাই। কেউ কি কখনো পাইয়াছে? আমি তো এমন লোক এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। এখন আমি একপ্রকার নাস্তিক। মাঝ হ'তে লাভ হইয়াছে, নশ্বরতা-রূপ মহাবিষ আমার হৃদ্‌পিণ্ড হ'তে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কাজও ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত হইয়া, তার জ্বালায় আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ছিলাম সুস্থ সরস-চিত্ত হাস্যামোদী বালক; অজ্ঞানতাবশতঃ, ইচ্ছা করিয়া, আমি এক মহাপীড়াকে দেহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া আছি।

এখন আমি মনো···র মোহও ছাড়াইয়াছি। তার সঙ্গে মাস কয়েক হইল, চাঁ—রে একবার দেখা হইয়াছিল। সে প্রথম স্ত্রী হারাইয়াছে, দুটী মাত্র ছেলে, তাও এক-সপ্তাহ মধ্যে হারাইয়াছে, কিন্তু তাও ভগবানে কেমন অটল বিশ্বাসী! তাকে দেখিয়া মনে হইল, সোনা আগুনে পোড়ার মত দুঃখে জ্বলিয়া তার বিশ্বাস যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই তো প্রকৃত ভক্তি,—যুক্তি, তর্ক কিছুই যার ভিত্তি সামান্যরূপেও নড়াইতে পারে না।

মনো···সুখী, কারণ সে বিশ্বাসী; বিশ্বাসই যে সকল কাজে সুখের মূল। আমার ভগবানে বিশ্বাস নাই; যশ, অর্থ, সম্পদ যার পাছে দৌড়াইয়া যাই, সবই দেখিতে পাই নশ্বরতা-দোষ-দুষ্ট, অথচ তাদের মোহও যে সামান্য রকমেও ত্যাগ করিতে পারি না। যাতে একটু মন বসাইতে চাই, তার দিকে চাহিয়াই মনে হয়, আর ক'দিন, কেন বৃথা চেষ্টা? হায়! আমি কি করিব? আমার যে কিছুই ভাল লাগে না! আমি যে প্রাণে আর শান্তি

পাইতেছি না! শান্তি! পাইবই না? আমার এ জ্ঞান অপেক্ষা পূর্ব্বের অজ্ঞানতাই যে আমার ভাল ছিল, যখন আমি কাজ করিয়া সুখ পাইতাম, কাজে উদ্দেশ্য ছিল, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল—এখন, এখন যে কিছুই নাই! সমস্ত জগৎ ভরিয়া এমন আনন্দের জীবন-প্রবাহ, আমারই চারিদিকে চির-যামিনী! কি হলাহল আমি নিজ বুক হ'তে খোঁচাইয়া তুলিয়া সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছি!

কি আমাদের দেশের, কি ইয়ুরোপীয় লেখকদের লেখায় একটা কথার সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়—ধ্যান, meditation। আমাদের ধর্ম্ম-চর্চ্চার তা মূলভিত্তিই হইতেছে—ধ্যান। যোগশাস্ত্র ইহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব ধ্যান সম্বন্ধে কত বলিয়াছেন। ইয়ুরোপীয় সাহিত্যেও, কি মনটেগ্, কি এমিয়েল, যাঁদের লেখা আমার প্রিয়, meditationর কত না প্রশংসা করিয়াছেন!

এ-সব যখন পড়ি, তখন একটা কথাই আমার মনে হয়, কি ধ্যান করিব? কিসের ধ্যান করিব? নিস্তব্ধভাবে অনেক সময় একাকী বসিয়া থাকিয়া দেখিয়াছি। পূর্ব্বে ভালই লাগিত না, এখন নেহাৎ মন্দ ঠেকে না। কি বিষয় ভাবিব? যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকিত, তা' হ'লে না হয় তাঁর সম্বন্ধে ভাবা যাইত। সেই বা কি রকম; হাত নাই, পা নাই, নিরাকার, সময় বিশেষে সাকার, কিম্ভূত কিমাকার—এঁর সম্বন্ধে ভাবাই বা যায় কি? এমন কি আছে, যে চোখ বুজিয়া গম্ভীরমুখ হইয়া কেবল ভাবিতেই হইবে?

আমি ধার্ম্মিকদের বোল্‌চাল বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম আমার সহিবে না।

৩০.১.১৪।—বঙ্গ-সাহিত্যে আধুনিক কালে চারিজন কবিকে প্রথম শ্রেণীর বলিয়া ধরা হয়—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। আমি শেষোক্ত দু'জনকে দেখিয়াছি। নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' ও 'অমিতাভের' মুদ্রণ-সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ পরিচয়ও হইয়াছিল।

আকৃতি দেখিয়া যে অনেক সময় প্রকৃতি বোঝা যায়—তা' এই চারিজন কবি সম্বন্ধেই কিছু কিছু খাটে।

মাইকেলের প্রশস্ত উজ্জ্বল নয়ন, তা' হ'তে যেন তেজ ও প্রতিভার জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁর 'মেঘনাদ বধের' ন্যায় এমন বীররস-প্রধান, তেজোপূর্ণ কাব্য আমাদের ভাষায় আর নাই ; অনেক ভাষাতেই নাই।

হেমচন্দ্রের মূর্ত্তি, শান্ত উদার চরিত্রের কথা মনে করাইয়া দেয়। তাঁর কাব্যেও এই প্রশান্ত ভাবেরই পরিস্ফুটন সমধিক দৃষ্ট হয়। তিনি গম্ভীর-ভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিয়াছেন। প্রতিভার উদ্দাম-লীলার বিকাশ তাঁর কবিতায় নাই বলিলেই চলে।

নবীনচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিভার আভামণ্ডিত। চক্ষু জ্যোতিষ্মান্, কিন্তু তা' হ'তে বীরভাব অপেক্ষা যেন বিলাসিতার ভাবই অধিকতর ক্ষরিত হইতেছে। তাঁর কবিতায় একাধারে মাধুর্য্য, তেজ, ও শক্তিহীনতার সম্মিলন।

রবীন্দ্রনাথ! যেমন তাঁর লেখা, তেমনি তাঁর মূর্ত্তি—উভয়ই কবিত্ব-পূর্ণ, গভীর ভাবব্যঞ্জক। এদেশে এমন ভাবুক কবি এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। জীবনের মধুর ভাব ও জটিল প্রশ্নাদি লইয়া কেউ এ ভাবে নাড়াচাড়া করেন নাই। কিন্তু তাঁর আকৃতিতে যেমন পুরুষোচিত ভাব

অপেক্ষা রমণীসুলভ কোমলতাই অধিক পরিস্ফুট, তাঁর কবিতাও তদ্রূপ। তাতে যথেষ্ট ভাব আছে, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে, যাতে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া বিমল আনন্দের ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে, পড়িতে পড়িতে মন নানা ভাবে রঞ্জিত হইয়া উঠে; কিন্তু মানবের কোমল বৃত্তিসমূহ লইয়াই প্রধানতঃ তাঁর কাজ।

নবীনচন্দ্র একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্লা ভাষা ছিল, প্রেমের ভাষা, স্ত্রীলোকের ভাষা, কোমলকান্ত পদাবলীতেই তার দেহ পূর্ণ ছিল। সর্ব্বপ্রথমে মধুসূদনই তাতে বীররস আনিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র ও আমি তার পরে যথাসাধ্য তাতে বীররস প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। দুর্ব্বল বাঙ্গালীর প্রাণে যাতে বীরোচিত ভাব জাগিয়া উঠে, তাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাঙ্লা ভাষা আবার পূর্ব্বের ঐ মেয়েলি-ভাষাতেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।" উক্তিটী এত সঙ্গত বোধ হইয়াছিল, যে আমার মনে এখনো তা পরিস্কার রূপে মুদ্রিত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবহেতু, তাঁর দৃষ্টান্তে যে বাঙ্গালার বর্ত্তমান লেখক স্ত্রী-জনসুলভ কোমলতা ও দুর্ব্বলতায় ভাষাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন, সন্দেহ নাই। ভাষা—প্রাণের কথা, তার প্রতিবিম্ব। বাঙ্গালী দুর্ব্বল-হৃদয়, তাই তার ভাষাও পদে পদে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেছে; সর্ব্বত্রই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে বিনাইয়া বিনাইয়া আহ্লাদে-ঢঙ্গে লেখা, প্রেমের গান, হা হুতাশ।

রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ-কবি কিন্তু বলহীন, বীর্য্যহীন বাঙ্গালীর দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে বীররস-প্রধান এমন কোন কবিকে পাইতে ইচ্ছা হয়, যাঁর লেখা পাঠে বিপদ আপদ অগ্রাহ্য করিয়া হাস্যমুখে বাঙ্গালী জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিবে; আব্ছায়ার মত ভাব নয়, সত্যকার নিত্য-নৈমিত্তিক সুখ, দুঃখ, আনন্দ, জ্বালা-যন্ত্রণা যাঁর কাব্যের বিষয় হইবে। কই সে কবি?

৮.২.১৪।—মাঘ মাসের শেষ ভাগ। প্রাতে বেড়াইতে যাইয়া গাছগুলির দিকে দৃষ্টি পড়িল। চারিদিক দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতি-রাজ্যে কি এক সাজ-সজ্জার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কে এক মহারাজ অতিথি আসিতেছেন, যেন তাঁকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকলেই নূতন বেশ ধারণ করিতেছে। প্রতি বছরই এমন হয়, প্রতি বছরই বৃক্ষরাজি নব-যৌবন-শ্রী প্রাপ্ত হয়।

এর মধ্যেও কিন্তু মৃত্যু লুকাইয়া রহিয়াছে। চিরকাল আর এমন নূতন শোভায় সাজা চলে না; ধীরে, অদৃশ্য অথচ নিশ্চিতভাবে মৃত্যু তার কাল কঙ্কালসার হাত বাড়াইতেছে। শেষে একদিন এমন শোভন-দৃশ্য বৃক্ষ সংসার হতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। দার্শনিক! তখন কোথায় যায় তার প্রাণ, তার আত্মা?

মানুষেরও এমনি। তবে, তার দেহের যৌবন বছরের কোনও কালের নিয়মাধীন নয়। যখন দেখা দেয়, কয়েক বছরের জন্যই ব্যাপিয়া থাকে; গেলে, জন্মের মতনই যায়। কিন্তু মানুষের আর একটী যা আছে, গাছের নাই। তার দেহ বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মন তত শীঘ্র বুড়া হয় না। দেহকে যেমন পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা কিছুকাল তার যৌবন-অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা চলে, মনকেও ভাব-রূপ খাদ্য যোগাইয়া তার যৌবনত্ব অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া চলা যায়। যার মন নূতন ভাব-রসে পুষ্ট হইতেছে না, সে তো মরিতে বসিয়াছে, মরিয়াছে—বাহ্যিক দেহের অবস্থা তার যেমনই হোক্।

১৯.২.১৪।—চিরটা কালই এগিয়ে যাবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মন প্রাণ ভরিয়া আছে। কিন্তু কিছু দূর যাইয়া মুখ ফিরাইতেই দেখি, কিছুই যেন মনের মতন হয় নাই; তখন সব মুছিয়া ধুইয়া আবার নূতন

করিয়া আরম্ভ করিতে ইচ্ছা হয়। তাও কিন্তু হইয়া উঠে না; পিছনের দড়িতে এমনই দিনের দিন বাঁধ পড়িয়া যাইতেছে যে, যতই কেন আগে না যাই, তার যোগ কিছুতেই ত্যাগ করা চলে না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, এ ভাবেই চলিবে। অফুরন্ত আশা ও দুঃসহ নিরাশা—দুই স্রোতের টানের মধ্য দিয়া জীবনের জীর্ণ-তরী কোন প্রকারে চলিতে চলিতে অবশেষে কালসাগরে ডুবিয়া যাইবে। কোথা হতে মানুষের প্রাণে এমন আশার সঞ্চার হইল? কিসে এর নির্ব্বাণ? সবই যে দুর্জ্ঞেয়!

আজ বড়ই ইচ্ছা করিতেছে, এমন একখানা বই আমি লিখিতে পারিতাম, যা পাঠে আমি বলিতে পারিতাম,—আমাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করিয়া আত্মার সমস্ত শক্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, দুঃখ, সব, তার ভিতর দিয়া পূর্ণ প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে, তা হলে বুঝি আমার জীবন সার্থক হইত। কিন্তু, সে ক্ষমতা আমার কৈ?

এও যে বুঝি না আমি,—কে আমাকে কি এক আদর্শের idealর পিছনে পিছনে আজীবন তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। এরই তাড়নায়—আমি জনতার মাঝে আনন্দ পাই না, নিজের মাঝে নিজে বিভোর, ইহাই আমার কাম্য অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে?

আমি যশ মান তেমন কিছুই চাই না; চাই, আজীবনের প্রাণ-ক্ষুধা মিটাইতে।

যদি কেউ থাকো, আমার সহায় হও, আমায় শক্তি দাও।

* * * *

ফরাসী-উপন্যাস বেশী পড়ি নাই, কিন্তু যে দু'চারিখানির সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি, তা' হতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে, যে তারা গার্হস্থ্য-উপন্যাস লিখিতে তেমন পটু নয়। যা নাই, তার কথা লিখিবে কেমন করিয়া? গার্হস্থ্য-জীবন তাদের সুখের নয়। সভ্যতার যে অবস্থায় গৃহস্থ-জীবনরূপ

আদর্শ family life দেখা দিয়াছিল, তার অন্তিমকাল খুব বেশী দূরে নয়। ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যজাতি তাই সর্ব্বাগ্রে তার মোহ ত্যাগ করিয়া নূতন ভাবে সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে। ফরাসীরা ভাব-সেবক; তাদের লেখায় এই ভাবের খেলাই দেখা যায় বেশী। ইংরাজের গৃহ-জীবন সুখের, তার বর্ণনায় তারা সিদ্ধহস্ত, কিন্তু তারা practical সংসার-অভিজ্ঞ জাতি; যেমন কাজের ভিতর, তেমন তাদের লেখার ভিতর মোটামুটি-বুদ্ধির commonsenseর দৌড়ই দেখা যায় যা কিছু, ভাব কম। তাদের লেখার ভিতর বেশ একটা freshness সজীবতা আছে, যা বড়ই আনন্দ-দায়ক; এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাস্থ্য-সম্পদে সকলের উপর বাহাবা দিয়া যারা আছে, তাদের কাছে এমনি আশা করা যায়। চরিত্র-চিত্রণও মধুর, কিন্তু আঁকিবার পট canvass ছোট, নূতন বড় কোন দৃষ্টি view তাদের লেখায় নাই। এ সকল কারণে তাদের উপন্যাস সুমিষ্ট হইয়াও বর্ত্তমানের ভাবের-বাজারে আর তেমন স্থান পাইতেছে না, অথচ লোকে তাদের একেবারে পরিত্যাগ করিতেও ইচ্ছুক নয়।

২৩.২.১৪।—রমণী পুরুষ অপেক্ষা কত বৈচিত্র্যময়ী! নানা সময়ে নানাভাবে নানারূপে তার বিকাশ। বাল্যে বালিকা মূর্ত্তি—সদানন্দময়ী, হাস্যময়ী। কিশোরী—লজ্জায় ঈষৎ আনত-মুখী, অস্ফুট পুষ্প-কলিকা, ভবিষ্যতের কত সুখ-স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিতেছে! যৌবন-সমাগমে বিশ্বমোহিনী—পুরুষের যুগযুগের মূর্ত্তিময়ী কামনা। তার পর আসন্ন-প্রসবা পীনস্তনযুগলা গুরুনিতম্বিনী অপরূপা মূর্ত্তি। কিছু পরে নবীনা জননী—সন্তান লইয়া সদাবিব্রতা, গৃহিণীর পদে নবগৌরবে সমাসীনা। তার পর গৃহলক্ষ্মী ভগবতী, স্বামীর সুখ দুঃখের সহিত জড়িত-জীবনা, সন্তানগণের শুভ কামনায় সদাতৎপরা, যখন সে বিশ্বমায়েরই অনুরূপা—মা।

২৯.৫.১৪।—চল্লিশ বছরে পা দিতে চলিলাম। জীবনের অর্দ্ধেকের বেশী চলিয়া গেল। দেশের প্রচলিত সংস্কারের দিকে চাহিয়া বলিতে হয়, আমি যৌবন ত্যাগ করিয়া প্রৌঢ়ত্বে নামিলাম—এখন হ'তে পাহাড়ের নীচের দিকেই আমার গতি। এমন কি, চলিত কথায় আমি একপ্রকার বুড়াই হ'তে চলিলাম।

কিন্তু, আমার মনে হইতেছে কি? আমি তো আমার অন্তর্জীবনের তেমন কোনও পরিবর্ত্তনই দেখিতে পাইতেছি না। গাছের বাহিরের ত্বক কিছু শুকাইয়াছে, কিন্তু ভিতর অনেকটা পূর্ব্বের মতই কাঁচা। বছর কুড়ি আগেও যা ছিলাম, এখনও তা। লোকে বলে বুড়া হ'তে চলিলাম, তাই বার্দ্ধক্যের ঠাণ্ডা বাতাস বুঝি বা কচিৎ মাঝে মাঝে গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। আমরা তো মৃত্যুর রাজ্যে বাস করিতেছি, যেখানে সেখানে যখন তখন লোক মরিতেছে; সংসারের অসারত্বের ভাবটা তাই আমাদের সকল কাজে কথায় জড়াইয়া আছে। আমাদের দর্শন, যার জন্য এত গৌরব আমরা নিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম্ম,—আমাদের মহাশত্রু, অসারতার বিষে সে-সব মাখা। তাইতো অনাবশ্যক এ-সব ভাব দেখা দিতেছে। আমার দেহের তো তেমন কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না; এ-ভাবে আশী বছর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

মোট কথা, আমি কিছু করি আর না করি, আমার চিত্ত সকল সময়েই কি এক আদর্শ idealর পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সাধারণ লোক হ'তে সেই আমাকে যা-কিছু বিভিন্নতা দান করিয়াছে। আমার মনে সরসতা আছে, বৃদ্ধত্ব আমার ত্রিসীমানার কাছেও নাই, বৃদ্ধ হ'তে আমি চাইও না।

২.৭.১৪।—জীবন ধারণের চেষ্টা কেন করিব—এ প্রশ্নের আমি কোন উত্তরই পাইতেছি না। জীবনের উদ্দেশ্য কি?

এই প্রশ্নটী গত দশ বছর ধরিয়া আমাকে বিচলিত করিতেছে। ইহারও উত্তর নাই, আমার প্রাণেও শান্তি, সুখ নাই।

কে কা'র? কিসের জন্য বাঁচিয়া থাকা? দু চার বছর; তার পর আমিও নাই, কেউ নাই! কিসের জন্য কাজ করা?

সর্ব্বব্যাপী নশ্বরতার রাজ্যে অবিনশ্বর কিছু পাইবার আশায়, প্রাচীন-ভারত কত বিফল চেষ্টাই না করিয়াছে! তারই শেষ-ফল বেদান্ত-দর্শন, যখন নাকি অবিনশ্বর 'আত্মার' সন্ধান পাইয়া ভারতের প্রাণ শান্ত হইয়াছিল।

ভারতের অন্য প্রধান ধর্ম্ম বৌদ্ধমতে 'আত্মা' বলিয়াও সত্য কিছু নাই। এর চোখে সবই নশ্বর এবং তজ্জন্য জীবন মহাদুঃখময়। পূর্ণ-জ্ঞান বিকাশের দ্বারা এই দুঃখকে দূর করিবার জন্যই বুদ্ধদেব চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কে অস্বীকার করিবে, মানব-জীবন মহাদুঃখের নয়? কে জগতের নশ্বরতা অস্বীকার করিবে?

ব্যাধির প্রকার বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু প্রতিকারের উপায় অশেষ চেষ্টাতেও শেষ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বিশ্বাসরূপ যে বালুকার ঢিপীর উপর 'আত্মা' প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা দিন দিন ধসিয়া যাইতেছে; 'আত্মা' যে ভ্রান্ত-সংস্কার, বৌদ্ধমতই এ ক্ষেত্রে ঠিক,—বিজ্ঞানও দিন দিন তাই প্রমাণ করিতেছে; এমন দিন আসিতেছে, যখন যে আত্মায় বিশ্বাস করিবে, তাকে লোকে বালক বলিয়া উপহাস করিবে।

পূর্ব্বে লোকে কোনও প্রখর-চরিত্রের লোক দেখিলে, তাঁর কথায়

অম্লানচিত্তে বিশ্বাস করিত। তাই, জ্ঞানী মুনি-ঋষি, বা সিদ্ধার্থের মত অমন সংসার-বিরাগী বিচক্ষণ-বুদ্ধি রাজপুত্রের নিকটে লোকের মাথা বিস্ময়-ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনকার দিনে তেমনটী হওয়া তত সোজা নয়। যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ এখন ভগবানের পুত্র ও আদিষ্ট পুরুষ হ'তে সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কৃষ্ণ ও চৈতন্য, এঁদেরও সেই অবস্থা।

তথাপি বলিতে হইবে, এখনো লোকে ধর্ম্মের কথায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে। মৃত্যু ভয়ে ভীত অস্থিরচিত্ত মানুষের কাছে অপর-জগত সম্বন্ধে যে কেহ জোরের সঙ্গে কিছু বলিতে পারে, তা সত্যই হো'ক্ বা মিথ্যাই হোক্, তারই কাছে লোক পূর্ব্বাপর জড় হইতেছে। তা না হ'লে আর সে-দিনকার আমাদের কলেজের দিনের প্রায়-নিরক্ষর রামকৃষ্ণ ভগবানের অবতাররূপে পূজা পাইতেছেন।

কারো কথায়, কিছুতেই আমার বিশ্বাস নাই। বিজ্ঞানের চোখে সবই যে দেখিতেছি মিছা-কল্পনা।

আমাদের অপেক্ষা ইয়ুরোপীয়েরাই শ্রেষ্ঠ। যে প্রশ্নের সমাধান হইবেই না, তার জন্য এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিবার কি দরকার? তাদের ধর্ম্মেও নশ্বরতা প্রচার আছে, কিন্তু আমাদের মত নশ্বরতা-ভাব-সর্ব্বস্ব তাদের জীবন নয়। কেমন জীবনের অস্তিত্বে, সুখে, মাহাত্ম্যের ভাবে তাদের হৃদয় পূর্ণ! কি প্রাণভরা আনন্দ, বুকভরা আশা উদ্যম! কেমন তারা কাজে মজিয়া আছে, পৃথিবীব্যাপী কীর্ত্তি! তারাই সুখী, তারাই সুখী, তারাই মানুষ! আমার এই ছাই ধর্ম্ম যদি ভুলিয়া যাইতে পারিতাম! যদি খোলস বদলাইয়া আবার নূতন করিয়া নূতন-রূপে জীবন আরম্ভ করিতে পরিতাম! কিন্তু তাতো হইবার নয়, নশ্বরতা-বিষে জীর্ণ হইয়া আমি যে জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া আছি!

১০.৭.১৪।—Heroর প্রধান উপাদান—ভাব; প্রধান লক্ষণ—চরিত্র-বল। যা সে একবার ধরে, ছাড়ে না। সাহস ও দৃঢ়তা তার চরিত্রের প্রধান গুণ। লোকের দিকে চাহিয়া সে চলে না; আত্ম-বিভোর, সর্ব্বস্বত্যাগী, জীবন-পণ।

Hero, মানব-রাজ। তাকেই মানব-সমাজ পূর্ব্বাপর অনুসরণ করিতেছে। ভাবের উপাসক; যে ভাব সে ছড়াইয়া যায়, তাহাই সাধারণ শ্রেণীর লোকে গ্রহণ করিয়া নিজেদের চালিত করে।

Hero, ছোট ও বড়—উভয় ক্ষেত্রেই আছে। কি জগতের বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র, কি নিজ-সংসারের সঙ্কীর্ণ সীমা,—Hero প্রত্যেক স্থানেই লোককে চালিত করিতেছে।

যার জীবন কথঞ্চিৎ রূপেও Heroর ভাবে রঞ্জিত নয়, সে-জীবন তো বৃথা, মাটীর স্তূপ,—তা সে মহাধনীই হোক্, আর যাই হোক্।

১১.৭.১৪।—কাল রাত্রিতে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' শেষ করা গেল। স্কুল-কলেজের দিন হ'তেই এই বইখানার সঙ্গে পরিচয়, এর কত লাইন আমাদের প্রতিদিনের কথার অঙ্গ-স্বরূপে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গ, বিশেষতঃ প্রথম সর্গ, অননুকরণীয়; জগৎ শেঠের গৃহে ষড়যন্ত্রকারীদের সভা মিল্‌টনের Hellএ Satan ও তার অনুচরবর্গের মন্ত্রণার বিষয় মনে করাইয়া দেয়। ভাষাও সম্পদশালী এবং চমৎকার! অনেকটা বাইরণের ধরণের লেখা।

নবীনচন্দ্র বাইশ বছর বয়সে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন, পড়িয়াও অনেকটা কাঁচা হাতের লেখা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাও বলিতে হইবে, 'পলাশীর যুদ্ধ' বাঙ্গালা-ভাষার একখানা শ্রেষ্ঠগ্রন্থ।

নবীনচন্দ্র বাঙ্গালার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের একটী মহা-স্মরণীয় ঘটনাকে এমনি সরস অত্যুজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যে বাঙ্গালীর পক্ষে এই গ্রন্থকে, অন্ততঃ এর অংশবিশেষকে, সাহিত্য-ক্ষেত্র হ'তে কথনো অপসারণ করা সম্ভবপর হইবেনা। কি অপূর্ব্ব-তুলিকা পাতে অল্পকথায় তিনি সে মহা-নাটকের চরিত্র কয়েকটীকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—রায় দুর্লভ, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, রাণী ভবানী, মীরজাফর, মোহনলাল, মীরমদন, বাঙ্গালার ভাগ্যনিয়ন্তা সব—কেমন সব চোখের কাছে ভাসিয়া উঠিতেছে! বিদ্যুৎ-বিদারিত মেঘাচ্ছন্ন গভীর অন্ধকার রাত্রিতে জগৎ শেঠের গৃহে গোপনে একত্রিত ষড়যন্ত্রকারীদের সেই সভা ও সে সকল মূর্ত্তি—যেন এখনো স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। রাণী ভবানী, অনেকটা কবির কপোল-কল্পিত চিত্র; হোক্ তা, তাও ভাবী বাঙ্গালী-রমণী-চরিত্রের আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া লোকে তাঁকে পূজা করিবে। সর্ব্বশেষে, হতভাগ্য সিরাজদ্দৌল্লা, আলিবর্দ্দি খাঁর আদরের নাতি, অসংযত-চরিত্র, উচ্চমনা, নিঃসহায়; কে না তাঁর দুঃখে বিগলিত হইবে? অল্প আয়তনের ভিতর কবি এমন একটী ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেমন জীবন্ত-মূর্ত্তি দান করিয়া চোখের কাছে ধরিয়া দিয়াছেন—এ-কথা, ও তখনকার তাঁর বয়সের বিষয় যখন ভাবি, তখন তাঁর প্রতিভার দিকে দৃষ্টি করিয়া, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি।

তথাপি বলিতে হইবে, তেমন উচ্চাঙ্গের বই নয়। 'মেঘনাদ বধের' সঙ্গে তুলনা হয় না, 'বৃত্রসংহারের' সঙ্গেও বোধ হয় নয়। তবে 'বৃত্রসংহারের' ভিতর যেন কবিতার স্রোতই নাই, মাঝে মাঝে মরা-গাঙ্গের মত জল যেন নড়েই না। 'পলাশীর যুদ্ধ' বাদ দিলে নবীনচন্দ্রের অন্যান্য লেখা অনেক স্থলেই কবিতা নয়, ছন্দোবদ্ধ উপন্যাস-বিশেষ। হেমচন্দ্রের লেখাও অনেকটা তদ্রূপ।

একটী বিষয়ে 'পলাশীর যুদ্ধ' শ্রেষ্ঠ, তার লোকজন, ঘটনা—সবই সত্য,

জীবন্ত। 'মেঘনাদ' ও 'বৃত্র'—দুটীই কাল্পনিক চরিত্র, মানবীয় ভাব human interest একরকম নাই, তাই তাদের সুখ-দুঃখে প্রাণ তেমন আলোড়িত হয় না। তথাপি, মধুসূদনের অতুল্য প্রতিভা 'মেঘনাদ'কে অনেকাংশে আমাদেরই একজনে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে; কিন্তু হেমচন্দ্রের 'বৃত্র'! না দৈত্য, না মানুষ,—কঠিন, কর্কশ, নীরস-গম্ভীর আকাশ-বিলম্বী পর্ব্বত।

২০-৭-১৪।—রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পড়িতেছি। মূলতঃ, ভগবানের উদ্দেশে অর্পিত এই কবিতার গুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথের ভগবান সত্য, শিব, সুন্দর। তাঁর স্তুতিতে তাঁর 'গীতাঞ্জলি' পূর্ণ। কি সুন্দর! কেমন প্রাণে শান্তি আনে, সুখ আনে, জীবন মধুময় করিয়া তোলে!

এ সকল কবিতার কতক, ও 'নৈবেদ্য', 'খেয়া' এবং 'গীতিমাল্যের' কতক কবিতার ইংরাজী অনুবাদ, 'গীতাঞ্জলি' নামে প্রকাশ করিয়া, তিনি পশ্চিমে প্রথম সুপরিচিত হন এবং তার ফলে নোবেল-প্রাইজ পাইয়া এক্ষণে জগৎ-বরেণ্য কবির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এ সকল কবিতায় যে অপূর্ব্বসুন্দর অতীন্দ্রিয় লোকের আভাষ পাওয়া যায়, অন্য কার কবিতায় আর তেমন পাওয়া যাইবে? পাঠে, ধীরে ধীরে মন-আকাশ যেমন সেই অদৃশ্য জগতের সৌন্দর্য্য-পাতে নানা কোমল মোহন রঙে রঙ্গীন হইয়া উঠে, যেমন অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ অনন্ত-অভিমুখী হইয়া দাঁড়ায়,—এমন আর কার লেখা পাঠে হয়? অথচ, সবই কেমন সহজ, সরল, স্নিগ্ধভাবে প্রকাশিত; সামান্য চেষ্টার চিহ্নটীও যেন নাই! ভাষাও কেমন আড়ম্বরহীন, সহজ-গতি-সম্পন্ন, অলঙ্কার-বর্জ্জিত, প্রভাতের মত শুভ্র, নির্ম্মল!

রবীন্দ্রনাথের নিকট এ জগৎ চির-সুন্দর, চির-ভোগ্য।

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভুলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

এ-সকলের ভিতর দিয়া এক 'অরূপ রতনের' সঙ্গে চিরকাল ধরিয়া মানবাত্মার মিলন ও বিরহ সংঘটিত হইতেছে। নানা সময় নানা-মূর্ত্তিতে—কথনো জীবন-দেবতা, কথনো মানস-সুন্দরী, কথনো বা অন্যরূপে—ইঁহার প্রকাশ। নব-বর্ষার ঘন-নীল-আকাশে, ভাদ্রের বারি-ধারায়, শরতের শেফালিকা-সুগন্ধ গগনে, বসন্তের বকুল-বিথারিত পথে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কবি মুগ্ধ পুলকিত হইয়া থাকেন।

তাই কবি ঘন মেঘের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন,

এস হে এস সজল ঘন,
বাদল বরিষণে;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে।

* * *

এস হে এস হৃদয়ভরা,
এস হে এস পিপাসাহরা,
এস হে আঁখি শীতল করা
ঘনায়ে এস মনে।

আবার কহিতেছেন,—

তুমি   নব নবরূপে এস প্রাণে
এস   গন্ধে বরণে, এস গানে।

*   *   *

এস   নির্ম্মল উজ্জল কান্ত,
এস   সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস   এস হে বিচিত্র বিধানে।

*   *   *

তুমি   নব নবরূপে এস প্রাণে।

শরতে কা'কে উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিতেছেন ?

এস গো শারদ-লক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে
এস নির্ম্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল
আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা।

কা'র অজানা-পুরী হ'তে কে অমন অমল ধবল পালে তরণী সাজাইয়া বাহিয়া আসিতেছে ?

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া

দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে
কোন্ সুদূরের ধন
ভেসে যেতে চায় মন
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।'

আবার, শিউলিতলার পাশে শিশির-সিক্ত ঘাসের উপর এই তরুণীকে দেখিয়া আনন্দ-রস-মগ্ন কবি গাহিতেছেন,

আমার নয়ন-ভুলানো এলে
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।

* * *

কোথায় সোনার নুপুর বাজে
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ গলা সুধা ঢেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।

এই 'অরূপ রতনেরই,' অন্য বিকাশ—প্রিয়তম জীবন-দেবতা।

কুজনহীন কাননভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের পরে!
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে।

একে উদ্দেশ্য করিয়া কবি শ্যামায়মান আষাঢ় সন্ধ্যায় একাকী ঘরে বসিয়া বলিতেছেন,

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
* * *
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে,
হতেছ তুমি পার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার!

কত উদ্ধৃত করিব?

ইনিই জীবন-দেবতা, যিনি—
ওগো কোথা তুমি আশার অতীত

ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত
কোথা গো স্বপন-বিহারী !

যাঁকে উদ্দেশ করিয়া কবি গাহিয়াছিলেন,

আজ মনে হয় সকলের মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।

কালে ইনিই বিশ্ব-দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছেন।

তাঁকে উদ্দেশ করিয়া কবি সব শেষে বলিতেছেন,

জীবনে যা' চিরদিন
রয়ে গেছে আভাসে
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে,
জীবনের শেষ দানে
জীবনের শেষ গানে
হে দেবতা তাই আজি
দিব তব সকাশে,
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে।

এ সব কবিতার তুলনা কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে পড়িতে, আমি সংসার-বাস সুখের বলিয়া মনে করি, সংসারের প্রতি আমার মায়ার বন্ধন কমিয়া যায়, কিন্তু

তাও যেন তাকে বড়ই মিষ্টি লাগে—সবই কেমন সুন্দর ও উপভোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কা'রো কবিতাই আমার প্রাণে এমন সুখের স্পন্দন আনে না।

তাঁর কবিতা পড়িতে পড়িতে, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি ভাগ্যবান যে বাঙ্গালী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তা না হ'লে এমন কাব্য-রস উপভোগ করার ভাগ্য আমার কেমন করিয়া জুটিত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত, হৃদয়কে এমন নির্ম্মল সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা, আর কোন্ কবিতার আছে?

২৭.৭.১৪।—দাদাভাই নারোজী বলিয়াছেন, যদি দীর্ঘজীবন লাভ করিতে চাও, তবে—

(১) সাদাসিধা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিবে।

(২) প্রত্যহ অন্ততঃ এক ঘণ্টা নির্ম্মল-বায়ুতে ব্যায়াম করিবে।

(৩) প্রত্যহ মানসিক শ্রম করিবে।

(৪) আট ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে।

(৫) জীবনের লক্ষ্য উচ্চ রাখিবে।

(৬) চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য পবিত্র রাখিবে।

(৭) সুরাপান করিবে না, তামাক খাইবে না, কোন কু-অভ্যাস করিবে না।

(৮) সাধ্যমত উত্তম কাজ করিবে এবং ফল যা হয়, তা'তেই সন্তুষ্ট থাকিবে।

(৯) কখনো উদ্বিগ্ন বা চিন্তাকুল হইবে না।

চমৎকার উপদেশ! বর্ত্তমান ভারতের ঋষিকল্প মহাপুরুষেরই উপযুক্ত।

১৮.৮.১৪।—'গীতাঞ্জলি' দ্বিতীয়বার পড়িতেছি। এবার যেন তেমন আনন্দ পাইতেছি না।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান গুণ, তাঁর লেখা প্রাণে নির্ম্মল পবিত্র প্রেমের ভাব, শান্তির ভাব আনয়ন করে—মনকে সাধারণ ধনমানের লোভমুক্ত করিয়া আদর্শ-সন্ধানের ঔৎসুক্যে পূর্ণ করিয়া তোলে। তাঁর কবিতা বড়ই মধুর। মাঝে মাঝে এক একটী শব্দ যেন প্রফুল্ল মল্লিকাটির ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে; এমন নির্ম্মল, এমন সুন্দর, যে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে; মনে হয়, যেন আমাদের কঠিন স্পর্শে তার বিমলতা নষ্ট হইবে।

কিন্তু, কি জানি কেন, এ-সবে যেন আজ প্রাণে তেমন আনন্দ বহন করিয়া আনিতেছে না। বাঙ্গালীর প্রাণে শক্তি আনিতে পারে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-প্রসূত যুগযুগান্তরের কুসংস্কার হ'তে তাকে মুক্ত করিতে পারে, মোটের উপর বাঙ্গালীকে নূতন শক্তি-সামর্থ্যশালী জাতিতে গড়িয়া তুলিতে পারে—এমন কবিতা চাই। হতভাগ্য দেশ! কে তোমাকে জীবন-পথে আনিয়া দাঁড় করাইবে? কে তোমার জড়তা, আলস্য দূর করাইবে? শুধু সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা, স্বপ্নের জাল লইয়া কি করিব? কই সে কবি, যে অর্দ্ধমৃত বাঙ্গালীর দেহে নূতন প্রাণ, নূতন উৎসাহ, নূতন আকাজ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবে? চাই কিছু tonic তেজস্কর ধরণের; এই জগৎব্যাপী যুদ্ধের দিনে এ-সব হা হুতাশ যেন ভালই লাগিতেছে না।

১৯.৮.১৪।—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া, সার্ভিয়া এক দিকে, অন্যদিকে জার্ম্মেণি ও অষ্ট্রিয়া—যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। ৪ঠা আগষ্ট হ'তে জগৎ জুড়িয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও ভারতের অন্য সব স্থানেই loyalty demonstration হইতেছে।

আমি—দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি।

মানুষ যতদিন আছে, ততদিনই এমন মাঝে মাঝে যুদ্ধ অনিবার্য্য। একজনকে বাঁচিতে হইলে, অন্যকে মরিতে হইবে—এই মহা-নিয়মের উপরই প্রাণী-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ প্রতিষ্ঠিত। মানুষ তো কেবল প্রেম ও দয়া দিয়া গড়া নয়—হিংসা, লোভ, ক্রোধ, এ সকল তার মনের একটা মস্ত অংশ (বড় অংশটাই) দখল করিয়া আছে। এরা যখন সজাগ হইয়া উঠে, তখন কোথায় বা যায় দয়ার ক্ষীণ স্বর, কোথায় যায় বিশ্ব-প্রেম! যতদিন মানুষের দেহ আছে, এ সবও থাকিবে; মারামারি, লাঠালাঠি, লড়াইও চলিবে।

যাঁরা universal federation, universal peace জগৎ-ব্যাপী মিলন বা জগৎ-ব্যাপী শান্তির কথা বলেন, তাঁরা মানুষকে ভাল করিয়া বোঝেন নাই, পরীক্ষা করেন নাই; অথবা আহাম্মক। নয়তো, নিতান্ত ধূর্ত্ত; পর-দেশ জয় করিয়া লুট-তরাজ করিয়া, স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে এখন শান্তি-প্রচার করিতেছেন।

জগতের অন্তঃস্থলে, আগ্নেয়গিরির বুকে, সভ্যতার ক্ষীণ-আবরণে গা ঢাকিয়া মহা-হিংসা, মহা-লোভ, মহা-ক্রোধ জমিয়া থাকে; শেষে একদিন সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে জ্বলিয়া গর্জ্জিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া বিষম উৎপাতের সৃষ্টি করে। In the parliament of men, in the federation of the world—ইয়ুরোপের কবির মুখে বলা শোভা পায় না।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এ রকম মারা-মারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি জগতের অমঙ্গলজনক, সভ্যতার পথে মহাবিঘ্ন। কিছু নয়। প্রলয়ের মধ্যে শান্তি বুকে লইয়া সমাজ দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। মাঝে মাঝে ঝড় উঠিয়া স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশি দূরে উড়াইয়া দিয়া, আকাশ নির্ম্মল করিয়া দিতেছে। উন্নতি না অবনতি—তাই বা কেমন

করিয়া বলা যায়? আদি-মানুষটী যে পূর্ব্বাপরই হিংস্র বর্ব্বর থাকিয়া যাইতেছে; বাইরের পোষাক পরিচ্ছদ, চাল-চলনে শুধু যা কিছু পরিবর্ত্তন।

সংসারটা একটা ব্যাকুবের দল, নয় যত ভণ্ডের আড্ডা। Philosopherদের আমার এই দু'দলের এক দলে ফেলিতে মন চায়। ভণ্ড বলিব না কেন? যাঁরা নিজেরা না বুঝিয়া পরকে তাদের পথে চলিতে উপদেশ দেন, তাঁদের কি বলিব? অথবা তাঁরা ভ্রান্ত; গোলকধাঁধার পথকে সত্যই সরল পথ ভাবিয়া পরকেও তা অনুসরণ করিতে বলেন।

সর্ব্বশক্তিমান্, ত্রিকালজ্ঞ, দয়াবান্ ভগবান্‌কে রাখিতে হইবে; আবার, স্বাধীন-প্রবৃত্তির মানুষ ও রাখা চাই। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব, আমি তো বুঝিয়াই উঠিতে পারি না। যত পাপ, দোষ আমার ঘাড়ে; যতটুকু আমার ভাল, ভগবানের। যদি ব্যারাম হয়, আমার নিজ দোষ; যদি চিকিৎসাগুণে ভাল হইলাম, ভগবানের আশীর্ব্বাদ। নদীর উপর ঝড়-সৃষ্টি করিলে কে? যদি মাঝির প্রাণান্ত চেষ্টায় নৌকা-রক্ষা পাইল, প্রাণে প্রাণে বাঁচা গেল—তবে ভগবানের অনুগ্রহে। কি সব চমৎকার যুক্তি, বুদ্ধি! সকল দেশের philosopherর মুখে একই কথা।

আসল কথা, ধর্ম্মের নামে তেমন জগৎপূজ্য বৈজ্ঞানিকও গোবর-গণেশ হইয়া দাঁড়ান; ধর্ম্মের রাজ্য, ঈশ্বরের রাজ্য—যুক্তি যেন সে পর্য্যন্ত হাত বাড়াইতেই সাহস করে না।

ভগবানের অস্তিত্ব বিনা-প্রমাণে postulate স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াই, সমস্ত philosopher তাঁদের মত প্রচারে বাহির হইয়াছেন [বাদে বুদ্ধদেব]। তা না হ'লে যে শেষ পর্য্যন্ত কোনও মতেরই প্রতিষ্ঠা করা

অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ভগবান-রূপ বোল্‌চালের নীচে যে অনেক যুক্তিতর্ককে আবরিয়া রাখা চলে। নাস্তিক হ'তে কারো সাহস নাই, কারণ ওটা নাকি মহা লজ্জার বিষয়; কিন্তু ইহাও ঠিক, এই নাস্তিকতাবাদই—যারই ইংরাজী নাম materialism—হইতেছে জ্ঞান-বৃক্ষের শেষ-ফল, সাহস করিয়া একে গ্রহণ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

ভগবানকে বাদ দিয়া Philosophy গড়াইবার চেষ্টাই ভাল কিন্তু তা হ'লে philosopher র অস্তিত্বই যে থাকেনা। মানুষ কিছুতেই স্বীকার করিতে রাজি নয়, এ-জীবন-সমস্যা বোধগম্য নয়।

অনেক Philosophy পড়া গিয়াছে, অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র ঘাঁটা গেল। নানা মুনির নানা মত। আসল প্রশ্ন—পূর্ব্বাপরই সমস্যা-স্বরূপ রহিয়া গেল, সমস্যা পূরণ হইল না। শুধু, যে যার খাম-খেয়ালি মত জাহির করিয়া দিন কয়েকের জন্য বাহাবা নিতেছে। কত মিছার-জালে-বোনা মত বাহির হইয়া, সমুদ্রের বুকে ঢিল ছুঁড়িলে তরঙ্গ বিক্ষেপর মত, সমাজে কিছু কম্পন উঠাইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। জগৎ, জীবন, মানুষের বোধের অগম্য,—অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া Philosophy গড়িয়া তোল না? ভগবানকে ডাকিতেছ, ডাক্তারকে ডাকিতেছ, হরির লুটও মানিতেছ, ইন্‌জেক্‌সেন্‌ও চালাইতেছ—এ কি বিসদৃশ কাণ্ড! যা হয়, একটায় বিশ্বাস করো না, philosopher ম'শায়! জীবন-যাত্রা সোজা হইয়া আসুক।

২১·৯·১৪।

'নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান।'

কবির প্রধান কাজ, যে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা অস্পষ্ট আবছায়ার মত

মনোরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাকে মূর্ত্তি দিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তোলা ও জীবনের কাজে লাগানো। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সমকক্ষহীন।

উপরের লাইন ছুটিতে আমারই প্রাণের অস্পষ্ট-ভাবে অনুভব করা এমনি একটী সত্য বিবৃত হইয়াছে। আত্মপ্রশংসা অপেক্ষা নিজ বা পরের চোখে, নিজেকে ঘৃণ্য করিয়া তুলিবার এমন উপায় আর নাই। পরের কাছে যখনি নিজ-গুণ-কীর্ত্তনে মুখর হইয়া উঠিয়াছি, তখনি যেন নিজের চোখে ছোট হইয়া পড়িতে হইয়াছে, আর নিজ-মন হ'তেও,—আ! কি বিশ্রী কাজ করিতেছি, কেন মিছা পরের কাছে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা—এই রকম একটা ধিক্কার দেখা দিয়াছে।

কিন্তু এ-যে বিজ্ঞাপন-সর্ব্বস্ব সভ্যতার দিন; নিজের ঢোল নিজ পিঠে চাপাইয়া না বাজাইতে পারিলে, নিতান্তই যে আঁধারে এক-কোণে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

৮.১০.১৪।—এই যে ভীষণ মানুষ-ধ্বংসকারী যুদ্ধ চলিতেছে, এর মধ্য দিয়া আমি একই সত্য প্রচারিত হইতেছে দেখিতে পাইতেছি—সর্ব্বশক্তিমান্ ত্রিকালজ্ঞ ভগবান, মানুষের সুখদুঃখ যাঁর চিন্তা ভাবনার বিষয়, এমন কেউ নাই। যদি থাকিতেনই, তা হ'লে এমন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ-দর্শনে কেমন করিয়া এমন নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতেন।

আরো দেখিতেছি, যার জোর, তারই মুল্লুক—অতি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন প্রবচন। ধর্ম্ম বা ন্যায় বলিয়া কিছু নাই; প্রতাপ দেখা দিলে এরা লেজের মত আপনা হ'তে আসিয়া তার পিছনে জুড়িয়া উড়িতে থাকে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, জোরের কাছে সকলেই অবনত-মস্তক; অক্ষম যে, যে দুর্ব্বল, সেই ভগবানের নামে দোহাই দিতেছে।

আর কেই বা ঠিক করিবে, কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টী অন্যায়? কত প্রাণীর রক্তপাতের উপর মানব-সমাজ গঠিত; ভগবান, ধর্ম্ম—কিছুই তো খুঁজিয়া পাইতেছি না।

শক্তিমান্, শক্তিমান্ হও। দৈহিক বলে শক্তিমান্ হও, মানসিক বলে শক্তিমান্, বুদ্ধিবলে শক্তিমান্ হও।

দয়ার মাত্রা কমাইয়া দাও, লোক-লজ্জা ত্যাগ কর, নিজ-চিত্ত-মত্ত হইয়া নিজের ভাবে নিজ পথে চল। তোমার জীবন-রথ চালাইতে হইলে, অনেক কীট, পিপীলিকার উপর দিয়া তাকে চলিয়া যাইতে হইবে। জীবন মৃত্যুর উপর স্থাপিত; একজনের প্রাণ, অন্য প্রাণব্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই প্রাচীন নিয়ম।

তোমাকে পূর্ণ-মানুষ, মনুষ্যরাজ superman হইতে হইবে।

পরমুখাপেক্ষীর কপালে শেষ-চিহ্ন—পরনিন্দা, অপযশ, তা ছাড়া আত্মগ্লানি; কা'কেও সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া লক্ষ-ভ্রষ্ট হইও না, নিজ-কাজের ক্ষতিকর কিছু করিও না।

'Turn not aside from thy own task,
For others, be they ne'er so great.

বুদ্ধদেবের এ মহৎ উপদেশ সব সময় স্মরণ রাখিও।

১৬.১০.১৪।—কোন্ ব্যাকুব বলিয়াছে, 'অর্থ অনর্থের মূল'? ভিক্ষুকের মুখে এ কথা শোভা পাইলেও পাইতে পারে; মানব-রাজের মুখে নয়। অর্থ না হলে, মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় কেমন করিয়া? এই অর্থের অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আহার-বিহার সকল বিষয়ে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিবার চেষ্টা হতেই তো মনুষ্য-সমাজের যা কিছু উন্নতি হইয়াছে। যে

সন্ন্যাসী অর্থ অনর্থ বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তিনিই বা এমনভাবে বড় হইয়া উঠিতেন কেমন করিয়া, এমন জ্ঞানামৃত-পান করিবার সুযোগ পাইতেন কেমন করিয়া,—যদি অর্থের কল্যাণে প্রয়োজনীয় সুযোগ সব না জুটিত? এখনো, তাঁর ভুরি-ভোজন জুটাইতেছে কে? মইয়ের সাহায্যে ছাদে উঠিয়া, তার দোষ দিলে চলিবে কেন? অর্থশূন্য দরিদ্র সমাজ, আর পশু-সমাজ,—পার্থক্য কতটা?

বন-জঙ্গলে ঢুকিয়া, যা তা ছাই ভস্ম গায়ে মাখিয়া, মাথার উপর শকুনের বাসার মত জটার জাল রচনা করিয়া জীবন কাটানো—ও বিদ্‌ঘুঁটে আদর্শ আর পছন্দ হয় না। কিসের জন্যই বা চোখ বুজিয়া ঠোঁট চাপিয়া বসিয়া থাকা? আত্মদর্শন? ভগবৎ-দর্শন? কারো ভাগ্যে হইয়াছে কি? হাজার হাজার বছর ধরিয়া কত ভ্রান্ত ব্যাকুবের দল, এমন করিয়া হিমালয়ের বক্ষের মধ্যে নিজ নিজ অস্থিপঞ্জর মিশাইয়াছে! কি শক্তির অপচয়! কি শোচনীয় কাহিনী! এমন একটা বুদ্ধিমান্ জাতি, কত কাল ধরিয়া এমন অনাবশ্যক নিষ্ফল চেষ্টায় কেমন আপনাকে ক্ষয় করিয়া দিতেছে! কি যে মোহ-অঞ্জন চোখে লাগিয়াছে তার, কিছুই তাকে আর প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। এখনো, অসংখ্য অসংখ্য কত যাত্রী সেই মৃত্যু-পথই বহিয়া চলিয়াছে! কে তাদের ঘরে ফিরাইয়া আনিবে? কারো কথা শুনিবে কি তারা? জ্ঞানের ধার ধারেনা, শুধু এক বিশ্বাসের দমেই তারা চলিয়াছে। চলুক্ তারা, হতভাগ্য মূর্খের দল!

বরং, ইয়ুরোপীয় জীবন-প্রণালী—খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, কথা কম বলা, সর্ব্বক্ষণ কাজ, দেশের জন্য, নিজের জন্য, মিছা দয়া মায়া না করিয়া নিজের ভাবে কোন একটা খেয়ালের দিকে নিজেকে চালিত করা ও তাতে মজিয়া থাকা, তার পর মরণ দেখা দিলে ভীত না

হইয়া বীর পুরুষের মত তাকে আলিঙ্গন করা—এই আদর্শই ভাল। কিন্তু বড়ই যেন স্বার্থান্বেষী, সঙ্কীর্ণমনা তারা ; শ্রদ্ধার ভাব ও নেহাৎ কম—তা না হ'লে, মনে হয়, তারাই প্রকৃত পথে চলিয়াছে। আমাদের দর্শন মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ; দিনের দিন মৃত্যুর দিকে জাতিকে টানিয়া এখন তাকে চরম অবস্থায় আনিয়া হাজির করিয়াছে। কিন্তু তাও তাকেই অনুসরণ করিবে লোকে ; তা না হ'লে, তার নিয়তি—মৃত্যু, ঠিক্ প্রতিপন্ন হইবে কেমন করিয়া ?

অর্থ চাই। টাকা, যেমন করিয়া হোক্ খুব টাকা, সর্ব্বাগ্রে রোজগার করিতে হইবে। অর্থাভাবে ছেলেপুলেদের মনের মত শিক্ষা দিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তেমন পুষ্টিকর খাদ্য জুটিতেছে না, নিজেও তেমন মনের মতন জীবন-যাপন করিতে পারিতেছি না, এমন কি দু চার খানা বই যে পড়িব, যা আমার জীবনের প্রধান আনন্দ, তাও সব সময় জোটে না। অর্থ চাই। তা না হলে জাতি বড় হইবে কেমন করিয়া ?

২১.১১.১৪।—সংসারের ভিতর এমন অপদার্থ হইলাম কেন ? বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, দেশ ধন-রত্নে পরিপূর্ণ—তথাপি আমাদের মত এমন দরিদ্রের দল জগতে নাই। কেন এমন ?—আমাদের ধর্ম্ম, জীবনাদর্শ।

এমন জাতিধ্বংসকারী ধর্ম্ম আর নাই। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, কত গভীর তত্ত্ব-রত্নই না এতে নিহিত—আত্মা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রাণ, অপান, সমান, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, সত্ত্ব, রজ, তম,—কত কি কথা ! ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু দেখা যাইবে,—সব ভুয়া, অনেক খুঁজিলে যদি এক আধ টুক্‌রা সত্যের কণা জোটে, যত সব পণ্ডিত-মূর্খের বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কপোল-কল্পনা। তা ছাড়া, জাতিভেদ ও স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ব্যবস্থারূপ যে দুটী মহা-তত্ত্ব মুনিঋষিদের উর্ব্বর মস্তিকে গজাইয়া উঠিয়াছিল

—তার দোসর তো কোথাও নাইই। এমন জীবনাদর্শরেই বা তুলনা কোথায়? পলে পলে মরাই যার প্রধান লক্ষ্য; নীচ হয়ে সকলের পায়ের নীচে পড়িয়া থাকাই যার কাম্য। লেখাপড়া-জানা লোকগুলাও কেমন এখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের পা-ধোয়া জল খাইয়া নিজ নিজ মুক্তির পথ প্রশস্ত দেখিতেছে। কি এক আফিংএর নেশায় সমস্ত জাতিটা ডুবিয়া আছে; কখনো যে আর প্রাণস্পন্দন দেখা দিবে, মনে তো হয় না।

সংসার অসার, মুখে খুব প্রচার হইতেছে, কিন্তু পেটের তাড়না যে বিষম তাড়না, তাই দেখা যায়, বামুন-ঠাকুর দাঁতে দাঁত লাগাইয়া সংসারে মজিয়া আছেন, দুটী অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। না, এ ধর্ম্ম আমার সহ্য হইবে না। নেংটা হইয়া, গায় ভস্ম মাখিয়া, ছাল কম্বল পরিয়া অ-মানুষের মত থাকার—আমি কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এ ধর্ম্মে, এ আদর্শে যা হইবার, তা তো খুবই দেখা গেল। আমরা তো জগতের ফুট-বল; যে আসিতেছে, সেই দুটা লাথি মারিয়া নিতেছে; তবে, রবারটা ভাল, তাই ব্ল্যাডারটা একেবারে ফাটিয়া যাইতেছে না।

আদর্শ বদলাও; শক্তি ও সাহসকে আশ্রয় করিয়া মানুষ হইবার চেষ্টায় লাগিয়া থাক। দর্শন, শাস্ত্র, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ,—যত সব কু-সংস্কার, কু-আদর্শ, মিছার স্তূপ—সব জলে নিক্ষেপ কর। অন্ততঃ, পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যতদিন তুমি মানুষ না হও,—তাদের সংশ্রব সম্পূর্ণ-রূপে ত্যাগ কর। এদের জন্যই ভাইয়ে ভাইয়ে এমন ঝগড়া, স্ত্রীলোক এমন অকর্ম্মণ্য হইয়া আছে। অন্যান্য জাতির মত আমাদেরও যে জগৎ-সভায় একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইতে হইবে। নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত কর।

২২.১১.১৪।—বর্ত্তমানে ইংরাজের আদর্শ পুরুষ লর্ড কিচনার—অল্পভাষী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বৃথা-দয়া-মায়া-শূন্য, সুদীর্ঘ, বলিষ্টদেহ বীরপুরুষ। ইনিই নিট্সের superman অতি-মানব। তাঁর উপর যুদ্ধ পরিচালনের ভার দিয়া ইংরাজ নিশ্চিন্ত। উন্নত সমাজেই এমন আদর্শ বীরের আবির্ভাব হয়। তাঁরই সমকক্ষ ক্যাইজার উইলিয়াম—যাঁর প্রতি কথা হতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া সমস্ত জার্ম্মেণ জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে ও উৎসাহে উদ্যমে জাতি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁরই তুল্য জেনারেল জোফার—নীরব, নিশ্চল, বিচক্ষণ সেনাপতি। কি সব জাতি! কি সব লোক!

১১.১২.১৪।—তিনিই আমার চোখে দেবতা—যিনি অল্পবাক্, সাধনায় সর্ব্বস্ব-পণ, অবিচলিতচিত্ত, বহুকাল ব্যাপিয়া লক্ষ্য ধরিয়া থাকিতে পারেন; নির্জ্জন-বাস যাঁর চিত্তানন্দদায়ক, আত্মপ্রশংসা-বিমুখ, নিজ-চিত্ত-বিভোর, এবং পরের নিকট উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন না।

১৯.১২.১৪।—ইংরাজী বই পড়িতে যাইয়া, অনেক সময়ই Bernard Shawর নাম পাইতেছি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি একজন প্রতিভাবান্ লেখক; বর্ত্তমানকালে ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! কি দুর্দ্দশাতেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ইংরাজী সাহিত্য! Man and Superman তাঁর একখানা প্রথম শ্রেণীর নাটক, কাহারো মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুঃখের বিষয়, নাটক-হিসাবে আমার মোটেই ভাল লাগিল না। চরিত্র-চিত্রাঙ্কন তো নাই বলিলেই চলে, গল্পটীর মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু নাই। Shawর লেখার ভিতর দিয়া ললিতকলোপাসক অপেক্ষা

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মূর্ত্তিটারই বিকাশ হইয়াছে বেশী। দর্শন ও বিজ্ঞানের হিম-স্পর্শে কাব্য-সুন্দরীর দেহ আপনা হ'তেই কেমন অবশ, অসার হইয়া আসে; তাই, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কবি হওয়া সুকঠিন। Shaw নাটক লেখার ছলে যে philosophy of life প্রচার করিয়াছেন, তাই বরং বইয়ের প্রধান সম্পদরূপে গণ্য করা যাইতে পারে—যদিচ তাও একপ্রকার ধার করা। Shaw, Nietzscheর একজন প্রধান ভক্ত। বাঁধা নিয়ম ও বোল cantর তিনি শত্রু। যুগযুগের চেষ্টায় প্রকৃতির কর্ম্মশালায় দু'একজন Superman তৈয়েরী হইয়া থাকে। তাঁর আদর্শে সমাজ দিনকয়েক উন্নতির দিকে চলে; ক্রমে, আবার উচ্চাদর্শ ভুলিয়া নীচে নামিয়া আসে। Superman সৃষ্টি ব্যাপারে, সমাজ প্রকৃতির সহায়ক হইবে—এই তাঁর মতে আদর্শ-সমাজের আদর্শ কার্য্যপ্রণালী। অযথা দয়া, তিনি দেখিতে পারেন না। প্রতি দশ বিশ বছরে রাজ্যের আইন-কানুন এক একবার সংস্কৃত করিয়া নেবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু হাজার বছরেও সমাজের রীতিনীতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা কারো মনে স্থান পায় না। সময়ের সঙ্গে খোলস বদলাইতে বদলাইতে সমাজকে উন্নতির দিকে চলিতে হইবে—মরা বাঁধের জল কতদিন না-শুকাইয়া থাকে? মোটের উপর, নাটক-হিসাবে উচ্চস্থান পাইবার উপযুক্ত না হইলেও, stimulating and thought-provoking ভাবোদ্দীপক গ্রন্থরূপে Man and Superman পাঠের উপযুক্ত।

*

২০.১২.১৪।—অনেকদিন পূর্ব্বে (১৯০৬ সনে) জার্ম্মেণ দার্শনিক Nietzscheএর লিখিত Beyond Good and Evil কিনিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্য-শ্রেণী, অনেকটা পাগলের উক্তির মত বোধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সংবাদপত্রে যেখানে

সেখানে তাঁর উল্লেখ দেখিতেছিলাম। তাই বইখানা আনিয়া পড়া গেল, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাদিরও সাক্ষাৎ লাভ হইল। এখন দেখিতেছি, তেমন অবোধ্য কিছু নয়। নিট্‌সের দর্শন,—শক্তি-দর্শন Philosophy of Power। তাই, এই মহা-প্রলয়ের দিনে, যখন আকাশ সর্ব্বক্ষণ কেবল সংগ্রাম ও সংঘর্ষের আলোচনাতেই পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাঁর দর্শন বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইতেছে না, আবছায়ার মত চোখের কাছে যা ছিল, তা যেন সরিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে, এই মহাযুদ্ধে জার্ম্মেণদের দার্শনিকই হইতেছেন—নিট্‌সে। সকলেরই বিশ্বাস, জার্ম্মেণরা তাঁরই ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া, এই জীবন-মরণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সঙ্গে, আরো দুজনের নাম উঠিয়াছে,—ঐতিহাসিক ট্রিস্কে Treischke ও সৈন্যাধ্যক্ষ বার্ণহার্ডি Barnhardi। নিট্‌সের অথবা তাঁরই প্রচারিত অনুরূপ ভাবের উপর ট্রিস্কে তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং বার্ণহার্ডি তাঁর Germany and the Next War নামক গ্রন্থে, কি উপায়ে তা দেশের কাজে নিয়োজিত করা যায়, তার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এঁরা প্রত্যেকেই শক্তিবাদী, অভিষ্টসাধনে দয়া-মায়ালেশশূন্য। যুদ্ধ ভয়াবহ নৃশংস ব্যাপার, নিতান্ত না ঠেকিলে এতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়,—এ পর্য্যন্ত সমাজে এরূপ ধারণাই প্রচলিত ছিল, কিন্তু এঁদের মত অন্যরূপ,—জাতীয় উন্নতির জন্য সময় বুঝিয়া ইচ্ছায় এই ভীষণ ব্যাপারে লিপ্ত হওয়াও দরকার। কি উদ্ভিদজগতে, কি প্রাণীজগতে, কি মানবসমাজে সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলকে পরাস্ত ও পদদলিত করিয়া সবল বড় হইতেছে, সর্ব্বত্রই শক্তিমানের জয়। নিট্‌সের মতে, war যুদ্ধ একটী biological necessity জীবজগতের অনলঙ্ঘনীয় নিয়ম। যে জাতি শুধু শান্তি-অন্বেষী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জন

করা ও ধনী হওয়াই যার লক্ষ্য, তার ধ্বংস নিকটবর্ত্তী, অনিবার্য্য। দৃষ্টান্ত—নরওয়ে, হল্যাণ্ড, পর্টুগাল, স্পেন। যেমন রুগ্নব্যক্তির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সময়বিশেষে ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রয়োজন, সেই প্রকার, এঁদের মতে, দুর্ব্বল মুমূর্ষু জাতির পক্ষে যুদ্ধও মৃত-সঞ্জীবনী। এঁরা প্রত্যেকেই মনস্বী, স্বদেশ-প্রেমিক, নিজ-দেশের মহিমা, সভ্যতা, ও প্রভাব যাতে জগৎব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, প্রত্যেকেরই তা লক্ষ্য। উদ্দেশ্য-সাধনে কোনও কুকার্য্যেই পরাঙ্মুখ ন'ন, ভীষণ দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিত্রয়!

পূর্ব্বাপরই, নিট্‌সের নিজ প্রতিভা ও শক্তির উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ১৮৮৩ সনে নাইস নগরে অবস্থানকালীন তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, চল্লিশ বৎসর মধ্যে তিনি ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়া পড়িবেন। আর এক সময়, বন্ধু পিটার গ্যাষ্টকে লিখিয়াছিলেন, যে পর্ব্বত-প্রদেশে তিনি ভ্রমণ করিতেন, উত্তরকালে লোকে সেখানে তাঁর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে।

ভবিষ্যৎবাণী সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। মৃত্যুর পর ত্রিশ বছরও অতীত হয় নাই—এই অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁর নাম জগতের সর্ব্বত্র উচ্চারিত হইতেছে। ইয়ুরোপ ব্যাপিয়া তাঁর উপাসকের অভাব নাই। বলিতে গেলে, সমস্ত জার্ম্মেণ জাতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে তাঁর শিষ্য। ইংল্যাণ্ডেও সুবিখ্যাত নাট্যকার বার্ণাড শ প্রমুখ অনেকানেক লেখক অনেক বিষয়ে তাঁর মতাবলম্বী ও ভাবে অনুপ্রাণিত।

চিরকালই এমন। এক যুগে যিনি ঘৃণ্য নগণ্য, পরবর্ত্তী যুগে তাঁর মূর্ত্তি পূজা করিয়া দেশবাসী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। নিট্‌সের প্রতিপত্তির প্রধান কারণ, তাঁর সত্যান্বেষণ প্রবৃত্তি এবং নির্ভীকতা; যা সত্য মনে করিয়াছেন, শুধু তাই তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর ভাষা কবিত্ব-মণ্ডিত ও প্রাণস্পর্শা; তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি।

তৃতীয়তঃ, তিনি দার্শনিকদের জটিল তর্ক ও বৃথা শব্দাড়ম্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ঠিক বলিতে গেলে, তাঁকে Philosopher বলা যায় না—বরং তাঁকে Prophet বলিলেই ঠিক হয়। যুক্তি অপেক্ষা ভাবের প্রাবল্যই অধিক, aphorism সূত্রাকারেই অনেক বিষয় লিখিত, অনেক সময় কবিতারও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য কারণেও তাঁকে দার্শনিক বলিতে ইচ্ছা হয় না। দার্শনিক যিনি, জীবন-সমস্যা তাঁর পূরণ হইয়াছে; তিনি শান্ত, ধীর, গম্ভীর—ইহাই আমাদের ধারণা; কিন্তু নিট্সের জীবনের দিকে দৃষ্টি করিলে, তেমন কিছু মনে হয় না, বরং বোধ হয়, কি এক অশান্তি ও অতৃপ্তির বোঝা বহন করিয়া আজীবন তিনি স্থান হতে স্থানান্তরে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

দার্শনিকদের মধ্যে তিনি সোপেনহরকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন দিতেন। সোপেনহরের মতে Will to Live জীবনধারণ-ইচ্ছাই জীবজীবনের মূল-প্রবৃত্তি principle। ডারুইন যাকে Struggle for Existence জীবন-সংগ্রাম বলিয়াছেন—ইহা তারই রূপান্তর-বিশেষ। কিন্তু নিট্সের মতে, মানুষ কেবল জীবনধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট নয়; সে, সকল সময়ই শক্তি-প্রয়াসী, ক্ষমতা-বৃদ্ধিপ্রয়াসী, এক জয়ের ও প্রভুত্ববিস্তারের আনন্দের ভাবে আজন্ম-বিভোর—Will to Power তার জীবনের মূলনীতি। তাঁর মতে, তাঁরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ,—যাঁদের ভিতর এই ক্ষমতাপ্রয়াসী প্রবল ইচ্ছাশক্তির Will to Powerর পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে—যেমন নেপোলিয়ন, ও ফ্রেডারিক দি গ্রেট। মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষ কালে স্থানে স্থানে যে সকল মহাবীরদের আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁরাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এঁরা নির্ভীক, মহাসাহসী, অদ্ভুতকর্ম্মা, নির্ম্মম, উদ্দেশ্য-সাধনে সর্ব্বস্বপণ, ইচ্ছা-শক্তির পূর্ণ অবতার।

ধর্ম্মযাজকের পুত্র কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা, নিট্সের মত খ্রীষ্টধর্ম্মের এমন

শক্র নাই। তাঁর মতে রোমীয় সভ্যতার প্রভাবে ইয়ুরোপে সর্ব্বত্র যে সভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল, তার প্রধান গুণ ছিল অন্তর্নিহিত শক্তি। প্রাচীন রোমান, প্রাচীন গ্রীক,—শক্তির উপাসক ছিল; সবল, সুস্থকায়, সুন্দর, দৃঢ়চিত্ত, দৃঢ়পণ মানুষই এদের চোখে আদর্শ-পুরুষ ছিল; দয়ামায়া জানিত না, সিদ্ধি-সাধনে প্রয়োজন হলে পরকে নির্দ্দয়ভাবে যন্ত্রণা দিতে ক্রুটী করিত না, নিজেরাও অবহেলায় প্রাণ ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। শক্তিশালী ছিল বলিয়াই এদের চরিত্রও মহৎ ছিল; দানে মুক্তহস্ত ছিল, হৃদয় ঔদার্য্যে পূর্ণ ছিল। অর্থগৃধ্নু য়িহুদীরা ছিল,—সম্পূর্ণ বিপরীতচরিত্র। এদের মত ধর্ম্মযাজকের শাসনাধীনে কোন জাতিই এত অধিককাল বাস করে নাই [বাদে অবশ্য হিন্দু]। চিরকালই এরা পরপদদলিত পরপ্রপীড়িত হইয়া আসিতেছে। তাই গরীবের, নির্য্যাতিতের যা বল ও সহায়—সে-সকল সাম্যের দয়ার একত্রীকরনের ভাবে এদের সমাজ পূর্ণ। কালে, রোমীয়-সভ্যতা, য়িহুদী-সভ্যতার কাছে পরাস্ত হইয়া গেল। নিট্‌সের মতে, তার পর হতে তিনজন য়িহুদী ও একজন য়িহুদী নারীর পায়ের নীচে ইয়ুরোপ লুটাইতেছে—যীশু, জেলিয়া পিটার, তাম্বুওয়ালা পল, ও যীশুর-মা মেরী। এই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে,—সাম্য, মৈত্রী, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি ভাবসকলের বিস্তৃতির সহিত, মানবেব ব্যক্তিত্ব individualityর বিকাশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে ইউরোপ দুর্ব্বল হইয়া অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

তাঁর মতে, লোকসকলকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; একশ্রেণী,—যাদের তিনি aristocratic অভিজাত আখ্যা দিয়াছেন, race of masters প্রভুজাতি; আর এক শ্রেণী,—slaves কৃতদাস-জাতি, পরমুখাপেক্ষী, পরপদানত, পরপদতলচর। প্রথম শ্রেণীর মতে তিনিই সৎ good,—যিনি মহৎ, নীচাশয়তার গন্ধ যাঁতে নাই, সাহস, বীর্য্য,

উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মাভিমান, আত্মসম্মানজ্ঞান, বিপদের প্রতি অবজ্ঞা, বিপদে আনন্দভাব রক্ষা করিয়া চলা, কঠোরতা, প্রয়োজন-বিশেষে নিষ্ঠুরতা, নির্ম্মমতা, ও ন্যায়ান্যায়বিচারহীনতা যাঁর চরিত্রাংশ। আর অসৎ bad সে, —যে কাপুরুষ, দুর্ব্বল, ভয়-গ্রস্ত, নীচাশয়, সকল বিষয়েই যে নিজ স্বার্থ ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজে হাত দেয়, নিজেকে যে অপমানিত হ'তে দেয়, তোষামোদ-প্রিয়, ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বনকারী; যে কপটাচারী, সর্ব্বোপরি যে মিথ্যাবাদী।

দাসজাতীয় লোকসকলকে অভিজাতবংশের হাত হতে নিজেদের সর্ব্বক্ষণ আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়। তাই, য়িহুদীদের মত নিপীড়িত জাতি যে-সকল নীতির সাহায্যে নিজ অস্তিত্ব কোন প্রকারে অক্ষুণ্ণ রাখে, সে-সকলই এদের সমাজে প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও সামাজিক নীতির প্রধান উপকরণ বলিয়া গণ্য হয়—যেমন দয়া, পরোপকার, পরিশ্রমশীলতা, বিনয়, বন্ধুত্ব। এরা ascetic ideal সন্ন্যাসীর জীবনকে আদর্শ মনে করে, সংসার এদের মতে অসার, জীবন অনোপভোগ্য, এ-জীবনে সুখ নাই, সুখ যা মৃত্যুর পরপারে, ভবিষ্যজীবনে। এ জীবনকে এরা ঘৃণা করে। যে সকল জাতি এ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, তাদেরই জগতে দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই ascetic idealই এর অধোগতির কারণ। ভাবিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে, কথাটীর ভিতর বিশেষ সত্য নিহিত রহিয়াছে। যারা বীরজাতি, তাদের মতে জীবন উপভোগ্য, বর্ত্তমান জীবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মৃত্যুর পর কি হইবে সে-ভাবনায় তারা বিচলিত নয়; সময় নাই, দরকারও নাই তাদের সে দিকে চাহিবার।

জীবন Lifeর অর্থ, নিট্সের মতে,—নিজ সত্বার ভিতর যা ক্ষয়শীল, জরাজীর্ণ, তার প্রতি কঠিনপ্রাণ ও নির্ম্মম হইয়া তাকে বিতাড়িত করা ও অন্যের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার। প্রত্যেক নীতির গুণাগুণ বিচার করিতে

হইবে,—সমাজ ও মানবের জীবনীশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধিবিষয়ে তার ফলাফল দেখিয়া। সমাজে যাতে Superman অতিমানবের আবির্ভাব হয়—তাই তার লক্ষ্য হইবে। দৈহিক বলে মানুষ একদিকে যেমন বলীয়ান্ হইবে, দৈহিক সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইবে, সেই প্রকার মানসিক বলেও শ্রেষ্ঠ হইবে, দৃঢ়চিত্ত, সাহসী, দুর্দ্ধর্ষ ও কর্ম্মঠ হইবে। এই Supermanর আদর্শ মনোবিজ্ঞানরাজ্যে নিট্‌সের শ্রেষ্ঠ দান। এর দিকে চাহিয়াই, তিনি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের বিষয় বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। এর জন্যই যে পঙ্গু, দুর্ব্বল, পীড়াগ্রস্ত—তাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'তে দেওয়ার তিনি বিরোধী; যাতে বলিষ্ঠ সুসন্তানে সমাজ শোভিত হয়—তাই তাঁর লক্ষ্য। এ-সব দেখিয়া তাঁকে কেহ কেহ Science of Eugenics সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের জন্মদাতা স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত ইয়ুরোপ খুঁজিয়াও যেন তিনি প্রকৃত মানুষ পান নাই, সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলচিত্ত ভাবুক sentimental লোকের সমাবেশ। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর মনোবিজ্ঞান Biology প্রাণীবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিট্‌সের দর্শন,—Biology ও Physiology প্রাণী-বিজ্ঞান ও শারীর-বিদ্যা দুইয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবজগতে দুর্ব্বল ও অধঃপতিত যারা, তাদের স্থান নাই; তাঁর কল্পিত আদর্শ মানব-সমাজেও তাদের স্থানাভাব। শক্তি ও উদ্যমের তারতম্যানুসারেই তিনি মানবমণ্ডলীকে প্রভু ও দাস আখ্যায় বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁর মতে সকল বিষয় সম্বন্ধেই এখন Transvaluation of values গুণের প্রকৃত-মূল্য-নির্দ্ধারণের দরকার। দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যে সকল গুণ সমাজে এতদিন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, তারা সে স্থান পাইবার উপযুক্ত কি না। এই দয়া pity তাঁর চক্ষুঃশূল স্বরূপ ছিল। দয়া যে অনেক সময় দৌর্ব্বল্যেরই রূপান্তর, কে অস্বীকার করিবে?

তিনি নাস্তিক ছিলেন; ভগবানে, কি আত্মার অমরত্বে ও ভিন্ন অস্তিত্বে, তাঁর বিশ্বাস ছিল না। পরমাণু অবিনশ্বর, এই বিশ্বাস যেমন এতদিন পরে বিজ্ঞানাগার হতে তাড়িত হইয়াছে, তাঁর মতে, কালে আত্মার অবিনশ্বরত্বের বিশ্বাসও দূরীভূত হইবে। ধর্ম্মবিশ্বাসের ক'থা উল্লেখ করিতে যাইয়া সুবিখ্যাত ফরাসী লেখক Emilie Boutroux বলিয়াছেন, বিজ্ঞান-গৃহে ভগবানের এক্ষণে আর স্থান নাই, বৈজ্ঞানিক তাঁর অস্তিত্ব অনস্তিত্বের জল্পনা কল্পনায় আর মনকে ব্যতিব্যস্ত হ'তে না দিয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যেমন দেখা যাইতেছে, কালে নিট্‌সে-প্রমুখ প্রচারিত নাস্তিকতা-বাদ সভ্য-সমাজের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে; কতদিন ঢাকিয়া রাখা চলিবে সত্য-সূর্য্যকে?

নিট্‌সের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হওয়া অসম্ভব। অভিজাতদের উন্নতির দিকে চাহিয়া, তিনি ক্রীতদাস প্রথার পর্য্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কে তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হইবে? তিনি দয়ার বিপক্ষপাতী, কিন্তু এই মৈত্রীভাব হ'তে উৎপন্ন মিলনের ভাবের কল্যাণেই যে মানব-সমাজ ক্রমে ক্রমে জ্ঞানে ধনে সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে—তার কি কোনও সন্দেহ আছে? সাম্য, প্রেম, বিনয়, ধৈর্য্য, মৈত্রী প্রভৃতি যে সকল ভাবের তিনি বিপক্ষে,—সবই, খ্রীষ্টের জন্মেরও বহু পূর্ব্বে, নিট্‌সের অভিজাতবংশসম্ভূত রাজকুমার সিদ্ধার্থ কর্ত্তৃকই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। অবিবাহিত নিট্‌সে অনেক সময় একাকীই জীবন যাপন করিতেন, সমাজের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। তাই, স্নেহ, মমতা, দাক্ষিণ্য, পরোপকার প্রভৃতি যে সকল গুণের সমন্বয়ে ও ফলে মানবসমাজ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে—তার বিরুদ্ধে এত কথা বলিবার অবকাশ পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁর লেখা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, অনেক সময়ই তিনি ভাবের প্রাবল্যে যুক্তি তর্ক পরিত্যাগ করিয়া একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন।

তাই, তাঁর লেখায় নানা প্রকার বিপরীত মত দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অযথা কটূক্তিতাবর্ষণেও সময়-বিশেষে তা কলুষিত। এ-সকল কারণে তাঁর ভক্তের যেমন অভাব নাই, নিন্দুকেরও নাই।

শক্তির বিকাশক্ষেত্র ইয়ুরোপে নিট্সের দর্শনের ফলে শক্তি চর্চ্চা আরও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ, জার্ম্মেণিতে—যেখানে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের কাল হতে এ পর্য্যন্ত কেবল ইচ্ছাশক্তিরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আসিতেছে—এর প্রভাবে দয়া-মায়া-পাপ-পুণ্য-ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া জার্ম্মেণরা শক্তি ও প্রাধান্যের বিস্তার করিতে যাইয়া সমস্ত জগতের বিভীষিকা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যে সকল জাতি দুর্ব্বল, তাদের উপর নিট্সের দর্শনের ফল অমঙ্গলজনক হইবে, বোধ হয় না।

নিট্সের পক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার যথেষ্ট আছে। তবে, বোধ হয়, এই ভাবুকতা sentimentalismর দিনে তাঁর দর্শন অনেকটা বীর্য্যবান্ ঔষধের মত সমাজশরীরে কাজ করিবে ; অল্প মাত্রায় গ্রহণ করিলে মহা-উপকারের সম্ভাবনা, অত্যধিক মাত্রায় মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশের বিশেষ ভয়।

৩০.১২.১৪।—কতদিন হতে,—কেন আছি, কোথা হতে এলাম, কোথায় যাব, কোথায় অন্ত—প্রশ্নসকলের সমাধানের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সম্যক উত্তর পাওয়া গেল না। কেবল আঁধারে ঘুরিয়াই বেড়াইতেছি।

মনে পড়ে, ১৯০৬ সালে ভা—তে বাসের সময়, বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী-পাঠে বেদান্ত-দর্শনের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই। তখন হতেই প্রকৃতরূপে আমি জ্ঞান-চর্চ্চা আরম্ভ করি। যা কিছু আনন্দ জীবনে পাইয়াছি, ইহা হতেই ; আর এর সংশ্রব যখনি ত্যাগ করিয়াছি, তখনি নানা-

প্রকার অশান্তির জ্বালায় অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিয়াছি। বিবেকানন্দের পরে, অভেদানন্দের লেখার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়। বাড়ীতে পণ্ডিতের কাছে শঙ্করাচার্য্যের টীকা-সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতগীতাও কতকদিন পড়া গিয়াছিল। দেখিলাম, বেদান্তের ভিতর কেবল কুটিল তর্ক, মূলতঃ সারশূন্য—আমার প্রাণের পিপাসা মিটাইবার মত তাতে কিছুই পাওয়া গেল না, সমস্যা অপূরণ রহিয়া গেল। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ও Theosophical Societyর কতক বইর সঙ্গেও এ-সময় আমার পরিচয় হয়। বরং, পাতঞ্জল-দর্শনে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির কি প্রকারে উৎকর্ষ ও উদ্বোধন করা যায়, তার নানা উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। ঈশ্বরের নাম আছে সত্য, কিন্তু যে ভাবে তাঁর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাতে চা'লের ভোগের উপর বাতাসার মত, তাঁকে বাদ দিলেও চলে। বেদান্তে উদ্দেশ্য লিখিত হইয়াছে—ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন ও মুক্তিলাভ; পাতঞ্জল-দর্শনে কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়, তার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বেদান্ত একবার বলিতেছে—'তত্ত্বমসি', অর্থাৎ তুমি ও ভগবান্ এক; আর একবার বলিতেছে,—ভগবান-লাভ ও তাঁতে মুক্তি, জীবের চরম-উদ্দেশ্য। মানবাত্মা পরমাত্মারূপ ভগবানের মধ্যে যেন নিহত ছিল; কোন্ এক খেয়ালের বশে বিচ্যুত হইয়া মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়াছে, অবশেষে আবার ভগবানে যাইয়া মিশিবে। আত্মার এ প্রকার উৎকট সখ কেন—ভগবানের দেহ হতে বাহির হইয়া বিনা কাজে বিনা উদ্দেশ্যে কিছু কাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া আবার তাঁতে ফিরিয়া যাওয়া? আর যদি আমি ও ভগবান একই হই, তা হলে তাঁর সঙ্গে মিশিবারই বা কোন্ প্রয়োজন, মিশিবই বা কেমন করিয়া? আর মুক্তি! তাই বা কি? এ যেন পট্‌কা বাজির মত ফট্ করিয়া ফুটিয়া যাওয়া। বেদান্ত বলিতেছে, এ সব মায়া, বুদ্ধির অগম্য। কেবল কূট তর্ক, কথার জাল,

rubbish। কৃষ্ণ, গীতায় এই কূট তর্কেরই পরিচয় দিয়াছেন। একবার, অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন, সকলই এক আত্মার বিকাশ, কেউ কাকে মারে না, কাটে না, পাপ পুণ্য কিছুই নয়; আবার বলিতেছেন, যে হেতু অর্জ্জুন! তুমি ক্ষত্রিয়, অতএব ক্ষাত্র-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শত্রু নিপাত করাই তোমার কর্ত্তব্য। সত্যই যদি সমস্ত সত্বাই একই আত্মার রূপান্তর, তা' হ'লে, মূলতঃ ক্ষত্রিয়ের পার্থক্যই বা কি, আর তার ভিন্ন ধর্ম্মই বা থাকে কোথায়? কেবল কথার কাটাকাটি, প্যাঁচ। যদি বুদ্ধির অগম্যই ভগবান ও আত্মদর্শন ব্যাপার, তবে পরকে বুঝাইবার চেষ্টা কেন?

তারপর, বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থাদি লইয়া বছর কয়েক নাড়া চাড়া করিলাম। বুদ্ধদেবের প্রধান গুণ—তাঁর কথায় কোন কুটিলতা নাই। রাজার ছেলে, সংসারের দুঃখ ও জরা-মরণ রূপ মহাবিপদের হাত হতে উদ্ধার পাইবার কামনায় গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। অনেক অক্লান্ত ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি যে ভাবে নিজে অবশেষে শান্তি-লাভ করিয়াছিলেন, জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তিনি তাদের কাছে সেই পথ দেখাইয়াছিলেন। নিজে যেমন ভাবে জীবন-মরণ-সমস্যা সাধন করিয়া লইয়াছিলেন, পরকেও সে-ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। কোন প্রকার ছল বা ঘোর-প্যাঁচ নাই।

বুদ্ধদেবের মতে 'ভগবান' দুজ্ঞের্য়, 'আত্মা'ও দুজ্ঞের্য়। সে ধর্ম্মে এ-সবের স্থান নাই। জগতে দুঃখ আছে এবং দুঃখ হতে ত্রাণ পাইতে হইবে —ইহাই তাঁর শিক্ষার সার। কোথায় আত্মা? কোথায় ভগবান? আমি তো খুঁজিয়া পাইলাম না। কেন আসিলাম, কোথা হতে আসিলাম, কোথায় শেষ—কিছুরইতো উত্তর পাওয়া গেল না। আর জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, যাকে 'আত্মা' 'আত্মা' বলিয়া মনে করিতেছি, তারই বা কত না পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাও কি বলিতে হইবে—'আত্মা' আছে এবং তা অবিনশ্বর ও অপরিবর্ত্তনীয়? বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞানও বুদ্ধদেবের

মতই গ্রহণ করিতেছে। ধর্ম্মপ্রচারকদের মধ্যে তাঁর মত জ্ঞানীই বা কে ছিলেন? অধিকাংশই তো অশিক্ষিতের দল, তাই মূর্খের যা স্বভাব, আবোল-তাবোল বোল-চালও তাঁদের মুখেই বেশী।

বুদ্ধদেব মাঝখান হতে মানুষকে ধরিয়াছেন। কেমন করিয়া তার সৃষ্টি হইল, তা তিনি বলিতে পারেন না। কেহই পারিবেও না। তাঁর মতে বাসনাই জীবনরূপ মহাব্যাধির প্রধান উপাদান, বাসনাই তার উৎপত্তির প্রধান কারণ। এই বাসনার ফলে মানুষ জন্মের পর জন্মগ্রহণ করিতেছে ; যখন বাসনার নিবৃত্তি হইবে, তখন শুষ্ক-বোঁটা ফলের মত জীবন চিরকালের জন্য খসিয়া পড়িয়া যাইবে, আর জন্ম দেখা দিবে না—ইহাই নির্ব্বাণ বা দুঃখ-হতে চিরকালের জন্য ত্রাণ, কারণ জন্মই যে দুঃখের মূল কারণ। বাসনার মূলচ্ছেদ করিয়া এই নির্ব্বাণ লাভই জীবের লক্ষ্য হওয়া উচিত—ইহাই চরম সুখের, শান্তির, মুক্তির অবস্থা।

বাসনাই যে জীবের উৎপত্তির কারণ, ইহা কি সত্য? এই যে চারিদিকে গাছ, লতা, পশুপক্ষী দেখিতেছি, এরা কি বাসনার তাড়নায় উদ্ভূত হইয়াছে? আর ইহাও বুঝি না, মানুষ যখন নিজ কর্ম্ম-দোষে নীচ পশু জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে, তখন পশু হতে কোন্ বুদ্ধির চালনা করিয়া কোন্ সৎকাজের সাহায্য পাইয়া আবার মনুষ্য-শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইবে? বাসনার নিবৃত্তিই যে জীবের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ইহাও যেন কেমন মনঃপুত হইতেছে না।

বর্ত্তমানে আমার মানসিক অবস্থা অনেকটা সন্দেহবাদী agnosticএর মত। ভগবান আছেন কি না আছেন, সে প্রশ্ন আমি অজ্ঞেয় বলিয়া ত্যাগ করিয়াছি। যদি তেমন কেউ থাকিয়া থাকেন, তবে, বেশ তিনি আছেন। জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাও অজ্ঞেয় বলিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আমি আঁধারে ঘুরিতেছি ; বুঝি, আজীবনই এমন ভাবে যাইবে।

৩.১.১৫.।—যতই কেননা আমরা আমাদের আর্য্য-সভ্যতার নাম করিয়া লম্ফ-ঝম্ফ না করি, ইহা অস্বীকার করা চলে না, ইংরাজী-সভ্যতার কাছে ইহা পরাস্ত। তাদের মত আমাদের এমন virility কই ? কয়টা বা লোক, সমস্ত পৃথিবীটাকে কেমন তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে !

আমাদের সভ্যতার ভিতর যা সারাংশ, তা অনেকটা নিবৃত্তিমুখী—দরিদ্রের দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। আমরা কষ্টসহিষ্ণু ; কষ্টকে পরাজয় করিয়া দূর করিয়া দিবার অপেক্ষা, তাকে সহ্য করিয়া মাথায় পাতিয়া নিতেই অধিক শিক্ষা করিয়াছি। আমাদের একপ্রকার-নিরামিশ আহারও এই প্রকার ভাবের চাষের সাহায্য করিতেছে। সাহস, বীর্য্য, নিজ হতে কোন কাজ করিবার ক্ষমতা, নাই বলিলেই চলে। সর্ব্বোপরি জাতি-ভেদরূপ মহাবন্ধন আমাদের কূয়োর ব্যাঙ্ করিয়া রাখিয়াছে ; এক একবার তার ভিতর লাফ দিতেছি, আর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া গর্ব্বভরে বলিতেছি, কে আমাদের মত বড় ?

ইংরাজের দিকে চাহিতেই নূতন শক্তি হৃদয়ে প্রবেশ করে। কি সাহস, কি বিক্রম, কি বুদ্ধি, কেমন স্বদেশ-হিতৈষণা ! জগৎ-জোড়া রাজত্ব, জগৎ-ব্যাপী কীর্ত্তি !

ইংরাজের সমকক্ষ হতে চাহিতেছি, কিন্তু পারিতেছি কি ? তাই এক একবার মনে হয়, আমাদের প্রাচীন আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঢিলা-ঢোলা চাল-চলন সব ত্যাগ করিয়া সকল বিষয়ে তাদের অনুসরণ করিয়া মানুষ হই। এমন কি, ফিরীঙ্গীগুলাকেও যেন আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয় ; কেমন চটপটে, সবল, কার্য্যক্ষম।

কিন্তু এ ভাব ক্ষণিক। বড় হতে ইচ্ছা করে,—কিন্তু মূলতঃ যে ধারায় এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছি, সে ধারায়; অন্যরূপে নয়। পরোপকারের অছিলায় পরদেশ-জয়ে, পর-ধন-লুণ্ঠনে প্রয়োজন নাই; জগতের যে যেখানে আছে নিজভাবে সুখে থাক্, পর-পীড়কের ঘৃণ্যজীবন যেন আমাদের না হয়। জগতের সর্ব্বপ্রাচীন এই আমাদের সভ্যতাটীর অঙ্গে ধীরে ধীরে নানা প্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া যে সকল অমূল্য রত্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যত্র তা কোথায় পাইব? দোষ যথেষ্ট আছে; গুণরাজিরও সীমা নাই। এমন উপনিষদ, বেদ-বেদান্ত, দর্শন, এমন বৌদ্ধ-জৈন-বৈষ্ণব-মত-সম্বলিত অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজি কোথায়? কোথায় বা দেখিব এমন জ্ঞান-তাপস মুনিঋষিগণ? কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে, কি চিত্র-অঙ্কনে, সঙ্গীত-শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই তো এই তাপসদের একনিষ্ঠা। কোথায় মিলিবে এমন সত্যব্রত রাজা দশরথ; এমন পিতৃবৎসল পুত্র, কোমলতা ও দৃঢ়তার আদর্শ দৃষ্টান্ত, মূর্ত্তিমান কর্ত্তব্যপরায়ণতা; কোথায় জোটে এমন ভাই লক্ষ্মণ; কোথায় এমন স্ত্রী, সীতা দেবী, রমণীর শিরোমণি? রাজকুমার সিদ্ধার্থ, মুক্তির উপায় অন্বেষণে সর্ব্বস্ব-ত্যাগী; রাজেন্দ্র অশোক, জগতে অতুলনীয়; ভীষ্ম, কর্ণ, গার্গী, দময়ন্তী, জনক, যাজ্ঞবল্ক—মানব-চরিত্রের এমন অপূর্ব্ব মধুর স্নিগ্ধ বিকাশ আর কোথায় হইয়াছে? এমন সভ্যতার উত্তরাধিকারী আমি—ধন্য আমি, ধন্য আমি!

কিন্তু,—কিন্তু আমি যে সকলের কাছে পরাজিত; নিজের উপরে যে আর নিজে বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছি না!

১২.১.১৫।—প্রাতঃকালটা গল্পে যায়, দুপুরটা আফিসে, রাত্রি বিশ্রামে। কাজ তো কিছুই হইতেছে না।

ভিতর হতে কেবলই ধিক্কার উঠিতেছে, কিছুই হলো না, কিছুই না!

এ কে আমার মন-মাঝে, যার কাছে আমার আজীবন বিচার হইতেছে? আমি যেন কাজ করিতেছি, আর একজন তার বিচার করিতেছে। সেই যেন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। কিন্তু তা যে সব সময় ঠিক পথ, তাও তো দেখিতেছি না। এই কি বেদান্তের অবিনশ্বর 'আত্মা'? তাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? জীবন ভরিয়াই তো এর পরিবর্ত্তন—এর মতের তো কোনও স্থিরতা নাই। বাল্যে এর চোখে যা ভাল ছিল, এখন তা নিতান্ত মন্দ। আর যে দিন শরীর খারাপ হয়, সে দিন এরও মেজাজ যেন কেমন গরম হইয়া উঠে, কোন কথাই যেন তার কানে পৌঁছায় না। না, এ কি কেবল আগাগোড়া বিচার করিয়াই যায়, উপদেশ দেয় না? আর এ কি এক? মনের ভিতর স্তরে স্তরে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মার অবস্থান দেখিতেছি।

কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না,—এই জীবন-প্রহেলিকা। ভগবান-দর্শন, আত্মা-দর্শন—এ যেন ভয়ানক জটিল কঠিন mathematical problem; মনে হয়, আগাগোড়াই ভগবান ঠিক করিয়া আছেন, নিতান্ত কঠোর-ব্রত দুচার জন ছাড়া আর কারো কাছে তিনি দর্শন দিবেনই না। কেন এমন ব্যবস্থা? অন্য সকলে এমন কি দোষ করিল?

প্রহেলিকাই বটে,—এই জীবন। যারা জীবনের উদ্দেশ্যের কথা বলে, তারা ভ্রান্ত। জীবনই বা কি, তার উদ্দেশ্যই কি? নদী-জীবনের, বৃক্ষ-জীবনের কি উদ্দেশ্য? যে জীবনের আদি অন্ত কিছুই বুঝি না, তার আবার উদ্দেশ্য! সকলেরই অন্ত যখন মৃত্যুতে, তখন জীবনের আবার একটা কি উদ্দেশ্য হইবে? পশু, পক্ষী, মানুষ—সবই এক বিবর্ত্তন-ক্রিয়ার ফল; একই রূপে বাড়িতেছে, এক মৃত্যুর ছায়া সকলেরই উপর ছড়াইয়া আছে। কিসের উদ্দেশ্য, কিসের আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম?

কিন্তু এ উদাস ভাব পোষণ করিয়াও যে শান্তি পাইতেছি না। একটা

কিছু করিয়া যাও—তা হলেই বুঝি আত্মা চরিতার্থ হইবে, তা হলেই বোধ হয় প্রাণে তৃপ্তির ভাব আসিবে। আসিবে কি? নেহাৎ সাধারণ লোকের মত হইয়া চলিতে ইচ্ছা করে না। এতকাল ধরিয়া, এত আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া নিতান্ত মু···র মত মরিতে প্রাণ চায় না।

১৫.১.১৫।—বাহির-বাড়ীতে শ······ও সু······পড়িতেছে, হেম······ মাষ্টারের কাছে পড়িতেছে। আমি ভিতর-বাড়ীতে শয়ন-গৃহে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের ‘ছিন্ন-পত্র’ পড়িতেছি। সৌ······ও সু······নিদ্রিত। বেশ যেন একটা নিস্তব্ধতার হিল্লোল ধীরে ধীরে মনে প্রবেশ করিয়া তাকে শান্তির ভিতর ডুবাইয়া দিতেছে।

কয়েক বছর হ’তেই দেখিতে পাইতেছি, নির্জ্জন-জীবন ক্রমে ক্রমেই আমার মিঠা লাগিতেছে, বিশেষতঃ তার স্মৃতি। আজ তো একটু বেশীই ভাল লাগিতেছে—রবীন্দ্রনাথের বইখানা যে এই নির্জ্জনতার গুণগানেই পরিপূর্ণ।

যখন স্কুল-কলেজে পড়িতাম, তখন মনো······র অনুকরণে কতদিন একাকী জনশূন্য নদীতীরে বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা-সময় উত্তীর্ণ করিয়াছি, কিন্তু তখন একটুকও ভাল লাগে নাই, পাঁচ সাত মিনিট মধ্যেই কেমন সঙ্গী-লাভের আকাঙ্ক্ষায় মন হাঁপাইয়া উঠিত। এখনো যে নির্জ্জনতা সব সময়ই খুব ভাল লাগে, তা বলিতে পারি না। তবে ইহা ঠিক, আমার জীবনের মধ্যে সুখ-চিহ্ন ধারণ করিয়া যে কয়েকটা দিন বা মুহূর্ত্ত আমার স্মৃতি-পটে জাগিয়া উঠে, তাহা প্রায়ই নির্জ্জনতার সঙ্গে জড়িত।

সেট······র কাজে আসার পর হতে আমাকে অনেকে সময়েই একাকী কাটাইতে হইয়াছে। কত সন্ধ্যায় আমি একাকী জনশূন্য নদীতীরে বেড়াইয়া বেড়াইয়াছি, নদীর ধারে উন্মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া আসন্ন ঝড় ও

ঘনমেঘাবৃত আকাশের লীলা দর্শন করিয়াছি। তখন যে খুবই ভাল লাগিয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু সে-সকল দিনের জড়িত স্মৃতিগুলি বড়ই মিষ্টি।

যতই দিন যাইতেছে, ততই মনে হইতেছে, বড় বেশী কথা বলিয়া শক্তির অপচয় করিতেছি। বেশী কথা বলিলে, এখন অনেক সময় মনে হয়, যেন নিতান্ত একটা গর্হিত কাজ করিলাম, কিন্তু কি যে বিশ্রী অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কথা না বলিয়াও থাকিতে পারি না। এ কু-অভ্যাস কি যাইবার নয়ই ?

হৃদয় ভরিয়া সর্ব্বক্ষণই অনুতাপের দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইতেছে, কিছুই করা হইল না—নিতান্ত ব্যর্থ জীবন! আর ক'দিন; তার পরেই তো মৃত্যু। আর মাস কয়েক, তার পরেই তো চল্লিশ বছর পূর্ণ হইবে। এ বয়সের ভিতর কত লোক কত কাজ করিয়া গিয়াছে, আমি তো কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। নিস্ফল জীবন! যে কিছু করিতে চায়, সে যেন সর্ব্বস্ব-পণ হইয়া তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া যায়; তা না হ'লে, তাকে অনুতাপে জ্বলিতেই হইবে।

পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত পাঠে গিয়াছে। তারপর, চাকরীর চেষ্টা; তারপর, সামান্য একখানা গ্রন্থ শেষ ও অন্যখানা আরম্ভ—তাই কি আমার মনের মতন,—এই তো আমার জীবন। কিছুই না!

এখনও সময় আছে। চল্লিশ হতে পঞ্চাশ—এ-দশ বছরের মধ্যে অতীত জীবনের ভুল পূরণ করিয়া নাও।

নির্জ্জনতার উপাসক হও; অন্য কিছুর দিকে না চাহিয়া নিজ অন্তরের মধ্যে, নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজের ভিতর ডুবিয়া যাও; আদর্শত্রয়ের অনুসন্ধানে মজিয়া থাক।

১৯·১·১৫। অনেকদিন হতেই মাঝে মাঝে মনে একটা সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিতেছে,—স্ত্রীপুত্রদের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া, অন্য কোথাও যাইয়া প্রতি বছরের কতকটা সময় একাকী কাটাই। খাওয়া দাওয়ার জন্য বিশেষ কোনও চিন্তা থাকিবে না। সংসার হতে নির্লিপ্ত হইয়া, কয়েকটা দিন বাস করিব; মনের মতন বই পড়িব, লিখিব, আর প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে মনোমত দু'একটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি, নির্জ্জনতার ভিতরই আমার অন্তর-দৃষ্টি খোলে ভাল; তখন আমার মানস-পটে যে সব চিত্র আঁকিয়া উঠে, অন্য সময়ে যেন তেমন হয় না। যে সময় 'ছোট গল্প' রচিত হয়, সে সময় রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই নৌকায় পদ্মাবক্ষে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটাইতেন। তাই মনে হয়, সে-সব এমন গভীর ও সুন্দর। আমার বর্ত্তমান মনের অবস্থায় নিজ-গৃহের হট্টগোল, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা, হিজির বিজির কিচির মিচির, যা লইয়া ধরিতে গেলে আমাদের জীবন,—ভাল লাগে না, অথচ একাকী চুপ্ করিয়া যে দিন কাটাইব, তাও যেন পারি না।

১৯১১ সনে সেট···র কার্য্যোপলক্ষে আমি 'চিথলিয়া' নামে মেঘনার চরের ভিতর একটা গ্রাম্য হাটের উপর দিন দশেকের জন্য তাঁবুতে বাস করিয়াছিলাম। সঙ্গে চাকর ও ছোট ছেলে একটী ছিল, অবশ্য আফিসের লোকজনও ছিল। সময় মত সরকারী কাজ সারিয়া, আমি একাকী দিবসের অন্য সময় কাটাইতাম। কা'রও সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই বড় একটা কথা বলিতাম না। মেঘনার মাঝে চর পড়ায় সেখানে নদীটী ছোট হইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া, অপর পারে চরের দিকে সুদূর আকাশ-প্রান্তে অস্তগামী সূর্য্যের

সঙ্গে দেখা হইত। নদীর পারে ছোট ছোট শাক সব্জীর ক্ষেত, তার ভিতর দিয়া ছোট পথটী দিয়া গ্রামের মেয়েরা সন্ধ্যায় জল লইয়া যাইত। চারিদিক কেমন ধীরে ধীরে শান্ত নির্জ্জন ভাব ধারণ করিত। আমি একাকী নদীতীরে বেড়াইয়া বেড়াইতাম, বেশ লাগিত। সে ক'টা দিন, আমি যেমন কাটাইয়াছি, এমন সুখের জীবন যেন আর বড় কাটাই নাই।

এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, ঠিকভাবে শিক্ষিত হই নাই। পূর্ব্বাপর জন-কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়া শুধু হৈ চৈ করিবার অভ্যাসই শিক্ষা করা গিয়াছে। যে যত চীৎকার করিতে পারে, যে যত গোলমাল করিতে পারে, যে যত লোকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করিয়া চলিতে পারে, সেই তত বাহাদুর, সেই তো লোক-চক্ষে মানুষ। এ-ভাবে, বাহাদুরী নেওয়া যায় সত্য, অর্থ-উপার্জ্জনেরও ইহাই প্রশস্ত পরিচিত পথ—কিন্তু প্রকৃত সুখ-পথ এ নয়। সুখ, অন্ততঃ আমার পক্ষে, নির্জ্জনতার ভিতর বাস করিতেছে। আমার প্রাণ-প্রিয়া হাটের ভিতর আমায় দেখা দিবে না।

এ-পর্য্যন্ত, প্রচলিত শিক্ষা-মতে যদি লোকের কাছে বাহাদুরী দেখাতে না পারিয়াছি, কারো পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি, তবে মহা দুঃখে ক্ষোভে প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এতদিন পরে প্রাণে যেন এ-বিষয়ে একটা শান্তি আসিতেছে। কারো সঙ্গে তর্কবিতর্কে নাই বা পারিলাম, পিছনেই না হয় পড়িয়া রহিলাম, নাই বা চিনিল কেউ আমায়, নাই সংবাদ নিল—তাতে তেমন দুঃখ আর নাই। প্রকাণ্ড সংসার—আমার মত কত লক্ষ লক্ষ লোকের স্থান পড়িয়া রহিয়াছে; যদি কেউ অন্যায় রূপে আগে যায়, তো যাক্। আমি শুধু নিজেকে লইয়াই সুখী হইব। আর যদি নাই বা সুখী হইলাম, না হইলাম। আমার প্রাণ যা চাহিতেছে,

তার তো অনুসরণ করা গেল। ক'দিনের বা এ জীবন? আমি নির্জ্জনতাকেই বরণ করিব। নির্জ্জনে কত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যাইতেছে; আমিও না হয় মনের মতন অন্তর-শোভায় ফুটিয়া উঠিয়া তাদের মত কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া অলক্ষিতে ঝরিয়া পড়িয়া যাইব।

২১.১.১৫। কোন দিনই বেশী লোকের সঙ্গে আমি মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারি না। অনেকটা দেহের ধর্ম্ম, অনেকটা কারণ, বাল্যকাল হতেই আমাদের অন্যের সঙ্গে তেমন মিশিতে দেওয়া হয় নাই। আমরা যেন নিতান্ত কচি ছেলে, নিতান্তই ক্ষুদ্র, অন্য কারো সঙ্গে মিশিয়া বুঝি বা নষ্ট হইয়া যাইব—এভাবের আবহাওয়ার ভিতরই আমরা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছি। ফল দাঁড়াইয়াছে, এখন লোক দেখিলেই দূরে সরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

সব জিনিষেরই একটা ভালর দিক আছে। উপরোক্ত কারণে পরিচিতের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায় নাই, কিন্তু যাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ হইয়াছে, তাদের মধ্যে অনেকে চিরকালের জন্য আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া আছেন—ব্যাপকতার দিকে সঙ্কুচিত হইয়া, গভীরতার দিকে প্রাণের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতায় যখন মেসে ছিলাম, তখনও আমাকে কেহ মানুষের ভিতর ধরিত না। বয়সে ছোট ছিলাম সত্য, তাও লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম, আমার সহাধ্যায়ী বা সমবয়সীরা লোকজন হতে যে প্রকার দৃষ্টি, সম্মান obedience and attention আদায় করিতে পারিত, আমি তার কিছুই পারিতাম না। চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাতে সফলকাম হইতাম না বলিয়া মনে বড়ই ক্ষোভ হইত।

এমন আমি, গ্রহের ফেরে উদরান্নের সংস্থানের চেষ্টায় এমন একটা

ব্যবসায়ের সঙ্গে আসিয়া লিপ্ত হইলাম, পরকে সরাইয়া ঠকাইয়া তার মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিয়া নিজ স্বার্থসাধনই যার প্রধান লক্ষ্য ; বাক্‌চাতুরী, ধূর্ত্তামি যার প্রধান যন্ত্র। এ-সব আমার সহ্য হইল না, তাই সে ব্যবসার সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইল।

তারপর হতে বর্ত্তমান কাজেই নিযুক্ত আছি। এ-কাজ অনেকটা আমি পারি ভাল, কিন্তু দেখিলাম সততা বলিয়া যে একটা জিনিষের আমরা বড়ই তারিফ করিয়া বেড়াই, এক্ষেত্রে বা অন্য কোন্ ক্ষেত্রেই কোনও মূল্য নাই উহার, শুধু ছেলে-ভুলানো ছড়ার মত অর্থশূন্য একটা কিছু,—দার্শনিক বা কবির লেখায় ছাড়া, সংসারে এর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সংসারে যখন লড়াই করিয়া না চলিতে পারিলে অন্ন জুটিবেই না, তখন যেমন করিয়া হোক্, পরের গায়ে বা নিজের গায়ে কাদা ধূলা মাখিয়াই হোক্, সকলের আগে যাওয়াই কাজ, সে যুদ্ধে মজিয়া থাকিতেই হইবে,—সংসারে যে জয়ী, সেই তো সৎ, মহৎ। জীবনটা বেশীর ভাগ লোকের পক্ষেই কাব্যের টুক্‌রা নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত কেবল জ্যোৎস্না-যামিনী, কোকিল-কূজন, বসন্ত, বকুলের কারবার নয়—ইহা একটা ভীষণ-ভয়াবহ ব্যাপার, কাব্যের সঙ্গে সম্পর্ক যার নিতান্তই কম। যে সব নীতি moralityর আমরা গুণ গাহিয়া বেড়াই, প্রকৃত জীবনে তার কয়টী খাটাইয়া লোক বড় হইতে পারিয়াছে? ও-সব তো শুধু কথার প্যাঁচ, বাক্‌চাতুরী। দুদিন পেটে ভাত না পড়িলে বা দুটো রুলের গুঁতোয় কোথায় যায় উড়িয়া!...থাক্, সে সব এখন।

এ-কাজে আসিয়াও অনুকরণ দোষবশতঃ অনেক সময় গায়ে পড়িয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ কাজে যৎসামান্য একটু মান-মর্য্যাদা আসিয়াছে। তার উপর ভর করিয়া, অনেক সময় নিজেকে অন্যের কাছে লইয়া হাজির করিয়াছি এবং কিছু ফল

হইল না দেখিয়া অবশেষে মনে মনে অপমানিত হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিয়াছি।

এখন—সব, সব শান্তি। শান্তি? এই চল্লিশ বছরের সীমানায় দাঁড়াইয়া মনকে বলিতেছি, কাজ নাই তোমার মান-মর্য্যাদায়, বাক্-চাতুরীতে, কাজ নাই পরের সঙ্গে ধাকাধাক্কি করিয়া আগে যাওয়ার চেষ্টায়। মনের যে দিকে স্বাভাবিক গতি, তাকে সেদিকেই অগ্রসর হতে দাও; যশ-মান, আসে তো আসুক; না আসে, না আসুক। দশটা বিশটা বা শ' কয়েক লোক তোমার নাম করিবে, তাতে তোমার কি লাভ, না করিলেই বা কি ক্ষতি? তোমার অন্তরস্থ আত্মা, সে তো লোকের হাটে কেনা-বেচার জিনিষ নয়। তাকে লোকের জল্পনা-কল্পনার বিষয়ীভূত হতে দেখিলেও যেন তার মানের গায়ে আঘাত পড়ে। যদি ভাগ্যগুণে, সাধনার ফলে, তোমার ভিতরের সেই আত্ম-দেব জাগ্রত হইয়া থাকেন, তা হলে তাঁর দিকে চাহিয়া, তাঁকে লইয়াই তুমি সুখে তন্ময় হইয়া থাক, অন্য কিছুর দরকার নাই। যে আলোকে চিত্ত আলো করিয়া, যোগী-ঋষি হিমালয়ের নির্জ্জন-গহ্বরে একাকী বৎসরের পর বৎসর কাটায়, সে আলোর যদি ক্ষীণ কণাটীও তোমার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে,—তা নিয়েই তুমি সুখী হও। নিতান্ত সাধারণ লোকের মত হইও না।

২২.১.১৫। বহু বৎসর পরে, একজন লোক দেখা দেন, যাঁর মধ্য দিয়া নূতন একটী ভাবের বিকাশ হইয়া সমাজে ছাড়াইয়া পড়ে। তিনিই কবি, দার্শনিক, শিক্ষাগুরু।

নিজের আত্মোত্থিত বাণী শুনিয়া পূর্ব্বাপর চলিতে যে সাহসী, সেই মনুষ্য-রাজ। তার কাছে জগৎ মাথা নত করিয়া চলিবেই।

কি সাহিত্যে কি অন্যক্ষেত্রে পূর্ব্বাপর কত মিথ্যার প্রচার হইতেছে। সকলেই আপনাকে অল্প-বিস্তর গোপন করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। লেখায় যে লোকটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, প্রকৃত মানুষটীর সঙ্গে তার কত প্রভেদ! তাই তো লোকচিত্তের উপর লেখার তেমন প্রভাব নাই।

মনের প্রকৃত কথা খুলিয়া লিখিলে, তার শক্তিও কম দাঁড়ায় না। সত্যের একটা শক্তি আছে, যার স্বরূপ অনেকটা প্রতিভার মত। যাঁর প্রতিভা আছে, তিনি তাঁর চর্চ্চা করুন। আর যাঁদের ওসব নাই, তাঁদের উচিত, মনের কথা খুলিয়া বলা; তাও একটা কম সাহস ও শক্তির কাজ নয় এবং তার প্রভাবও নেহাৎ কম নয়।

২৫.১.১৫।—ধীর, স্থির, অল্পভাষী, কার্য্যতৎপর পুরুষ; জ্ঞানী, জ্ঞানচর্চ্চায় নিমগ্ন-জীবন; সমস্ত কুসংস্কারের জাল যিনি ছিন্ন করিয়াছেন; যিনি ভাবুক, সরল, সাহসী, মৃত্যুকে ভয় করেন না; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যিনি মিছা-দয়ায় গলিয়া যান না; যাঁর কথা হতে, কার্য্য হতে, মুখ হতে এক পবিত্রতার, দৃঢ়চিত্ততার ভাব সর্ব্বক্ষণ ঝরিয়া পড়িতেছে। যিনি বিপদে বন্ধু, বিপদ কালে যখন সমস্ত দেশ নিরাশায় নিমজ্জিত, তখন যাঁর হৃদয় নিঃসৃত আশা ও উৎসাহের বাক্যে সকলের প্রাণ সাহস ও বীর্য্যে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। যিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপাসক, নিজ চিত্ত-বিভোর। চিত্ত যাঁর মহৎ ও উদার, জীবনাদর্শ যাঁর সৎ ও উচ্চ এবং লক্ষ্যলাভের জন্য যিনি সর্ব্বস্বপণ; কোনও বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ন'ন, সারাদিন দেশের কাজে, নিজের কাজে লিপ্ত থাকিয়া যিনি সন্ধ্যায় নিভৃত-নিলয়ে জ্ঞানদেবীর মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন; দেশকে যিনি প্রাণ-প্রিয় মনে করেন, যিনি নিজ অন্তরস্থিত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া দেশের কাজে নিযুক্ত

করিতে সচেষ্ট—সেই মহাযোগী, নিরহঙ্কারী, দৃঢ়চিত্ত, উৎসাহ-উদ্যমপূর্ণ, জ্ঞানসেবক লেখক আমার আরাধ্য চিত্র।

লেখক হতে পারা যায় কি না যায়, এই প্রকার দার্শনিক philosophera মত জীবন-যাপন করা একেবারে অসম্ভব বা অসাধ্য নয়।

Philosopher দার্শনিক! কি সুন্দর তোমার জীবন! সকল দেশের সকল কালের পথ-প্রদর্শক, শিক্ষাগুরু! হিংসা-বিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জরিত, অত্যাচার-প্রপীড়িত, হাহাকার-দুঃখ-বিলাপে-পরিপূর্ণ এই বিপুল ধরার মাঝে তুমিই একমাত্র মহাপুরুষ, যার চিত্ত শান্তির সুস্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত। এই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ জগৎ-সমুদ্রের ভিতর জ্ঞানালোকদীপ্ত তোমারই হৃদয়-রূপ দিব্য-গৃহে ঝঞ্ঝাবাতের চিহ্নটী মাত্র নাই। আঁধারের মধ্যে, একমাত্র তুমিই আলো ধরিয়া আছ। তোমার দিকে চাহিয়াই পূর্ব্বাপর দিক্-ভ্রষ্ট মানুষ গন্তব্য-পথ নির্ণয় করিয়া নিতেছে। তুমিই জীবন্ত-দেবতা, প্রকৃত মানুষ। চিরকাল তোমার চরণে লোকে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য হইতেছে।

তোমার জীবন! আমি কেমন করিয়া তা' আমার জীবনে ফুটাইয়া তুলিব?

৩১.১.১৫।—অনেকদিন হতে Benjamin Kidda Social Evolutiona নাম শুনিয়া আসিতেছি। এতদিন পরে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হইল। বিশেষ ভাল লাগিল না।

চরাচর ইংরাজ-লেখকদের বই যেমন, এও সেই শ্রেণীর। চিন্তাশীল লেখক বলিয়া এঁর নাম, কিন্তু চিন্তাশীলতার লক্ষণ তো তেমন কিছু দেখিলাম না। কোনও গভীর শ্রেষ্ঠ-ভাবের আস্বাদ, ইংরাজী বই হতে পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। নিটসে সত্যই বলিয়াছেন, ইংরাজ-লেখক

মাঝারি-গোছের mediocre, সাধারণ সংসারীর উপযোগী ভাব লইয়াই নাড়াচাড়া করেন, গভীর ভাবের তাঁরা সংবাদ কিছু কমই রাখেন। তাঁর মতে দর্শন-শাস্ত্রে, মানব-চিন্তার বিকাশ যাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়, ভারতবাসীর স্থান সর্ব্বোচ্চে এবং ইংরাজের সর্ব্বনিম্নে। ইংরাজ-লেখকের বলিবার নিয়মও এমন, যে তাঁর হাতে তেমন গভীর জিনিষও যেন নিতান্ত সাধারণ mediocre রূপ ধারণ করে।

একটা কথা খাঁটী বলিয়া বোধ হইল। ফরাসী ও ইংরাজ জাতির শতাব্দীব্যাপী সংর্ঘষের শেষে, ইংরাজের কাছে ফরাসীর পরাস্তের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া Kidd বলিয়াছেন, ফরাসীরা intellectual side জ্ঞানের দিক হতে ইংরাজ অপেক্ষা হয়তো বড়, কিন্তু জাতির উন্নতির পক্ষে, জ্ঞানই একমাত্র উপকরণ নয়। তা' অপেক্ষাও, প্রভূত মানসিক শক্তি, সাহসিকতা, কার্য্যসাধনে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনোনিবেশের ক্ষমতা এবং একাগ্রচিত্ততা- এ সকল গুণের উৎকর্ষ সাধনই এক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজন। এ-সব গুণের সাহায্যেই যখন যে কর্ত্তব্য সম্মুখে পড়িয়াছে, তা'ই সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে যাইয়া ইংরাজ ভারতে এমন বিশাল রাজত্ব-স্থাপনে সক্ষম হইয়াছে ; ভবিষ্যতের চাকচিক্যময় কোনও আদর্শ-চিত্রের দিকে চাহিয়া সে তার কর্ত্তব্য-পথ নির্ণয় করে নাই। কথাগুলি বড়ই ঠিক। আমরাও তো জ্ঞানের দিক হতে দেখিতে গেলে কোন জাতি অপেক্ষা তেমন নিকৃষ্ট নই, কিন্তু যে গুণে মানুষ মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয়,—বল, দৃঢ়তা, একাগ্রচিত্ততা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বদেশহিতৈষণা, শাসন পরিচালনক্ষমতা—সে সকল গুণ আমাদের মধ্যে কোথায় ?

কয়েক দিন হইল, শ্রীমতী কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' দ্বিতীয়

বার পড়িয়াছি। আমাদের কলেজের দিনে বইখানা যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন একে লইয়া বেশ একটু sensation চাঞ্চল্য জড়াইয়া উঠিয়াছিল।

সুন্দর, মধুর কবিতার সমষ্টি! রবীন্দ্রনাথের লেখায় যেমন লিখিবার নূতন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, শ্রীমতী কামিনী রায়ের লেখাতেও তদ্রূপ। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ও নবীনচন্দ্রের পুরানো নিয়ম হ'তে, এঁর লিখিবার ভঙ্গী এবং বলিবার বিষয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক, ও নূতন, এবং ঠিক ঠিক বলিতে গেলে, কমনীয়। পড়িতে পড়িতে ভাব ও ভাষার মোহনত্বে মুগ্ধ হতে হয়; তবে, খুব যে গভীর ভাবাত্মক, তা বলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষায় গীতিকবিতায় রবীন্দ্রনাথের পরেই কামিনী রায়ের স্থান, কিন্তু অনেকটা নীচে।

কয়েকটী লাইন এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—

(১) শৈশবে দোঁহারে লয়ে বেঁধে দিলে হাতে হাতে
বাঁধিতে নারিল তারা হৃদয় হৃদয় সাথে
জ্ঞানের আলোকে নাথ, তুমি হলে অগ্রসর
অজ্ঞানের অন্ধকারে আমি তো বেঁধেছি ঘর!
শৈশব গিয়েছে চলি, কৈশোর পেয়েছে লয়,
কবে পরিণয় হলো, কবে হলো পরিচয়!
তোমাতে আমাতে মিল, আলোতে আঁধারে যত
তাইতো মলিন মুখে ভ্রমি দুঃখে অবিরত।

* * * *

কোন্ দূর আকরের সন্ধান পেয়েছ যেন,
আমার ঐশ্বর্য্য যাহা, তুচ্ছ তারে কর হেন!

কি দৃষ্টি সে লভিয়াছ, পেয়েছ সে কি রতন
উপেক্ষা করিছ যে এ আমাদের ধন জন ?
কতবার সাধ যায়, নমি তব পদতলে
শিখি সেই দিব্য মন্ত্র, যাহার মোহন বলে
ধনী হতে ধনী তুমি, যাহার অভাবে মম
প্রভাহীন রূপরাশি, আঁখি দুটী অন্ধসম।
বৃথা আশা, আর দাসী চরণকণ্টক হয়ে,
চাহে না ভ্রমিতে সাথে ; থাক সে আঁধার লয়ে,
সাঁতারিতে নারি সাথে, কেন আপনার ভারে
ডুবাইব, প্রাণাধিক, তোমারে ও পাথারে। (নিরাশা)

কাকে উদ্দেশ করিয়া এ-কবিতা লিখিত ?

বাঙ্গালী স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ও মূর্খা অথচ যৎসামান্য আলোকপ্রাপ্তা বাঙ্গালী স্ত্রীর হৃদয় মথিত করিয়া অহরহঃ নীরবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে যে শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইতেছে, কেমন মর্ম্মস্পর্শী সরল করুণ ভাষায় তা বিবৃত হইয়াছে ! সত্যই, বাঙ্গালী স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ আলো ও আঁধারের সম্মিলন স্বরূপ। পাশ্চাত্যদেশীয় বিবাহে, দুটী আলোর ধারা দুদিক হতে আসিয়া একত্রীভূত হয়। আমাদের আলোটীও আঁধারের সঙ্গে মিশিয়া অনেক সময় তার ভিতর নিবিয়া যায়।

(২) যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।

বেশ কথাটী।

*　　*　　*　　*

কবিবর রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'ছিন্নপত্র' শেষ করা গেল। চমৎকার

বই, আমার মনের মত বই। অনেকদিন পরে যেন একখানা বইর মত বই পড়া গেল। 'ছিন্নপত্র' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে বন্ধু-বান্ধবদের *কাছে যে-সব পত্র লিখিতেন, তার ভিতর হতে সাধারণ্যে প্রকাশোপযোগী* কতক অংশ লইয়া এই গ্রন্থ রচিত। যদি ঠিকই তাই হয়, তা হলে বলিতে হইবে, সাধারণ চিঠি অপেক্ষা এগুলি অনেক বিষয়েই দুর্ব্বোধ্য—যে সে লোকের বুঝিবার কথা নয়, বলিবার বিষয়ও ভিন্ন রকমের। লেখাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতে এ-সকল কোন দিন সাধারণ লোকের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইবে, এ কথা মনে পোষণ করিয়াই যেন লিখিতে বসিয়াছিলেন। এ সকল চিঠির কি এক এক কপি নকল তিনি তাঁর কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন, না যাঁদের কাছে লিখিয়াছিলেন, তাঁদের হতে যোগাড় করা হইয়াছে? কেমন করিয়াই তা না হলে কোথা হতে এ সকল জুটিল? আর কেমন করিয়াই বা কবিবর নিজে তা ছাপাইলেন? এ সকল ভাবিয়া মনে হয়, চিঠিগুলিতে যা লেখা হইয়াছে, তা সব সময় লেখকের স্বতোত্থিত প্রাণের কথা নয়। লোক দেখাইবার জন্য, লোকের নিকট বাহাদুরী নেবার জন্য, যেন অনেক কথা বলা হইয়াছে। ভাষাও যেন বড় বেশী মাজা ঘষা, পরিমার্জ্জিত, ও অনেকটা artificiality কৃত্রিমতার গন্ধ যেন এদের সহিত জড়িত, সাধারণ চিঠির মত কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ভাল করিয়া চিনেন অথবা তাঁকে তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের সংশ্রবে এবং লেখা ও কবিতার মাঝ দিয়া চিনিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁদের কাছে কিন্তু এ সকল লেখা তেমন artificial কৃত্রিম বলিয়া বোধ নাও হতে পারে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথ সকল বিষয়েই *এক নূতন ধরণের অভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সামগ্রী। আমাদের দেশের অন্যান্য* কবির সঙ্গে যেমন তাঁর কবিতার কোন প্রকারে তুলনা হয় না, ভাব, ভাষা সবই কেমন যেন নূতন ধরণের, সেই প্রকার রবীন্দ্রনাথ লোকটীও

অন্য লোক হতে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। চেহারা তো অতি সুন্দর, দিব্য কমনীয় কান্তি ; রমণীর মত সুকুমার, তারই মত মিহি মিষ্টি স্বর । লোক তিনি দময়েই :র থাকেন, সাধারণ লোকের মিলেন মিশেন কম, নিতান্ত কম। বাল্যকালাবধি তিনি নির্জ্জনতার উপাসক। শুনিয়াছি, এমন দিনও গিয়াছে, যখন একাদিক্রমে তিনি অনেক কাল পর্য্যন্ত কা'রও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া কাটাইয়াছেন। নিজের ভাবনাতেই তিনি সর্ব্বক্ষণ বিভোর, এ সংসারে থাকিয়াও সংসারের উপরের কোন্ মধুর হিল্লোলের ভিতর যেন তিনি ডুবিয়া আছেন। খাল বিল, নদ নদী, বৃক্ষ, ফল, পুষ্প, প্রকৃতির নানা মূর্ত্তি যেন তাঁরই জীবনসঙ্গিনীর রূপ-বিশেষ। প্রকৃতির সহিত তিনি যেন কি এক নিগূঢ় সম্পর্কে গ্রথিত, তার সৌন্দর্য্যে তিনি তন্ময়।

শিলাইদহ ও তার নিকটবর্ত্তী পল্লীসকলের বন্ধনবিমুক্ত প্রকৃতিসুন্দরীর সৌন্দর্য্য তিনি কি অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভাবে না ব্যক্ত করিয়াছেন! তাঁর তুলিকায়, বর্ষাসমাগমে খরস্রোতা যৌবন-চঞ্চলা পদ্মার ভীষণ-মধুর কান্তির চিত্র কেমন সুন্দরই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! আবার শীত-সমাগমে সেই পদ্মার শীর্ণকায়া ম্লানমূর্ত্তি, তার বর্ণনাই বা কেমন মধুর! পদ্মার মাহাত্ম্যের গানে তাঁর গ্রন্থ পূর্ণ। গ্রাম্য-জীবনের ছোট-খাট সুখ-দুঃখের কথাগুলিই বা কেমন প্রাণ দিয়া অপূর্ব্ব ভাষায় লিখিত! সাধারণ সকল জিনিষ,—যা আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি, কেমন তাঁর কলমের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

'ছিন্নপত্র' পড়িতে পড়িতে আমার অনেকদিন পরে আবার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। রবীন্দ্রনাথের লেখায় যেন কতদিনের পুরানো কথা মনে জাগিয়া উঠিল। বাল্যকাল হতে যৌবনের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের তেমন কোন সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু তার পর হতে A. C. Benson র লেখার গুণে ও

কার্য্যোপলক্ষে জন-বিরল স্থানে বাস হেতু তার প্রতি আমার কেমন একটু টান্ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় প্রকৃতি-চর্চ্চার Nature studyর কোনও প্রকার বন্দোবস্তই নাই। গ্রন্থগুলিও অধিকাংশই বিদেশী ভাব, বিষয়, ও স্থান লইয়া লিখিত। তাই, এমন নদীবহুল, শস্যশ্যামল, ফলফুল-শোভিত, সুশ্রী-বিহঙ্গম-পরিপূর্ণ, বন-প্রান্তর-খচিত দেশে বাস করিয়াও আমরা প্রকৃতির দিকে কোনও প্রকারে আকৃষ্ট হই না। আমাদের চোখের সুমুখেই যে প্রত্যহ নানাবিধ সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতে করিতে অত্যুজ্জ্বল তেজোময় সূর্য্য ও বিমল চন্দ্র উদয় হইতেছে ও অস্ত যাইতেছে, আকাশে অসংখ্য তারার দল ফুটিয়া উঠিতেছে ও ডুবিয়া যাইতেছে, ষড়ঋতু বনদেবীকে নানা সময়ে নানাভাবে সাজাইয়া একে একে অদর্শন হইতেছে—এ সকল দিকে আমাদের একেবারেই দৃষ্টি আকর্ষণ হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও তার সৌন্দর্য্য-রসে প্রাণকে সিক্ত ও সঞ্জীবিত করা, মানবজীবনের একটী প্রধান সম্পদ ও সুখের আকর। এ-সম্পদ ও সুখ হতে আমরা একপ্রকার বঞ্চিত। যে দেশের সাহিত্য ও কাব্য, তপোবনের পশু, পক্ষী ও বৃক্ষলতার সৌন্দর্য্য-ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ, বনের ভিতর ব্যয়িত-জীবন মুনিঋষিদের পুত-চরিত্রের গুণ-গরিমা বর্ণনে মুখরিত, সে দেশের বালক চারিদিকের প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট! দুঃখের, চিন্তার বিষয় নয় কি? রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থখানি পড়িলে এ সকল ক্ষোভ অনেকটা দূর হয়। বাঙ্গালার প্রকৃতি-সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি ভালবাসায় চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের এই বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইতেছিল, যেন আধুনিক ইউরোপীয় কোনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আস্বাদ পাইতেছি; ভাব, ভাষা, বিষয়, সবই নূতন, সবই আধুনিক, সবই সুন্দর, অথচ আমাদেরই দেশের কথা আমাদেরই বাঙ্গালা

ভাষায় লিখিত। তাঁর কল্যাণে দেশকে যেন আবার অনেকদিন পরে দেখিয়া লইলাম।

চমৎকার বই! যতদিন পড়িতেছিলাম, ততদিন যেন কি এক সুখের কল্পনারাজ্যে বাস করিতেছিলাম। শেষ হতেই মনে হইল, আহা! ফুরাইয়া গেল! বাঙ্গালায় এমন বই তো আর পাইব না।

বইখানা পড়িতে পড়িতে, Amiel's Journalর কথা মনে পড়িতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এমিয়েলের ন্যায় জটিল ধর্ম্মের, নীতির, ও সমাজের প্রশ্নাদি লইয়া জল্পনা কল্পনা করেন নাই। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে লিখিত সাধারণ পত্রে সে সকল বিষয় সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার কোনও সুযোগও তাঁর ঘটিয়াও ওঠে নাই। গ্রন্থখানি তাই তেমন গভীর-ভাবপূর্ণ নয়। তাও 'ছিন্নপত্রের' মাঝে মাঝে জীবন-সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে,—সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী। আর, স্বভাব বর্ণনা! প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ব্যক্ত করিতে, রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ ক'জন?

২.২.১৫।—গত রাত্রিতে হঠাৎ Moral Discourse of Epictetus পড়িবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। চিরটাকালই এমন দেখিতেছি। সারা বছর যেমন একপ্রকার আহার ভাল লাগে না, সেরূপ একপ্রকারের বইও ভাল লাগে না। কখনো দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, কখনো জীবন-চরিত, কখনো উপন্যাস, কাব্য—মনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আহারে রুচি। অনেক দিন হতেই Epictetus কিনিয়াছি, মাঝে কয়েকবার পড়িবার চেষ্টাও করিয়াছি, কিন্তু তেমন ভাল লাগে নাই। বোধ হয়, মনের অবস্থা তেমন উপযোগী ছিল না।

Epictetus ঠিক philosopher ন'ন। আমাদের দেশের চাণক্য প্রভৃতির ন্যায় তিনি নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি stoic

ছিলেন—যারা দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, দারিদ্র্য, মৃত্যু, কিছুকেই ভয় করিত না। রোমানদের ভিতর Cato, Marcus Aurelias, Senecca প্রভৃতি জগৎ-প্রসিদ্ধ বহু লোক এই-মতাবলম্বী ছিলেন। মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও মানসিক বলের এঁরা উৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছে। Stoicরা রোমীয় সমাজের ভিতর মহাশক্তি আনয়ন করিয়াছিল; বোধ হয়, রোমান-চরিত্রের ভিতর যে সকল প্রধান গুণ—দৃঢ়তা, অল্পভাষিতা, কার্য্যতৎপরতা, কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান, সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন ও সৎচিন্তা—গ্রীক্ দার্শনিক Zeno প্রবর্ত্তিত Stoic দর্শন হতেই অনেকটা তারা পাইয়াছিল। যখন এ সকল পুরুষোচিত, বীরোচিত গুণ অন্তর্হিত হইয়া, তার স্থানে পূর্ব্বদেশ-সংশ্রবে-প্রাপ্ত পূর্ব্বদেশ-সুলভ বিলাসিতা, অলসতা, মিছা-দয়া-দৌর্ব্বল্য দেখা দিল, তখন হতে তাদের পতন আরম্ভ হইল।

Epictetusর ভিতর কি যেন একটা rough naked সাদাসিধা খোলামেলা ধরণের শক্তি নিহিত আছে, যে পড়িতে পড়িতে চিত্ত সাহস ও বীর্য্যের ভাবে পূর্ণ না হইয়া যায় না। তাঁর মতে আদর্শ চরিত্রের লোক—Cynic। বাল্যকাল হতে এই cynic কথাটীর সঙ্গে কত বিসদৃশ ভাবই না পোষণ করিয়া আসিয়াছি। Cynicকে আমরা বিশ্বনিন্দুক বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু Epictetus পাঠে সে মত বদলে গেল।

তাঁর মতে Cynicও যা, আমাদের দেশের মুনি-ঋষিও তা—তিনি সমাজের শিক্ষাগুরু। বাসনাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হতে উৎপাটিত করিয়াছেন; ঘৃণা জানেন না, বিদ্বেষ জানেন না, ক্রোধ জানেন না, মিছা দয়াও জানেন না। পুত্রকন্যা, যশ-মান, কোন প্রকার সুখাদ্য—কিছুতেই তিনি আকৃষ্ট ন'ন। সংসারে থাকিয়াও তিনি নির্লিপ্ত, জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত যা প্রয়োজনীয়,—এমন আবাসস্থল, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহারের সামগ্রী ব্যতীত তাঁর আর কিছুই নাই, চা'নও না তিনি।

মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না, কারণ তিনি জানেন, মৃত্যু একদিন আসিবেই। দেশত্যাগী হতেও তাঁর ভয় নাই, কারণ তিনি জানেন, যে এই পৃথিবী হতে অন্য কোথায়ও তিনি স্থানান্তরিত হইবেন না। যেখানে যাইবেন, সেখানেই এমনি সূর্য্য, এমনি চন্দ্র, তারকা পাইবেন ; এমনি মধুর স্বপ্ন উপভোগের সুযোগ, ভগবানের সঙ্গে মিলনের এমনি পন্থা পাইবেন। তিনি জানেন, ভগবান কর্তৃক তিনি এ-জগতে প্রেরিত হইয়াছেন। কেন ? ভ্রান্ত জগৎবাসিদের দেখাইতে, যে তারা যা ভাল মনে করিতেছে, ভাল নয় তা,—মন্দ ; যে পথে তারা চলিতেছে, মৃত্যুর পথ, মোক্ষের নয়।

তাঁর শত্রু নাই। যদি তোমার দিকে এ-হেন মহাপুরুষ কখনো চাহিয়া থাকেন, তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিও। মনে করিও যে, তাঁর ইচ্ছা তুমিও মহৎ হও, বড় হও—তুমি তা হইবেও। তাঁরই তা হলে অনুসরণ কর।

তাঁকে যদি কেহ গর্দ্দভের মত প্রহার করে, তা হলেও তাকে তিনি পিতার মত, ভাইয়ের মত ভালবাসেন। সংসারে ভগবান Jupiter ব্যতীত কারো নিকট তিনি নতশির ন'ন। তিনি আবার কার দ্বারস্থ হইবেন ?

তিনি বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ন'ন। যদি বা কখনো বিবাহ করেন, তা' হলে তাঁর স্ত্রীও তাঁরই মত জীবন যাপন করিবেন। যদি সন্তান-সন্ততি হয়, তারাও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। বিবাহ করার তাঁর কোনও প্রয়োজন নাই। Thebeর বীরবর Epaminendes কোনও সন্তান রাখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁর মত দেশের উপকার কোন্ পিতা করিয়া গিয়াছেন ? তারা হয় তো জন-কয়েক অপদার্থ সন্তানের জন্ম দিয়াছেন মাত্র।

তিনি মানবমণ্ডলীর পিতা। জগতের যত পুরুষ, তাঁর পুত্র; যত স্ত্রীলোক, কন্যা। তিনি সকলের সেবায় যত্নতৎপর, সকলের সুখবিধানের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। যদি কখনো তিনি কাকেও মন্দ বলেন, জানিও তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ; পিতা তিনি—পিতার চক্ষে তার দিকে চাহিয়াই এমন কথা বলেন।

রাজ্যের টেক্স, খাজনা, যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নাই। তাঁর চিন্তার বিষয় মানুষের হৃদয়-রাজ্য—তার সুখ, দুঃখ, শান্তি, মুক্তি।

তাঁর শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ। তিনি যদি যক্ষ্মাগ্রস্ত, কৃশ, দুর্ব্বল হন, তা হলে তাঁর কথার তেমন প্রতিপত্তি হইবে কেমন করিয়া? তিনি সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্য আহার করেন, স্বাস্থ্যপূর্ণ-দেহে জীবন যাপন করেন। তাঁকে দেখিলে পূর্ণস্বাস্থ্যগুণে, পরিচ্ছদ ও দেহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য, লোকে তাঁর প্রতি আপনা হতে আকৃষ্ট হয়। তিনি ভিখারীর বেশে থাকেন না, কারণ ভিক্ষুককে সকলেই ঘৃণা করে।

তাঁর ব্যবহার সুমিষ্ট, বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ। সর্ব্বোপরি নির্ম্মল সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাও তাঁর চিত্ত নির্ম্মল, পবিত্র; কপটতা তাতে নাই। অন্য লোককে তিনি যা করিতে নিষেধ করেন, নিজে তা কখনো করেন না।

সাধারণ রাজা, তাঁর আজ্ঞা যাতে পালিত হয়, সে-জন্য সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের উপর নির্ভর করেন। তাঁর ক্ষমতা, তাঁর বিবেকরূপ উৎস হতে নির্গত। তিনি নির্ম্মলচিত্তে নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, অধিকতর নির্ম্মলচিত্তে নিদ্রোত্থিত হন; তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত ভাবনাই, তিনি নিজেকে দেবতার বন্ধুস্বরূপ, ভগবানের অংশস্বরূপ মনে করিয়া জগতের হিতার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি কেন সাহস করিয়া, তাঁর ভাইকে, সন্তানগণকে প্রয়োজন হলে মন্দ বলিবেন না?

Cynic যিনি, তাঁর হৃদয় সহিষ্ণুতার আধার, প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় যেন

তিনি অনুভবশক্তি-হীন। যার যেমন ইচ্ছা, তাঁর প্রতি ব্যবহার করিতেছে; তিনি নিশ্চিন্ত, নিশ্চল, স্থির। তাঁর হৃদয়ে অনাবিল শান্তি বিরাজ করিতেছে; এমন শান্তি, যে কিছুতেই তা নষ্ট হইবার নয়।

Cynicএর কাছে জাতিভেদ নাই, শত্রু মিত্র নাই; সকলেই তাঁর মিত্র, জগতের সকলেই তাঁর বন্ধু। সমাজের এমন হিতার্থী ও হিতকারী বন্ধু আর নাই। যে সমাজে এমন মহানুভব ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। Cynic নরদেবতা, Superman।

৩.২.১৫।—গুণী লোকের নাম কেমন করিয়া যেন ধীরে ধীরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামে। জীবনের প্রায় অধিকাংশ ভাগই তিনি নিজামের অধীনে প্রফেসারি কাজে হায়দরাবাদে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে বছর-কয়েকের জন্য কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। সেখানে Alchemy শাস্ত্রের চর্চ্চায় তিনি জীবনের শেষ সময়টুকু কাটাইয়া গিয়াছেন।

কয়েক দিন হইল, তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই তাঁর স্তুতিবাদ দেখিতে পাইতেছি। সংসারে বড় লোক দুই শ্রেণীর,—এক শ্রেণী আছেন, যাঁদের বিজয়গাথা সকলের মুখেই প্রচারিত হইতেছে, এঁদের ভিতর কিন্তু খাঁটী বড়লোক Great men কমই; আর একশ্রেণী, যাঁরা একপ্রকার লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজ আদর্শের অনুসরণে জীবন কাটাইয়া চলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যাঁরা তাঁদের সম্পর্কে আসেন, তাঁরাই জানেন কি মহৎ চরিত্রের লোক! অঘোরনাথ শেষোক্ত শ্রেণীর লোক। তিনি সদালাপী, অতিথিপরায়ণ, মহাজ্ঞানী ছিলেন। বোধ হয়, সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর 'বোম্বাই ভ্রমণে' তাঁর আতিথেয়তা ও পারিবারিক জীবনের অতি সুখ্যাতি করিয়াছেন। তাঁরই বিদুষী কন্যা ভাবময়ী

দেশগতপ্রাণা বাগ্মী সুকবি শ্রীমতী সরজিনী নাইডু, অন্যান্য সন্তানও ভাবপ্রাণ জ্ঞানসেবক। জ্ঞানচর্চ্চায়-অতিবাহিত-জীবন, অমায়িক, সরল-প্রকৃতি তাঁর কথা পড়িয়া সে-দিন বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। বেশ একটী লোক চলিয়া গেল!

৪.২.১৫।—গত বছরের অনুকরণে কাল 'বসন্ত-ভ্রমণে' বাহির হইয়াছিলাম। সহরের চারিদিকটা ঘুরিয়া আসা গেল, কিন্তু হৃদয়নন্দন এমন কিছুরই সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।

এবার, বসন্ত আগে না পরে আসিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। তবে, এটা যেন লক্ষ্য করিতেছি, সব গাছেই বসন্ত-প্রভাব প্রতিবছরই একসময়ে দেখা দেয় না। জাম গাছগুলি এবারও দেখিলাম, সর্ব্বাগ্রে শুক্‌নো পাতা ফেলিয়া, নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে কিন্তু রাস্তার ধারের সেই শিশু গাছটী, গত বছর যার কচি কচি নবপল্লবে সাজানো বিচিত্র পরিচ্ছদ দেখিয়া, যথার্থই আমার প্রাণ আনন্দের কম্পন অনুভব করিয়াছিল, সে এখনো তেমন ভাল করিয়া সাজিয়া উঠিতে পারে নাই। পথের পাশের জঙ্গলের ভিতরকার ছোট ছোট গাছগুলি এখনো সব পুরানো পাতা ত্যাগ করে নাই, দেখিতে ভাল লাগিল না; তবে বথৈ গাছ ক'টী কচি কচি ফিকে-সবুজ-পল্লবে বড় সুশ্রী দেখাইতেছে। আমার আফিস হতে আসার রাস্তায়, এমন একটী গাছ আছে; ছোট গাছটী, কিন্তু কেমন সুন্দর দেখাইতেছে!

এবারকার বসন্ত-বনশোভা বুঝি আমার পক্ষে তেমন আনন্দদায়িনী হইবে না। এখনো মাঘ মাস, কিন্তু ইতিমধ্যেই একটু গরম বোধ হইতেছে। বসন্ত বোধ হয় এবার সকালেই আসিবে। সব কাজই

তাড়াতাড়ি সারিতে যাইয়া যে দোষ হয়, এবার বসন্ত-উপলক্ষে প্রকৃতির সাজসজ্জাও বুঝি তাই তেমন মনোমত হইবে না।

কয়েক বছর হতেই আমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি,, ভাটিম ফুলগুলি বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠে। চাঁদ—রে আমাদের বাসারই কাছে, এমন হাজার হাজার গাছে হাজার হাজার ফুল একসঙ্গে ফুটিয়া হাসিতে থাকিত। বেশ দেখিতে লাগিত; বোধ হুইতেছে, এখনো আমার মনের ভিতর তারা হাসিতেছে। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Daffodils কবিতার কথা মনে হইতেছে। কেউ এদের সংবাদ নেয় না, কিন্তু যার এ-সব দিকে দৃষ্টি আছে, সে অবশ্য এরা যে অপরূপ দৃশ্যের রচনা করে, তার গুণগান না করিয়া পারিবে না। কাল বিকালে, বাসায় ফিরিতে দেখিতে পাইলাম, জঙ্গলের পাশে রাস্তার ধারের ভাটিম গাছগুলি বেশ যেন সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, ফুলের কলি আগায় ধরিয়া দিন দিনই তারা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। আর দিন কয়েক, তার পরেই কত সব ফুল একসঙ্গে হাসিয়া উঠিবে—কেমন শাদার বাহার হইবে! তা-দর্শনে আমার চিত্তও কেমন শাদা নির্ম্মল হইয়া উঠিবে! ভাবিতেছি কার জন্য, কি উদ্দেশ্যে, কেন প্রকৃতির এই বাৎসরিক সাজ-সজ্জা? আমিও কি এ মহা-সাজানো ব্যাপারের অন্তর্গত, না, এ-সব হতে ভিন্ন কিছু?

বসন্তকে ঋতুরাজ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে; ঋতুরাজই সে। বর্ত্তমানে একে সম্যকরূপে গ্রহণ করিবার আমাদের তেমন সুযোগ হইয়া উঠে না সত্য, কিন্তু যার অবকাশ এবং দেখিবার চোখ ও ইচ্ছা আছে, তার পক্ষে ইহা মহা-উপভোগের কাল বলিয়াই বিবেচিত হইবে। কি কুশিক্ষাই আমাদের দেওয়া হইতেছে, যে নিজ-দেশের চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বাতাস, আলো, বৃক্ষ-লতা, পতঙ্গ, পাখীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ই প্রায় ঘটিয়া

ওঠে না। পূর্ব্বে এমন অবস্থা ছিল না। তাই তো, সংস্কৃত-সাহিত্যে যেরূপ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক সাহিত্যে তেমন কিছুই দেখা যায় না। তাই, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবির লেখায় শরৎকালের- বর্ণনায় 'কোয়েলের' ডাকের সংবাদ পাওয়া যায়। এমন শিক্ষা কি প্রকৃত শিক্ষা ?

Nature study প্রকৃতি-পাঠ ইংরাজ-বালকের শিক্ষার একটী অঙ্গ। ইহার ফলে, সৌন্দর্য্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, ও তাকে উপভোগ করার শক্তি, উভয়েই বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটী সুখের উপাদানের সৃষ্টি হয়। আমি দেখিতে পাইতেছি, যতই জোর করিয়া মনকে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি করিতে অভ্যাস করানো যায়, ততই যেন সে অন্তর্নিহিত নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া দেখা দেয়। উচিতও সকলেরই তাকে বুঝিবার, ভোগ করিবার চেষ্টা করা ; এমন সর্ব্বদা-সম্মুখে-উপস্থিত শান্তি-সুখের-উৎস নীরব-মধুর বন্ধু আর নাই।

চারিদিকে সৌন্দর্য্য-সম্ভার লইয়া বসন্ত-লক্ষ্মী আপনার অঙ্গ সাজাই-তেছেন। আকাশ নির্ম্মল হইতেছে, সূর্য্য তেজোপূর্ণ হইতেছে, পাখীরা নানাস্থান হতে আসিয়া দেখা দিতেছে, আমার চিত্ত-মধ্যেও কেমন নূতন শক্তিসঞ্চার অনুভব করিতেছি। এ-সময় সহরের কোলাহল ছাড়িয়া প্রকৃতির কোনও রম্য-নিকেতনে—কোনও পর্ব্বতের উপত্যকা বা সমুদ্র-তীরে—যাইয়া যদি বাস করা যাইত! এই তো প্রকৃতিকে দেখিবার, উপভোগ করিবার সম্যক্ সময়। সব দিকেই কেমন উৎসব আনন্দের ভাব! এ-সময়ে, সেই নিতান্ত দরিদ্র, যার এ-হেন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্য উপযুক্ত প্রাণ নাই।

৮.২.১৫।—কে তুমি বাল্যকাল হতে আমার ভিতর বিরাজ করিয়া, তোমার নির্দ্দেশিত পথে আমাকে চলিবার জন্য এমন ভাবে উদ্বোধিত

করিতেছ? সে অনেকদিনের কথা; বোধ হয়, তখন আমি ন' দশ বছরের বালক, যখন চিত্তমধ্যে প্রথম তোমার পায়ের-স্পর্শের-প্রভাব আমি অনুভব করিয়াছিলাম। সে সময় প্রথমে জৈম···রে 'নির্ব্বাসিতা সীতা' ও পরে পূর্ণি···তে 'বিজয় বসন্ত' পাঠে আমি এক অব্যক্ত সুখের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। তখন হৃদয়-গুহা হতে যে আনন্দ-ধারাটী বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহাই সময়ের সঙ্গে পরিপুষ্ট হইয়া, আমার জীবনকে সময়-বিশেষে কেমন মধুময় করিয়া তুলিয়াছে; এখনো যা কিঁছু সুখ, তার মূলেও তা'ই; এ-পর্য্যন্ত কখনো তা সম্পূর্ণরূপে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় নাই।

তারপর, রাজ···তে যখন দ্বিতীয় শ্রেণী হতে এফ, এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ি, তখনো তুমি আমাকে আমার কর্ত্তব্যপথ দেখাইবার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছ। কিন্তু সবই যেন তখন কেমন আবছায়ায় ঢাকা ছিল। তখন হতেই লেখকের দিব্য-মূর্ত্তির চিত্র তুমি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়াছ। কেন আমার প্রতি তোমার এমন অনুগ্রহ? আমি যে অক্ষম! না, এ-কি হতভাগ্যের নিদর্শন, আমার দ্বারা ব্যর্থজীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইবে বলিয়াই কি এ-পথে আমাকে লইয়া আসিলে? যদি তাই না হইবে, তা হলে আমায় কাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিলে না কেন? তাও তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, তোমার কল্যাণেই এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তা প্রাণে স্থান পায় নাই।

আজ তুমি আমার সমস্ত প্রাণ প্রায়-পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছ। কিন্তু কৈ, এখনো তো তোমায় সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিলাম না। আমার আশা তো পূর্ণ হলো না, আকাজ্ক্ষা অপূর্ণই রহিয়া গেল। জ্ঞান-দেবী বা ভাগ্য-লক্ষ্মী কারো সেবাই আমার দ্বারা পূর্ণ-প্রাণ, পূর্ণ-শক্তির সহিত হইল না; তাই তো বাইরের লোকের চোখে ও নিজের-চোখে আমি ব্যর্থ হইলাম। ব্যর্থ জীবন!

কিন্তু, আবার মনে হইতেছে, তুমি, তুমি কি আছ? সারাজীবন কি স্বপ্নের জাল লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছি?

১২.২.১৫।—যদি তুমি জীবন-ব্যাপারের দিকে ঠিক্‌ভাবে পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়া থাক, তা হলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, যে হস্ত তোমায় মিছা দয়া দেখাইতেছে, সেই হস্তই তোমার সর্ব্বপ্রধান শত্রুর হস্ত। বৃথা দয়া, বৃথা শান্তির ভাব,—মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া দেয়। ডাক্তার যেমন শত্রুর মত রোগীর স্ফোটকের ভিতর ছুরি প্রবেশ করাইয়া দেয়, তেমন তুমিও যার মঙ্গল কামনা কর, তার দোষ দূর করিতে নির্ম্মমহৃদয় হও। প্রাণ দয়ায় পূর্ণ হইবে, কিন্তু হস্ত ঘাতকের মত কঠিন নির্ম্মম হইবে; তা না হলে জানিও, তুমি তার মিত্র নও; মহা শত্রু। চাহিয়া কেন দেখ না দুর্ব্বলচিত্ত দয়ালু পিতার মত সন্তানের এমন শত্রু কে?

১৮.২.১৫।—সে দিন Lewes' Biographical History of Philosophyর উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে Stoic Philosophyর দিকে দৃষ্টি পড়িল। বস্তুতঃ, গ্রীকদর্শনের মধ্যে Stoic-দর্শনই আমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

জাতীয় ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন একটী সময় দেখা দেয়, যখন লোকে প্রাচীন বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, যখন অবিশ্বাস, কাপুরুষতা, নীচাশয়তার বিষ সমাজ-দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া তাকে পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে। এমন সময়, মাঝে মাঝে দৈবীশক্তিসম্পন্ন এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, লোক-চক্ষুর সম্মুখে নূতন জীবনের, মনুষ্যত্বের পথ উন্মীলিত করিয়া দেয়। সমাজ যদি ততদিন একেবারে মৃত না হইয়া থাকে, তা হলে তিনি জাতীয়-জীবনকে নূতন ধারায় প্রধাবিত করিয়া

আসন্ন-মৃত্যু হতে তাকে রক্ষা করিয়া যান। আর যদি সে-জীবন পূর্ব্বেই চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, তা' হলে তিনি মৃতদেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া যান, এবং ভবিষ্যতের জন্য এক অক্ষয় নির্ম্মল নাম রাখিয়া যান।

Stoic Philosophyর প্রবর্ত্তক Zeno ঈদৃশ মহাপুরুষ। তাঁর প্রচারিত Stoicism শক্তির উৎস, মনুষত্বের আকর—মরা মানুষের হাড়েও নূতন জীবন আনাইয়া দেয়।

২৪·২·২৫।—গত শনিবার পুনা নগরে নিজ-গৃহে গোপালকৃষ্ণ গোখলে মারা গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে যে ক'জন লোক এ-দেশে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ও দেশ-সেবক রূপে নাম করিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে গোখলে একজন। কি রাজপুরুষ কি দেশবাসী,—অনেকেরই তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

দেশসেবায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ; এজন্য-তাঁর-স্বার্থত্যাগ অনেককে দেশের প্রতি আকৃষ্ট করিবে। খুব বুদ্ধিমান্ লোকও ছিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। বড়লাটের সভায় Finance সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া, Primary Education দেশব্যাপী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা, Servant of India Society স্থাপন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসিদের South Afiican Government কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কঠোর আইন হতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুত গান্ধিকে কিছু টাকা তুলিয়া সাহায্য করা—ইহাই তাঁর জীবনের প্রায় সমস্ত কাজের মোটামুটি সমষ্টি। কি উদ্যম, উৎসাহ, ক্ষমতা—আর কি সামান্য ফল! এ-সব কাজের যে কোনও মূল্য নাই, এমন নয়। গোখলে-প্রমুখ সভ্য-সকল লাটসভায় দিনের পর দিন যে আন্দোলন চালাইতেছেন, তাতে

লোকের নানাদিকে দৃষ্টির প্রসার বাড়িতেছে এবং বাইরের লোকেও বুঝিতেছে, বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ভারতবাসী কোনও অংশে কারো অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। আত্মসম্মান জ্ঞানও ইহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এ-সবের খুবই একটা moral force নৈতিক শক্তি আছে, যা কালে দেশের বিশেষ উপকারে আসিবেই। কিন্তু সব সত্ত্বেও গোখলেকে আমার তেমন ভাল লাগে নাই।

গোখলে-চরিত্রের প্রধান দোষ দুর্ব্বলতা। তাঁকে বর্ত্তমান ভারতের একজন Hero রূপে ধরিয়া দিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে ভাবে তাঁকে গ্রহণ করিতে লোক রাজি নয়। মানুষ চিরকাল শক্তি, সাহস ও আন্তরিকতার উপাসক। এ-সব বিষয়েই গোখলের অভাব ছিল; (মূলতঃ, ঠিক খাঁটী টাকা নয়, তামার খাদ যথেষ্ট।)

২.৩.১৫।—প্রশস্তহৃদয়, একনিষ্ঠ বাণী-সেবক বন্ধুবর জ্ঞান···বাবু জাতিভেদ Caste System সম্বন্ধে একখানা বই লিখিবার মনস্থ করিয়াছেন এবং সে-সম্বন্ধে আমার মত, ও কিছু সংবাদ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

এ-বিষয়ে আমার আবার মত কি? স্বার্থমুগ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাদের কর্ত্তৃক নানাপ্রকার-ছলনার-সাহায্যে অত্যাচারিত পদদলিত কৃতদাসের দল ব্যতীত—কে এই প্রথার সমর্থন করিবে? যা আছে, তার সমর্থনকারীর কখনো অভাব হয় না। কত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যেই না ইহার অস্তিত্বের সমর্থন করা হইয়া থাকে? অন্য দেশে এমন প্রথার অস্তিত্বও লোকের কল্পনার অতীত; এখানে ইহার জয় জয়াকার!

এমন সমাজধ্বংসকারক প্রথা এ পর্য্যন্ত কোথাও সৃষ্ট হয় নাই। আমাদের বহুযুগব্যাপী দুর্দ্দশাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার জন্য কত মিথ্যার জালই না

রচিত হইয়াছে। আদি-অন্ত সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুসভ্যতার উপরে এই মহাপাপের ছায়া ছড়াইয়া আছে।

না, না,—জাতিভেদ কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়। যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহার অনুমোদন করে, তাদের মত দেশ-বৈরী নাই মনে করিতে হইবে, সমাজে তাদের স্থান যতই কেন না উচ্চ হোক্। যে সব ব্রাহ্মণ জাতিভেদ লইয়া থাকিতে চায়, তারা ভিন্ন দল হইয়া থাকুক্। তাদের বাদ দিয়া, অন্যান্য লোক লইয়া সমাজ কি গঠিত হতে পারে না? পরিষ্কার করিয়া তাদের বলা হোক্,—হে ব্রাহ্মণ, তোমার এতদিনের বুজ্‌রুকি, চালাকি ধরা পড়িয়াছে, ও-সব আর চলিবে না; তুমি দেবতা নও, অন্যান্য মানুষের মত তুমিও সামান্য মানুষ, কেউ তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়, সকলেই সমান। মিথ্যা আর কতদিন চালাইবে?

জাতিভেদ-প্রথায় লোকের প্রতি যে প্রকার ঘৃণা প্রকাশ হয়, তা ক্রীতদাসের প্রতি ইউরোপীয়েরা যে ঘৃণা দেখাইত, তা অপেক্ষাও বেশী। সত্য, কাফ্রিরা তাদের চোখে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ কিন্তু তাও তাদের স্পর্শ করিতে বা তাদের তৈয়ারী আহার বা হাতের জল খাইতে তারা কুণ্ঠিত ছিল না। ব্রাহ্মণের মতে চণ্ডাল প্রভৃতি তো কুকুর অপেক্ষাও অধম। চণ্ডালের মাথার খুলি, তান্ত্রিক তার 'কারণ' রাখিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে; চণ্ডালের শব, তার সাধনার আসন। ব্রাহ্মণের শব লইয়া যদি কোনও চণ্ডাল এমন আচরণ করিত, তা হলে সমাজে কি প্রকার আন্দোলনই না দেখা যাইত! ভাবিতে দুঃখও হয়, ঘৃণাও হয়। কি ছাই সমাজে আছি! এও সভ্য-সমাজ!

ইহা সুনিশ্চিত, ব্রাহ্মণ যতদিন তার তন্ত্র মন্ত্র, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রাদি ও পূজা-পার্ব্বণ, যাগ-যজ্ঞের পুটুলী লইয়া বিদায় গ্রহণ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এ-সমাজ এমনই ছিন্নভিন্ন, দুর্ব্বল ও

জীবনশক্তিবিহীন হইয়া থাকিবেই। কিন্তু সে দিনও কখন আসিবে না, ভারতের ভাগ্যও ফিরিবে না।

পাব...; ২৫.৩.১৫।—কাল রাত্রিতে তিনটার সময় একটী ছেলের ওলাউঠা হইয়াছিল, আজ বেলা এগারটার সময় মারা গেল।

আমাদের দর্শন ও ধর্ম্মের সঙ্গে অসারতার ভাব যে এমন ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, তার প্রধান কারণই এ-প্রকার মৃত্যুর ছড়াছড়ি। ওলাউঠা, বসন্ত, মহামারি, ম্যালেরিয়া, সর্পদংশন, হিংস্রজন্তু—চারিদিকেই নানারূপ-ধারী মৃত্যু ছড়াইয়া আছে; এমন মৃত্যুর রাজ্যে প্রাণ বাস করিবে কেমন করিয়া; আশা, উদ্যম, জীবনে-বিশ্বাসই বা থাকে কি প্রকারে? তাইতো, কথাবার্ত্তা, কাজ কর্ম্ম, সমস্তের ভিতর হতেই এই মৃত্যুর বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশ ধূমপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ইয়ুরোপে এ-স বর ভয় নাই, এমন অকস্মাৎ রূপে তিরোহিত হইবার কারণ খুবই কম; স্বাস্থ্য সম্পদপূর্ণ সে-দেশের লোকের জীবন তাই আনন্দময়; উৎসাহ-উদ্যমপূর্ণ, কর্ম্মঠ সব জাতি। দেশই এমন অসারতার ভাব আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া তুলিয়াছে।

৩.৬.১৫।—যার জীবন যতটা নিয়মের অধীন হইয়া চলে, ততই তা কার্য্যকরী হয়, সুখেরও হয়। এখন কিছু, তখন কিছু—এ-ভাবে কাজ করিলে বিশেষ কিছু করিয়া যাওয়া যায় না। একবার নিয়ম রচনা করিলে, নেহাৎ না ঠেকিলে তার পরিবর্ত্তন কিছুতেই করা নাই; তা না হলে শেষটায় নিয়ম-পদ্ধতি থাকে না। এতে সময়বিশেষে অনেকর অসন্তোষের কারণ হতে হইবে, কিন্তু নিজ-স্বার্থের দিকে চাহিয়া, তার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে; তা ছাড়া উপায় নাই। বড়ই মনের বলের দরকার

ভাবে চলা। নিয়ম মানিয়া চলিলে কেবল যে কাজের পরিমাণ বাড়িবে, শুধু তা নয়; শরীরও ভাল থাকিবে, এবং মন প্রফুল্লতাপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

পশুর তুলনায় মানুষের জীবন অনেকটা নিয়মাবদ্ধ এবং এজন্যই সে তার অপেক্ষা পরাক্রমশালী ও শ্রেষ্ঠ। জার্ম্মেণরা বর্ত্তমানে কি জ্ঞান-বিজ্ঞান, কি অন্য বিষয়ে সকল জাতির অগ্রগামী। তার কারণ, তারা দেশের সমস্ত লোককে বাঁধা-নিয়মে চালাইতেছে। অনেকে বলেন, এতে initiative কার্য্য-করার উদ্ভাবনী শক্তি কমিয়া যাইবে। যখন দেখা যায়, সভ্যমানুষ মাত্রেই সমাজ-প্রণীত নিয়মের মধ্যে আবাল্য গঠিত, তখন তাকে কতদূর মাত্র অগ্রসর করাইয়া, এমন অবাধ স্বাধীনভাবে চলিবার সুযোগ দেবার তেমন কি প্রয়োজন? নিয়ম-মানিয়া-চলা-জীবনের ভিতরও স্বাধীনতার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। কই, জার্ম্মেণদের সঙ্গে কি দর্শন, কি কাব্য, কি সঙ্গীত-শাস্ত্র, কি বিজ্ঞান, এমন কি যুদ্ধ-ব্যাপারেও তো কেউ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইংরাজ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইয়ুরোপীয় জাতি, সকলেই নিয়মের দাস; তাই তো তারা এমন বড়। স্বেচ্ছাচারী, শৃঙ্খলাশূন্য লোক বা জাতির স্থান আর নাই।

২০.৬.১৫।—ধর্ম্ম, জাতি-গঠনের, জাতীয় উন্নতির একটী প্রধান সহায়; জাতীয় অবনতিরও সময়বিশেষে মূল কারণ ইহা।

ইয়ুরোপের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব যথেষ্ট, কিন্তু ইহাও সুনিশ্চিত, তার উন্নতির অন্তরায়ও অনেক বিষয়ে এই ধর্ম্ম। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব, জ্ঞানের শুভ্র তীব্র আলোক তার চোখে অসহ্য। না হইয়া উপায়ও নাই, কারণ আঁধার, অজ্ঞানতা, কুসংস্কারই যে ধর্ম্মের মূলভিত্তি; অনেক ধর্ম্মেরই তো আদি-প্রচারক অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত; সর্ব্বত্রই যে একমাত্র অন্ধ-বিশ্বাসের জোরেই ধর্ম্ম চলিতেছে।

এক সময় ছিল, যখন খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের অত্যাচারে বিজ্ঞান ইয়ুরোপে ভাল করিয়া মাথা তুলিতেও সাহস করে নাই। বিজ্ঞানের মহিমা প্রচার করিতে যাইয়া দার্শনিক ব্রুনো খ্রীষ্ট-সেবকের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, গ্যালিলিও নির্য্যাতিত হইয়াছেন। Spanish Inquisitionর ভয়ে স্পাইনোজা তাঁর এমন জ্ঞান-চিন্তার-উৎস Ethics জীবদ্দশায় ছাপাইয়া বাহির করিতে সাহস করেন নাই। Reformationর পর হতে গোঁড়া রোমান-ক্যাথলিকদের প্রভাব কমিয়া গেলে, ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সে সময় হ'তেই বর্ত্তমান ইয়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক নবজীবনের সূচনা।

স্পেন ধর্ম্মের কবলে পড়িয়া, Inquisition নামক ভয়াবহ বিধিদ্বারা বিভিন্নমতাবলম্বীদের নির্য্যাতন করিতে করিতে, কালবশে গোঁড়ামির জালে জড়িত হইয়া নিজেই শক্তিহীন হইয়া পড়িল। জার্ম্মেণ, ইংরাজ, ফরাসী, যারা বিজ্ঞানকে বরণ করিয়া নিল, তারাই ক্রমে ইয়ুরোপের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইল।

কালে, ফরাসীদেশে রাজশক্তি হতে ধর্ম্ম Religion বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশে কিন্তু এখনো State Religion নামে রাজত্বের-সঙ্গে-বাঁধা একটা Religion আছে; ইহাতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী নানাভাবে অত্যাচারিত হইতেছে। এরই ফলে, এখনো ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা Education সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলেই, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা জটিল সমস্যা উঠিয়া, তার বিস্তারের পথ রোধ করিয়া থাকে। এখনো গোঁড়া পাদরীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের কত তর্ক বিতর্ক চলিতেছে; পাদরী হটিয়া যাইতেছেন সত্য, মিথ্যা কতদিন টেকে, কিন্তু তাও জনসাধারণের উপর তাঁর প্রতিপত্তির অভাব নাই।

যে স্থানের লোক, যে লোক ধর্ম্মের হাত হ'তে মুক্ত হইয়া স্বাধীন-

মতাবলম্বী হইতেছে, সে স্থান ও সে লোকই তত শীঘ্র উন্নত হইতেছে। ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই মিথ্যা ও কুসংস্কারের স্তূপ-বিশেষ। শিক্ষা ও যা-সত্য তাকে সাহস করিয়া গ্রহণ করিতে যে জাতি শিখিয়াছে, তার উন্নতির পথ উন্মুক্ত। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই এ বিষয়ে হতভাগ্য। মুসলমান এখনো ষষ্ঠ-শতাব্দীর আরবী-সভ্যতার আচার-ব্যবহার চাল-চলন রীতি-নীতিকে আদর্শ মনে করিয়া তারাই অনুসরণ করিবার জন্য সচেষ্ট; কোরাণই ধরিতে গেলে তাদের পক্ষে সমস্ত জ্ঞানের মূল-আকর। বিজ্ঞানের নামে, কোনও পরিবর্ত্তনের নামে তারা তটস্থ হইয়া পড়ে। গোঁড়ামীর bigotryর জন্য তারা বিখ্যাত; ইহা যে তাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায় তা তারা দেখিতেছে না। হিন্দুরাও তাদেরই অনুরূপ। যিনি যতই কেন না বলুন, এখনো ব্রাহ্মণ সমাজের একচ্ছত্র রাজা, তার প্রবর্ত্তিত জাতিভেদ প্রথার জয়জয়াকার, বিধবা-বিবাহ মহা গর্হিত কার্য্য।

এই বিজ্ঞানালোকিত বিংশ-শতাব্দীতেও আমরা তিনহাজার বছরের পূর্ব্বের মনু ও যাজ্ঞবল্কের মতানুসারে আপনাদের চালিত করিতেছি। সংসারের কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, কিন্তু এঁদের লেখা—যার নাম শাস্ত্র—তা নাকি অভ্রান্ত!

আমি বলি, একটু সাহসী হও। মনু, যাজ্ঞবল্ক, উপনিষদ, বেদ, পুরাণ ইত্যাদিতে কাজ নাই; ও-সব Second-hand-books-sellerদের দোকানে রাখিবার উপযুক্ত জিনিষ প্রত্নতত্ত্ববিৎদের উদ্দাম কল্পনার রসদ যোগাইবার জন্য একদিকে সরাইয়া রাখিয়া দাও; জাতিটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন খোলা বায়ুতে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচুক্।

২৩-৬-১৫।—"জীবনের একটা আদর্শ ঠিক করিয়া, যতদিন না সে আদর্শ বাস্তবে ও সত্যে পরিণত হয়, ততদিন ক্রমাগত অবিরাম চেষ্টা

করিতে থাক। ইচ্ছাশক্তি থাকিলে কিছুই অসম্ভব বা অসাধ্য নহে। দুঃখ ক্লেশ স্বীকার না করিয়া কখনো কোন বড় কাজ হয় নাই। সুতরাং যদি বড় কিছু করিতে চাও, তবে দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে হইবে।...বড় হইবার সম্ভাবনা প্রত্যেকের মধ্যেই সমানভাবে বর্ত্তমান। প্রতিভা? সুশৃঙ্খলার সহিত কঠোর পরিশ্রমে কাজ করিয়া যাওয়া ভিন্ন প্রতিভা আর কিছু নয়। যদি ইচ্ছা কর, তুমিও প্রতিভাশালী হইতে পার। স্বদেশের কোন না কোন একটা কাজে জীবন উৎসর্গ কর।...জীবনটা নিতান্তই ছোট,—কাজেই বৃথা সময় নষ্ট করিবার অবকাশ বা অধিকার কাহারো নাই। মাধুর্য্যে, আলোকে, কর্ম্ম-নিষ্ঠতায় এই জীবনকে পূর্ণসার্থক করিয়া তোলাই তোমার আদর্শ হউক।"

আমেরিকায় অবস্থান কালীন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ভারতীয় ছাত্রদের উপরোক্ত প্রকারে উপদেশ দিয়াছিলেন। কথায় কোন আড়ম্বর নাই, অথচ কেমন মনের ভিতর যাইয়া প্রবেশ করে।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ,—দুজনে নিজ নিজ আদর্শানুসারে জীবনযাপন করিতে যে নিবিষ্ট-চিত্ততা দেখাইয়াছেন, তা প্রত্যেক বাঙ্গালীর পক্ষে অনুকরণযোগ্য। তাঁদের জীবন-কাহিনী বাঙ্গালার অতুল্য সম্পদ। মানসম্ভ্রম অর্থ প্রতিপত্তির দিকে তাঁরা কখনো দৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু তা'ও তা তাঁদের যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। নব্য-ভারতের দুই মহাজীবন।

আমি তাঁদের দুজনকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতেছি; তাঁদের মত জীবন-যাপন করিবার ক্ষমতা আমার হোক্।

২৯.৬.১৫।—রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি' এই মাত্র পড়িয়া শেষ করিলাম। বিশেষ যে ভাল লাগিয়াছে, বলিতে পারি না। এক 'ছোট-

গল্প ও উপন্যাস-ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের গদ্য-লেখার আমি তেমন উপাসক নই। সোজা কথায় সরলভাবে তিনি কিছুই যেন বলিতে জানেন না; তাঁর গদ্য-লেখা পড়িতে যাইয়া আমার ধারণা হইয়াছে, ইহা তাঁর একটা শারীরিক ব্যাধি-বিশেষ। পদ্যে তা এমন ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট ভাব একরকম লাগে ভাল, কারণ স্বপ্ন দিয়াই যে সে জগৎ রচিত। কিন্তু গদ্য হইবে, লোকের কাজ কর্ম্মের ভাষা, তাতে যা বলা তা সরল তেজোপূর্ণ উৎসাহবর্দ্ধক হইবে—নাকি-সুরে বিনাইয়া প্যাঁচাইয়া বলা সে-ক্ষেত্রে সাজে না। এ বিষয়ে জার্ম্মেণরা আদর্শ-লেখক,—নিট্‌সে, ট্রিস্‌কে, বার্ণহার্ডি, ফ্রেডারিক দি গ্রেট, যাঁর লেখাই হাতে নাও, সবই কেমন সবল, সরল; কিছুক্ষণ পড়িলেই প্রাণে নূতন আশা ও শক্তির সঞ্চার হয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-লেখায় নূতন ভাবের সমাবেশও যেন তেমন দেখা যায় না। আমার তেমন ভাল লাগে না। অবশ্য, 'ছিন্নপত্র' ভাল লাগিয়াছে, তার কারণ তার আবহাওয়াই কাব্য; 'জীবন-স্মৃতির' তো তা নয়।

তবে 'জীবন-স্মৃতির' ভিতর রবীন্দ্রনাথ নিজ কাব্যজীবনের উন্মেষ, কি কি মূল-ভাব তাঁকে বাল্যকালাবধি উদ্বোধিত করিতেছে, এবং কোন্ ভাব হতে কোন্ কবিতা রচিত হইয়াছে, তার কিছু পরিচয় দিয়া তাঁকে জানিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থ যদি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইত, তা হ'লে তাঁকে বুঝিতে এতটা কষ্ট হইত না। যেমন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য লেখা; ঘটনার সমাবেশ এ-বইতেও নাই বলিলেই চলে, ভাব লইয়াই যা কিছু নাড়া চাড়া; মনে হয়, যেন অনেকটা অবাস্তবতার দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এই মাটীর সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক কম।

তা যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথের সব লেখার মত এও নূতন ধারায় লেখা এবং উপভোগ্য।

২৭.৬.১৫।—কপাল-দর্শন Philosophy of Luckর ন্যায় এমন নিখুঁত দর্শন আর নাই। যে ভাবে এখানে এর পসার প্রতিপত্তি, তাতে ভারতবর্ষকে ইহার জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ইহার দ্বারা কি জাতীয়-জীবনের কি নিজ-জীবন বা পর-জীবনের সমস্ত সমস্যাই অতি সহজে পূরণ করা চলে। ওলাউঠায় গ্রাম ধ্বংস হইতেছে, ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন হইতেছে, স্ত্রী দেখিতে কুরূপা, আগুন লাগিয়া ঘর পুড়িয়া গেল, চাকরীতে তেমন সুবিধা হইতেছে না, অর্থাগমের সুবিধা নাই—যে কোনও বিষয়েরই কারণ কেন খোঁজ না, কপাল-দর্শন সকল সময়ই নির্ভুল উত্তর লইয়া উপস্থিত। উত্তর একই—কপালেই এমন ছিল।

আর কপাল! এই কপালের দিকে চাহিয়াই, আমরা কপাল খোয়াইতেছি। চোখের সামনেই দেখিতেছি, সময় মত ভাল কবিরাজ ডাক্তার দেখাইতে পারিলে ব্যারাম সারে, স্বাস্থ্যসম্বন্ধে নিয়ম মানিয়া চলিলে শরীর ভাল থাকে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিলে, কি সহর কি গ্রামের মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়—অথচ সকল সময়ই শুধু মাত্র 'কপালের' দোহাই দিয়া মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছি। এশিয়া জুড়িয়াই এই 'কপালের' রাজত্ব; তাই তো এশিয়ার এমন পোড়া কপাল।

দেখিতেছি, যারা কাজ করে, যে সব জাতি কর্ম্মঠ, সাহসী, জ্ঞানান্বষণে, ধনার্জ্জনে তৎপর, তারাই অন্যান্য সকলকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; তাও কি শুধু 'কপালের' দিকে চাহিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে?

এই 'কপালের' সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস ওতপ্রোত ভাবে

জড়িত। ভগবান-ভক্তির চাষ যে দেশে বেশী, সে দেশেই কপাল-দর্শনের প্রসার দৃষ্ট হইবে; দুর্ব্বলতা অক্ষমতাও এ-সব জাতির অঙ্গ। ভগবান ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, যার জীবন সম্বন্ধে তিনি যা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তা'ই হইবে, বৃথা চেষ্টায় কি প্রয়োজন—এ-ভাবই কপাল-দর্শনের মূলভিত্তি। ভগবান যে আছেন এবং তিনি যে আমার জীবনের উপর কোনরূপে প্রভাব বিস্তাব করিতেছেন—তার প্রমাণ কি? মিছা ভগবানের বিশ্বাসে দরকার নাই; শুধু 'কপালের' উপর নির্ভর করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবারও দরকার নাই। এস দেখি, যে যার আদর্শ লক্ষ্য করিয়া চলি,—কিছু করিয়া যাইতে পারি কি না; অর্থ, যশ, সম্পদ সুখকে করায়াত্ত করিতে পারা যায় কি না? কবে 'কপালের' কবল হতে দেশ মুক্ত হইবে?

২৮·৬·১৫।—প্রতিভা বলিয়া যে একটা বিশেষ কিছু নাই, তা শেষ পর্য্যন্ত অস্বীকার করা চলে না। মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের মত করি, চেষ্টা করিলেই হওয়া যায় না। তবে ইহাও সুনিশ্চিত, কায়-মন ও বাক্যের সহিত দৃঢ়পণ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকিলে, প্রায় সকলেই একদিকে না একদিকে কিছু একটা করিয়া যাইতে পারেই। প্রায় সকলেরই বাল্যকালাবধি একদিক না একদিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। কারো প্রাণ চায় গায়ক হ'তে, কেউ চায় লেখক হতে, কারো ইচ্ছা বৈজ্ঞানিক হওয়া, কারো বা ইচ্ছা করে বক্তা হতে, কেউ চিত্রকলার দিকে ঝুঁকিয়া আছে, কেউ চায় দেশ-ভ্রমণে জীবন কাটাইতে—নানা লোকের নানাদিক দিয়া জীবনের মূল আকাজ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। যারা জীবনের এই স্বভাবজ আকাজ্ক্ষাকে পরিচর্য্যা দ্বারা পুষ্ট করিয়া তুলিতে পারি, তারাই কালে জগতের পৃষ্ঠায় নিজ নাম অঙ্কিত করিয়া যায়; আর যারা আকাজ্ক্ষার

উপযুক্ত খোরাক না যোগাইয়া তাকে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হতে দেয় অথবা প্রকৃষ্টরূপে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে না,—তারা কালে নিস্ফল হইয়া যায়। চিরকাল ধরিয়া আকাশ এই নিস্ফলতার দীর্ঘনিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে!

যে দিকে মন যায়, অশ্বমেধের ঘোড়ার ন্যায়, উন্মুক্ত অবস্থায় তাকে ছুটিতে দাও। অন্তরস্থিত আকাঙ্ক্ষাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য যা দরকার, তা তাকে পূর্ণরূপে দাও—কালে তুমিও প্রতিভাবানের স্থান অধিকার করিবে। ফরাসী-লেখক Buffoonই বোধ হয় বলিয়াছিলেন, Genius in another name for labour প্রতিভা পরিশ্রমেরই নামান্তর। কত লোক কেবল এই পরিশ্রমের সাহায্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী-দের সঙ্গে একত্র স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন। যদি তেমন ভাবে ইচ্ছা-শক্তির চালনা করিতে পার, তা হলে তুমিও কালে তাঁদের সঙ্গে একাসনে বসিবার যোগ্য হতে পার।

*   *   *   *

"ক্রমে ক্রমে বুঝ্‌তে পারা যায়, মনটা কি চায় এবং কি চায় না। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বস্‌লে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে কোন কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পার্‌লে, তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটী পাওয়া যায়'—'জীবন-স্মৃতি'।

মন কি চায়, এবং কোন্ দিকে তার শক্তি—ঠিক করা কঠিন। যে অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর বয়সের ভিতর, এ দুটী প্রশ্নের সদুত্তর পায় নাই,—সে দুর্ভাগ্য। লক্ষ্যভ্রষ্ট তারার মত, তার জীবন-গতি কখনো এ-দিকে, কখনো অন্যদিকে চালিত হতে হতে—হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া তাঁকে গ্রাস করিয়া লইয়া যায়। পঁচিশ বছরের মধ্যে এদুটী প্রশ্নের সমাধান হওয়া দরকার। তার পর,—মরণ পর্য্যন্ত একমাত্র লক্ষ্যের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া

কাজে লাগিয়া থাকা। একেই বলে—মানুষের মত চলা। নানাদিকে মনকে বিক্ষিপ্ত হতে দেওয়া নাই,—যার যে দিকে শক্তি, শুধু সে দিকেই চালনা করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হতেই সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র-কলার চর্চ্চায় ডুবিয়া আছেন। কবিত্ব শক্তির বিকাশ করাই, তাঁর আবাল্য সাধনা; অন্যান্য বিষয়ে যা কিছু চর্চ্চা, ইহার সাপেক্ষ-স্বরূপে তাঁর কাছে তাদের যা-কিছু মূল্য। মান, যশ, করতালধ্বনির দিকে না চাহিয়া, লোক লৌকিকতার দিকে কোন দিন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি তাঁর জীবন-দেবতার আদেশ-পালনে মন-প্রাণ, ধন-ঐশ্বর্য্য, সমস্ত শক্তি,—সম্পূর্ণরূপে সঁপিয়া দিয়াছেন। এতদিনে, সাধনা সফল হইয়াছে। আজ তিনি জগতের মহাকবি, বাঙ্গ'লার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান,—জগৎ-সভায় কোনও বঙ্গ-সন্তানের এমন উচ্চস্থান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই।

* * * *

'সে সময় সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থ মনে করিয়া, তাহাকে সদা সর্ব্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে সমস্ত আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমায় কি করিবে, এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না।'—জীবনস্মৃতি'।

পরের মুখের দিকে চাহিয়া চলিবার ও বলিবার অভ্যাস বর্জ্জন করিতে হইবে। ও-ভাবে চলিলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইতে হয়, এবং নিজের বিশেষত্ব কিছুই থাকে না। সর্ব্বাগ্রে নিজ স্বার্থ; পরে পরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা। নিজ উৎকর্ষের জন্য, লক্ষ্য লাভের জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

যদি মনে কর, নূতন কিছু বলিবার তোমার আছে,—খুলিয়া বল। যদি তার মধ্যে কিছু সার থাকে, অন্ততঃ দুজন হলেও গ্রহণ করিবে। *আর

যদি তাও না করে, তাতে ও ক্ষতি নাই—তুমি তো তোমার কথা বলিয়া গেলে, মনের জ্বালা মিটাইলে।

খাঁটি কথা নির্ভীক-হৃদয়ে জোরের সহিত বলা—এও একপ্রকার প্রতিভারই রূপান্তর, একটা মহৎ কিছুর পরিচায়ক। দুইই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ; স্পর্শে মরা-দেহে প্রাণ আসে। তুমি আর কিছু না পার, সরল সহজ কথায় মনের গুটিকতক ভাব, যার সঙ্গে মিছার কোনও সম্পর্ক নাই,—লোককে উপহার স্বরূপ দিও।

৫.৭.১৫।—Goetheর জীবনীতে দেখিতেছি এবং অন্য অনেক প্রধান ব্যক্তিদের জীবনীতেও দেখিয়াছি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা, আলাপ-পরিচয়, কথাবার্ত্তায় তাঁদের অনেক সময় ব্যয়িত হয়। মোটের উপর, এদের চিন্তা-ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম তাঁদের জীবনের অনেকাংশ জুড়িয়া থাকে। আমার চোখে যেন এ-জীবন তেমন লোভনীয় বলিয়া বোধ হয় না। রাজনৈতিক বা সামাজিক দিক হতে ক্লাব club প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা থাকিলে ও থাকিতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, যে সব বিষয় জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত, তা লইয়া লোকের সঙ্গে বেশী নাড়া-চাড়া করিলে, তাব গৌরবের হানি হয়। যতটা সম্ভব, জীবনের আসল ভাগটা নির্জ্জনতার ভিতর অতিবাহিত হইবে—সেখানে শুধু মাত্র আমি ও আমার জীবনাদর্শ, জীবন-দেবতা। ইহাই দার্শনিকের জীবন, চিরকাল যা লোকচিত্ত আকৃষ্ট করিতেছে।

Goetheর একটী সুন্দর নিয়ম ছিল। তাঁর মতে, মনে মনে কোনও প্রতিজ্ঞা করিলে, তার বিষয় কা'কেও বলা উচিত নয়, তা না হলে প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হয় না। তাই তিনি মনের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা কা'কেও জানাইতেন না।

নিতান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মতটী। মনের নিম্নস্তরে নিস্তব্ধতার মধ্যে শক্তির বাস ; কথার ভিতর দিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া তা নষ্টতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই বক্তাকে কদাচিৎ কার্য্যশীল হতে দেখা যায়। যে যত মনের সঙ্কল্প গোপন করিয়া চলিতে পারে, সেই তত শক্তিমান্, কার্য্যক্ষম।

আজ আদর্শ-জীবনের বিষয় ভাবিতে যাইয়া, কেন'যেন Spinoza ও Zenoর কথা মনে জাগিয়া উঠিতেছে, যাঁরা সংসারে থাকিয়াও সংসারী ছিলেন না, প্রাণ যাঁদের শক্তির আধার ছিল কিন্তু যাঁদের সে শক্তি নিজ উৎকর্ষ ও পর-হিতসাধনে, পরের অনিষ্টে নয়, ব্যয়িত হইয়াছিল।

মুনি-ঋষিদের জীবনও শিক্ষাপ্রদ—কেমন আড়ম্বরবিহীন, সঙ্কল্প-সাধন-তৎপর ! কিন্তু জাতিভেদরূপ মহাপাপের কাদার ভিতর গঠিতচরিত্র তাঁদের আচার ব্যবহারে, শিক্ষায়, কার্য্যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের প্রতি এমন একটা ঘৃণার স্তর জড়াইয়া আছে, যে সে বিষয় মনে হতেই, তাঁদের কাছ থেকে আমার দূরে সরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে। কি কুশিক্ষাই এঁরা পেয়েছিলেন, আর কত সব মিথ্যার জালই না রচনা করিয়া গিয়াছেন !

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। এমন জ্ঞানই বা কা'র ? কারই বা সিদ্ধি-লাভে এমন সাধনা ? তাঁর উপদেশ-সব পড়িলে আশ্চর্য্যে অভিভূত হতে হয়, যে অমন অ-শিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রাচীনকালে, কেমন করিয়া তিনি এমন বর্ত্তমান-কালোপযোগী নব্য-বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে জীবন-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াসে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সংসার-বিরাগী ছিলেন, তার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন ; যে প্রকৃত শান্তি ও নির্ব্বাণ-অভিলাষী তার পক্ষে তা করাই যে দরকার, এ-মত প্রচার করিয়াছিলেন। আমি তো সংসার-ত্যাগী নই ; তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সায়

দিয়া তো আমি চলিতে পারি না ; তাঁকে অনুসরণ করিতে তাই আমার প্রাণ চায় না।

চায় না? চায় এক সময়,—যখন কোনও আত্মীয়ের বিরহে কিম্বা অন্য কোনও দুঃখহেতু সংসার-বাস অসহনীয় বোধ হয়, যখন সংসারকে অসার ও নিজেকে অস্তিত্বশূন্য মনে করিতে পারিলে, প্রাণে যা কিছু শান্তির উদ্ভব হয়। বুদ্ধদেবই ঠিক, সাংসারীর জীবনে সুখ নাই।

কিন্তু, সংসার-বিরাগী সাধু! সেই কি সুখী? কা'কে অনুসরণ করিব? কিসের অনুসরণ করিব? সবই যে শূন্য, ভিত্তীবিহীন, অর্থশূন্য! কোথায় আমার আদর্শ-জীবন?

৭.৭.১৫।—আবার বর্ষা আসিয়াছে, 'এসেছে ভুবন-ভরসা।' আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দদায়ক কবিত্বে-ভরা কাল ; আর সব তো একঘেয়ে, অনেকটা একই রকমের। যে দেশে বর্ষা নাই, সে দেশে গভীর-সুখ-ভোগের কবিত্বোদ্বধক এক প্রধান উৎসই নাই। প্রকৃতি-বৈচিত্র্য—এমন আর কোন্ কালে দৃষ্ট হয়?

বর্ষার সঙ্গেই যত প্রেম-অভিসার জড়িত। মেঘদূত হতে গীতগোবিন্দ, গীতগোবিন্দ হতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী ও বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথের কবিতা—বর্ষার মেঘ-মেদুর বিদ্যুৎ-দীপ্ত আকাশের সঙ্গে কোন্‌টার সম্পর্ক নাই?

'এ মাহ ভাদর, ভরা বাদর, শূন্য মন্দির মোয়'—বিরহকাতরা রাধিকার মর্ম্ম হতে উত্থিত কথা ক'টার সঙ্গে যে প্রাণ-ব্যাকুলতা মিশ্রিত হইয়া আছে,—বর্ষাসমাগমে কোন্ বিরহিণী সে-সুখ-শোকপূর্ণ-ভাবে অভিভূত হয় নাই? বিরহিণী রাধিকা, বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া! কাব্যজগতে অতুল্য-সৃষ্টি ; কোন্ ঋতুতে এরা কবির মানস-মন্দিরে দেখা দিয়াছিল?

বর্ষাসমাগমে আমার চিত্ত কি যেন এক নূতন আনন্দে 'ময়ূরের মত নাচিয়া উঠে'। সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক বিরহ-কাতরতাও দেখা দেয়। কে কি সে, যার জন্য মনোরাধিকা এমন ব্যাকুল হইয়া উঠে? অনন্ত-প্রয়াসী মন—বর্ষার নূতন মেঘের সঙ্গে কোথায় কোন্ অনন্ত-যাত্রার উদ্দেশে উড়িয়া যাইতে চায়?

আর যে দিন গ্রীষ্মের তীব্র দাহনের পর কালো মেঘের ভিতর হতে ধীরে বারি-ধারা নামিয়া আসে, তখন বোধ হয়, সমস্ত ধরণীর সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহ মনও কি এক স্নিগ্ধ ধারায় ভিজিয়া ভিজিয়া ক্রমে ক্রমে সব জ্বালার হাত হতে মুক্ত হইয়া শান্ত শীতল হইয়া উঠিতেছে। কোথা হতে অন্তরের ভিতর এই শান্তি নামিয়া আসে?

আর দিন কয়েক; তার পরেই আমাদের গৃহের কিয়দ্দূরে ক্ষুদ্র-কলেবরা 'ইছামতী' নদীটী জলে ভরিয়া উঠিবে। অদূরে আগত-যৌবনা 'পদ্মা' জল-স্ফীতবক্ষা হইয়া অপূর্ব্ব-মোহন ভৈরব বেশ ধারণ করিবে। কতস্থান হতে কত বোঝাই নৌকা কত প্রকারের লোকজন ও বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া, দেশ বিদেশের বার্ত্তা বহন করিয়া, 'ইছামতী'র বক্ষে আসিয়া দেখা দিবে। কেমন একটা নূতন স্ফুর্ত্তি ও সজীবতার ভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে!

এ তো গেল, বাইরের কথা। যে-দিন সকাল হতে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসে, সারাদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, মাঝে মাঝে দু একটা দম্‌কা হাওয়া বহিয়া যায়,—তখন, সত্যই আমার প্রাণের ভিতর কি যেন, কেমন আনন্দ-অধীর হইয়া উঠে—সে-ভাব আমি ভাষায় ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বাল্যকাল হতেই বর্ষার দিনে আমি এমন আনন্দ অনুভব করিয়া আসিতেছি। এক একদিন এমন সময় নদীতীরে বৃষ্টির ভিতর ছাতা মাথায় ভিজিয়া ভিজিয়া চলিতে চলিতে কত কি

এলোমেলো ভাবে প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। পূর্ণিমার চাঁদ অথবা বসন্তের বনশোভা, কিছুই আমার প্রাণে তেমন আনন্দ বহন করিয়া আনে না, যেমন নববর্ষার নূতন ঘননীল মেঘ।

কল্পনা কাব্যের মূল, জীবনের সুখের মূল। এই যে বর্ষা-প্রকৃতির অনুপম শোভা দর্শনে আনন্দের সঞ্চার, ভবিষ্যতের কল্পনা-তুলিকায় যখন এ-দৃশ্য আরো ঘন সবুজবর্ণ ধারণ করিয়া দেখা দিবে, তখন আরো কত মধুর বোধ হইবে! 'ভরা বাদর' ও বুঝি ভাদ্রে তেমন মধুর নয়, যেমন ভবিষ্য-শীত-সন্ধ্যায় তার স্মৃতি। বর্ষাতীতে বর্ষা আমার চিত্তাকাশে আরো মনোহর-মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিবে—বর্ষার তুলনা কোথায়?

১৪.৭.১৫।—Dantzer প্রণীত Goethe-র জীবনীর প্রথম খণ্ড শেষ করা গেল। ভালই লাগিতেছে না। মনে হইতেছে, নিতান্ত সাধারণ জীবন। Idealism, যা'ই শুধু জীবনকে চন্দ্রালোকদীপ্ত জগতের মত মধুর-দর্শন করিয়া তোলে,—নাই বলিলেই চলে। জীবনটীকে যে কেমন উপভোগ্যের জিনিষ করিয়া তোলা যায়, সে বিদ্যার সংবাদ অনেকেই রাখেন না। Art of Living সম্বন্ধে Goethe-র মত পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, তাঁর নিজ-জীবনে সে সম্বন্ধে উদ্ঘাটিত নূতন কিছু তত্ত্বের সন্ধান পাইব। কলেজের দিন হতে কত গ্রন্থে, কত স্থানে তাঁর কথা পড়িয়াছি; কত আশা করিয়া তাঁকে জানিতে গিয়াছিলাম—এই তিনি! নেপোলিয়ানও গেটে—উনবিংশ শতাব্দীর ইয়ুরোপের দুই প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু নেপোলিয়ানের তুলনায় তাঁকে কত ছোট বোধ হইতেছে—সূর্য্য এবং ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক! দেখা যাক্, দ্বিতীয়বার পাঠে কি ধারণা হয়।

১৮.৭.১৫। প্রত্যেকেরই একটা hobby খেয়াল থাকিবে—যার

যা ইচ্ছা। তাকে অনুসরণ করাই জীবিতের লক্ষণ; তাতেই প্রকৃত আনন্দ। নেপোলিয়ানের hobby ছিল, যুদ্ধ; যীশুখ্রীষ্টের, ধর্ম্ম; তান সেনের, সঙ্গীত; বিদ্যাপতির, কবিতা—এক একজন এক একটার চরিতার্থ করিতে যাইয়া, জগৎজয়ী হইয়া আছেন। যার কোনও hobby নাই, তার সঙ্গে অন্যান্য সাধারণ লোকের কোনও পার্থক্য নাই। সুখের ভিতরও উচ্চ এবং নীচ—নানাশ্রেণী রহিয়া আছে। সাধারণ লোক নীচশ্রেণীর সুখে তন্ময় থাকিয়াই নিজেদের মহাসুখী মনে করে, কিন্তু যারা প্রকৃত সুখের আস্বাদ পাইয়াছে, তারা তাদের উচ্চাকাশ হ'তে দৃষ্টি করিয়া এদের পিপীলিকার মত মনে করে। 'অমৃতের' সন্ধান এরা পাইল না, এমন কি খোঁজও করিল না—সে শক্তিই যে নাই, সে চোখ ও নাই। মাটীর ডেলা, কিছু হৈ চৈ করিয়া মাটীতে মিশিয়া যাওয়া—সোজা কথায় এদের জীবনেতিহাস। এ-শ্রেণীর লোক কখন আমার হৃদয়-অর্ঘ্য পাইবে না, তা সে যত বড় ধনী বা পরাক্রমশালীই হোক্।

২০.৭.১৫।—কি ধর্ম্মব্যাপারে, কি সামাজিক আচার ব্যবহারে, কি সাহিত্যে—সকল বিষয়েই আমরা নিতান্ত conservative রক্ষণশীল।

সামাজিক নীতিসম্বন্ধে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এবং সাহিত্যক্ষেত্রে রামায়ণ ও মহাভারত—আমাদের চরম আদর্শ, যার বিরুদ্ধে মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে কা'রো সাহস নাই।

সাহিত্যে—নূতন আদর্শ, স্বাধীন চিন্তা নাই বলিলেই চলে। সেই রামায়ণ ও মহাভারতের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ, সেই মুনি-ঋষিদের কাহিনী, সেই অর্থ-শূন্য-সতীত্বের গৌরব ব্যাখ্যা—নূতন আদর্শ কৈ, নূতন কিছু বক্তব্য কৈ?

বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের ঋষিরূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন, কিন্তু কৈ তাঁর সে উদার দৃষ্টি, যার সুমুখে ভারতের সকল জাতি একই দেশের, একই

সমাজের সন্তানরূপে সম্মানিত হইবার উপযুক্ত। তিনি বিষয়সম্বন্ধে কিছু নূতনত্ব আনিয়াছিলেন, কিন্তু গোঁড়া সঙ্কীর্ণমনা পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁর লেখাতেও যেখানে সেখানে এই গোঁড়ামির পরিচয়। অন্য বর্ণ ও জাতির প্রতি ঘৃণায় তাঁর লেখা কলুষিত। প্রাচীন আদর্শের মোহেই তিনি মুগ্ধ ছিলেন।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' বিষয়-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মনোহর উদ্যম, কিন্তু তিনিও শেষ-জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের মত কৃষ্ণ ভজনা করিয়া গেলেন। যৎসামান্য যা কিছু নবীনত্ব, উৎসাহ—যৌবনে; বার্দ্ধক্যে, সকলকেই যে একই জাতিভেদমূলক প্রাচীন আদর্শ ও পৌত্তলিকতার কূয়ায় যাইয়া মাথা মুড়াইতে হইবে।

মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের লেখায় নূতন বিষয় বা আদর্শের তেমন কোন প্রকার সাক্ষাৎ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের বলিবার বিষয় ও নিয়ম, উপরের সকল হ'তেই সম্পূর্ণ রকমে নূতন। তাঁর হাতে ভাষা সংস্কৃতের কবল হ'তে মুক্তি পাইয়া নিজ গৌরব ও শক্তিতে ভর করিয়া স্বাধীন স্বচ্ছন্দ-গতিসম্পন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ব্যাকরণের বিভীষিকা নাই, সরল কথ্য শব্দের সংযোজনে ভাষার দেহ কেমন সহজ সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে! কি ভাষা, কি ভাব, কি বলিবার পদ্ধতি—সমস্ত বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা পাশ্চাত্য-বর্ণিত Modern বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত হইয়াছি। তাঁর কল্যাণে এ-সব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কোন সমৃদ্ধশালী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার এক্ষণে কোনও পার্থক্য নাই। Idealism আদর্শ-অনুসরণের যে ভাব তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন, ইহাও বর্ত্তমান কালের সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মূলভাব।

সর্ব্বত্রই এই idealism আদর্শ-অনুসরণ ধীরে ধীরে বহুপূর্ব্বে হ'তে প্রতিষ্ঠিত ভগবানকে সরাইয়া, মানব-চিত্তে সাধনার বস্তু-স্বরূপে স্থান অধিকার

করিতেছে। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের লেখায় ideal, যারই নামান্তর জীবন-দেবতা, ও ভগবান পাশাপাশি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথবা সময়-বিশেষে দুটীতে এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যে idealismর ভাব,—ইহা একটী অতি শ্রেষ্ঠ ভাব; মানুষকে, জাতিকে সামান্য, অর্থ বা যশের মোহের লোভ হতে মুক্ত করিয়া ও দূরে রাখিয়া—মহত্বের দিকে, আত্মবিকাশের দিকে লইয়া যায়। এজন্য, এবং তিনি যে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের অনুপম সৌন্দর্য্যের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে সে চির-ঋণী। উপনিষদও বুদ্ধ-বাণীর পরে, ভারতে তাঁর কবিতার মত এমন নির্ম্মল, এমন পবিত্র, সুন্দর কিছু এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই—বুঝি কোথায়ও হয় নাই। এক্ষেত্রে ভারতের কবি যে গভীর সৌন্দর্য্য স্তরে যাইয়া পৌছিয়াছেন, শুধু সৌন্দর্য্য-চন্দ্রের আলোকেই যা উদ্ভাসিত,—আর কারো দৃষ্টি সেখানে যায় নাই।

কিন্তু, তাও সূক্ষ্মবিচারে বলিতে হইবে, প্রকৃত জীবনতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও তেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া তো জীবন নয়; দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা, পাপ-তাপ, কত কি কদর্য্যতা তার অঙ্গ ব্যাপিয়া আছে—যার সঙ্গে দখিন-পবন, জ্যোৎস্না-যামিনী, বসন্তের কোকিল-বকুল, বা শরতের শেফালির কোনও সম্পর্ক নাই। আর সে-ই তো ধরিতে গেলে প্রকৃত জীবন, যাকে লইয়া সংসারের অধিকাংশ লোকের দিন কাটিতেছে। কেমন বীভৎস্য-দৃশ্য,—পীড়া, দারিদ্র্য, দুঃখ, আবর্জ্জনা, বর্ব্বরতা, অপরিচ্ছিন্নতা যার নিত্য-সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ লইয়া আছেন, তা' পরম সুন্দর; ভগবান সেথানে সর্ব্বোপরি সম্রাট-স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন,—তাঁর নিম্নে মর্ত্ত্যের রাজা, মহারাজা, জমীদার, পুরোহিত, প্রজা, নফর; সেই প্রাচীন নিতান্ত পরিচিত জগৎ, যেথানে দরিদ্র মানুষের সংজ্ঞাভুক্তই নয়, স্ত্রী পুরুষের দাসী; ধনী, ব্রাহ্মণ যেথানে লোকের ভাগ্য-

নিয়ন্তা। যে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রার ভাব জগৎ ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিতেছে, যার প্রভাবে ক্রীতদাসের শিকল পা হ'তে খসিয়া গিয়াছে, দরিদ্র এতদিন পরে মাথা তুলিয়া ধনীর পাশে তার ন্যায্য স্থান অধিকারের চেষ্টা করিতেছে, নারী পুরুষের সমস্বত্বাধিকারাণী বলিয়া দাবী করিতেছে—সে সবের সঙ্গে তাঁর লেখায় সাক্ষাৎ হয় কোথায়? অথচ, এ সকল লইয়া ধনী দরিদ্রে, Capital ও Labour এ, পুরুষে নারীতে, জগৎব্যাপী জীবন-মরণ সংগ্রাম চলিয়াছে। Capitalistic অর্থের-উপর-প্রতিষ্ঠিত সমাজ-বিধি যে আর থাকে না। শতকরা নিরানব্বই জন লোকই দুর্ব্বল, মূর্খ, দুঃখী, নিরন্ন,—তাদের সুখ দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা, মূর্খতা, বর্ব্বরতা, নিতান্ত-নিঃসহায়-তার বিষয় বাঙ্গালার কোন্ লেখকের লেখায় স্থান পাইয়া থাকে? একে দরিদ্র, তার উপর জাতিভেদ—বহুদিন হতে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে তাদের সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। অথচ, ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, যদিচ বীভৎসরূপে সন্দেহ নাই, প্রকৃত প্রাণের খেলা তাদের ভিতর দিয়াই হইতেছে—জীবন-সংগ্রাম কি প্রকার ভয়াবহ সত্যকার ঘটনা তাদের কাছে! সত্যের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া শুধু মিছাকে অলীক কবিত্বের আবরণে ঢাকিয়া নাড়া-চাড়া করা; তাই তো এ-সব লেখা এমন প্রাণহীন, ফেকাসে—জাতিও তাই তাতে সাড়া দেয় না। ধনী রবীন্দ্রনাথের লেখায়, প্রকৃত জীবনের তেমন কোনই সংবাদই পাওয়া যায় না; সমাজের উন্নতি-বিধায়ক তেমন নূতন কোনও ভাবেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। সুখী ধনী ও স্বচ্ছন্দ-জীবন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সামান্য রকমের সুখ-দুঃখই যা কিছু তাঁর লেখায় স্থান পাইয়াছে; তাদের জীবনে যেমন গভীরতা বা প্রাণমনধ্বংসকারী কোনও ঘটনা বা ভাবের সমাবেশের অবকাশ কম, তাঁর লেখায়ও তেমনি মনপ্রাণ-আলোড়নকারী হৃদয়-মন্থনকারী ভাব নাই। সবই কেমন ভাষা ভাষা,—কেমন সব মিহি মিষ্টিসুরে, মিহি সুখ দুঃখের বিষয় লেখা। সর্ব্বোপরি

আছেন—ভগবান ; তাঁর উদ্দেশে কত সব সুন্দর প্রার্থনা সঞ্চিত। কে তিনি ? যাঁর রচিত জগতে দরিদ্র সুখ বলিয়া এ-পর্য্যন্ত কোনও জিনিষের সন্ধান পাইল না ; শুধু কাঁদিবার, কষ্ট পাইবার, নানা প্রকারে ধনীর পদে লাঞ্ছিত দলিত হইবার জন্যই যে তার সৃষ্টি। প্রাণান্ত হইয়া তাকে ধনীর জীবন-রথ চালাইতে হইবে—এই তো সমাজ। যিনি অর্থশালী, যাঁর জীবন সুখের, তিনিই এ-ভগবানের বন্দনা করিতে পারেন। দরিদ্রের তাঁর সঙ্গে কি সম্পর্ক—শুধু পীড়ক মূর্ত্তিতেই যাঁর সঙ্গে তার পূর্ব্বাপর সাক্ষাৎ ? তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার দরিদ্রের আর সময় নাই, দরকারও নাই তার। এতদিন ধরিয়া ধনীর শিক্ষায় এমনভাবে তার সঙ্গে মিলিয়া কত প্রার্থনাই সে করিয়াছে, কিন্তু তার দুর্গতির সামান্য লাঘবও হয় নাই। তার পাছে পাছে চলিয়া তার কি লাভ হইয়াছে এপর্য্যন্ত ? আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই, এই বিজ্ঞানের দিনে, যখন প্রমাণ ব্যতীত কোনও কথাই লোকে বিশ্বাস করিতে চায় না,—রবীন্দ্রনাথের মত মনীষী কেমন করিয়া এমনভাবে ভগবানকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন। কিছু পাইয়াছেন কি তিনি তাঁকে ডাকিয়া ? তাঁর দর্শন-লাভ হইয়াছে কি ? এ-সব যখন ভাবি, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রায় সবই কেমন অর্থশূন্য ভিত্তিবিহীন উক্তির সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। আর তাঁরই শুধু কেন, জগতের অনেক লেখকের অনেক লেখাই এমন। নূতন দৃষ্টি লইয়া নূতনভাবে জীবন-ব্যাপারকে দেখিতে হইবে ; নূতনরূপে সব জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণের সময় আসিয়াছে। কত অসার জিনিষই না এ পর্য্যন্ত মূল্যবান্ রত্নরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে জমিয়া রহিয়াছে ; ধর্ম্মের ছাপ, ভগবানের ছাপ ধারণ করিয়া এভাবের কত গ্রন্থই না সমাজের উন্নতির স্রোতের মুখে বিঘ্নস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। কত আদরের গৌরবের Paradise Lost, Devine Commedyকেই না কালে আবর্জ্জনা-জ্ঞানে আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দিগকে ঝাঁটাইয়া সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

কই সেই নবযুগের কবি, লেখক,—যাঁর লেখার ভিতর দিয়া প্রকৃত জীবনের সঙ্গে পরিচিত হইয়া—সাহিত্য-চর্চ্চা সার্থক মনে করিতে পারিব; যিনি নূতনের বাণী শুনাইয়া নূতন জীবনের পথে অগ্রসর হতে জাতিকে উদ্বোধিত করিবেন?

২২.৭.১৫।—কয়েক দিন যাবৎ চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত 'ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা' পড়িতেছিলাম। কাল বিকালে, অন্য কি কাজ করি করি ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে পুস্তকখানিই শেষ করা গেল।

চৈতন্যের জীবন, বাঙ্গালার মহাসম্পদ। চৈতন্য, রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ধর্ম্মজগতে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চারি ব্যক্তি। চৈতন্য, ভক্তির অবতার; রামমোহন, জ্ঞানোপাসক একেশ্বরবাদী, ভারতের নবজীবনের পথপ্রদর্শক; কেশবচন্দ্র, জাতিভেদধ্বংসকারী সাম্যভাবের প্রবর্ত্তক, এবং বিবেকানন্দ, সেবাধর্ম্মের মহোপদেষ্টা।

চৈতন্য ধর্ম্মোন্মাদ ছিলেন; শেষকালে সত্য সত্যই তিনি আত্মহারা পাগল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কখন যে কোথায় কি ভাবে যাইয়া মারা পড়েন, এই চিন্তায় তাঁর শিষ্যেরা সকল সময় ব্যাকুল থাকিতেন। তাঁর মৃত্যুর বিষয় ভাবিলেও ইহাই অনুভূত হয়, যে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় মরেন নাই।

ভক্তি তাঁর জীবনের প্রধান উপাদান ছিল। এই ভক্তি ও প্রেম বলে, তিনি রাজা প্রতাপরুদ্র হতে আরম্ভ করিয়া দীন চণ্ডালকে পর্য্যন্ত একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। তাঁর ভক্তি-বিমণ্ডিত অনুপম-সৌন্দর্য্য-বিভাষিত মূর্ত্তি যে দেখিত, সেই তাঁর চরণে প্রণত হইয়া পড়িত। পূর্ব্বকালে বুদ্ধদেবেরও লোকের উপর এমন প্রভাব ছিল। উভয়েই চরিত্রসম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, উভয়েই বিষয়-বৈরাগী মহাজ্ঞানী ছিলেন, জীবন-ক্ষুধা

৮৫

নিবৃত্ত করিবার জন্য উভয়েই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন; পার্থক্য, একজন ঈশ্বরে মহাভক্তিমান ছিলেন, কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন, আর একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন।

চৈতন্য যে কিদৃশ মহাশক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, তা' তাঁর শিষ্যদের দিকে দৃষ্টি করিলেই অনেকটা উপলব্ধি হয়। তাঁর আকর্ষণে রাজমন্ত্রী রূপ সনাতন, মহা ধনীর পুত্র রঘুনাথ, ভিখারীর বেশে ভগবানের সেবায় দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। নিতাই, অদ্বৈত, জীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস— এমন শিষ্যবৃন্দের তুলনা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? যেমন বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতিরাজ্যে চারিদিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠে, অকস্মাৎ দেশান্তর হতে আগত বিহঙ্গমের কাকলীধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হতে থাকে,—সেই প্রকার চৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার জীবনে হঠাৎ কি এক নবভাবের সঞ্চার হইল, আর অমনি নানাদিক হতে ভক্তবৃন্দ তাঁর গুণগানে রত হইলেন ও তাঁর আরাধ্য রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমের মধুরকাহিনী অননুকরণীয় ভাষায় বিবৃত করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার 'পদাবলী-সাহিত্য' চৈতন্যের স্পর্শে যেন এক নূতন প্রাণ পাইয়া বিকশিত হইয়া উঠিল। জগতের যত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আছেন,— কৈ, সমসাময়িক সাহিত্যের উপর আর কে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন?

কিন্তু শতগুণ সত্ত্বেও চৈতন্য-চরিত্র আমার প্রাণের পূর্ণশ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। তিনি সাম্যভাবের প্রবর্ত্তক ছিলেন কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে, তাঁর হৃদয় তেমন প্রশস্ত ছিল না। তাঁর রচিত বা কথিত 'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' বাক্যে, চণ্ডাল যে জন্মগত দ্বিজ ও অন্যান্য বর্ণ হ'তে নিকৃষ্ট, এ ভাবেরই পরিচয় দিতেছে। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সচরাচর অন্যের প্রস্তুত আহার ভোজন

করিতেন না। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মণ যতই কেন উদারচরিত্র হোক্ না, অন্য জাতিকে নিকৃষ্ট বিবেচনা না করিয়াই যেন পারে না। চৈতন্যও এ মহাদোষে দোষী। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানশূন্য ভক্তি,—যা'ই তাঁর ধর্ম্মের মূলভিত্তি, তা'ও আমার কাছে চিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হয় না। রাধাকৃষ্ণকেই বা, কে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিনে ভগবানের অংশ বলিয়া বিশ্বাস করিবে? রাধিকা-সখী গোপীনীদের দেবত্বেই বা কে বিশ্বাস করিবে? তৃণের ন্যায় সহিষ্ণু হওয়া, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অনেকটা এই প্রকার তাঁর শিক্ষার প্রভাবেই, বাঙ্গালী ভবিষ্যৎকালে কাপুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁর অসারতামূলক হরির লুটের গান বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যত ক্ষতি করিয়াছে, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই করে নাই। তাঁর ধর্ম্মে কোথায়ও সাহস ও বীর্য্যের কথা নাই। অনেকাংশে তাঁরই ধর্ম্মের প্রভাবে পূর্ব্বকালের শৌর্য্যবীর্য্যশালী উড়িষ্যাবাসী এক্ষণ কাপুরুষতা ও ভীরুতার উদাহরণ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথিত আছে, চীনদেশে বাল্যকাল হতে মা সন্তানকে ক্ষুদ্র হতে উপদেশ দেন। ফল যা' হইতেছে, তা' তাদের বর্ত্তমান জাতীয়-জীবনের ইতিহাসেই প্রমাণিত হইতেছে। চৈতন্যের প্রভাবও মোটের উপর বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের উন্নতি-সাপেক্ষ নয়। বিশেষতঃ, যিনি শেষ পর্য্যন্ত নিজেই নিজকে ঠিক রাখিতে পারিলেন না, ভাবের প্রাবল্যে একপ্রকার উন্মাদ হইয়া গেলেন, তাঁকে কেমন করিয়া পূজা করিব? এ সকল দোষ বশতঃই, বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিনে, Survival of the Fittest শিক্ষার যুগে, চৈতন্য-ধর্ম্মের প্রসার-বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয়।

সে যা' হোক্, গতকল্য তাঁর অপূর্ব্ব চরিতাখ্যান পাঠে সময়টা বড় সুখে কাটাইয়াছি। রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী ও রঘুনাথের জীবনও আমার কাছে বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছে। আরও বলো,

ভক্তিই বলো,—চরিত্রের ন্যায় বল নাই। অনেকটা শুধু এরই প্রভাবে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ আজও পূজা পাইতেছেন। সেই কারণে চৈতন্য এবং তাঁর শিষ্যেরাও আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য পাইয়া আসিতেছেন ও পাইবেন।

২৫·৭·১৫।—Goetheর জীবনীর দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইয়া আসিল। পড়িতে যাইয়া একটা কথা মনে হইতেছিল। আমাদের দেশে চরিত্রের বিষয় বলিতে গেলেই স্ত্রী-পুরুষঘটিত ব্যবহারটীকেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। যিনি সে বিষয়ে সাবধান, তিনিই চরিত্রবান্ পুরুষ। সাধুব্যক্তি বলিলেই মনে করিতে হইবে—একটী অপদার্থ গোবেচারী। Goetheর চরিত্র এ-দিক হতে চাহিতে গেলে বড়ই বিশ্রী ছিল, কিন্তু তা' যে তাঁর কলঙ্কের বিষয়, সে সম্বন্ধে তাঁর চরিতাখ্যায়কের যেন দৃষ্টিই পড়ে নাই। শক্তিমান্ সাহসী পুরুষ, যার শক্তি পর-অনিষ্টে বা কুকার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া, সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী হয়—সেই আমার চোখে আদর্শ-চরিত্র। দুর্ব্বলদেহ, কোটরগতনয়ন, অতিমাত্রায় বিনয়ী ভীরু বকধার্ম্মিক জীবটী কখনো আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে না, যতই কেন না তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত।

* * * *

হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিব? কোন্ ধর্ম্মের? ব্রাহ্ম?—আমি যে ভগবানের উপর কিছুতেই বিশ্বাস জমাইয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি—হিন্দু নই, ব্রাহ্ম নই, বৌদ্ধ নই, মুসলমান, খৃষ্টান, বা অন্য কোনও ধর্ম্মমতাবলম্বী নই। আমি স্বাধীন মতাবলম্বী—যুগ-মানব। আমি জাতিভেদ মানি না; সকলে সমান ইহাই আমার মত; আমি স্ত্রীলোকের সকল বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতার পক্ষপাতী, কারণ আমি জানি, যে-যার নিজ স্বার্থ যেমন বোঝে, অন্যে তা' বোঝে না ও তা' উদ্ধারের তেমন

চেষ্টা করে না; আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, কারণ তাঁর অস্তিত্বের সন্তোষজনক বিজ্ঞানসম্মত কোনও প্রমাণ পাইলাম না; আদর্শ-অনুসরণ ও নিজ-শক্তির পূর্ণবিকাশ-সাধন চেষ্টা—ইহাই আমার পক্ষে ধর্ম্ম; আমি সংশয়বাদী, কারণ জগতের কার্য্য-কারণ কিছুই আমি বুঝিতে পারি না, কোথায় আমার উদ্ভব, কোথায় অন্ত, কেনই বা এখন আছি—সবই দুর্জ্ঞেয়; আমি নীরবতার উপাসক, সঙ্গীশূন্য, নিজ-চিত্ত-মত্ত। সকল ধর্ম্মকেই আমি কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার স্তূপ মনে করি—কারণ সকলেই যে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

২৭.৭.১৫।—রমণী সৌন্দর্য্যের দুই রূপ। এক রূপ, যা' আনন্দ দান করে, সঙ্গে সঙ্গে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উদ্বোধন করে। আর এক প্রকার, যার সুমুখে প্রাণ বিস্ময় শ্রদ্ধায় পুলকে অভিভূত হইয়া পড়ে। ভক্তের দেবীর প্রতি যে ভাব, এ-সৌন্দর্য্য চিত্তে অনেকটা সে ভাব যেন আনাইয়া দেয়। অনেক বছর হলো, যখন ল-ক্লাসে পড়িতাম, তখন পূজার সময় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে অতিসুন্দর একটী বালিকামূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এখনো যেন আমার মানসপটে তা' ভাসিতেছে। যেমন অপূর্ব্ব সুন্দরী, তেমনি তার মুখ চোখ হতে কেমন একটী সরলতা ও পবিত্রতার ভাব বিচ্ছুরিত হইতেছিল; দর্শনে আমার চিত্ত কি এক অব্যক্ত মহৎ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। যতই চাহিতেছিলাম, ততই যেন মনে হইতেছিল, আমার মত সাধারণ মনুষ্যের উপভোগের জন্য প্রভাত-লক্ষ্মীর মত পবিত্র-নির্ম্মল এ-সৌন্দর্য্য নয়। একে কেবল দর্শন করা যায়, হৃদয়ের শ্রদ্ধা দেওয়া যায়, দেখিয়া মাধুর্য্যরসে প্রাণ পূর্ণ করা চলে—কিন্তু কোন প্রকার দেহজ-সম্পর্ক, ভাবিতেও যেন sacrilegious মহাপাপ বলিয়া মনে হয়।

তার সৌন্দর্য্যও যে আমার কাছে অনেকটা এমনি বোধ হইত! চির-কালই সে আমার চোখে দেবীর স্থান অধিকার করিয়াছিল।

২৬-৭-১৫।—'নারায়ণ' পত্রিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত 'বৌদ্ধধর্ম্ম' সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধ হ'তে নিম্নলিখিত কথা ক'টী উদ্ধৃত করা গেল:—

'একজন আচার্য্য তাঁহার এক সেবককে ভিক্ষু করিবার জন্য বড়ই চেষ্টা করিতেন। সেবক বলিত, মহাশয় আমার এখনও সময় হয় নাই। কিছুদিন পরে সে আসিয়া বলিল, আচার্য্য মহাশয়, আমার আর ভিক্ষু হইবার দরকার নাই, আমি একেবারে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছি। আচার্য্য বলিলেন, কি সে এমন হইল? সে বলিল, এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই ইচ্ছা হয়, ইহাকে খুন করিয়া ফেলি। আচার্য্য বলিলেন, তবে ঠিকই হইয়াছে।'

উপরের লাইন ক'টীতে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণের ঘৃণাই শ্লেষাত্মকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি বৌদ্ধেরা, যাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গই হইতেছে সর্ব্ব জীবে প্রীতি ও মৈত্রী, কালক্রমে ব্রাহ্মণকে এমন ঘৃণা করিতে কেমন করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল—ইহাই বিবেচনার বিষয়। ব্রাহ্মণ, অন্যান্য বর্ণের উপর যুগযুগান্তর ধরিয়া যে প্রকার নানাভাবে অত্যাচার করিয়াছে ও করিতেছে, তা'তে তা'কে যে লোকে ঘৃণা করিবে, আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আশ্চর্য্য বরং এই, যে এত করিয়াও তারা এ-যাবৎ পূজাই পাইয়া আসিতেছে। ভারতের মনোরাজ্যের উপর কি আধিপত্যই না তারা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে! পূর্ব্বাপরই কত না মিথ্যার জালই এই সিদ্ধি-সাধন-উদ্দেশে রচিত হইয়াছে, কত মিথ্যা গল্প-কাহিনী,—যে কোন প্রাচীন গ্রন্থই হাতে নেওয়া যায়, তা'তেই ব্রাহ্মণের ভিত্তিহীন মহিমার কীর্ত্তন। বাল্যকাল হ'তে কথাবার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে, কাজে-

কর্ম্মে, পুঁথি-পুস্তকে, ঘাটে-পথে—সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে, সত্যই লোকে মনে করে ব্রাহ্মণ সত্যই ভগবানেরই অংশ-বিশেষ। ব্রাহ্মণের নিজের মনেও এ-ভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এতদিন ধরিয়া একই ভাব brain cell মস্তিষ্কের উপর ক্রীড়া করার ফলে, তার এমন বিকৃতি হইয়া গিয়াছে, যে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের-লোকের অন্যরূপে ধারণা করার শক্তিই একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। এমন করিয়া মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই একজাতি অন্য জাতির, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর আধিপত্য করে—ইহা একটী psychological fact মনোবিজ্ঞান-সম্মত সত্য। এত যে মুসলমানও অন্যান্য জাতির হাতে লাথিগুতো খাইল ও খাইতেছে, তাও ব্রাহ্মণ তার ভগবানত্ব ভুলিতে পারিতেছে না, অন্যান্য বর্ণও পারিতেছে না। পারিবে কি ? মাথার মগজই যে বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে, অন্যরূপে ভাবিবার শক্তিই যে এক রকম লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে।

এমন যে বুদ্ধদেব, তিনিও ব্রাহ্মণত্বের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। দুর্ব্বলতাবশতঃ, ব্রাহ্মণ ও শ্রামণকে সমান আসনে বসাইতে যাইয়া, কালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কবলে পড়িয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অপদস্ত ও পরাস্ত হইয়া ভারত হতে বহিষ্কৃত হইয়া গেল। ভারতের যা গৌরবের, তা স্থানান্তরে যাইয়া অন্যান্য দেশকে উন্নত করিল, আর যত সব অপদার্থের দল, এখনো ব্রাহ্মণের ধূলা মাথায় লইয়া, ব্রাহ্মণের দেওয়া জাতিভেদরূপ শিকলে হাত-পা বাঁধিয়া, নিজ স্বল্পায়তন জরাজীর্ণ অন্ধকার-গৃহে স্বেচ্ছায় বন্দী-অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া, জগতের একপ্রকার অস্পৃশ্য-জাতিতে পরিণত হইয়া আছে।

২৮.৭.১৫।—দিন তিনেক হইল, Goethe র জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ শেষ করিয়াছি; একটুও সুখী হই নাই। Goethe র সম্বন্ধে

কলেজের দিন কত কি ধারণা ছিল, পড়িয়াই বা কি দেখিলাম। বহু বৎসর পূর্ব্বে Faust পড়িয়া, বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়াছিলাম। সেই Fausta লেখক—এমন Goethe!

Goethe-প্রতিভার প্রধান গুণ, ব্যাপকতা; Poetry, Music, Painting, Geology, Minerology, Optics, Botany,—এমন কত কি বিষয়ই তিনি আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আর সকল বিষয় সম্বন্ধেই, কম-বেশী হোক্, নুতন কিছু আলো দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাব্য-রচনা, সর্ব্বোপরি Faustই, তাঁর প্রধান কীর্ত্তি। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে, বর্ত্তমান ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

Goethea দু একটী বাণী এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

(১) Society তে বেশী মেলামেশা ভাল নয়; Society দেয় অপেক্ষা নেয় বেশী।

(২) নিজ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার চেষ্টাই, প্রকৃত দেশ-হিতৈষণার পরিচায়ক।

(৩) সুশিক্ষিত cultured ও সুরুচিসম্পন্ন লোক যাঁরা, তাঁরা বিনা-গোলমালে জীবন কাটাইয়া যান।

৩.৮.১৫।—দর্শন Philosophyর বিরুদ্ধে নানাসময়ে নানা কথা শুনা যায়। Lewes' Biographical History of Philosophyর, ধরিতে গেলে এক প্রকার শেষ সিদ্ধান্তই হইতেছে, যে দর্শন-শাস্ত্র এ-পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় অনুধাবন করিয়াছে, তার কোনটীরই মীমাংসা হয় নাই, বা হইবার নয়; অতএব, দর্শন ত্যাগ করিয়া ইংরাজের মত common sense মোটামুটি-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সংসার চালাইবার চেষ্টা করাই ভাল। আমাদের দেশেও, পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র প্রভৃতি

প্রবাদ-বাক্য দর্শনের কূটতর্কের অপ্রয়োজনীয়তার বিষয়ই নির্দ্দেশ করিতেছে।

যিনি যাই বলুন, যতদিন মানব-সমাজ আছে, ততদিন দর্শনশাস্ত্র থাকিবেই, এই কূটতর্কও থাকিবে। দর্শন—জাতীয়-জীবনের মূল উৎস; কাব্য, বিজ্ঞান আর সমস্ত শাস্ত্রই ইহার ধারাবিশেষ। অন্যান্য সকল শাস্ত্রই এই শাস্ত্র দ্বারা সঞ্জীবিত হইতেছে।

মানবজীবন ও এই জগৎ, নানাভাবে নানাদেশের লোকের মন আলোড়ন বিলোড়ন করিতেছে, করিবে। জগৎসমস্যা নানামূর্ত্তিতে নানাজনের কাছে প্রকটিত হইতেছে। যে জাতি যতটা গভীর ভাবে এ প্রশ্নের আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে জাতির জীবনী-শক্তিও যেন তত অধিকতর স্থিতীশীল। কারণ, দর্শনই জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি। চিন্তাশক্তি মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান; সে শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষ ফল, দর্শন। এ-কারণেই, প্রাচীন ভারত বাহ্যতঃ পরপদানত হইয়াও হৃদয়-রাজ্যে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া এখনো অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম [দর্শনের সঙ্গে ভারতের ধর্ম্মের পার্থক্য নাই] এখনো জগতের কোটী কোটী লোকের জীবনগতি নির্ণয় করিয়া দিতেছে। রোম এক সময় গ্রীসের উপর রাজত্ব করিয়াছিল, কিন্তু রোমের দর্শন Philosophy ছিল না। তাই মনোরাজ্যের উপর রোমের প্রভাব কম, কিন্তু গ্রীসের সক্রেটিশ, প্লেটো, এরিষ্টটল, জেনো এখনো লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিতেছে।

বাঙ্গালী একসময় তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল প্রভৃতি তর্কে নিমজ্জিত ছিল বলিয়া মস্তিষ্কের অপব্যবহার জন্য নিন্দিত হইতেছে, কিন্তু ইহা ধ্রুব নিশ্চয়, যে দেশে এমন তর্কে লোক নিযুক্ত হয় নাই, সেখানে দর্শনেরও আবির্ভাব হয় নাই। এ প্রকার কুটিল তর্ক হতেই, ভারতের

ষড়্দর্শনের সৃষ্টি, জগতের সকল দর্শনের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের স্বল্পায়াসলব্ধ ফলের দিকে চাহিয়া যাঁরা বাঙ্গালীর স্কন্ধে শক্তির অপব্যবহারের জন্য দোষ অর্পণ করিতেছেন, তাঁরা দার্শনিকের চক্ষে হাস্যাস্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। বাঙ্গালী এক সময় ন্যায়ের চর্চ্চা করিয়াছিল—ইহা বাঙ্গালীর মহাগৌরবের, শ্লাঘার বিষয়।

দর্শন, সমাজের পুঞ্জীভূত জীবন্ত ভাব সমূহের সার। মানবজীবন সম্বন্ধে যে সকল নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবির্ভূত হইতেছে, যে সব ভাব সমাজকে আলোড়িত করিতেছে, দর্শন তাই ধীরে ধীরে নিজ কলেবরের ভিতর গ্রহণ করিয়া তার সারতত্ত্ব যা' তা প্রকাশ করিতেছে, এবং মানুষের ভবিষ্য জীবন-পথ নির্ণয় করিয়া দিতেছে। যে জাতি জীবন্ত, তা'তে নূতন নূতন দার্শনিকেরও আবির্ভাব হইতেছে। মরা-জাতি আমরা, নূতন ভাব আমাদের নাই, নূতন দর্শনও আমাদের নাই; প্রাচীন পরিচিত পথেই আমাদের চলিতে হইবে। জার্ম্মেণিতে দার্শনিকের অভাব নাই, ফরাসীদেশ ও ইংল্যাণ্ড এ-সব মহানুভব ব্যক্তিদ্বারা অলঙ্কৃত হইতেছে। যে দেশ হতে Philosopher দার্শনিক-রূপ শিক্ষাগুরুর লোপ হইয়াছে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। বর্ত্তমানকালে জাপানের অভ্যুদয় আশ্চর্য্য। জাপানের মূলে এসিয়ার, বিশেষতঃ ভারতের, যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত ভাব-সকল ক্রীড়া করিতেছে। জাপান যদি নূতন ভাবসমুহে নিজেকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে না পারে, তা হলে শুধু পরের নিকট হতে গৃহীত ভাব-দ্বারা, কতদিন নিজেকে চালাইতে পারিবে?

দর্শনকে বাদ দিলে জাতীয় জীবনের কি থাকে? কাব্য?—তা' লইয়া কি করিব? শুধু বিজ্ঞান?—তা' লইয়াই বা কি করিব? অঙ্কশাস্ত্র? তাতেই বা কি প্রয়োজন? কেন আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কে আমি, এ-সবের প্রশ্নের যদি মীমাংসা না হইল, অন্ততঃ এদের বুঝিবার যদি চেষ্টা

না হইল, তা হলে এই জীবন-যাপন ব্যাপারই যে একান্ত অর্থশূন্য হইয়া পড়ে ; এ সকল চিন্তার হাত এড়ানই বা যায় কেমন করিয়া ? এদের উপরই যে মনুষ্যত্ব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

১·৮·১৫।—জাতির মধ্যে নূতন জীবন আনিবার জন্য নব্য-দর্শনের প্রয়োজন। প্রাচীনকে বর্জ্জন করিতে হইবে ; তিন হাজার বছরের বেদ, বেদান্ত, মনু যাজ্ঞবল্ক্যকে লইয়া চলিতে যাইয়া আমাদের যে দুর্দ্দশায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে, তাও কি তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে ?

এই নব্য-দর্শনের মূল সূত্র হইবে :—

(১) ভগবান —নাই।

(২) আত্মা—নাই।

(৩) জাতিভেদ—থাকিবে না।

(৪) পুরুষ ও নারীর সব বিষয়ে সমান অধিকার।

(৫) স্ত্রী-পুরুষ, ধনী ও দরিদ্র—বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোককে, শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষা—অবৈতনিক, ও আগাগোড়া সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক compulsory and tree হইবে।

(৬) স্ত্রীলোক পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে। অবরোধ প্রথা থাকিবে না, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইবে।

(৭) স্বাস্থ্যের দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি থাকিবে ; 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্'—ধর্ম্মের একটী প্রধান সূত্র বিবেচিত হইবে। ব্যায়াম-চর্চ্চা—স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক compulsory হইবে এবং শিক্ষার প্রধান অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হবে।

(৮) ধন ও জমী, জাতির সকলের মধ্যে সমান-ভাবে প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিতরিত হইবে। একদিকে মহাধনী, অন্যদিকে নিরন্ন

নির্বস্ত্র, দরিদ্র—যেমন করিয়া হোক্ এ অবস্থা আর কখনো উপস্থিত হতে দেওয়া হইবে না।

(৯) সকলকেই পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে; অলসকে কোনও ধন উপভোগ করিতে দেওয়া হইবে না।

(১০) প্রত্যেককেই জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য অন্ততঃ একটী ব্যবসা শিক্ষা করিতে হইবে।

(১১) বিদেশ-ভ্রমণ, শিক্ষার একাঙ্গ গণ্য হইবে।

(১২) দরিদ্রতা, মহাপাপ বিবেচিত হইবে।

(১৩) অজ্ঞানতা, মহাপাপ বিবেচিত হইবে।

(১৪) নীরবতার উপাসক হইতে হইবে।

(১৫) প্রত্যেককে একটী উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে, এবং তার সাধনে দ্যূতক্রীড়কের মত সর্ব্বস্ব-পণ হইতে হইবে।

(১৬) মিছা দয়া-মায়া প্রচারিত হইবে না; তাদের স্থানে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(১৭) দেশকে ভালবাসিতে হইবে এবং আয়ের কিয়দংশ তার সেবায় প্রত্যেককে ব্যয় করিতে হইবে ও কিয়দংশ জমাইয়া রাখিতে হইবে।

(১৮) মহাসাহসী হইতে হইবে; মৃত্যুকে কেহ ভয় করিবে না। ভগবানকে ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপর ভর করিয়া চলিতে হইবে।

(১৯) অসারতার ভাব বর্জ্জন করিতে হইবে, এবং সকল সময় মনের প্রফুল্লভাব রাখিয়া চলিতে হইবে।

২৮-১৫।—ব্রাহ্মণের লেখা শাস্ত্রাদি পাঠে ও তাদের কথাবার্ত্তায় বোধ হয়, যে তারা ইচ্ছা করিয়াই কোন দিন রাজপদ প্রার্থনা করে নাই।

কি ভ্রান্ত ধারণা! প্রার্থনা করিলেই বা দিত কে? ব্রাহ্মণ ছিল রাজবাড়ীর পুরোহিত, ছিল রাজার প্রজা। তারা কি ইচ্ছা করিলেই রাজা হতে পারিত? বশিষ্ঠ মুনি কি ইচ্ছা করিলেই অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন? কোনও ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলেই হস্তিনার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিত? তাই যদি হইত, তা হ'লে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-কালীন দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন অন্যায় জানিয়াও কেন যুধিষ্ঠিরের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই? করিবেন কি? তাঁদের জীবিকাই যে রাজা দুর্য্যোধনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত। ব্রাহ্মণ ছিল যাগ, যজ্ঞ, জ্ঞান-চর্চ্চা লইয়া ব্যাপৃত—ভীরুপ্রকৃতি; বল-চর্চ্চা, যুদ্ধবিদ্যা, রাজপদ যাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলই না। প্রাচীন-ভারতে ব্রাহ্মণের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠান অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কি সব মিছা ভাবই পূর্ব্বাপর প্রচারিত হইয়াছে।

৩.৮.১৫।—বাল্যকাল হতেই, আমার স্ত্রীলোকের প্রতি কেমন যেন স্বাভাবিক ঘৃণা। তাদের হ'তে আমি দূরেই থাকিয়া আসিয়াছি। বিশেষতঃ, আমাদের দেশের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক আমার চোখে অনেক সময় একপ্রকার মানুষ বলিয়াই বিবেচিত হয় নাই। এ বিষয়ে যাকে বলে misanthrope. আমার অবস্থা অনেকটা তদ্রূপ। তথাপি, কাল বিকালে বাজারে বেড়াইতে যাইয়া রাস্তায় হঠাৎ অসংখ্য পুরুষের মধ্যে দুটী যুবতী রমণীকে দেখিয়া আমি কেমন এক নূতন ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চারিদিকের কর্কশতা, কাঠিন্য ও পৌরুষ ভাবের ভিতর সেই রমণী দুটীর মূর্ত্তি যেন আমার প্রাণে কেমন এক কোমলতা ও শ্রী-ভাব আনয়ন করিতেছিল। মনে হইতেছিল, এই সংসারে স্ত্রীলোক যদি না থাকিত, তা হ'লে কি কঠোর, কর্কশ, অসহনীয় স্থানেই না ইহা

পরিণত হইত! মরুভূমির মরূদ্যান, এদের সঙ্গেই তো জীবনের যা কিছু মাধুর্য্য, কবিত্ব, ও সৌন্দর্য্য জড়িত। শান্তি-সরোবর, এরাই জীবনে স্নিগ্ধরস আনয়ন করে। আজও বিকালে টেনিস্ খেলার শেষে, বাসায় ফিরিতে দূর হ'তে আগত একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া আমার মনে এমন ভাবই জাগিয়া উঠিতেছিল।

৫·৮·১৭।—অনেক সময়ই, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথায় বলিতে ইচ্ছা ক'রে,—

জীবনটা কিছু না ঃ,
একটা ইঃ, একটা উঃ, একটা আঃ,
জীবনটা কিছু না ঃ।

সত্যই সুখের দিক হ'তে চাহিতে গেলে, জীবনে এমন লোভনীয় কি আছে? এই তো, আমার চল্লিশ বছর বয়স চলিয়া গেল; কৈ, সুখের মুখ দেখিলাম কৈ? কেবল সুখের আশায় বিভোর হইয়াই অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু এও দেখিতেছি, ভাবিতেই মনে হইতেছে, সুখ যা কিছু, তা অতীতেই ছিল; যখন সে আসিয়াছিল, তার সঠিক-স্বরূপ বুঝিয়া তাকে প্রকৃতভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই, কোন্ ফাঁকে যেন আমার দৃষ্টি এড়াইয়া পিছনে চলিয়া গিয়াছে; এখন আবার দূর হ'তে কেমন সুশ্রী বোধ হইতেছে! এই যে আগে-পিছে সুখের লুকোচুরি, এও জীবনের এক রহস্যজাল।

শতেকের মধ্যে নিরানব্বইজন লোকের জীবনই তো আমার মত, বুঝি সুখীর সংখ্যা তার অপেক্ষাও কম। মাঝে মাঝে হঠাৎ আবার এক এক একদিন কোথা হ'তে কেমন করিয়া প্রাণের ভিতরকার কোন্ অদৃশ্য আনন্দ-উৎসের মুখ খুলিয়া যায়, যখন সংসার-বাস নিতান্তই সুখের বোধ হয়,

চারিদিক হ'তেই মনে হয় সুখ-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে-দিনের সংখ্যা নিতান্তই কম। তখন কিন্তু সত্যই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। আমার সমস্ত জীবনে হয় তো আট দশ দিন এমন হইয়াছে, যখন দেহের, মনের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া সুখ উথলিয়া উঠিয়াছে।

সুখ-দুঃখ, পাপ-পূণ্য, আঁধার-আলো এ-সব লইয়াই এ সংসার, জীবন; সবই একেরই নানামূর্ত্তি। আঁধারের ভিতর পড়িলে আলোর দিকে প্রাণ উন্মুখ হইয়া থাকে; দুঃখের দিনে পূর্ব্ব-পশ্চাতে সুখের ক্ষীণ রশ্মিটীর দিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। এমন করিয়া চলিতে চলিতে জীবনের অন্ত হইবে। তখন সবই শূন্য, আঁধার আলোর শেষ, অফুরন্ত ছট্‌ফটানির শেষ। তাই কি, ভাবিতেছি।—কি উদ্দেশ্যে এ কৌতুকময় সৃষ্টি-ব্যাপার সংশাধিত হইতেছে? কেই বা এমন করিতেছে? কেউ করিতেছে কি?

* * * *

কারণ হ'তে কার্য্য—এই যুক্তির উচ্চভূমির উপর দাঁড়াইয়াই, এই জগৎ-সৃষ্টির পশ্চাতে লোকে ভগবানের অস্তিত্ব দেখিতেছে। এ বিষয়ে আমার মত, কার্য্য দেখিলেই কারণ, এ-ভাবে যে যুক্তি, তার মূল কারণ আমাদের physiological conditionsই শারীরিক গঠন প্রণালীই এমন, যে আমরা অন্যভাবে যুক্তি করিতে পারি না। হয়তো, আমরা যে দৃশ্যমান্ জগতে বাস করিতেছি, তা ছাড়া অন্য যে সকল জগৎ আছে, তাতে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের অস্তিত্ব নাও থাকিতে পারে; সেখানে এ ভাবে যুক্তি-তর্কের অবতারণার তাই অবকাশই হয় না। সৃষ্টিতত্ত্ব-ব্যাপারের এত সোজা ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না।

৮·৮·১৫।—কয়েকদিন যাবৎ, এখানকার পাব্লিক লাইব্রেরী হ'তে আনিত Lamartine's History or the Girondists পড়িতেছি। কি চমৎকার বই! কেমন ভাবোদ্দীপক, বলিবার শৃঙ্খলা, ভাষা! অপূর্ব্ব গ্রন্থ! অনেকদিন এমন কিছু পড়া হয় নাই।

ছেলেবেলা হ'তে পড়িয়া আসিতেছি,—ফরাসীরা আমোদ-প্রিয় হাল্‌কা ধরণের জাতি, আর গম্ভীর জার্ম্মেণরা গবেষণা-তৎপর, ইংরাজেরাও নাকি অনেকটা জার্ম্মেণদের মত, উভয়েই যে এক টিউটনিক Teutonic জাতির অন্তর্গত। কিন্তু যতই এদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইতেছি, ততই দেখিতে পাইতেছি, ইংরাজী-লেখকের তুলনায় ভাষার বা ভাবের মিষ্টতায় তো ফরাসী শ্রেষ্ঠই,—ভাবের গভীরতায় ও শ্রেষ্ঠ। Les Miserables, Zola জোলার Rome Loudres and Paris, ও মোপাসার ছোট-গল্প-পাঠে, আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, যে তাদের মত একাধারে চিন্তাশীলতা, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ইংরাজী উপন্যাসে নাই। Amiel's Journalর মত এমন গভীর-ভাবপূর্ণ সুমিষ্ট গ্রন্থ ইংরাজীতে কোথায়? Joubertর Penseesর সমকক্ষ কৈ? অনেকটা Nietzsche নিট্‌সের সঙ্গে একমত হইয়া বলিতে হয়, ইংরাজ যা দেখে বা যা করে, তার ভিতরই common sense মোটামুটি-বুদ্ধির এমন ছাপ পড়িয়া যায়, যে তা শেষে common-place সাধারণ-রকমের হইয়া দাঁড়ায়। মোটের উপর, Emerson ছাড়া এমন কোনও ইংরাজী লেখকের বই পড়ি নাই, যাতে আমার প্রাণের অন্তঃস্থল তেমন গভীর আনন্দ ও শ্রদ্ধার ভাবে আলোড়িত হইয়াছে। এমন কি, সেক্স-পিয়ার, যাঁর জয়-ডঙ্কা ইংরাজ-মুখে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে, তিনিও আমার হৃদয়-অর্ঘ্য তেমন পান নাই। প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে, তাকে

বিমল আনন্দ-রসে পূর্ণ করিতে, তাঁর লেখায় এমন কি আছে? কবি ওয়াউস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির মহা-উপাসক বলিয়া পরিচিত, কিন্তু একটু বিশেষরূপে তাঁর লেখার সম্পর্কে আসিলে দেখা যাইবে, একরকম পাড়াগেঁয়ে কবি তিনি; ফুল, পাখী, গ্রাম্য-বালিকা, কৃষক ও কৃষক-পত্নী, এ-রকম ছোটখাটো চিত্র তাঁর নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়াছে অতি সুশ্রীভাবে, ভাব এবং ভাষারও কেমন সুন্দর সমাবেশ; কিন্তু যতই কেন না বলি, মোট-পট canvass ক্ষুদ্র আকারের। ইংরাজ কবিদের মধ্যে একমাত্র Browning ব্রাউনিংর লেখাতেই বর্ত্তমানকালের লোকের চিন্তা-ক্ষুধা মিটাইবার উপযোগী যা কিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। কিন্তু মোটের উপর ব্রাউনিংর লেখার ভিতর Philosophy দর্শন বলিয়া প্রকৃত কিছু নাই।

ফরাসী লেখকদের যেমন বলিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তেমনি ভাব। ফরাসীরা যে শুধু বৃথা-আমোদ-প্রিয় জাতি তা নয়। তাদের আমোদ-প্রিয়তার সঙ্গে কাব্য ও সাহিত্য চর্চ্চা-জড়িত হইয়া আছে। বড়ই সুশিক্ষিত উন্নত cultured জাতি; তাই সাহিত্য-চর্চ্চা তাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের একাঙ্গ হইয়া আছে। বইখানা পড়িতে পড়িতে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই Lamarntine লামার্টিন ও তাঁর স্বদেশ বাসীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে—ফরাসী বিদ্রোহ, রাজা লুই, রাণী মেরি এ্যাণ্টোনিট, তাঁদের সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ, স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত প্যারিসের জনমণ্ডলী, তাদের কৃত ভয়াবহ নৃশংস সমস্ত কার্য্যবাসী, ম্যারাট, শার্লটি কর্ডে, ড্যান্টন—সর্ব্বোপরি নর-দেবতা নর-রাক্ষস অতুলনীয় রোবস্পিয়ার—সবই কি অপূর্ব্ব তুলিকাপাতেই কবিত্বমণ্ডিত দর্শনের ভাবে-ভরা সরস ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে! সবই যেন চোখের কাছে ভাসিতেছে। অত্যাশ্চর্য্য, অভুতপূর্ব্ব সব দৃশ্য! অত্যাশ্চর্য্য তাদের বর্ণনা!

*   *   *   *

নদীর ধারে ধান কাটা হইতেছিল। কাটা গাছের নীচে অনেক ধান পড়িয়া থাকে। এ সকল ধানের সংবাদ কৃষকেরা নেয় না, তাহাই আহরণ করিয়া মুনিঋষিরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এরই নাম ছিল, নিবার ধান্য। নিষ্কামভাব, আত্মনির্ভরতার ভাব যাতে চিত্তে বদ্ধমূল হয়, তার জন্য তাঁরা কত না চেষ্টা করিতেন!

মনের ভিতর হ'তে প্রশ্ন জাগিতেছে, সত্যই কি মুনি-ঋষিরা চরিত্র-গৌরবে খুব শ্রেষ্ঠ ছিলেন? বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের গরু বাছুর লইয়া ঝগড়া, সর্ব্বদারাগে অগ্নিশর্ম্মা দুর্ব্বাসা, পরাশর ব্যাসের জীবনকাহিনী, বিশ্বামিত্র মেনকার ব্যাপার—এ সকল কথা মনে হইলে তো তেমন বোধ হয় না; এরাই কিন্তু ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

যতদূর বুঝা যায়, মুনি-ঋষিরা ছিলেন, এখনকার কালের টোলের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মত; বিদ্যালোচনা, বিদ্যাদান, পৌরোহিত্য, যাগ-যজ্ঞ-সম্পাদন তাঁদের প্রধান কাজ ও জীবিকা উপায়ের পন্থা ছিল। অনেকের বিশ্বাস, তাঁরা চরিত্র-বিষয়ে এখনকার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মিথ্যা ধারণা। প্রাচীন কালের যা কিছু, ঐতিহাসিকের অতিরঞ্জিত ভাষা বা কাব্যের কল্পনা-জল্পনার ভিতর দিয়া জানিতে হয়; তাই ইতিহাস-শূন্য এ-দেশে ঠিক সত্য মানুষটী কি প্রকার ছিল, জানিবার তেমন উপায় নাই। এ-জন্যই মুনি-ঋষি আমাদের চোখে এমন আরাধ্য-চিত্র হইয়া আছেন; বিশেষতঃ, তাঁরাই যে সমগ্র দর্শন, ধর্ম্ম ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। কিন্তু সত্য লোকটীর সঙ্গে পরিচিত হ'তে যাইয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণছাড়া অন্য জাতির ঘৃণায় মুনি-ম'শায়ের চিত্ত এখনকার ব্রাহ্মণেরই ন্যায় পূর্ণ। চণ্ডাল ত কুকুরের সমান, বা তার অপেক্ষাও নীচ 'শুনিচে চ সপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'—গীতার এ-বাক্যে চণ্ডালের প্রতি

ভারত-বিশ্রুত ব্যাস-মুনির কি ঘৃণার ভাবই না বিবৃত হইয়াছে! ব্রাহ্মণ-দাস রামচন্দ্রও এ-সব মুনি-ঋষিদের উত্তেজনায়, বেদপাঠ করিতেছিল বলিয়া শম্বুক-শূদ্রের প্রাণ বধ করিয়া আদর্শ রাজারূপে বাল্মীকি-ঋষির রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই মুনি-ঋষিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি কমিয়া আসিতেছে। শকুন্তলায় কণ্বমুনির আশ্রমের যে মনোজ্ঞ বিবরণ রহিয়াছে, তা' অনেকটা কাল্পনিক; মুনিদের চক্ষেও তা' আদর্শ-তপোবনের চিত্র। এ-সব চিত্র হ'তে মুনিঋষিদের চরিত্র নির্ণয় করিতে যাওয়া ঠিক নয়।

* * * *

শ্রাবণ মাসও যায় যায়, কিন্তু এখনো আমার মনের মত বৃষ্টি একদিনও হইল না। চারিদিক মেঘাবৃত করিয়া সারাদিন ধরিয়া বৃষ্টি পড়িবে, জোরে বাতাস বহিবে. মেঘ ডাকিয়া উঠিবে, বিদ্যুৎ কড়্ কড়্ শব্দ উত্থিত করিয়া চারিদিক কাঁপাইয়া মাঝে মাঝে হাসিতে থাকিবে, মাঠ ঘাট জলে ভরিয়া যাইবে—তবেই তো আনন্দ। বর্ষায় নদীতে জল হইয়াছে, যদিও তেমন কূলে কূলে ভরিয়া উঠে নাই। নূতন জল দেখিলেই কেমন যেন প্রাণে সরসতা দেখা দেয় ও স্ফূর্ত্তির ভাব জাগিয়া উঠে। আমাদের গৃহের কাছের 'ইছামতী' নদীটী, এখন কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! বেশ বেগে স্রোত বহিয়া যাইতেছে। আজ ভোরে বেড়াইতে যাইয়া, নদীর দিকে তাকাইতে বাড়ীর কথা মনে হইল। আমাদের বিক্র—! সে তো জলের দেশ, কল্ কল্, ছল্ ছল্ অমন জল, যার প্রতি তরঙ্গ প্রাণে আনন্দ-কম্পন আনিয়া দেয়,—তেমন দেশ আর কোথায় দেখিব?

১১·৮·১৫।—এমন একটা Philosophy of Lifeর দরকার, যাকে সম্বল করিয়া জীবন-যুদ্ধে নিশ্চিন্ত-মনে অগ্রসর হওয়া যাইবে, সকল

সংশয়ের যার দ্বারা সমাধান হইবে। সকল দেশের Philosopherই, এ-প্রকার একটা Philosophy প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কেহই তেমন কিছুই দিয়া যাইতে পারেন নাই, যাকে গ্রহণ করিয়া দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হইয়া বাস করা যায়।

এ-পর্য্যন্ত যত Philosophyই পড়িয়াছি, তার ভিতর তিনটাই যা-কিছু আমার ভাল লাগিয়াছে। যিনি negation of life জীবন-অবাঞ্ছনীয় ভাবের দিক হতে দেখেন, তাঁর কাছে বৌদ্ধ-দর্শন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার প্রাণ যখন দুর্বিবষহ যাতনায় দগ্ধ হ'তে থাকে, তখন এই দর্শনই আমার শেষ-আশ্রয়স্থল। সে-সময় আমার বুদ্ধদেবের উপদেশের—'আমি' নাই, 'আত্মা' নাই'—কথা মনে হয়। এ-দুটী যে মহাসত্য, সন্দেহ নাই। 'আমি' যে আছি, তার প্রমাণ কি? আর এই যে দুঃখ, নদীর বুকে মেঘের ছায়ার মত,—এরই বা অস্তিত্ব কোথায়? কিসের দুঃখ?

যিনি negation ও affirmation of life—জীবন-অবাঞ্ছনীয় ও বাঞ্ছনীয় এই দুই ভাবের মাঝে অবস্থিত, তাঁর পক্ষে গ্রাক-দার্শনিক জেনো Zeno প্রবর্ত্তিত Stoic Philosophy গ্রহণীয়। Stoic জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতি indifferent বীতরাগ; দেহ যখন জরা-জীর্ণ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন জেনো ইচ্ছা করিয়া আর অধিক কাল সংসার-বাস উচিত নয় মনে জীবনের অবসান করিয়াছিলেন। এ-ভাবে, তাঁর শিষ্যদের ভিতর আরো কতজন অনায়াসে জীবন দান করিয়াছেন। এঁরা Self-culture আত্মোন্নতিকেই জীবনের চরম-লক্ষ্য মনে করেন, মহা-কর্ত্তব্যজ্ঞানী। কত মহৎ-চরিত্রের লোকই না এঁদের ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আর যিনি affirmation of life জীবন-বাঞ্ছনীয় এ-ভাবের দিক হ'তে জীবনকে দেখিতে চান, তিনি নিট্‌সে Nietzschea মতানুসারে

চলুন্। ভগবানের ধার ধারেন না, 'আত্মার' ধার ধারেন না তিনি বোঝেন শক্তির চরম উৎকর্ষ-সাধনই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য।

কিন্তু, ইহা বলিতে হইবে, কি Stoic-দর্শন বা নিট্‌সে-দর্শন, কোনটাই জীবনের মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে সামান্য মীমাংসার আলোও দান করিতে সক্ষম নয়। সে-দুই দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ প্রকৃত কোনও দর্শন নাই ; তাই, জ্ঞানীর-সভায় তাদের তেমন স্থান হইবে কেমন করিয়া ?

* * * *

ভগবান আছেন কি না আছেন, মানুষের পক্ষে ঠিক করা অসাধ্য। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর মত কোটী কোটী, তার অপেক্ষাও সংখ্যায় বেশী গ্রহ নক্ষত্র লইয়া যে বিরাট বিশাল জগৎ কোটী কোটী বছর বিরাজ করিতেছে, তার কার্য্যকারণের মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিবে মানুষ, সামান্য মানুষ,—এও সম্ভব ? কেবল মিছা জল্পনা-কল্পনার স্তূপ জড় করা হইতেছে। যে ভগবানকে কিছুতেই বুঝা যাইবে না, পাওয়া যাইবে না, তাতে বিশ্বাস করার কোনও দরকার নাই ; ভগবান নাই।

প্রতিমুহূর্ত্তে 'আমি' ও জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছি। পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনার সংযোগ পরম্পরায় আমার দেহমধ্যে যে ধারণার সূত্র রচিত হইতেছে,—তা'হাই 'আমি' বা 'আত্মা'। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের বিনাশের সঙ্গে, বা যে শক্তি এ-ভাবের জন্মদাতা তার ক্ষীণতা-প্রাপ্তির সঙ্গে,—ইহারও বিনাশ বা অস্তিত্বের ক্ষীণাবস্থা-প্রাপ্তি। অবিনশ্বর 'আত্মা' রূপে কিছুই নাই, কারণ জগতে সবই পরিবর্ত্তনশীল ; প্রতিমুহূর্ত্তে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতিকে লইয়া জগৎ অনন্তকাল ধরিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কা'কে ধারণ করিয়া, এই মহাপরিবর্ত্তন-ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে, কে বলিবে ? 'আত্মা' নাই। 'আমি' ?—'আমি'ও নাই।

১৩.৮.১৫।—আজ চিরঞ্জীব শর্ম্মা রচিত কেশবচন্দ্রের জীবনী শেষ করা গেল। ভাল লাগিল না। লেখা কোনও কাজেরই নয়, কোনও শৃঙ্খলা নাই, বলিবার নিয়মও ভাল নয়।

কেশবচন্দ্র এমন কতকগুলি ভাবের বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, যা দিনের পর দিন সাহসের সহিত গ্রহণ করিয়া, বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য জাতিভেদের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তথাপি তাঁরা জাতিভেদের প্রধান নিদর্শন উপবীত ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ সকল ভুলিলেও যুগ-যুগান্তরের ব্রাহ্মণত্বের গৌরব ও মোহ ভুলিতে পারে না।

কেশবচন্দ্র জাতিভেদের বিরুদ্ধে মহাপ্রচারক ছিলেন। তাঁরই প্রভাবে বিভিন্ন বর্ণের ভিতর বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা বহুল প্রচারিত হইয়াছে। তিনি নব্যভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। যে সাম্যের ভাব রাজনীতি-ক্ষেত্রে অহরহঃ প্রচারিত হইতেছে, সকল জাতিতে মিলিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইবার যে আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিয়াছে—কেশবচন্দ্র নূতন বিবাহবিধি প্রণয়ন করিয়া তার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ—যে দুটী কুপ্রথা হিন্দুসমাজে ক্ষয় ব্যাধিরূপে বিরাজমান—তাঁর প্রবর্ত্তিত বিবাহ-বিধি এই প্রথাদ্বয়ের মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছে। এই বিধির কল্যাণেই পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীতে, মান্দ্রাজবাসী ও বাঙ্গালীতে, এমন কি, বাঙ্গালী ও জাপানীতে বিবাহ ও সংমিশ্রণ সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের নবযুগের পথপ্রদর্শক মহাপুরুষ!

বিবেকানন্দ অনেক বিষয়ে কেশবচন্দ্র অপেক্ষাও শক্তিশালী। বোধ হয়, ১৮৯৫ সনে তাঁর প্রথম সন্দর্শন লাভ হয়, কলিকাতায় রাজা রাধাকান্ত

দেবের বাটীতে যখন তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়। তিনি সে বার চিকাগোর মহাধর্ম্ম-সম্মেলনে হিন্দুর নাম গৌরবোজ্জ্বল করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। সভায় অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই ভাবিতেছিল, কি বক্তৃতা তরঙ্গেই না আকাশ বিকম্পিত হইবে, কিন্তু ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল ; বক্তৃতা মোটেই ভাল লাগিল না—না তাঁর তেমন গগনভেদী স্বর, না মন-মাতানের ক্ষমতা। আমরা, কলেজের ছাত্রের দল, ভাবিলাম, আমেরিকা হুজুগের দেশ, তাই এমন লোকের বক্তৃতাতেও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল,—সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিলে না জানি তারা কিই বলিত।

তারপর, বছর কুড়ি মাত্র অতীত হইয়াছে, কিন্তু এই অত্যল্পকাল মধ্যে বিবেকানন্দের নাম ভারতের ঘরে ঘরে উচ্চারিত হইতেছে ; তাঁর মূর্ত্তি, তাঁর কথা, তাঁর লেখা পত্রাবলী আজ বাঙ্গালী বালকের জীবন-মরণের সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাঁর রামকৃষ্ণ মিশনের অনুষ্ঠিত সেবা-ধর্ম্মের ভিতর দিয়া বাঙ্গালী তাঁর স্বদেশ-প্রীতি, স্বদেশবাসী-প্রীতি চরিতার্থ করিয়া ধন্য কৃতার্থ হইতেছে। শুধু কি বাঙ্গলায়, শুধু কি ভারতে তিনি পূজিত হইতেছেন, আমেরিকা ও জাপানেও, তাঁর নাম জয়ের সহিত বিঘোষিত হইতেছে।

এমন অলৌকিক প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ, তাঁর গভীর প্রখর স্বদেশানুরাগ। এমন ভাবে দেশের কথা ক'জন ভাবিয়াছেন ? ক'জন দেশ-সেবার এমন প্রকৃষ্টপন্থা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ? জ্ঞানরাজ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া, জগৎ-সভায় ভারতের ন্যায্য স্থান অধিকার করা তাঁর কাম্য ছিল। এমন তেজ ও বীর্য্য, এমন জ্বলন্ত উৎসাহই বা কোথায় দেখা যাইবে ? তাঁর এক একটী কথা ভীরু, কাপুরুষ বাঙ্গালীর প্রাণে সাহসের বহ্নি জ্বালাইয়া দেয়। তাঁর লেখায় উদ্বোধিত হইয়া বাঙ্গালী আজ দরিদ্রপীড়িত নিঃসহায় ভ্রাতাভগ্নীর সেবায় প্লেগাক্রান্ত কুটীরে, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনপদে, প্রলয়ঙ্করী বন্যার মুখে অকাতরে প্রাণ ঢালিয়া দিতেছে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, এক সেবা-ধর্ম্ম ব্যতীত তিনি তেমন নূতন কিছু দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁর চেষ্টায় হিন্দুধর্ম্ম আমেরিকায় প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্মের মূল উপাদানই জাতিভেদ, তা' যে ম্লেচ্ছদেশে কি-ভাবে প্রচারিত হইবে, তা' বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সে-দিন তাঁর 'পত্রাবলী' পড়িতেছিলাম। পাঠান্তে নিরাশ হইলাম; তেমন খাঁটি জিনিষ নহে—ঝুঁটা, ঝুঁটা। প্রথম প্রথম জাতিভেদের বিরুদ্ধে কত কথাই না বলিয়াছেন। একজন বাঙ্গালী কায়স্থ শিষ্যাকে লিখিতেছেন, 'তুমি দাসী লিখিয়াছ কেন? বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস-দাসী লিখিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব-দেবী লিখিবে। কেন, তিনি নিজে কায়স্থ ছিলেন বলিয়া কি? শূদ্র ও বৈশ্য এমন কি দোষ করিল? 'অপিচ, জাতি ইত্যাদি ব্রাহ্মণ মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কার দাস? সকলেই হরির দাস।" আর একস্থানে আছে, "ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হ'য়ে ভীমরতি হ'য়েছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে, তোমাদের জাত যায়। এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট্ কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ব'সে আছ, হাজার হাজার বছর ধ'রে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার ক'রে শক্তিক্ষয় কচ্ছো। পৌরোহিত্যরূপ আহম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ। শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে, তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এ কোর্‌ছই বা কি? আহম্মক তোমরা, বই হাতে কোরে সমুদ্রের ধারে পাইচারী কর্‌ছো (ইয়াকোহামা ১০ই জুলাই, ১৮৯৩)। অন্যত্র বলিতেছেন, "ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই, কৌশলে কিছুই হয় না।' কিন্তু তাঁর 'পত্রাবলী' শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে মনে হয়, তিনিও এই কৌশলের সাহায্যেই জাতিভেদরূপ মহাপাপ, যার বিরুদ্ধে, তিনি প্রথম প্রথম কত কথাই বলিয়াছেন, দূর করিতে চাহিয়াছেন।

একস্থানে লিখিতেছেন, "জাতিভেদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিও না, অথবা সামাজিক কোন কুরীতির বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার দরকার নাই। কেবল লোককে বল,—গায়ে পড়ে কারু অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যেও না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" কিন্তু কেমন করিয়া হইবে, তার কোনও কথাই বলেন নাই।

মোট কথা, বিবেকানন্দই হোন্, আর যিনিই হোন্, যে মহা অনিষ্ট-কারী প্রথার প্রভাবে আমরা যুগযুগান্তর ছিন্ন-ভিন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া আছি, সেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে সাহসের সহিত খোলাভাবে যিনি বলিতে না পারিবেন এবং তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যার সাহস নাই, তিনি আমার, নব্য-বাঙ্গালীর, নব্য-ভারতবাসীর প্রাণের পূর্ণ অর্ঘ্য পাইবেন না বা পাইবার উপযুক্ত নন। সত্যই, ফাঁকি দিয়া কোনও মহৎ কাজই হয় না। এক স্থানে লিখিতেছেন, "বুদ্ধ হইতে রামমোহন পর্য্যন্ত সকলেই এক ভ্রম করিয়াছিলেন, যে জাতিভেদ একটা ধর্ম্মবিধান। সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্ম ও জাতি উভয়কেই একসঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।" হাঁ,—তাঁরা ভুল করিয়াছিলেন! জাতিভেদও যদি হিন্দুধর্ম্মের 'ধর্ম্মবিধান' না হয়, তবে কোন্‌টা তার 'ধর্ম্মবিধান'? এই জাতিভেদকে মেরুদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই তো এ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম দাঁড়াইয়া আছে। সব বুজ্‌রুকি! এও যদি চালাকি বোল-চাল না হয়, তবে চালাকি আর কাকে বলে?

আসল কথা, বিবেকানন্দ মুখে যতই কেন না বলুন, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তাঁর তেমন সাহস ছিল না; মোটের উপর, লোকটা ছিল ভীরু, অন্ততঃ এ-বিষয়ে। তাঁর গুরুদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণাচার-পদ্ধতি অনুসারে, 'কালীপূজা' করা তাঁর প্রথম জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ-সকল কারণে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ভিতর জাতিভেদ-প্রথা রহিয়াই গিয়াছে। এখনকার দিনে অবশ্য বিবেকানন্দই 'ফ্যাসন'

দাঁড়াইয়াছে, কারণ তাঁর কথাগুলি আমাদের হিন্দু আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও মতের ভিতর বিশেষ যে নূতনত্ব, কিম্বা বিশেষ যে সার আছে, বোধ হয় না। সেবা-ধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজ হ'তেও ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইতেছিল ; বিবেকানন্দের দল তাকে স্বদেশ-প্রীতির সঙ্গে যোগ দিয়া ও অভূতপূর্ব্ব নিঃস্বার্থপরতা দেখাইয়া তাকে বিশেষ-ভাবে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। তজ্জন্য দেশবাসী তাঁর কাছে মহাকৃতজ্ঞ। কিন্তু ইহা ঠিক্, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের আচার নিয়মাদি মানিয়া চলে বলিয়াই অনেকটা রামকৃষ্ণ-মিশনের এই অল্পদিন মধ্যে এমন পসার হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায়ের অদ্ভুতদর্শন, শূন্য-কচ্ছ গৈরিক-বেশধারী সন্ন্যাসীদের দিকে চাহিলে, টিকিধারী বা তদ্রূপ-বেশধারী মুণ্ডিত-মস্তক বৈরাগীদের কথাই মনে হয়। তাদের গান-বাজনা, এঁরা অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন ; তাদেরই মত মহোৎসব, জন্মোৎসব ইত্যাদিও ইতিমধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। চৈতন্যও তাঁর শিষ্যানুশিষ্য যেমন অত্যল্পকাল মধ্যেই ভগবান ও তাঁর অংশ-বিশেষরূপে পূজা পাইয়াছিলেন, এঁদের গুরুদেব 'রামকৃষ্ণ পরমহংস'ও ইতিমধ্যেই সেই প্রকার অবতাররূপে পূজিত হইতেছেন। যেমন দেখা যাইতেছে—বিবেকানন্দও শীঘ্রই প্রমোশন পাইয়া ভগবানের ক্লাসে যাইবেন এবং ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি ছোট ছোট 'আনন্দ'গণও কালে ছোট ছোট 'ঠাকুর'রূপে পূজা পাইবেন।

বিবেকানন্দ ধর্ম্মের আবরণে স্বদেশ-প্রীতিই অধিকতর প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁর মূল 'বেদান্ত' ধর্ম্মটী এমন সব প্রাচীন কুসংস্কারের উপর স্থাপিত, যে তার প্রচারে দেশের উপকার যদি বা কিছু হইতেছে, প্রকারান্তরে তুলনায় অপকার হইতেছে, যদিচ সূক্ষ্মভাবে, তার অপেক্ষা বেশী। ভারতে এবং শুধু ভারতে বলি কেন, জগতে সেবা-ধর্ম্ম, যার প্রচারই বিবেকানন্দের বিশেষত্ব ও মহা-গৌরবের বিষয়, প্রথম প্রচারিত

হইয়াছিল, বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক। কিন্তু তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মে জাতিভেদের গন্ধও ছিল না, সাম্যের আলোকে তার একদিক হ'তে অন্যদিক উদ্ভাসিত, পৌত্তলিকতারও তাতে স্থান ছিল না। বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন-সব মানুষ-পূজার পথ সুগম হইয়া উঠিতেছে। বৈধব্য প্রথা, রমণীর পরাধীনতা, জাতিভেদ-বিলোপ, অসবর্ণ-বিবাহ-প্রবর্ত্তন, সমাজের কোনও উন্নতিস্কর প্রাণবর্দ্ধক প্রস্তাবের সপক্ষে তাঁর শিষ্যবর্গকে শক্তি নিয়োগ করিতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, তাঁদের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার ফলে, প্রাচীন কুসংস্কার সব আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, এবং তাঁদের অনুকরণে নানা বেশধারী কুসংস্কারপূর্ণ 'স্বামীজী'ও 'সন্ন্যাসী' এবং তাঁদের শিষ্যদের আবির্ভাবে বঙ্গের ভবিষ্যতের উন্নতির পথ দ্রুতগতিতে বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে।

কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ অপেক্ষা ভাবের বিশালতা ও নূতনত্বে বড়, কিন্তু এক কলঙ্কেই তাঁর এমন দিব্য-চরিত্র ম্লান হইয়া আছে। তিনি নিজে যাই কেন না বলুন, কুচ্‌বিহার-বিবাহে তাঁর হৃদয়-দৌর্ব্বল্য এমন ভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে; যে সে বিষয় ভাবিতে গেলে, আর তাঁর প্রতি ভক্তি রাখা কঠিন হইয়া উঠে।

তাও বলিব, কেশবচন্দ্র যে সব পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাতেই জাতির মুক্তি, এবং বিবেকানন্দ মূলবিষয়-সম্বন্ধে মোটের উপর মিথ্যা পথপ্রদর্শক false prophet।

ভগবান-বিশ্বাসী সাধু আমার প্রাণে ভক্তিশ্রদ্ধা উৎপাদন তো করেই না; বরং, তাঁর দর্শনে, দয়া বা ঘৃণার ভাবই উদ্রেক হয়। ভগবান ঘাড়ে একবার চাপিলে, সিন্দাবাদ নাবিকের স্কন্ধের উপরের দৈত্যের মত যে আর তাকে ত্যাগ করা যায় না। ভগবানকে তো কেউ

এ-পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না; তাও মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ, সকল সময়েই, 'হা ভগবান্! হা দয়াময়! কৃপা কর, ভাল কর প্রভৃতি কাতোরোক্তিতে কান ঝালা-পালা করিয়া তোলা। ভ্রান্ত ব্যাকুবের দল! কেশবচন্দ্রকেও এই জন্য আমার ভাল লাগে না, ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-পদ্ধতিও ভাল লাগে না। নিরামিষ ভোজন, যা তিনি প্রবর্ত্তিত করেন, এবং বিনয়ী ও নীচ হইয়া চলা প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল তাঁর ব্যবস্থা—ও-সব তো বৈরাগীদের উপযুক্ত।

যে প্রকার দেখা গেল, তাতে মনে হয়, আরো কয়েক বছর বাঁচিয়া গেলে, কেশবচন্দ্রও আলখোল্লাধারী বৈরাগীতে পরিণত হইতেন। তাঁর জীবনী পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছিল, তিনিও যেন অত্যধিক ভাবের চাষ করিতে করিতে, শেষটায় চৈতন্যের মত চিত্ত-স্থিরতা balance of mind হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অহরহই যেন কাজ করিবার ইচ্ছা, কি যেন করা হইল না রূপ একটা অশান্তিময় ভাব—তাঁর অনুষ্ঠিত সকল ব্যাপারেই প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্য তো শেষ-বয়সে একপ্রকার পাগলই হইয়া পড়িয়াছিলেন; কেশবচন্দ্র সম্বন্ধেও কেহ কেহ প্রায় সেরূপ মত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মৃত্যু-রজনীতে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক শিষ্য আনন্দের কাছে বিবৃত জ্ঞান-গম্ভীর শান্ত-মধুর কথা-বার্ত্তার বিষয় পড়িতে যাইয়া, চিত্তপটে যে মহানুভব প্রশান্ত-হৃদয় সৌম্য-শান্ত মহাপুরুষের ছবি জাগিয়া উঠে, অন্য কোনও ধর্ম্মপ্রচারকের জীবন-কাহিনী পাঠে কি তেমন হয়?

১৪.৮.১৫।—ধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, শক্তি forceই শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হইয়াছে। জ্ঞান ও যুক্তি, শক্তির কাছে পূর্ব্বাপর পরাস্ত। হিন্দুর দেব-দেবীতে, খ্রীষ্টানের যীশুতে, মুসল-

মানের মহম্মদে—কোন্ জ্ঞানী লোক বিচার করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে? যত সব কুসংস্কারের উপর, বিজ্ঞান-বিরোধী বোল্‌চালের উপর স্থাপিত যত সব ধর্ম্ম, কিন্তু একজনের পর আর একজন, এমন করিয়া দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর—সমস্ত বাধা অমান্য করিয়া এ-সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, এবং কালে নদীর মুখে পাহাড়ের মত, সমস্ত প্রতিবন্ধক অপসারিত হইয়া গিয়াছে। Fanatic গোঁড়াকে প্রথম প্রথম লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু তার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইবার কার ক্ষমতা? কিন্তু ইহাও ঠিক, ধীরগামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শক্তির পদানুসরণ করিয়া তার রাজত্ব ক্রমে ক্রমে কাড়িয়া নিতেছে। ধীর কিন্তু সুনিশ্চিত জ্ঞানের কাজ। এমন দিন আসিবে, যখন তার কল্যাণে একটী মুসলমান, একটী খ্রীষ্টান, একটি হিন্দুও পৃথিবীতে থাকিবে না—যখন তার আলোকপাতে এ-সকল ধর্ম্মমত কুসংস্কারের রূপান্তর বলিয়া লোকে পরিহার করিবে। প্রাচীন মিশর ও এশিরিয়ার প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের এক্ষণে এমন অবস্থা। অবশ্য, সে-দিন আসিতে এখনো অনেক দেরী।

* * * *

ভারতের বাঁচিবার একমাত্র উপায়—তার প্রাচীন দর্শন, ধর্ম্ম ও সমাজ-তত্ত্ব ত্যাগ করা। ত্যাগ করিতে হইবে—ব্রাহ্মণ, তার শাস্ত্র, তার জাতিভেদ, স্ত্রী-পরাধীনতা; ত্যাগ করিতে হইবে,—ভগবানে, অবিনশ্বর 'আত্মায়', কপালে বিশ্বাস। গ্রহণ করিতে হইবে,—জ্ঞান-বিজ্ঞান; গ্রহণ করিতে হইবে—সাহস, কাঠিন্য, সাম্য, মৈত্রী ও সর্ব্বোপরি ন্যায়।

১৫.৮.১৫।—কাল বিকালে বাজারের দিকে বেড়াইতে যাইয়া রাস্তায় দুটী বিধবা স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলাম। একটী বৃদ্ধা—অন্যটী যুবতী, সুন্দরী। দ্বিতীয়টী কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিল, প্রথমা তাকে ধরিয়া

প্রবোধ দিতে দিতে লইয়া চলিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইল, কোনও আত্মীয়-বিরহে দ্বিতীয়টী শোকে মুহ্যমানা।

এ-দেশের স্ত্রীলোকদের দিকে যখনি আমি দৃষ্টি করি, তখনি কেমন এক দুঃখের ছায়া আমার প্রাণ ঢাকিয়া ফেলে। এমন দুঃখী নিঃসহায় অন্যায়রূপে-প্রপীড়িত জীব জগতে নাই। এদের প্রকৃতিদত্ত প্রখর বুদ্ধি শিক্ষার অভাবে কালক্রমে ম্লান হইয়া পড়ে। সকল বিষয়ে—কি মুখ-গ্রাসের জন্য, পরিবার কাপড়খানার জন্য, সামান্য দুটী পয়সার জন্য—সকল সময়ই এদের পুরুষের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে—সকল অবস্থাতেই এরা পুরুষের অধীন। ইহাই ভারতের মহাবুদ্ধিমান্ শাস্ত্রকার মনুর ব্যবস্থা, যাঁকে তাঁর বুদ্ধিমান্ দেশ-বাসীরা হাজার হাজার বছর ধরিয়া অন্ধের মত অনুসরণ করিয়া গর্ব্ব নিতেছে।

বড়ই কোমল এরা; মমতায় হৃদয় পূর্ণ, মূর্ত্তিমতী দয়া। তাই, আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে বা তিরোধানে এদের প্রাণ শোকে ফাটিয়া যায়। যতদিন সাংসারিক অবস্থা ভাল থাকে, স্বামী বা সন্তান উপার্জ্জনক্ষম থাকে, ততদিন তাও একপ্রকার চলিয়া যায়, কিন্তু যখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যত দুঃখ কষ্টের বোঝা এদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। পুরুষের দৌরাত্ম্যে ইহারা সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিতা, নিঃসহায়া; এমন সাধ্য নাই যে, নিজেরা উপার্জ্জন করিয়া, চেষ্টা করিয়া, সাংসারিক অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিবে, অথচ শিক্ষা পাইলে ইহারাও পুরুষের মত উপার্জ্জন করিতে সক্ষম। শাস্ত্রকারদের ব্যবস্থামত মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহারা যে খাঁচার পাখী, বাইরে পা বাড়াইলেই সর্ব্বনাশ; মানুষ হইয়াও মনুষ্যত্বের আস্বাদ হ'তে এরা চির-বঞ্চিত। সুখের দিনে, এদের বুদ্ধি-পরামর্শ নেওয়াও কেহ তেমন সমীচীন মনে করে না,

কিন্তু বিপদ দেখা দিলে, এরাই সংসারের মেরুদণ্ড হইয়া দাঁড়ায়। তখন ইহারা নিজেরা না খাইয়া অন্য সকলের আহার যোগায়, ভিক্ষা করিয়া নিজ-জনের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করে। তখন, এদের মত সাহস, প্রাণের বল পুরুষের মধ্যে দেখা যায় না। কোমলতা ও কাঠিন্যে মিলিয়া রমণী এক অপূর্ব্ব জিনিষ; পুরুষ অপেক্ষা মূলতঃ সে অধিক শক্তিশালী, দৃঢ়চরিত্র। ইহারা যেমন কঠিনচিত্ত একমন হইয়া সংসার পরিচালন করিতে সক্ষম, পুরুষ তেমন নয়। বাল্যকাল হ'তেই গৃহের সঙ্কীর্ণ-সীমার ভিতর,—যেখানে সর্ব্বক্ষণ বাইরের যত দুঃখকষ্ট আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত জমা হইতেছে,—বাসহেতু, দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে পূর্ব্বাপরই এরা বিশেষরূপে পরিচিত, তাই সাধারণ দুঃখ-কষ্টে দমে না। ছেলে-পুলেদের কাঁদাকাটি, আব্দারের সঙ্গে বিশেষ করিয়া এরা পরিচিত; তাই কারো অনাবশ্যক কাতর ক্রন্দনে এরা টলে না, খোলা কঠিন সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া যেমন অবিচলিতচিত্তে এরা চলিতে পারে, পুরুষ তেমন পারে না। অনাবশ্যক ভাবুকতা, দয়া, এদের কাজ-কর্ম্মে দেখা যায় না। আসন্ন-মৃত্যু আত্মীয়ের শয্যা-পার্শ্বে এ-সকল বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি যেরূপ অটলভাবে স্থিরচিত্তে বসিয়া শেষ পর্য্যন্ত সেবা-শুশ্রূষা করে, দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষের পক্ষে তা অসম্ভব।

ক্ষুদ্র সংসারটীকে লইয়াই, এদের জীবন কাটাইতে হয়, তাই বিপদের দিনে পুরুষের পক্ষে যেমন বাইরের দশটা বিষয়ে হাত দিয়া সময় কাটানো সম্ভবপর, এদের পক্ষে তেমন কোনও সুযোগ নাই। বিপদকে সঙ্গে লইয়াই এদের সব সময় চলিতে হইবে। দুঃখের দিনে, দুঃখকে গায় মাখিয়া লইতে হইবে; মৃত্যু যখন গৃহে দেখা দিবে, তখন মৃতকে লইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। ভারতের রমণী! তোমার মত দুঃখীনী জগতে নাই। ভারতের পুরুষ! তোমার মত স্বার্থান্ধ স্বার্থপর

কোথাও নাই। মেয়ে, বোন, স্ত্রী, মা—এদের অশিক্ষিত নিঃসহায় অবস্থায় গৃহের ভিতর বদ্ধ রাখিয়া তুমি যে তোমার নিজ-পায়েই কুড়ালের ঘা মারিতেছ,—তা দেখিতেছ না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্র ভুলিয়া যাও, তার শেষ চিহ্নাংশ নদীজলে নিক্ষেপ কর। জগৎ জুড়িয়া চারিদিকে এমন নূতন আলো দেখা দিয়াছে, তিন হাজার বছরের পুরাতন পুঁথি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তার অনুগামী হও। কই, প্রাচীন শাস্ত্রকারদের প্রবর্ত্তিত পোষাক পরিচ্ছদ তো তুমি আর দেহে ধারণ করিতেছ না; অনেক দিন হ'তেই যে সে সব অচল অব্যবহার্য্য হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবে, তোমার মনকে কেন তাদের পরিত্যক্ত কুসংস্কারের আবরণে ঢাকিয়া রাখিবার অবসর দাও? নূতন জ্ঞান-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া, দেহ মনের ময়লা ধৌত করিয়া, নির্ম্মল-পবিত্রচিত্তে, আলোর-সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিয় অগ্রসর হও। অন্যান্য দেশ যেরূপে মানুষ হইয়াছে, তোমাকেও অনেকটা সে-ভাবে মানুষ হইতে হইবে। মনে করিও না, তোমার পুরাতন জীর্ণ পুঁটলীতেই যত জ্ঞান-বুদ্ধি জমা হইয়া আছে, আর অন্য যত সব ব্যাকুব। রমণীদের শিক্ষা দাও, পূর্ণ স্বাধীনতা দাও, তারা যে স্বাধীন জীব, তাদের বুঝিতে দাও; তোমার অপূর্ব্ব-বিকট সতী-ধর্ম্মের ব্যাখ্যার চাপে ফেলিয়া আর তাদের জীবন দুর্ব্বিষহ: করিয়া রাখিও না। তুমি নিজে অজ্ঞান, অমানুষ; তাই বুঝিতেছ না, তোমার অজ্ঞানতাবশতঃ অন্যের জীবনও নষ্ট করিতেছ। রমণী মানুষ হোক্, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাপ, ভাই, স্বামী, পুত্রও মানুষ হোক্,—ভারতে নবজীবন দেখা দিক্।

১৭.১০.১৫।—অনেক দিন পরে, একখানা ভাল বই পড়া গেল—In Tune with the Infinite by Trine। বইখানার নামও শুনিয়া আসিতেছিলাম অনেক দিন হ'তে।

এমন একখানা বই, যা পড়িলে প্রাণে নূতন আশার বাণী শুনা যায়, জীবন বাঞ্ছনীয়, উপভোগ্য মনে হয়। যে ভগবান-বিশ্বাসী, তার পক্ষে তো কথাই নাই; তা নয় যে, সেও পাঠে মহাফল লাভ করিবে।

Trineর মতে, এই যে দৃশ্যমান বিশ্বচরাচর, তার পিছনে এক অনন্ত শক্তির আধার-স্বরূপ ভগবান বিরাজ করিতেছেন। যতদিন লোকের ইচ্ছা ও কাজ, এই শক্তির অনুগামী হয়, ততদিন তার কার্য্যকরী শক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার সুমুখে বিদ্যমান—ইচ্ছা করিলেই তার আহরণে তোমার শক্তি বৃদ্ধি করিতে পার।

মানুষের পক্ষে এই শক্তির মূল উৎস—চিন্তা। যে ভাবে সে চিন্তা করিবে, সে ভাবেই সে গঠিত হইবে। যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—ধ্রুব সত্য এই কথা।

মনকে সকল সময়েই, কি সম্পদে, কি বিপদে, উৎসাহে, আনন্দে, আশায় পূর্ণ রাখিবে—নিরাশার সামান্য ঠাণ্ডা বাতাসও যেন সেখানে প্রবেশ করিতে না পারে; ইংরাজীতে যাকে optimistic mood বলে, সব সময় সে-ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। Pessimist দুঃখবাদীর পক্ষে উন্নতি কষ্ট-সাধ্য।

"জীবন গড়িবে
হাসির মতন করি।"

নিতান্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে,—বাইরে যার নোংরামি, ভিতরেও সে নোংরা। যে অর্থের দিকে চাহিয়া ছেঁড়া নোংরা কাপড় পরে, অপরিচ্ছন্ন থাকে, তার পক্ষে প্রতিপত্তি অর্জ্জন কঠিন।

স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। সুখাদ্য খাইবে, নিয়মমত ব্যায়াম করিবে, নির্ম্মল বায়ু ও সূর্য্যের আলো প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিবে,

এবং দেহকে সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ইহা ছাড়া, শরীরের জন্য আর কিছুই চিন্তা করিবে না। বালকের মত সদা-প্রফুল্ল থাকিবে, জীবনের খারাপ দিকে সামান্য দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিবে না, সৎ ও মহৎ কার্য্য দ্বারা জীবন পূর্ণ করিয়া তুলিবে।

গতদিনের জন্য কোনও চিন্তার দরকার নাই। গতস্য শোচনা নাস্তি, Forget the past। কল্যকার চিন্তা, কল্যই করিবে, To-morrow's supplies are not needed till to-morrow comes.

জীবনের centre মধ্য-বিন্দু, সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য কি, ভাল করিয়া বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইবে। সমস্ত শক্তি, অর্থ,—তার চরিতার্থতাতেই ব্যয়িত হইবে। পরের দিকে চাহিয়া, পরকে সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া, centre ত্যাগ করা নাই, যে যাই বলুক বা করুক।

ভয়ের রাজত্বে আমাদের বাস; সর্ব্বত্রই ভয়,—অভাবের ভয়, অনাহারের ভয়, লোকনিন্দার ভয়, আত্মীয়-স্বজনের নিন্দার ভয়, আজ যা আছে, কাল তা নাও থাকিতে পারে, এরূপ কাল্পনিক ভয়, ব্যারামের ভয়, মরার ভয়—চারিদিকেই ভয়, ভয় যেন আমাদের জীবনের নিত্য-অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি না, যে এ-প্রকার ভয়ে ভয়ে বাস করাই হইতেছে, যা আমরা হারাইব বলিয়া ভয় করি, তা হারাইবার সহজ উপায়।

না, ভয়ের কোনও কারণ নাই। মহাকবি গেটের কথায়ঃ—

'সত্যই কি তুমি তোমার কাম্য জিনিষ লাভের অভিলাষী? তা হ'লে, এই মুহূর্ত্তকেই বলে ধৃত কর। যা তুমি পার বা স্বপ্নাবেশে কখনো ভাবিয়াছ তুমি পার, আরম্ভ কর। সাহসের ভিতর প্রতিভা, ক্ষমতা ঐন্দ্রজালিক শক্তি নিহিত। কেবল নিজেকে কাজে নিযুক্ত কর, তখন

মন আপনা হ'তেই তেজোপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আরম্ভ কর, আরম্ভ কর, তা হ'লেই কাজ শেষ হইবে। পশ্চাদ্‌পদ হইও না, আশা পরিত্যাগ করিও না, কালে তোমার অভিষ্টধন পাইবেই।'

বুদ্ধদেবের কথায় বলিতে হয়, আমি সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, আমি আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, সত্যই আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিব।

অর্থসঞ্চয়-প্রবৃত্তি দরুণ অনেকেই জীবনকে stunted and dwarfed খাটো করিয়া রাখে। এমন দিন আসিতেছে, যখন অর্থ-সঞ্চয় দোষের মনে করা হইবে। নিজ শক্তি-উন্মেষ ও নিজ উন্নতির জন্য, যে অর্থের প্রয়োজন তা সম্বন্ধে ব্যয়-কুণ্ঠিতা যেন না থাকে; সৎভাবে অর্থব্যয়, ভবিষ্যতে অর্থসঞ্চয় অপেক্ষা লাভজনক হইয়া থাকে।

অসন্তোষের ভাব কখনো প্রকাশ করিও না, মনোমত পদ বা স্থান না পাইলে হতাশ্বাস হইবে না। যে কাজ পাইয়াছ, মনপ্রাণের সঙ্গে তা করিয়া যাও এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষারূপ জলে মন-ভূমিকে সর্ব্বদা সিক্ত রাখ। দেখিবে কালে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবেই।

সকল সময়েই মনে রাখিবে, তুমি ঋদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবস্থা লাভ করিবে। এই বিশ্বাসের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করো—কালে তুমি নিশ্চয়ই ঋদ্ধিমান্ হইবে। মনে মনে রাজ-প্রাসাদে বাস করিতেছি, ভাবিতে ভাবিতে কালে তুমি রাজ-প্রাসাদে বাস করিবে। মনের সহিত যে যা চায়, তাই পায়।

তুমি কি শক্তির আধার হ'তে ইচ্ছা কর? তা হ'লে, Be yourself, তুমি যা, তাই হইও, অন্তঃস্থিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সত্বা the highest within your প্রতি অকপট-আচরণ-সমন্বিত হও এবং তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার

সামাজিক রীতি-নীতি দ্বারা আপনাকে চালিত হতে দিও না। কোনও principleর উপর স্থাপিত নয়, এমন কোনও খামখেয়ালি মানুষের কপোলকল্পিত নিয়ম মানিয়া চলিবে না। কোন কারণেই, অন্যের দিকে চাহিয়া বা অন্যকে সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া, তোমার individuality ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিবে না। আমাদের বর্ত্তমান জীবন কেবলই concessionএ ভরা, a mush of concessions আপোষ-মীমাংসার সমষ্টি। এ-প্রকার concessionর ফলে, শেষ-পর্য্যন্ত কিছুই থাকে না। যখন ভগবান অথবা কোনও principleর দিকে চাহিয়া কাজ করা যায়, তখন কোনও লোক-ভয় বা নিন্দায় বিচলিত হইবার কারণ থাকে না। আর যদি পরের মানান-সই করিয়া, নিজেকে চালিত করিতে হয়, তা হ'লে তাদের মনোমতও কখনো হ'তে পারিবে না, নিজেও সুখী হইবে না।

যদি লেখক হও,—নির্ভীক হইও, মনে যা ভাল বোঝ, তাই লিখো। পরকে নকল করিও না, কিম্বা পরের মুখের দিকে চাহিয়া লিখিও না। যে চরিত্রবান, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তার লেখায় কি যেন কি থাকে, যা লোকের হৃদয়-অর্ঘ্য পাইয়াই থাকে। এ-সব লোকের প্রকাশিত ভাব অপেক্ষাও লেখায় লুক্কায়িত শক্তি লোকের মনের উপর অধিক ক্রীড়া করে। নিজ ব্যক্তি-সাতন্ত্র্য, centre জীবনকেন্দ্র ঠিক রাখিয়া, নিজ নিজ sphere ক্ষেত্রের উপযোগী কাজ করাই—মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের উপায়।

Trine নির্জ্জনতার উপাসক। কতকটা সময় নির্জ্জনে কাটাইবে; প্রত্যেকেরই এই প্রকার meditation moments ধ্যানের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

চমৎকার বই! যারা জীবন-যুদ্ধের জন্য শক্তি-আহরণ-প্রয়াসী, তাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত।

২২.১০.১৫।—Henri Ruhi and Margaret Paul লিখিত দার্শনিক Henri Bergsonর জীবনী ও তাঁর Philosophy সম্বন্ধে একখানা বই পড়িতেছি। Bergson ও Rudolph Eucken এ-দুজনই বর্ত্তমান ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। Euckenর Problem of Human life ও অন্যান্য গ্রন্থ পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছি—তৃপ্তি পাই নাই। Lifeর problem জীবন-সমস্যা, তিনি পূরণ করিতে পারেন নাই। Bergsonর Creative Evolution জগৎ-বিখ্যাত গ্রন্থ, অনেকটা দুর্ব্বোধ্য। তিনিই কি problem, solve করিতে পারিয়াছেন ?

Philosophy সম্বন্ধে কোনও নূতন বই হাতে আসিলেই, সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা আনন্দ দেখা দেয়। কলেজে যখন পড়িতাম, তখন Philosophy আমার মহাভয়ের কারণ bugbear ছিল। সেখানে যে Philosophy পড়ান হয়, তা অনেকটা তার খোসা-বিশেষ ; তারপর, পরীক্ষার চিন্তাতে তেমন সরস জিনিষও নীরস হইয়া দাঁড়ায়।

এক্ষণে Philosophy দর্শন আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পাঠের জিনিষ। সত্য, নানা মুনির নানা মত ; সত্য, কোনও মতেরই সঙ্গে আমার মনের মিল হয় না,—তথাপি ইহাতো ঠিক, দার্শনিকেরা আমারই মত জীবন-মরণ প্রশ্নের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, তার সমস্যা-সাধনে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইহাই মানব-জীবনের আদি-প্রশ্ন ও শেষ-প্রশ্ন। প্রশ্ন সমাধান করিতে কেউ পারেন নাই, কিন্তু একে লইয়া যাঁরা নাড়া-চাড়া করিয়াছেন, তাঁরাই এর সম্পর্কে আসিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে হইলেও দেবত্বের অংশ লাভ করিয়াছেন—স্পর্শমণির সংস্পর্শে নাকি সব ধাতু সোণায় পরিণত হয়। এঁরাই নর-দেবতা, সমাজের শিক্ষা-গুরু, জ্ঞান-গুরু। এঁদের চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া, এঁদের মহৎ জ্ঞান-বাণী শ্রবণ করিতে

করিতে, সত্যের জন্য এঁদের প্রাণ-তৃষ্ণা ও তার অন্বষণে অক্লান্ত যত্নের দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে—কালে সামান্য নরও দেবতার পদে উন্নীত হয়। আমিও কি হইব না?

২৪·১০·১৫।—দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গেল। বাঙ্গালা জুড়িয়া কত হৈ-চৈ, কত আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, ব্রাহ্মণ-ভোজন, অর্থব্যয় হইয়া গেল! এমনভাবে আর কতদিন চলিবে? শেষ-দিন যে ঘনাইয়া আসিতেছে—যখন দুর্গাপূজা বা কোনও পূজার নামটী পর্য্যন্ত শোনা যাইবে না, জনশ্রুতিতে সে সব পরিণত হইবে। নব্য-শিক্ষা ও নব্য-বিজ্ঞান ক্রমাগতই প্রাচীন কুসংস্কারের অট্টালিকাতে আঘাত করিতেছে; আজ কোথাও একখানা ইট খসিয়া গেল, কাল কতটুকু চূণ পড়িয়া গেল, একদিন প্রকাণ্ড একটা দেওয়াল চুর্‌মার্‌ হইয়া গেল,—এমনভাবে তার অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে।

কি শক্তির অপচয়! কি অনর্থক অ-কাজে, কুকাজে, অর্থব্যয়! দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, দানব-দৈত্য—কত আজগুবি মনোকল্পিত জন্তু, গল্প! কবে লোকে এ-সব ত্যাগ করিয়া, সত্যকে আশ্রয় করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে এবং প্রকৃত পথে চলিতে শিখিবে?

১০·১১·১৫।—যদি প্রকৃত-জীবনের আস্বাদ কেউ পাইতে চায়, তা হ'লে কোনও কাজে তার নিযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন; পাপ-কদর্য্যতা দূরীভূত করিয়া তৎস্থলে পুণ্য-সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় শক্তি নিয়োগের দরকার। মন্দ যা, তার ধ্বংস সাধন করিয়া, তার স্থানে, যা সৎ তাকে প্রতিষ্ঠিত করা—ইহাই প্রকৃত-পক্ষে কাজ work নামের উপযুক্ত। এ-ভাব হ'তে যে কাজ করিবে, সে-ই প্রকৃতরূপে অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ-

দর্শনে স্থখী হ'তে সক্ষম হইবে। ঘৃণাকে যে দূর করিতে পারিয়াছে, কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়াছে, যে-সকল কল্পিত কুপ্রথা সমাজের একাংশের লোককে অন্যাংশ হ'তে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাদের প্রভাব হ'তে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, অথবা অন্য কোন উপায়ে মানবজীবন মিষ্টতর, অধিকতর শান্তিপ্রদ ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে—সেই প্রকৃত Hero বীর, সেই প্রকৃত মানুষ।

মনুষ্যত্ব-মন্দিরের দুটী স্বর্গ-প্রবেশদ্বার—একটী চিন্তা, অন্যটী কর্ম্ম। অথবা একটী দ্বারও বলা যাইতে পারা যায়—চিন্তামূলক কর্ম্ম। যে প্রকৃতভাবে কর্ম্মে রত, তার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মহৎহৃদয়ের সঙ্গে পরিচয় হইবে, যাঁদের সংশ্রবে সে দিনের পর দিন উন্নততর ভাবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবে। বিশুদ্ধ নির্ম্মল ভাব-জলে মাঝে মাঝে কর্ম্মকে ধৌত করিয়া লইতে হইবে, তবেই তার পুষ্টতা সাধন হইবে। কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে থাকিতে দেখিতে পাইবে সে, তার চিত্ত-প্রদেশ যেন উন্মুক্ত হইয়া আসিতেছে। কালে চিত্ত পূর্ণ-বিকশিত হইয়া উঠিবে ; তখন, শক্তির পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি দেখিয়া সে আনন্দিত হইবে। প্রত্যেকের নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষানুরূপ কাজ খুঁজিয়া লওয়া এবং তাতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সর্ব্বক্ষণই আহারের বা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিলে, কালে জীবনে শূন্যতার ভাব আসিবে, যখন সংসার-বাস আর তেমন কাম্য মনে হইবে না।

ইহা অপেক্ষা, জীবন-যাপনের জন্য যে সময়টুকু পরিশ্রম না করিলে না হয়, তাতে সে-ভাবে ব্যাপৃত থাকিয়া, বাকী সময় মূল আকাঙ্ক্ষিত কার্য্যে লিপ্ত থাকাই উচিত। যেমন করিয়া হোক্, এমন একটা কাজ খুঁজিয়া লইতে হইবে, যাতে সম্যকরূপে সত্বার বিকাশ full expression হয়, যার পরিচর্য্যায় অন্তরতম আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে। ছোট বা বড় যাই-ই হোক্, তাতে বিশেষ পার্থক্য নাই—যতদিন

মহৎ উদ্দেশ্য পিছনে, ততদিন সব কাজই পবিত্র, মহান্। মৃত্তিকাখননে লিপ্ত থাক, ধাতব-দ্রব্য নির্ম্মাণ, বা প্রস্তরোপরি মূর্ত্তি রচনা করিবার কাজেই নিযুক্ত থাক, অথবা ললিতকলার মধ্য দিয়া নিজ-শক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার চেষ্টাই কর—যতদিন কেহ সমস্ত শক্তির দ্বারা, মন-দ্বারা নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজকে পূর্ণতা প্রদানে চেষ্টা করে, ততদিন তার কাজ পুণ্য-কাজ, ততদিন সে দেবতা।

কি ভাবে লোকে কাজ করিবে? শক্তির শেষ কণাটী পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া; তার কম নয়।

১৪·১১·১৫।—কিছুই যেন সমস্ত প্রাণ দিয়া করিতে পারি না। একবার ইচ্ছা করি, ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিব, ফিট্-ফাট্ চট্-পটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্ম্মক্ষম লোকটীর মত চলিব, কারণ সংসারে উন্নতির পক্ষে পোষাক পরিচ্ছদ অনেকটা সহায় বিশেষ। Lord Roseberyর মতে Dress has a commercial value, সংসার-বাজারে পরিচ্ছদের একটা বিশেষ মূল্য আছে। পরমুহূর্ত্তেই খরচের দিকে চাহিয়া আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করি। সুখাদ্য-ভোজনে শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ থাকিবে ও মন প্রফুল্ল হইবে—তাই ইচ্ছা হয়, ভাল খাইতে, কিন্তু দিন কয়েক পরেই খরচের জন্য আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করিয়া আনি। বড়ই ইচ্ছা হয়,—গ্রন্থ-চর্চ্চায় শক্তি ও অর্থ যা আছে পূর্ণ-প্রয়োগ করিব, মানুষ হইব, কোনও একখানা বই লিখিয়া অমরত্বের আস্বাদ-ভোগ করিব, কিন্তু দু-চারমাস না যাইতেই, টাকা, আনা, পয়সার হিসাব করিতে যাইয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকি। এ-ভাবে যারা চলে, তারা সফলকাম হয় না—আমিও হই নি।

বন্ধু, পরিচিতদের মধ্যে কা'রা সংসারে উন্নতি করিল? যারা হিসাবী,

বুনিয়াদি ? না, তারা নয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল ? না, তারাও তেমন নয়। বরং পূর্ব্বাপরই যারা reckless adventurer রূপে জীবন-যাপন করিয়াছে, তারাই। পরীক্ষায় তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু বৃহত্তর কার্য্যক্ষেত্রে, যেখানে জ্ঞান অপেক্ষা বাইরের বাগাড়ম্বর, সাহস ও brass নির্লজ্জতারই মূল্য অধিক, অভিষ্ট-সাধনে কি শক্তিই না তারা প্রয়োগ করিয়াছে! দেনা করিয়া ভাল পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়াছে, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মান-সম্ভ্রমের দিকে চায় নাই, প্রয়োজন হলে নিতান্ত বেহায়ার মত যাকে তাকে খোষামদ করিতে ক্রুটী করে নাই। ফলে, এক্ষণে তারা অর্থশালী, সম্পদশালী, সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত এবং সর্ব্বত্র বিচক্ষণ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত। আর ভাবিতে গেলে, আমারই কি আত্ম-সম্মান অক্ষত রহিয়াছে, না, তাদের অপেক্ষা কোন কাজের জন্য আমি অধিকতর উপযুক্ত ?

মোটের উপর, এখন স্পষ্ট দেখিতেছি, যে যা প্রাণের সহিত চায়, তার জন্য তার পূর্ণ-প্রাণ ব্যয় করিতে হইবে, যা-কিছু বুদ্ধি, শক্তি, অর্থ সব অকাতরে ঢালিয়া দিতে হইবে। তা না হলে, আজীবন হা-হুতাশ করিয়াই যাইতে হইবে।

১৭.১১.১৫।—Havell লিখিত The Basis for Artistic and Industrial Revival in India কয়েক দিন হয় শেষ করিয়াছি। ভাল বই।

কেবল আনন্দ দানই হেভেলের মতে art কলা-বিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। এ-বিষয়ে তিনি মোগল-সম্রাট আকবরের সঙ্গে একমতাবলম্বী; ইহার সাহায্যে বিশ্ব-প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে, মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশে পূর্ণতা প্রদান করাও ইহার উদ্দেশ্য। প্রকৃত শিক্ষার,

ইহা একটী প্রধান অঙ্গ। সঙ্গীত ও চিত্রকলা—এ-দুটী প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির নিতান্ত শিক্ষনীয় বিষয়।

গোঁড়া Puritan খ্রীষ্টান, বা গোঁড়া মুসলমানই—ইন্দ্রিয়-সেবা সংক্রান্ত আমোদ-প্রমোদের একাঙ্গ মনে করিয়া ধর্ম্মাচরণ হতে এদের দূরে রাখিয়াছে। ভ্রান্ত সংস্কার! যে জাতির ভিতর ললিত-কলার সম্যক পরিস্ফুটন হয় নাই, সভ্যতার পদবীতে সে-জাতি অতিনিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে ইহা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যে জাতির প্রাণে আনন্দ নাই, জীবন যার দুঃখ-প্রপীড়িত, চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার যার শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সে জাতির ভিতর কলা-বিদ্যার আবির্ভাব ও বিকাশ দর্শন কঠিন। বৌদ্ধ-যুগেই ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা ঐহিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, চিত্র ও অঙ্কন-বিদ্যাও সে-সময় সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছিল। আকবরের কাল হতে শাহাজাহানের রাজত্বের অবসান পর্য্যন্তই মোগলদের চরম উন্নতির কাল। সে-সময় মধ্যে তাদের প্রবর্ত্তিত চিত্র ও সঙ্গীত-বিদ্যাও সর্ব্ববিষয়ে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

ভারত যদি আবার আপন-জীবনে আনন্দ-স্পন্দন অনুভব করিতে চায়, আবার চিত্র, সঙ্গীত ও ভাস্কর্য্যের ভিতর দিয়া আকাঙ্ক্ষা ও সুখ অভিব্যক্ত করিতে চায়,—তা হ'লে লোকসকলকে বর্ত্তমানের নৈরাশ্য ও আত্ম-সুখে নিমজ্জিত থাকার ভাব ত্যাগ করিতে হইবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে একে অন্যের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ হইবে, একে অন্যের সাহায্য করিবে। সহর, গ্রাম, সকল স্থানের আবর্জ্জনা দূর হইবে, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, পীড়া হতে দেশ মুক্ত হইবে—জীবন যাতে প্রকৃতই আনন্দময় হইয়া উঠে, তার চেষ্টা করিতে হইবে। কলা-বিদ্যা art জীবন ও ধর্ম্মের অঙ্গে পরিণত হইবে, যেমন পূর্ব্বে ছিল। অবশ্য, পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানও ইহার সহিত সংযুক্ত হইবে, কিন্তু তা ভারতের ভাব-প্রবাহেরই একাংশ-স্বরূপে অঙ্গীভূত হইবে—এক-বিশ্বব্যাপী প্রেমের ভাবে দেশ-চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

স্কুল-কলেজ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া, হেভেল লিখিয়াছেন,—তাদের চারিদিকের দৃশ্য সুন্দর ও মনোমোহন হওয়া প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বিশেষ সম্পর্ক, আনন্দের চির-মিলন। যার সৌন্দর্য্য-জ্ঞান নাই, তার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রসারও নিতান্ত কম বলিতে হইবে। সৌন্দর্য্য-লিপ্সাই, আর একভাবে ধরিতে গেলে, প্রেম ; প্রেমের মধ্য দিয়াই যে সৌন্দর্য্যের চরম-বিকাশ হইয়া থাকে। উভয়েই মধুর! এই মাধুর্য্যের ভিতরই শান্তি, প্রকৃত-সুখ বিরাজ করে—যেখানে গোঁড়ামির গন্ধ পৌঁছেনা, হিংসা, দ্বেষ কলহের যেখানে স্থান নাই। পূর্ব্বকালের নালন্দার সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সুশোভন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ভিতর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সৌন্দর্য্য-জ্ঞান পূর্ণজীবনের একটী প্রধান অঙ্গ, সুখের একটী প্রধান উৎস। এ-জ্ঞান যাতে বৃদ্ধি পায়, তার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু হেভেলের সঙ্গে এক বিষয়ে, একমত হতে পারিলাম না। তিনি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য দেশের industrialism কলকারখানা-সম্বলিত ব্যবসা-বাণিজ্য আনিতে চান না, কলকারখানা তাঁর মনঃপূত নয়। বয়ন সম্বন্ধে তিনি তাঁত handloomএর পক্ষপাতী ; কল millএর নন। সত্য, industrialismএর সঙ্গে জড়িত হইয়া অনেক কদর্য্যতা, অশান্তি ও পাপ প্রবেশ করিতেছে ; যাতে তা না হয়, দেখিতে হইবে, কিন্তু তাকে বাদ দেওয়া চলে না। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এই সব কল-কারখানার ব্যাপার ; এদের ভিতর দিয়া মানবীয় শক্তি কেমন বিকাশ পাইয়াছে। এদের ত্যাগ করা, বুদ্ধির পরিচয় নয় ; তা হ'লে জীবন-সংগ্রামে অন্যান্য জাতির সঙ্গে হটিয়া যাওয়া অপরিহার্য্য। কলও থাকিবে, তাঁতও থাকিবে।

যে ভাবেই হোক্, আমাদের যে সর্ব্বাগ্রে ধনী হইতে হইবে, গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে হইবে, আমরা যে না খাইয়া মরিতেছি। কেবল সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠুতার দিক হ'তে দেখিলে চলিবে না, অনেক কাদামাটী ঘাঁটিয়া যে জীবনকে চলিতে হয়। আর যাঁরা ভাবিতেছেন, প্রাচীনকে পূর্ণরূপে ফিরাইয়া আনিবেন, তাঁরা স্বপ্ন দেখিতেছেন। যে স্রোতস্বতী একবার হিমালয়ের শৃঙ্গদেশ হ'তে নীচে নামিয়া আসিয়াছে, তাকে কি আর জোর করিয়া ধরিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে নেওয়া যায়? জগতের গতিই তেমন নয়; যে ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, তার আর নূতন করিয়া ফুটিবার সম্ভাবনা নাই, চিরজন্মের জন্য তার ক্ষণিক-লীলা সাঙ্গ হইয়াছে, পুনর্জন্মের সম্ভাবনা আর নাই।

২১.১১.১৫।—Margot Tenant (Mrs. Asquith) লিখিত Reminiscences পড়িতেছিলাম। Gladstone তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আমার দুটী প্রধান দোষ ছিল; দুটীকে উন্মূলিত করিবার জন্য আমি আগাগোড়া চেষ্টা করিয়াছি—প্রথমটী, ব্যয়-কুণ্ঠিতা, আমি খরচ করিতে পারিতাম না; দ্বিতীয়টী, ক্রোধকে দমন।

ব্যয়-কুণ্ঠিতা—একপ্রকার সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে মহৎ গুণ; আসলে কিন্তু তা নয়। কৃপণ-স্বভাব লোক জগতের কিছুই করে না; একমাত্র অর্থবৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনকে তারা dwarfed and stunted খাটো করিয়া রাখে। অর্থ, শক্তি-উন্মেষের সহায় হইবে, শুধু গচ্ছিত করিয়া রাখাতে লাভ নাই। হিন্দুদের এ-প্রবৃত্তি বড়ই অন্যায়-রূপে প্রবল; হিন্দু, বর্ত্তমানের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে না চাহিয়া, ভবিষ্যতের চিন্তাতেই সর্ব্বক্ষণ প্রপীড়িত। বার্দ্ধক্য ও বিপদ-আপদের জন্য কিছু জমা অবশ্য রাখিতে হইবে; তা ছাড়া অর্থ, জীবন-বিকাশের কাজে

ব্যয়িত হইবে। ব্যয়কুণ্ঠিতাও যে একটা দোষ, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। Gladstoneর মত লোকের মুখেই এমন উক্তি শোভা পায়।

২৮.১১.১৫।—আজ দুখানা বইর উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেছিলাম, দুখানাতেই একি ভাবের একটী কথা দেখিতে পাইলাম। একখানা A. C. Bensonর House of Quiet; অন্যখানা Deemsdale Stocker প্রণীত Personal Ideals।

Benson লিখিতেছেন, আমাদের চেষ্টা করিয়া, জোর করিয়া, মাঝে মাঝে নির্জ্জন-জীবন কাটানো দরকার; সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন (সোমবার) কারো সঙ্গে কথা বলিবে না। এতে অবশ্য, প্রথম প্রথম কষ্ট হইবে, কিন্তু শেষে দেখা যাইবে, পরদিন নূতন উদ্যমে ও স্ফূর্ত্তিতে কাজে ব্যাপৃত হইবার পক্ষে ইহা বেশ নিয়ম। বন্ধু-সঙ্গও পরদিন মধুরতর বোধ হইবে। নির্জ্জনতার কেমন যেন একটী আকর্ষণী শক্তিও আছে; দিনকয়েক চর্চ্চা করিলে শেষে সে-জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট ও সুখের বোধ হইবে।

Stockerর মতে প্রতিদিন কতক সময় নির্জ্জনে বসিয়া কোনও সদোদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনকে ব্যাপৃত রাখা কর্ত্তব্য।

কতকদিন পূর্ব্বে Dresserর Power of Silence এবং Trineর In Tune with the Infiniteএও এ-ভাবের কথা পাঠ করিয়াছিলাম। Trine, Stockerরই মতাবলম্বী কিন্তু Dresserর মতে এ-সব সময় উদ্দেশ্য-মূলক কোনও বিষয়ই ভাবা উচিত নয়, শুধু চুপ করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবে। আমারও এই মত—নীরব, নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকা, যেন ধীরে ধীরে শান্তি-ধারায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে; সব সময়ই যে Moral Class Book পকেটে লইয়া ঘুরিতে হইবে, এ-কোনও কাজের কথা নয়।

অনেকদিন হতেই আমি নির্জ্জনতার ভিতর যাতে জীবন কাটাইতে পারি, কথা যাতে কম কহিয়া, নির্লিপ্তভাবে শুধু নিজেকে লইয়া একাকী চলিতে পারি—চেষ্টা করিতেছি। এখন পর্য্যন্ত সফলকাম হইলাম না। কিন্তু তাও আমার চোখের কাছে দিনের দিন এই সত্য ফুটিয়া উঠিতেছে, কথা যত কম বলা যায়, কাজ করিবার শক্তিও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় এবং জীবন সুখের হইয়া উঠে। আর, ক্রোধদমনের পক্ষে, সংসারে শান্তি আনয়নের পক্ষে, নীরব জিহ্বার মত এমন মিত্র নাই। জীবনের সংশয়, সন্দেহ, সমস্যা-পূরণের পক্ষেও নির্জ্জনতার মত এমন সহায়ক বন্ধু নাই। জীবনের পুষ্টতা সম্পাদনও অন্য কিসের দ্বারা এমন হয়?

নির্জ্জনতা! নীরবতা! তোমাদের আজ আমি আবার নূতন করিয়া বরণ করিয়া নিতেছি। তোমাদের ভিতর আমার হৃদয়-মন্দির ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হোক্।

২৯.১১.১৫।—অনেক দিন হ'তে Havell লিখিত Indian Sculpture and Painting গ্রন্থের নাম শুনিয়া আসিতেছি; কাল পাঠ শেষ করিয়াছি।

কোনও লোক বা জাতি, যখন পতিত হয়, তখন ক্রমে ক্রমে আত্ম-মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলে। যার মধ্যে এই মর্য্যাদার ভাব নাই, তার ভিতর মনুষ্যত্বও নাই। হাজার বছর পর-পদানত অবস্থায় বাস-হেতু, আমরা এই আত্মাভিমান জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। যা হোক্, Sir William Jones হতে Maxmuller পর্য্যন্ত বহু ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের কল্যাণে, এতদিন পরে আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, কি ভাষা-সম্পদে, কি গভীর দার্শনিক তত্ত্বচিন্তায়, কি অঙ্ক, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে, আমরা জগতের কোনও

জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নই। দর্শন সম্বন্ধে যে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তা নিট্‌সে প্রভৃতি ইয়ুরোপের অনেক পণ্ডিতের মুখেই শোনা যায়। ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে Ferguson আমাদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁর মতে আমরা নাকি এ-সব বিষয়ে গ্রীসের শিষ্য। বালক গ্রীসের শিষ্য, জ্ঞান-বৃদ্ধ ভারত!

হেভেলের বইতে আমাদের অপরূপ ভাস্কর্য্য-লীলা ও চিত্রকলার বিষয় পড়িতে পড়িতে, চিত্ত আনন্দরসে অভিষিক্ত হয় ও আত্মমর্য্যাদার ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। যতদূর বুঝা যায়, তাঁর মতে বিষয়-বিশেষে আমাদের ভাস্কর্য্য, গ্রীস ও ইটালীর ভাস্কর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য তেমন মুখ ফুটিয়া তিনি বলেন নাই। আর বৌদ্ধ অথবা পরবর্ত্তী প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার যুগে, ভারতে যে ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছিল, তার উপর যে কোনও প্রকার গ্রীক্-প্রভাব পতিত হয় নাই, তা'ও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বরঞ্চ, প্রকারান্তরে তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন, ইটালীর Renassence যুগের ভাস্কর্য্য হয়তো ভারতের ভাস্কর্য্যের ভাবে সময়-বিশেষে indirectly পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠতার তারতম্য অনুসারে ভাবকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি—সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক। ইয়ুরোপীয় চিত্রাদিতে শেষের দুটী ভাবই বিকশিত হইয়াছে; স্বাত্বিক ভাবের বিকাশ তেমন দেখা যায় না। যা কিছু হইয়াছে, তা'ও এশিয়ার ভাবে-পুষ্ট রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের কল্যাণে, প্রোটেষ্টেণ্টদের দ্বারা নয়। ইয়ুরোপীয় চিত্র বা মূর্ত্তি এপর্য্যন্ত যতটী দেখিয়াছি, তাতে প্রাণ গভীর শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে, এমন খুব কমই দেখিয়াছি। যে সকল হয়তো খুব সুন্দর, প্রকৃতি Natureকে সকল বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসরণ করা হইয়াছে, শারীর-বিজ্ঞানের Anatomyর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, হাত, পা, মুখ

প্রভৃতি আঁকা হইয়াছে ; সবই নিখুত, কিন্তু তাও যেন কিসের অভাবে চিত্তে প্রশান্ত ভাব আসে না।

ভারতের ভাস্কর্য্য-প্রতিভার চরমোৎকর্ষ—বুদ্ধদেবের সৌম্য, ধ্যান-নিমগ্ন মূর্ত্তি। চাহিলেই যেন সব অশান্তি ও ঘৃণা দূর হইয়া এক প্রেমের, শান্তির ভাবে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে! যবদ্বীপের বড়ভূধরে প্রাপ্ত অপূর্ব্ব-শ্রী প্রাজ্ঞাপারমিতার স্থায় এমন জ্ঞান-প্রেমবিভা-বিমণ্ডিত মূর্ত্তি কোথায়? ইয়ুরোপীয় ললিত-কলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ইটালীর Virgin Maryর চিত্র, ভাবসম্পদে এদের তুলনার যোগ্য নয়। মানুষের প্রাণ চিরযুগ ধরিয়া যে পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তার সঙ্গে সংসারের পঙ্কিলতা মলিনতার সামান্য সংশ্রবও নাই। কবি-মানস-সরোবরেই সেই সৌন্দর্য্য-কমলের আবির্ভাব হইয়া থাকে—নির্ম্মল, পবিত্র, শান্তভাবোদ্দীপক; যোগীর চিত্তই তার বিকাশের স্থান। মডেল দেখিয়া আঁকা ইয়ুরোপের কোনও চিত্রই তেমন স্বর্গের সমাচার বহন করিয়া আনে না, তেমন উচ্চ-ভাবে প্রাণ পূর্ণ করিয়া তুলিবার তাদের ক্ষমতা নাই।

ইয়ুরোপ গভীর সাত্বিক-ভাবের চর্চ্চা তেমন করে নাই। তারা practical জাতি, দৃষ্টি ছোট। অসীম অনন্তের ভাব—যাকে হৃদয়ঙ্গম করাই ভারতের শিক্ষার চরমাদর্শ, তার সম্বন্ধে চর্চ্চা তারা কমই করিয়াছে। চিত্রকলা সম্বন্ধে তারা শুধু Nature প্রকৃতিকে সকল বিষয়েই অনুসরণ করিতে অস্থির। কিন্তু বুদ্ধদেবের মডেল model কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? মানব-প্রাণ-কাম্য আদর্শ-সৌন্দর্য্যের নমুনাই বা বাইরের জগতে কোথায়? ভারতের স্থায় ইয়ুরোপের আধ্যাত্মিকতা কোথায়? এশিয়া গভীর ভাবসমূহের উৎস স্বরূপ, জগতের যত ধর্ম্ম এ-স্থান হতেই উদ্ভূত। আজও ভারতে ও পারস্যে নূতন নূতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আবির্ভূত হইতেছেন, যাঁদের প্রভাব ইয়ুরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত অনুভূত

হইতেছে। কৈ, ইয়ুরোপে এত শতাব্দীতে একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকও তো আবির্ভূত হইলেন না? কেন?—কারণ, তাদের আধ্যাত্মিক-দৃষ্টির খর্ব্বতা। লোককে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য-সম্পদে মুগ্ধ করা যায়, বলে বশীভূত করা যায়, কিন্তু অন্তরস্থ আত্মা, অসীমকে লাভ করিবার জন্য যার আজন্ম আকাঙ্ক্ষা, তার শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁকেই দেয়, যিনি সংসারে থাকিয়াও বিরাগী, যিনি নিষ্পাপ, নির্ম্মুক্ত, অনন্তের ভাবে যিনি তন্ময়। এ-হেন নরদেবতা যুগে যুগে ভারতে, এশিয়াতেই আবির্ভূত হইতেছেন। সাধারণ কার্য্যক্ষেত্রে ইয়ুরোপ হতে ভারত নিকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ভাবরাজ্যে সে আজও জগতের কোন দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়।

জাপানী-লেখক অকাকুরা Okakuraও তাঁর Ideals of the Eastএ অনেকটা Havellর মতই লিখিয়াছেন। তাঁর মতে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, সমস্ত এশিয়া ব্যাপিয়া একই ভাবে অনুপ্রাণিত, একটী art-world ললিত-কলা-জগৎ বিদ্যমান ছিল। ইহার প্রভাব এক সময় সুদূর মিসর, ফোনেসিয়া, এমন কি আয়র্ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত অনুভূত হইত। সময়-বিশেষে, ভারতবর্ষ ও চীন এই art-worldর কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। বর্ত্তমানকালে জাপান সেই চিত্রকলার কিয়দংশের অধিকারী। গ্রীস এই বৃহত্তর এশিয়ার একাংশ বিশেষ, সে ভারতের শিক্ষা-গুরু নয়।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত, সকল বিষয়েই নিজদেশের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিতে ব্যস্ত। কিন্তু হায়! সত্য ক্রমেই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। আজ হেভেলের কল্যাণে ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা-শাস্ত্রে জগৎসভায় ভারতের স্থান হইতে চলিয়াছে। কালে আয়ুর্ব্বেদ ও সঙ্গীত-বিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়েও ভারতের যশঃ ফুটিয়া উঠিবে। হেভেলের কথায়,—যে জীবনাদর্শ ভারতের ভাস্কর্য্যও চিত্রকলায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তেমন উচ্চাদর্শ গ্রীসের কল্পনার অতীত; ভারতের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, ইটালীর স্বপ্নাতীত।

৩.১২.১৫।—কেন অন্যজাতির সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে হটিয়া গেলাম? কারণ, আমাদের ভিতর জাতি nationর ভাব কখনো তেমন পূর্ণরূপে বিকশিত হয় নাই। এক সময় ছিল, যখন ধর্ম্ম অনেকটা আমাদিগকে একসূত্রে গাঁথিয়া তুলিয়াছিল। সে ধর্ম্মের ভিতরই বা কত অনৈক্যের বীজ নিহিত ছিল! তাই, ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, জাতিভেদের বিষময় ফলে, আমরা গান্ধার হতে পেশোয়ারে, জাভা ক্যাম্বোডিয়া হতে বঙ্গোপ-সাগরের উপকূলে সরিয়া আসিয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছি; এখন, এ স্থানটুকুতেও যে প্রধান্য থাকে, তারও ভরসা কম। মুসলমান দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে, হিন্দু কমিতেছে; যেমন দেখা যাইতেছে, হিন্দু-সভ্যতারূপ স্রোতস্বতীটীর শুকাইয়া অস্তিত্বলোপের দিন খুব বেশী দূরে নয়।

আমরা দেশের দিক হতে কখনো নিজের দিকে চাহি নাই। যা কিছু করিয়াছি, ধর্ম্ম লইয়া। দেশে কে রাজা হইলেন, বা না-হইলেন, দেশ থাকিল, কি মরিল—তার বিশেষ কোনও সংবাদ রাখি নাই। ইয়ুরোপে, গ্রীসের অভ্যুদয় হতেই এই দেশ-ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে; গ্রীসের পর রোম কর্ত্তৃক এই স্বদেশহিতৈষণার ভাব বিকীর্ণ হইয়াছে।

ইয়ুরোপের সর্ব্বত্রই এক এক দেশকে লইয়া, এক এক মহাজাতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। দেশকে কেন্দ্র করিয়া, দেশের নর-নারী একে অন্যের সহিত সাম্য-সৌহার্দ্দের বন্ধনে মিলিত হইয়াছে—আপদ-বিপদে একে অন্যের বন্ধু; বাইরের শত্রু হতে দেশকে রক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে সকলের কর্ত্তব্য—সে কর্ত্তব্যের তুলনায় ধর্ম্মাচরণ, এমন কি, নিজ-জীবন তুচ্ছ। দেশ-সেবাই প্রকৃত পক্ষে সে-সব দেশের প্রধান ধর্ম্ম। দেশের প্রতি কে কি করিয়া গেলেন, তাকে জগৎ-সমাজে কতটা উন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়া গেলেন—ইহা দিয়াই দেশবাসীর সমাজে স্থান ও মূল্য নির্ণীত হইয়া থাকে।

তারা জানে ও শিখিয়াছে, নিজ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য অন্য সকল হতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করা শুধু স্বার্থপরতা নয়, স্বার্থের দিক হতে দেখিতে গেলেও, সঙ্কীর্ণ নীতি। চারিদিকেই শত্রু; কি জীব-জগতে, কি উদ্ভিদ-জগতে—বলশালী, বলহীনকে পদদলিত ও সংহার করিয়া বড় হইতেছে। এই ভয়াবহ ধ্বংস-যজ্ঞের মধ্যে, যারা সাহচর্য্য Co-operation-নীতির অনুসরণ করিয়াছে, তারাই বাঁচিয়া আছে, বড় হইতেছে, আর যারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র-স্বার্থ অন্বেষণে মজিয়া আছে, তারাই মরিয়াছে, পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, পর-পদদলিত হইতেছে। দলবদ্ধ যারা, একে অন্যকে সাহায্য করিয়া চলে যারা, তারাই শক্তিমান্; জগতের ইতিহাস সর্ব্বক্ষেত্রে এই শক্তিমানের উদ্বর্ত্তন Survival of the Fittest-নীতির প্রচার করিতেছে। এই মিলন-ভাবের অভাবেই ডায়েনথেরাস প্রভৃতি কত বিশালকায় জীব-জন্তু চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

এ-জাতির যদি কিছুর অভাব থাকে, তা' হলে এই Co-operation সাহচর্য্য; যদি কিছুর প্রয়োজন থাকে, তবে এই সাহচর্য্য। এ-ক্ষেত্রে ধর্ম্মই আমাদের প্রধান অন্তরায়, তাহাই যে একে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতেছে। এমন ধর্ম্ম—জাতিকে ধ্বংস করাই যার মূলগতি, এমন ভয়াবহ ধর্ম্ম, ত্যাগ করিতে হইবে; আর শুধু এ ধর্ম্ম কেন? সব ধর্ম্ম—নামান্তর যাদের কুসংস্কার। তবে যদি কখনো কবির কল্পনা—মহামানবের সম্মিলন—সম্ভবপর হয়।

২২·১২·১৫।—সে-দিন মান্দ্রাজের গভর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড সেণ্ট-জন এম্বুলেন্স-এসোসিয়েসেন প্রবর্ত্তিত Popular Health Lectures সম্পর্কে একটী সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইংরাজের ছোট বড় সব কর্ম্মচারীই

কেমন সুশিক্ষিত, এবং শুধু তাও নয়, পূর্ব্বাপর কেমন অধ্যয়নশীল, এবং সকল বিষয়ে দেশের খবর রাখিয়া চলে! ইংরাজের General intellectual culture সাধারণ জ্ঞান-চর্চ্চা আমাদের অপেক্ষা কত উঁচু! এই জন্যই তো তাদের সঙ্গে আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারি না। বক্তৃতাটী হতে দেখা গেল, ভারতের মৃত্যু সংখ্যা হাজারে পঁয়ত্রিশ জন, ইংল্যাণ্ডে কিঞ্চিৎ অধিক পনর। যদি এ-দেশের মৃত্যু সংখ্যা ইংল্যাণ্ডের ন্যায় কখনো হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তা হলে বছরে গড়ে লক্ষ লোক বাঁচিয়া যাইবে। ১৬৬৫ সন—অর্থাৎ যে বছর Great Fire of London সংঘটিত হয়,—হতে, প্লেগের নাম ইংল্যাণ্ডে বিলুপ্ত হইয়াছে। ওলাউঠা, বসন্তও প্রায় বর্ত্তমানে তদ্রূপ। ক্ষয়কাশ Consumption ও Typhus Fever জ্বরাতিসার রোগের আক্রমণও দিন দিন কমিতেছে। আর, আমাদের মৃত্যুসংখ্যা? দিন দিনই বাড়িতেছে। কেন?

অবশ্য, ভীষণ দারিদ্র্যই এর কারণ; আমাদের জীবন-যাপন প্রণালীও অন্য প্রধান কারণ। এমন নোংরা জাতি জগতে দুটী নাই। যে প্রকার ময়লা, হীনপরিচ্ছদে, একপ্রকার খালিগায়, খালিপায় আমরা থাকি, অন্যদেশের লোক তা দেখিলে ঘৃণায় সরিয়া দাঁড়ায়; ধোপাকে পয়সা দেওয়াতো একটা নিতান্ত অনাবশ্যক বাজে খরচ বিশেষ।

তাও, যতদিন প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা বজায় ছিল, ততদিন একভাবে জীবন যাইতেছিল। আহার ও চলন সম্বন্ধে যে সকল বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল, তা পালন করিয়া স্বাস্থ্য একরকম মন্দ থাকিত না। কিন্তু সে-সকল জাতিভেদ-মূলক ব্যবস্থা এখনকার দিনে পালন করিয়া চলা, দিন দিনই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এক্ষণে, রেলে, ষ্টীমারে, হোটেলে, বাজারে—যে যার হাতে যা ইচ্ছা তা আহার করিতে বাধ্য হইতেছে; ফলে, নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নানাভাবে অকালে

যেখানে সেখানে মাছির মত মরিতেছে। ওদিকে এই ভীষণ মৃত্যুস্রোত দেখিয়া, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কারক সগর্ব্বে বলিতেছেন, হইবে না কেন, কলিযুগের অবসান নিকটবর্ত্তী, জগতের ধ্বংস সন্নিকট, শাস্ত্র যে অভ্রান্ত।

হাঁ, শাস্ত্র অভ্রান্ত, আমাদের বেলাই, মূর্খদের বেলাই, যারা বিজ্ঞান-প্রদর্শিত পথে না চলিয়া, বিজ্ঞানের বাণী অবহেলা করিয়া, শুধু কপালের উপর নির্ভর করিয়া চলে। কপাল ভোল, ভগবান ভোল, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাক, ব্যায়াম চর্চ্চা কর, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ কর, নির্ম্মল বায়ু, আলো সেবন কর, উপযুক্তরূপ পরিচ্ছদ ধারণ কর—পীড়া, গৃহের চতুঃসীমানার মধ্যেও আসিবে না।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, পূর্ব্বাপর একটী মাত্র জাতি স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। ইযুদীদের ধর্ম্মে, স্বাস্থ্যরক্ষা, নীতি-সম্বন্ধীয় নিয়মাদি মানিয়া চলার মত, একটী প্রধান লক্ষ্য। দেহের পীড়া, পাপেরই পরিণামরূপে সে ধর্ম্মে বিবেচিত। তাদের সমাজে, বৎসরের সময়বিশেষে যাতে কূপ, জলাশয় প্রভৃতির সংস্কার হয়, গৃহ পরিস্কৃত ও রন্ধনের বাসন প্রভৃতি মার্জ্জিত হয়, কোনও সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে, সে বিষয়ের সংবাদ যাতে জনসাধারণের ভিতর বিজ্ঞাপিত হয় ইত্যাদি স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রকারের নিয়ম প্রচলিত ছিল। ফলে, জনপদধ্বংসকারী মহামারীর মধ্যে বাস করিয়াও তারা অকাল-মৃত্যু হতে আপনাদের রক্ষা করিয়াছে। জীবন যাতে দীর্ঘ হয় এবং মৃত্যুকালে যাতে সুস্থ সবল সন্তান-সন্ততি রাখিয়া যাইতে পারা যায়—ইহাই তাদের কাম্য ছিল। তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও তারা করিয়াছে এবং সফলকামও হইয়াছে।

আর আমরা? জীবনকে আমরা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করি। মরিয়া ভগবানরূপ কিম্ভূত-কিমাকার কারো সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা, মরাই,

আমাদের প্রধান কাজ ; মরিও তাই সকালে। ভারতের বক্ষ ভেদ করিয়া যে মৃত্যু-ক্রন্দন অহরহ উত্থিত হইতেছে, তার গতিরোধ হইবে কি প্রকারে ? মহাশ্মশান ভারত !

ঢা—,২৬·১·১৬।—কাল, মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে দেখিলাম, আচার্য্য মহাশয় চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন, নীচে ফরাস ও বেঞ্চের উপর অন্যান্য ভক্তেরাও তদ্রূপ অবস্থায় উপবিষ্ট। লোক-সমাগমে, গান-বাজনায় কক্ষটী গম্ গম্ করিতেছে। ঐ যে লোক সকল স্তিমিত-নেত্রে উপবিষ্ট, উহার ভিতর কেউ কি ভগবানকে লাভ করিয়াছে ? বা তাঁর অনুসন্ধান পাইয়াছে ? কোনও লক্ষণই তো দেখিতেছি না। যারা ভগবান-ভক্ত, তারাও যে চরিত্রের মানুষ, আমিও তো তেমনি। ভগবান লাভ করিয়াছেন, এমন লোক এ-পর্য্যন্ত দেখি নাই। তবে, ইহা দেখি, লোককে যেমন ভূতে পাইলে যা তা বলিতে দেখা যায়, তেমন মাঝে মাঝে দু' একটা লোককে বিশেষভাবে ভগবানে পায় এবং তারা তখন আবোল-তাবোল যা তা বকিতে আরম্ভ করে। লোকে তখন মনে করে, তার সঙ্গে ভগবানের বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ চলিতেছে। ভূতগ্রস্ত আর ভগবান-গ্রস্তে পার্থক্য নাই। সর্ব্বৈব মিথ্যা ! মিথ্যা !

কলেজে যখন পড়িতাম, তখন আমাদের গ্রামের তারা ·····দাদার সঙ্গে এ-সম্বন্ধে প্রায়ই আলাপ হইত। দুজনেই ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত করিতাম, প্রায়ই তাঁকে প্রার্থনার গুণগান করিতে শুনিতাম। জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি গম্ভীরমুখ হইয়া বলিতেন, আরে, ভগবান কি দেখাবার জিনিব, চিনির কি স্বাদ, তা যে চিনি না খাইয়াছে, তাকে কি বুঝানো যায় ? ধ্যান কর্, ভগবানকে লাভ কর্, দেখ্বি তখন কি আনন্দ ! শুনিয়া, আমি ব্যাকুবের মত অবাক্ হইয়া থাকিতাম, ও

ভাবিতাম, আরা⋯দাদার সঙ্গে ভগবানের বুঝি কি নিগূঢ় সম্পর্ক! এখন দেখিতেছি, তিনিও যা, আমিও তা,—সংসার-কীট; চিনির স্বাদ উভয়েই সমান ভাবে পাইয়াছে। সকল ভক্তেরই এই অবস্থা; পার্থক্য, এতদিনে তারা⋯দাদার কাঁধের ভূত অনেকটা তাঁকে ছাড়িয়াছে, অনেকেরই তা হয় না।

ভগবান? বিকৃত-মস্তিষ্কই তাঁর একমাত্র বাসা—ত্রিভুবনের অন্যত্র কোথাও তিনি নাই।

২৪.৪.১৬।—জর্জ্জ ফক্সের শিষ্যবৃন্দেরা হইতেছে, ইংরাজ-জাতির ভিতর বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী ও successful লোক। তারা বিনাড়ম্বরে শান্ত, উদ্দেশ্যমূলক জীবনযাপন করে; বৃথা বাক্য, উত্তেজনা পরিহার করিয়া চলে। নীরব সম্প্রদায়-ভুক্ত, নীরবতাই শক্তি—এই নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাদের সভা-সমিতি পরিচালিত হইয়া থাকে।

ময়—, ১৭.৬.১৬।—Walter Bagehotর Bicgraphical Studies পড়িতেছি। বইখানাতে Pitt, Gladstone, Cobden, Bolingbroke, Adam Smith, Clarendon প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের জীবনী সম্বন্ধে সুন্দর সমালোচনা নিবদ্ধ রহিয়াছে।

এঁদের মধ্যে Earl of Clarendon সম্বন্ধে যে গুটিকতক কথা লিখা আছে, আমার কাছে বেশ শিক্ষাপ্রদ বোধ হইল। কি ভাবে কাজ করা উচিত, তাঁর জীবনী পাঠ করিলে বেশ উপলব্ধি করা যায়।

তাঁর মত পরিশ্রমশীল লোক খুব কমই ছিল। পূর্ব্বে তিনি ডাব্লিনে আবকারী-বিভাগে কাজ করিতেন, এবং প্রায় যৌবনের শেষ পর্য্যন্ত, তিনি যে ভবিষ্যতে Clarendon বংশ-সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারী-সূত্রে

পাইবেন—এ-আশা তাঁর ছিল না। সে সময় জীবিকা উপার্জ্জনের জন্ম, তাঁকে বিশেষরূপে পরিশ্রম করিতে হইত। যৌবনের সে শিক্ষা, তার পক্ষে ভবিষ্যতে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। তিনি নিরূপিত সময়ে কাজ করিতেন এবং সারাদিনে মোটের উপর যে কাজ করিতেন, সমসাময়িক অন্য কোনও কর্ম্মচারী ততটা করিতে পারিত না। লেখায় ভুল-ভ্রান্তি প্রায়ই থাকিত না; যা লিখিতেন, বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনার পর লিখিতেন।

সচরাচর দেখা যায়, যারা কর্ম্মশীল, তাদের সঙ্গে সদা-ব্যস্ততার একটা ভাব যেন সব সময়ই জড়াইয়া থাকে। Clarendon ভিন্নপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর চাল-চলন ও চেহারায় একটী সৌম্যভাব মিশ্রিত ছিল। তিনি বিচক্ষণ, ধীর, মিষ্টভাষী লোক ছিলেন; দেখিলে কেউ মনে করিতে পারিত না, যে তাঁর মত পরিশ্রমী লোক খুবই অল্প। যাঁরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁরা দেখিয়াছেন, যে মাঝে মাঝে দু' একটী লোক এমন দেখা যায়, যে সে বড়ই ধীর, স্থির, বাহির হতে দেখিলে মনে হয়, বিশেষ কিছু করিতেছে না, কিন্তু সপ্তাহের শেষে দেখা যায়, সে যতটা কাজ করিয়াছে, তার তুলনায় সদা-ব্যস্ত, অস্থিরচিত্ত, মহা-উদ্যমশীলেরা, এক মুহূর্ত্তও যাদের বিরাম নাই অথবা আফিসের কাজ ছাড়া অন্য দিকে মনোনিবেশের সামান্য সময়টুকু নাই, কাজে অনেক কম। Clarendon এই প্রকার ধীর শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। এ-সব লোক কি করিবেন, কি লিখিবেন, কি ভাবে চলিবেন—পূর্ব্বেই ভাবিয়া ঠিক করেন, আর যাঁরা অহরহ ব্যস্ত, তাঁরা চিন্তা না করিয়াই অনেক সময় কাজে হাত দেন, ফলে যা করার নয়, তাই করিয়া বসেন, এবং তা সংশোধন করিতেই অর্দ্ধেক সময় নষ্ট করিয়া ফেলেন।

বেশ একটী মনের মতন কাজের লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেল।

২৫·৬·১৬।—বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মন মিশাইয়া দেওয়া, তাতে ডুবিয়া যাওয়া—ইহা কি সম্ভব? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জীবনী ও তাঁর সম্বন্ধে সমালোচনাদি পড়িলে মনে হয়, প্রকৃতিকে তিনি সম্ভোগ করিতেন, তার সঙ্গে যেন তাঁর গোপন-প্রাণ-বিনিময় হইত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠেও বোধ হয়, তাঁর চোখের সুমুখেও যেন কি এক অনন্ত-সুন্দর জগৎ ফুটিয়া রহিয়াছে, তার মাঝে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী বিরাজ করিতেছে,—ফুলে, লতার ললিত-দোলনে, ঘন মেঘের কোলে দামিনী-স্ফুরণে ইহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কবি মুগ্ধ পুলকিত হইয়া থাকেন। সত্যই কি প্রকৃতির সঙ্গে এঁদের এমন নিগূঢ় সম্পর্ক?

প্রকৃতি তো বাহির হতে দেখিতে গেলে নীরব, জড়পদার্থ, প্রাণী-জগতের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু ইহাই এর পূর্ণ-স্বরূপ নয়। যিনি যেমন চোখে দৃষ্টি করেন, সেও তেমনি ভাবে তাঁর কাছে দেখা দেয়। মায়াবিনী মনোরমা প্রকৃতি—কতরূপে কতভাবে ইহার প্রকাশ! বৈজ্ঞানিকের কাছে এক মূর্ত্তি, কবির কাছে অন্য।

কৈশোরের দিন হ'তে আমি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে এবং তা হ'তে আনন্দ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার প্রাণে প্রাণে তো কেউ কথা কয় না! নদীর অপর পারে যখন সন্ধ্যা-সূর্য্য ডুবিয়া যায়, অথবা এই বর্ষার দিনে ঝড়ের পূর্ব্বে অপর পারের আকাশ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে, নীচে শ্যামল-শোভায় শস্যক্ষেত্র বাতাসে দুলিতে থাকে ও নদীর বুক কালো ঢেউয়ে ভরিয়া উঠে, তখন অবশ্য দৃশ্যটী চোখে সুন্দর লাগে। এমন কি, অনেক দিন হ'তে জোর করিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করার দরুণ, এখন এ-সকল দৃশ্য একাকী ভোগ করিতে অনেকটা ভালই লাগে, তথাপি মনে হয় না শুধু প্রকৃতিকে লইয়া জীবন কাটাইতে

পারি। সে যে আমার পক্ষে নীরব, নিস্পন্দ—আমার প্রাণের সঙ্গে যে কোনও সংযোগ নাই তার, সে যে জড়, প্রাণহীন! মূক মেদিনী; সে কি চিরকালই আমার কাছে মূকই থাকিয়া যাইবে,—কথা কি কহিবেই না?

মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা, গল্প-গুজব—যতটা কম হয়, ততই মঙ্গল। মানুষ কোথায়? কতকগুলি বাচাল, কল্পনার যাদের জীবনে স্থান নাই, জড়পিণ্ড। জীবনে এপর্য্যন্ত দেবচরিত্র, সদাপ্রফুল্ল, হাসিমুখ মনো......, হেমচন্দ্র—জীবন-প্রভাতের প্রথম বন্ধু, চিরদিনের জন্য অপসৃত! ও—আরো দু-চারিজন মাত্র জুটিয়াছে, যাঁদের সঙ্গ প্রকৃতরূপে আমার পক্ষে সুখকর। কতক জন দেখিলাম, যাদের চিত্তে কল্পনা-কুসুম ফুটিতে না ফুটিতেই, অর্থ তাড়নায় বা সম্যক্ আবহাওয়ার অভাবে শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি ভ্রান্তি! কি বিড়ম্বনা! লোকের সঙ্গে মিশিতে হইবেই, যা-তা কথায় সময় ব্যয় করিতেই হইবে—এ রকম চলনই যে সভ্যতার অঙ্গ।

প্রকৃতিকে জানিব কেমন করিয়া? তাকে ভোগ করিব কেমন করিয়া? কেমন করিয়া তাকে আমার পক্ষে প্রাণময়ী করিয়া তুলিব? আমি তো কবি নই। কবি, কল্পনা-তুলিকায় সুন্দরকে সুন্দরতর করিয়া তোলেন, কুৎসিৎকে সুরূপা দেখেন, দুঃখ-মধ্যে অন্তর্নিহিত সুখের-স্বাদ পান। কবি এক ভিন্ন প্রকৃতির লোক; বাস্তব real অপেক্ষা অবাস্তব ভাব-জগৎ ideal-ই তাঁর প্রাণকাম্য আবাসস্থল। তিনি যে ভাবে বাস করিয়া সুখ পান, সাধারণ লোকের পক্ষে সেরূপ জীবন-যাপন অসহনীয়; সংসারে থাকিয়াও সংসারে তাঁর মন নাই—কোন্ অনিশ্চিত বিপুল সুদূরের দিকে সর্ব্বক্ষণই প্রাণ উন্মুখ হইয়া আছে এবং সেই অদৃশ্য জগতের আলোকপাতে চিত্ত নানা সময়ে নানাপ্রকার বিচিত্ররূপে রঙীন হইয়া উঠিতেছে। কেমন সুন্দর, মধুর কবি-জীবন আমারও মন ক্রমে সংসার-নির্লিপ্ত হোক্,

প্রকৃতির ভিতর আমি ডুবিয়া থাকি—কিন্তু তা কি কখনো সম্ভবপর হইবে? সাধারণ লোকের জীবন—শুধু অর্থোপার্জ্জন, মামলা-মোকদ্দমা, বিবাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-কলহ—ভাবের যাতে সামান্য সমাবেশও নাই, আমার যে ভাল লাগে না। কবি-জীবন, বিশেষ করিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের জীবন, কেমন লোভনীয়, স্পৃহনীয়!

৯·৭·১৬।—ভোর হতে বাদলের ধারা পড়িতেছে। আমি রুদ্ধদ্বার-গৃহে একাকী বসিয়া আছি। তাও, গৃহের লোকজনের কথা-বার্ত্তা শুনিতেছি। মনে হয়, এ-সব সময় সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জনে থাকিলেই ভাল লাগে।

সংস্কৃত-সাহিত্য বসন্ত-প্রশংসায় মুখর, কিন্তু আমার কাছে বর্ষার মত এমন চিত্তহারী কোনও ঋতুই নয়। বর্ষার বৃষ্টিপাতের সঙ্গে যেমন কবিত্ব মাখা, এমন আর কোন্ কালের সহিত?

এ-সকল সময় আমার ইচ্ছা করে, ঘরে একাকী বসিয়া বাইরের বর্ষা-প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিতে; আর ইচ্ছা করে, নদীতীরে বৃষ্টির ভিতর একাকী বেড়াইয়া বেড়াইতে। কেমন সুন্দর, এখনকার বৃষ্টি-বাত্যা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-চঞ্চল নদীবক্ষের দৃশ্য!

রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-সম্বন্ধীয় কবিতা পাঠেরও এই সময়।

ঐ মেঘ ডাকিতেছে গুড়্ গুড়্ করিয়া,—কেমন গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ, মধুর!

মন যে কি চাহিতেছে, ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না,—প্রকাশও করিতে পারিতেছি না। কেবল এই মাত্র বুঝিতেছি—ভালই লাগিতেছে। বিনা কাজে, নিশ্চিন্ত মনে এই বর্ষার দিনে ঘরের ভিতর বসিয়া থাকা, বেশ সুখপ্রদ। কিন্তু এই কর্ম্মবহুল সভ্যতার দিনে, তেমন

অনাবিল নির্জ্জন-জীবন পাইব কেমন করিয়া ? কাজ—কাজ, কেবলই কাজ, আর অর্থ-তাড়না ! নির্লিপ্ততাও যে একটা ভোগের জিনিষ, আলস্য-বিলাস বলিয়াও যে কিছু একটা থাকিতে পারে—এ যেন সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। কোথায় সে প্রাচীন-যুগের সরল সহজ জীবন, জীবন-সংগ্রামের তীব্র তাড়না-বিহীন, কাব্য-চর্চ্চার অবকাশের অভাব যার ভিতর ছিল না। সভ্যতার সোপানে কে উপরে—প্রাচীন, না বর্ত্তমান ?

কার সঙ্গে যাইয়া কথা কহিব ? কোনও লোকের সঙ্গই যে ভাল লাগে না। নিজ পরিবারের লোকজন ও ছেলে-পুলে ছাড়া, আর কারো সহিতই মিশিতে মন যায় না। একাকী জীবন কাটানোই বেশ—নিজ-কুলায় ; চারিদিকের আঁধারের ভিতর সেখানেই যা কিছু আলোর সন্ধান পাইতেছি।

এখনো বৃষ্টি পড়িতেছে, তবে তীব্রতা কমিয়া আসিয়াছে। চারিদিক আবার আঁধার হইয়া আসিবে, আকাশের উপর দিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া মেঘের পর মেঘ উড়িয়া যাইবে, মেঘ ডাকিয়া উঠিবে, বিদ্যুৎ চমকিবে, বাতাস বহিবে, ঘরের জানালা-কপাট বায়ু-প্রকোপে অস্থির হইয়া উঠিবে—বিশ্বের উপর দিয়া একটা তীব্র সুখের চঞ্চল-কম্পন খেলিয়া যাইবে,—আমার প্রাণও আনন্দাপ্লুত হইয়া উঠিবে। ভাবিতেও সুখ।

ধীরে ধীরে বারিধারা পড়িতেছে। গৃহের ছাদ হতে টপ্ টপ্ শব্দোত্থিত করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতেছে, ঈষৎ দূরে দেয়ালের পিছনে গাছ-লতার মধ্য হতে সোঁ সোঁ শব্দ শ্রুত হওয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে মেঘ ডাকিতেছে,—সকলে মিলিয়া বেশ এক তান-লয়-পূর্ণ শব্দ হইতেছে। অন্যদিক হতে মনকে অপসারিত করিয়া, এই শব্দ-জগতের দিকে নিবদ্ধ করিলে বেশ এক মধুর-রাজ্যে প্রবেশ করা যায়।

আবার বেশ সজোরে বৃষ্টি নামিয়াছে।

১০.৭.১৬।—লর্ড কিচনারের কথা পড়িতেছিলাম। বর্ত্তমানকালে কেহই চরিত্রগুণে ইংরাজ জাতির এমন শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। যোদ্ধা তাঁর মত, তাঁর অপেক্ষাও বড়, আরো হইয়াছে, কিন্তু এমন চরিত্র-সম্পদ অতি অল্প লোকেরই ছিল। চরিত্র অর্থে—আমি তথাকথিত ধার্ম্মিকের চরিত্রের কথা বলিতেছি না। আমি তেমন চরিত্রের কথাই বলিতেছি, যা লোকে সচরাচর সাংসারিক লোকের ভিতর দেখিতে ইচ্ছা করে। এমন কার্যাক্ষম, কর্ত্তব্যগতচিত্ত অদ্ভুত organiser বর্ত্তমানকালে ইংল্যাণ্ডে দেখা দেয় নাই। সাধারণ লোক তাঁকে অনেকটা legendary hero পৌরাণিক যুগের বীরের স্থানে ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের লোকের চোখে তিনি একপ্রকার দেবতাস্থানীয় ছিলেন।

তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ—Silence, নীরবতা। কথা প্রায় কারো সঙ্গে বলিতেনই না; বন্ধুবর্গের সহিত কিন্তু ঘনিষ্টভাবে মিশিতেন। He never made himself cheap, সস্তায় নিজেকে বিকাইতেন না। নিজের প্রশংসা গাহিয়া বেড়াইতেন না, he never advertised। At once, এই মুহূর্ত্তেই—ইহা তাঁর একটা বিশেষ নিয়ম ছিল। কাজের সময় দয়া-মায়া ছিল না। লোকে বলে, তিনি একটা bloodless machine রক্তহীন-যন্ত্র ছিলেন, শোকে, সুখে, বিপদে, সম্পদে যার চলন-পদ্ধতির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইত না। Imperturability, calmness অনুদ্বিগ্নমনতা, শান্ত-ভাব, তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। পত্রিকায় পাঠ করিলাম, Hampshire জাহাজ যখন mineএর সংঘর্ষে দ্রুতবেগে তাঁকে লইয়া ডুবিতেছিল, তখনও তিনি ধীর স্থির নিশ্চিন্ত মনে জাহাজ হতে লাইফ-বোট life-boat প্রভৃতি নামাইবার ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

কঠিন পরিশ্রম, ধৈর্য্য, এবং প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার, সকল সময়ই জানিবার আকাঙ্ক্ষা—ইহাই তাঁর জীবনের enormous অদ্ভুত সাফল্যের মূল কারণ। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ-লোকের ন্যায়, তিনি মনের কথা গোপন রাখিয়া চলিতেন, দৃঢ়চিত্ততা ও একাগ্রতা তাঁর চরিত্রের অঙ্গ ছিল।

প্রকৃতরূপেই খাঁটি শ্রেষ্ঠ-পুরুষ—তাঁর সান্নিধ্যে লোকে তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিত; এই শ্রেষ্ঠত্বের ভাব, জ্যোতির মত সর্ব্বক্ষণ যেন তাঁকে ব্যাপিয়া বিরাজ করিত। লোক চালাইবার তিনি একটী ভীষণ শক্তি-কেন্দ্র ছিলেন, he was a tremendous driving force, কিন্তু সমস্ত কাজই তাঁর বিনাড়ম্বরে, অল্লায়াসে, শান্তভাবে সম্পন্ন হইত এবং কোন প্রকার অভদ্রতার তার সঙ্গে সংশ্রব থাকিত না।

ভাগ্যবান্ সে দেশ, উজ্জ্বল-ভাগ্য জাতি, যে দেশে যে জাতির মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব হয়। বহুযুগের সঞ্চিত শিক্ষা-যত্নের ফলেই এমন চরিত্রের আবির্ভাব সম্ভবপর,—এ-কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়।

১৪.৭.১৬।—উপন্যাসের ভিতর দিয়া যেমন সমাজ-চিত্র ফুটিয়া উঠে, সাহিত্যের অন্য কোনও ক্ষেত্রেই তেমন নয়। নাটকের সঙ্গে এ বিষয়ে উপন্যাসের তুলনাই হয় না, কারণ উপন্যাসের পরিসর তুলনায় কত অধিক বিস্তৃত। তা ছাড়া, উপন্যাসের কোমল কবিত্বমাখা তুলিকা স্পর্শে, কি ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সবই কেমন রূঢ়তা ত্যাগ করিয়া, প্রিয়-দর্শন ও উপভোগ্য হইয়া উঠে।

রুশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক দুজনের দুখানা বই পড়িলাম,—টলষ্টয়ের Resurrection, ও Dostoieffeskyর Crime and Punishment। রুশিয়ার সমাজের ভিতর অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত যে অশান্তি-

স্রোত বহিতেছে, দুখানা উপন্যাসপাঠেই তা উপলব্ধি করা যায়। সুখ, নিরাবিল শান্তি নাই—সর্ব্বত্রই জ্বালা, যন্ত্রণা; বিমল গার্হস্থ্য-জীবনের অভাবও পদে পদে দৃষ্ট।

Crime and Punishment একটা ভীষণ নারী-হত্যার কাহিনী। গ্রন্থের নায়ক Roskolinikoff ইউনিভার্সিটির শিক্ষিত যুবক। নানা প্রকারের গ্রন্থ পাঠের ফলে, তার চিত্ত সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে নূতনভাব সমূহে পূর্ণ। একজন কৃপণস্বভাবা কুশিদ-জীবনী কর্কশচরিত্রা বৃদ্ধা ছিল; তার অর্থে নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করা ও তার কিয়দংশ সমাজের দরিদ্র বিপন্নদের হিতার্থে ব্যয় করা, তার জ্ঞান-চোখে ন্যায়ানু-মোদিত বলিয়া প্রতিভাত হইল। ফলে, সে তাকে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করে। কিন্তু অবশেষে সে সেই বিষম পাপের বোঝা যেন গোপনে বহন করিতে পারিল না। ক্রমে, সে অনেকটা বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া পড়িল, যার-তার কাছে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, কথায়-কার্য্যে, হত্যা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে লাগিল, শেষে গায়ে পড়িয়া নিজ-হতে পুলিসের কাছে ধরা দিয়া আট বছরের জন্য সুদূর সাইবেরিয়ার কারাগারে নির্ব্বাসিত হইল। এ-পর্য্যন্ত এ-প্রকারের যে সকল বই পড়িয়াছি, এবং এ-সকল বিষয় যতদূর শুনিয়াছি, তাতে পাপের জন্য অনুশোচনাবশতঃই নরহন্তা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু Crime and Punishmentর এই চরিত্রটীর এই একটী বিশেষ পার্থক্য, যে নিজ-কৃত কার্য্যের জন্য সে যৎসামান্য পরিমাণেও দুঃখিত নয়; বরং, পূর্ব্বাপর সে বলিয়া গিয়াছে, সে যে কাজ করিয়াছে, তা কুকার্য্য নয়, তার দোষ এই মাত্র, যে শেষ পর্য্যন্ত সফলকাম হতে পারিল না। এ-হিসাবে Roskolinikoff একটী নূতন চরিত্র—নব্যবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সন্তান, খোলা naked যুক্তিই যার একমাত্র পরিচালক ও পথপ্রদর্শক।

Roskolinikoffর মতে সমাজে দুই শ্রেণীর চরিত্রের আবির্ভাব দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর যারা,—তারা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির দাস, সে-সকল মানিয়া চলা তাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক অবস্থা, অতি-সাধারণ ধরণের লোক, পরদাসরূপে জীবন-যাপনই তাদের destiny ভাগ্যলিপি। এ-শ্রেণীর লোকেই সমাজ পরিপূর্ণ,—গতানুগতিকের পক্ষপাতী, সকল বিষয়েই সংরক্ষণ-নীতির উপাসক, শান্তিপ্রয়াসী, স্বাধীন-চিন্তা-গতি-হীন। আর একশ্রেণী,—সংখ্যায় নিতান্ত কম; সমাজের ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করা উচিত, তার দিকে চাহিয়া বর্ত্তমানকে ধ্বংস করিতে তারা উদ্‌গ্রীব। এরা সমাজের আইন-নিয়মকে মানে না। যদি এরা সফল-কাম হয়, তা হলে জাতির আদর্শ hero মহাপুরুষের স্থানে উন্নীত হন। Lycyrgus, Solon, Mahomed, Napoleon প্রভৃতি Genius প্রতিভাশালী লোক এ-শ্রেণীর অন্তর্গত। সমসাময়িক সমাজে হয় তো এরা তেমন প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ভবিষ্যতে প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইয়া জাতির পূজার সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়।

Roskolinikoffও আপনাকে শেষোক্ত শ্রেণীর সংজ্ঞাভুক্ত মনে করিয়া, নারী-হত্যারূপ ভয়াবহ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সব দিক বজায় রাখিতে না পারিয়া, স্বেচ্ছায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। আগাগোড়া সে বলিয়া গিয়াছে, যে তার দোষ তার কৃত কাজটী তেমন একটী বড় কাজ নয় এবং তা'তেও সে যে ভাবে হাত দিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া থাকিতে পারিল না—নেপোলিয়ানও তাতে এই পার্থক্য। বৃহতের ভয়াবহ বিস্তারের ভিতরই যে লোক-চক্ষে মহত্ত্ব ও গৌরব বিরাজ করে; এই জন্যই তো সামান্য জল মাটীর কোনও মূল্য নাই, কিন্তু জল-সমষ্টি সমুদ্রের, মাটীর স্তূপ পর্ব্বতের, কেমন মাহাত্ম্য ও গৌরব!

গ্রন্থপাঠে আশ্চর্য্য হুতে হয়, যে এ-রূপ সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভাব কি প্রকারে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। যুক্তি-তর্কের চোখে, এমন সভ্যজগতের আদিম যুগ হতে জঘন্য বলিয়া বিবেচিত নর-হত্যারূপ ব্যাপারও যেন এক্ষণে আর পাপের-কাজ মনে হইতেছে না। জ্ঞানের ছুরিতে সমস্ত সংস্কারই যে দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইতেছে; মূল সত্য বলিয়া কিছু কি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পাইবে?

গ্রন্থ-পাঠ শেষে মনে হয়, লেখকের বক্তব্য—কোনও কাজই কুকাজ নয়, যদি জয়ী হওয়া যায়। বিজয়ীর স্তবস্তুতিতেই বিশ্বপরিপূর্ণ, বিদ্রোহের কণ্ঠ তার সুমুখে আপনা হতেই নির্ব্বাক হইয়া আসে। পাপ-পুণ্য একটা কথার কথা-বিশেষ—অর্থশূন্য। যার শক্তি আছে, সাহস আছে, সেই মানব-রাজকে আইন-বিধান মানিয়া চলিবে; সমাজ তার হাতে নরম মাটীর মত, যে-ভাবে ইচ্ছা সে তাকে গড়িয়া যাইবে। আর যারা সে প্রকারের নয়, তারা ক্ষণিক উত্তেজনায় কোনও নূতন অদ্ভুত কাজ করিলেও, Roskolinikoff-র মত প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির পদতলে লুটাইয়া পড়িবে ও অবশেষে নিজ-হতে ধরা দিয়া নিজ-মনোকল্পিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

বইখানা মিষ্টি নয়, তবে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষাত্মক powerful উপন্যাস। কিন্তু যতটা নাম শুনিয়াছিলাম, তেমন লাগিল না।

৪.৮.১৬।—জাপানে রবীন্দ্রনাথ।

'যাঁহারা কবিবরের সহিত দেখা করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে একাকী বাস করিতেই তিনি অভ্যস্ত, জন-কোলাহল হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতেই তিনি ইচ্ছা করেন।...সম্ভব হইলে জাপানের কোন বৌদ্ধ-মঠে তিনি কিছুকাল বাস করিতে চাহেন।...ভারতবর্ষেও

তিনি পল্লীতেই অধিকাংশ সময় বাস করেন, এবং পল্লীর সহিত তাঁহার পরিচয় অধিক।'—'সঞ্জীবনী।'

কবিবর রবীন্দ্রনাথের এই নির্জ্জনতা-প্রিয়তা, অল্পভাষিতা ও সাহিত্য-চর্চ্চায় অক্লান্ত অনুরাগ, তাঁর জীবনের এই তিনটী প্রধান features স্বরূপ অনেক দিন হতে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

জগদীশচন্দ্র, বিজ্ঞান আলোচনায় যিনি সারা জীবনের সঞ্চিত সমস্ত ধন অর্পণ করিয়াছেন, নিজেকেও সম্পূর্ণরূপে দান করিয়াছেন; আর একজন রবীন্দ্রনাথ—যিনি মাতৃভাষার বন্দনায়, সেবায় আজীবন তন্ময়। একজন বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, আর একজন বিশ্ব-বিশ্রুত কবি। এঁদের দুজনের তুলনা বাঙ্গালায়, ভারতে নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে এমন অনুকরণযোগ্য আদর্শ-চরিত্র heroও নাই। Man's mission is himself to be, Ibsenর মহাবাক্যের চরিতার্থতা এঁদের জীবনে যেমন হইয়াছে, এমন আর কার হইয়াছে? কি অক্লান্ত অধ্যাবসায়! নিজ নিজ সত্ত্বার উপর কেমন বিশ্বাসবান্! কেমন আদর্শ-গত প্রাণ! দুজনেই সম্পূর্ণরূপে নিজ নিজ জীবন-মুকুল পূর্ণরূপে ফুটাইয়া পূর্ণমনুষ্যত্বের আনন্দামৃত পান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এঁদেরই একদেশবাসী,—এতে আমি আপনাকে কত গৌরবান্বিত মনে করি!

৫.৮.১৬। Rudolf Steiner নামক জার্ম্মেণ লেখক প্রণীত The Way of Initation নামে Theosophical Society হতে প্রকাশিত একখানা বই পড়া গেল। নূতনত্ব বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না।

Theosophy জিনিষটা আমার কোন সময়ই ভাল লাগে নাই; গভীর শ্রদ্ধা ও ভাব যার মূলে নাই, সে-ধর্ম্ম লোক-চিত্তের উপর কখনো তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। Theosophy একটা খিচুরী

ধর্ম্ম, সব ধর্ম্ম হতে কিছু লইয়া জোড়া দিয়া নূতন ধরণের একটা ধর্ম্ম-গড়নের চেষ্টা মাত্র হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম-হিসাবে যে এর বিশেষ মূল্য আছে মনে হয় না। ধর্ম্মের মূল উৎস, একপ্রকার বলিতে গেলে মনের Sub-conscious regionএ, গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি এর ভিত্তি; এমন হিসাব করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কাটিয়া ছাটিয়া ধর্ম্ম গড়া যায় না। মনে পড়ে না, এ পর্য্যন্ত এমন কোনও Theosophist দেখিয়াছি, যার দর্শনে প্রাণ তার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে অথবা গভীর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে,। ধর্ম্ম অপেক্ষা বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার দিক হতে Theosophyর যা কিছু প্রয়োজনীয়তা; সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু সকল ধর্ম্মের মূল তত্ত্বের আলোচনা ও বিশ্লেষণ হতে মানবের ধর্ম্ম-জীবনের অনেক গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ হইবার কথা।

বইখানার মাঝে মাঝে বেশ ভাবের সমাবেশ আছে, প্রাণে যা দাগ রাখিয়া যায়। Madam Von Siners নাম্নী জনৈক রুশীয়-রমণী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, অন্যান্য সৎবংশোদ্ভব রুশিয়ানদের মত তিনিও এমন কোন ideal work আদর্শ-মূলক কার্য্য খুঁজিতেছিলেন, যার সাধনে সমস্ত শক্তি উত্তম প্রয়োগ করিতে পারেন। এমন ভাবে যারা জীবনের একটী ideal work পাইয়াছে ও তার অনুসরণে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারিয়াছে, তাদের, একমাত্র তাদেরই জীবন-যাপন স্বার্থক, তারাই মানবরাজ heroes। এই idealকে অনুসরণ করা—ইহাই বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ-মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম। পূর্ব্বকালের প্রাচান ভগবানের স্থানে প্রকৃত-পক্ষে ইহাই এক্ষণে জীবন-কেন্দ্রের মধ্যস্থলে পূজার পাত্ররূপে অধিষ্ঠিত; বহুযুগ হতে নানা সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানবচিন্তা এর দিকেই অগ্রসর হইতেছিল, এখন এর যশোগানে সমস্ত শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য মুখর। এই ideal-সেবায় মানুষের শক্তির পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে। তাই,

দেখা যায়, যখনি কোন জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তখনি এ-সব idealistsদের আবির্ভাবে দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এরা ধন-মানের আত্মপ্রতিষ্ঠার ধার ধারে না, একমাত্র ভাবের সেবা করিতে যাইয়া নির্ভীক; শক্তির আধার, এদের কার্য্যে, কথায়, চাল-চলনে চারিদিকে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভাবে যে শক্তি বিকীর্ণ হইয়া থাকে, অন্যান্য ক্ষুদ্র-চরিত্রও তা সঞ্চয় করিয়া শক্তিমান্ হইয়া উঠে। রুশিয়ায় এ-সকল লোকের এমন প্রচুর ভাবে আবির্ভাব হইতেছে, তাই মনে হইতেছে, তার মুক্তির দিন সন্নিকটবর্ত্তী।

১০.৮.১৬—অনেক দিন হ'তে দুজন লেখকের নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম, দুজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পাঠ করা গেল; একজন ফরাসী ঔপন্যাসিক Flaubert ও তাঁর রচিত Madam Bovary, আর একজন Swedish লেখক Strindberg ও তাঁর লিখিত নাটক There are crimes and crimes.

একখানা ফরাসীদেশের ইতিহাসে পড়িতেছিলাম, ফরাসী-সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস Madam Bovary। মূলগ্রন্থে ভাষার বোধ হয় খুব পারিপাট্য আছে; Flaubertর মত এমন ভাবিয়া চিন্তিয়া, ঘসিয়া মাজিয়া কেহ লিখেন নাই। মনোমত শব্দটীর অন্বেষণে তাঁকে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিতে হইত! সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মেপোসা ও জোলার গুরুরূপে পরিচিত।

ভাষা যাই হোক্, গ্রন্থে যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তা আমাদের চোখে নিতান্তই বিসদৃশ ও বিকৃত বলিয়া বোধ হয়। ইহাই যদি Realistic Novelর আদর্শ হয়, তা'হলে Realism রসাতলে যাওয়াই উচিত।

Zolaর Drink পড়িয়াছি। তাতেও পাপচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু Zolaর লেখার বিশেষত্ব এই যে, পাঠে পাপের প্রতি ঘৃণার ভাবের উদ্রেক হয়। Flaubert পাঠে, মনে তেমন কোনও ভাবের সঞ্চার হয় না, বরং পাপকে এমনি চাকচিক্যের সহিত দেখানো হইয়াছে, যে তার দিকে মন প্রলুব্ধ হয়। এই বইতে Madam Bovaryর কুৎসিৎ কুকার্য্য সব এমনই খোলা, লজ্জাশূন্য ও চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে পড়িতে পড়িতে পাঠকের চিত্তে তাদের প্রতি বেশ একটা সহানুভূতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ডাক্তার Bovaryর চরিত্রখানা বেশ সুন্দর; স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর, সেই অন্তর্নিহিত ভালবাসার আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া সে নিঃশেষ হইয়া গেল। শেষ চিত্রটী সংযত কিন্তু মহাদুঃখব্যঞ্জক।

যে ভাবে গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে, তাতে বোধ হয়, অসতী স্ত্রীর ব্যবহারে কোনও দোষ ছিল না; বরং স্বামী যে এমন সুন্দরীর লালসার যথেষ্ট খোরাক জুটাইতে পারিলেন না, তজ্জন্য তারই দোষ।

এমন সব ধিক্কার-জনক ঘটনা সমূহের এমন নির্লজ্জ সরস সহানুভূতি-পূর্ণ বর্ণনা পাঠে পাশ্চাত্য সমাজের দিক হ'তে ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয়। তৎক্ষণেই কিন্তু আবার এও মনে হয়, মিছার পাতলা রেশমী পর্দ্দায় বিসদৃশ সমাজের গা কোন প্রকারে আবরিয়া আমরা যে তার বাইরের খোসা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি ও বাহবা নিতেছি, তাতে লাভ কি হইতেছে? প্রকৃত সত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে দোষ কি? এত ভয়ই বা কেন? প্রাচীন সাহিত্যও এভয়ে তেমন অবসাদগ্রস্ত নয়। যে সভ্যতার পোষাক পরিয়া আমরা গৌরব নিয়া থাকি,—কি মূল্য বা সে সভ্যতার? অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর ন্যায়, পাপস্রোত জানিয়া শুনিয়া সমাজ-বক্ষের ভিতর দিয়া না বহাইয়া, বাহিরে তাকে ধরিয়া দেখাইলে এমন

কি দোষের? সত্যই সুন্দর; একমাত্র তার জলেই পাপ-ময়লা ধৌত হইয়া থাকে। সত্যের উপর, শুধু সত্যের উপর সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হোক্; পাপকে ঢাকিয়া রাখায় কি লাভ?

১১·৮·১৬—অনেক দিন হ'তে ফরাসী ঔপন্যাসিক Balzacর নাম শুনিয়া আসিতেছি। ইয়ুরোপীয় নাট্যজগতে Shakespeareর যে স্থান, উপন্যাস-ক্ষেত্রে Balzacর অনেকটা তেমনি।

কিন্তু কি বলিব, আমার Shakespeareকে তেমন ভাল লাগে না। Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear প্রভৃতি নাটক আমার কাছে অনেক সময় ছেলেপুলের গল্প বলিয়াই মনে হয়। তা'দের ভিতর এমন বিশেষ কোনও গভীর ভাব দেখি না, এমন কোনও জীবনাদর্শ বা সামাজিক জটিল সমস্যার আলোচনা দেখি না, যা'তে আমার প্রাণ আলোড়িত বিলোড়িত হ'তে পারে, গভীর আনন্দরসে পূর্ণ হ'তে পারে। এদের মধ্যে Hamletই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞান-দর্শনে-পুষ্ট লোক-প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার এতে এমন কি আছে? বরং, Goetheর Faust এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; বর্ত্তমান যুগের মানবের অশান্তি, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ভাব ত'তে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে!

জগৎব্যাপী ইংরাজের রাজত্ব, Shakespeareর ও সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা ও এত প্রতিপত্তি। ইহার শতাংশের একাংশও তিনি সমসাময়িক লোকের নিকট পান নাই—তাই তাঁ'র অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান হইতেছেন। বোধ হয়, তাঁ'র প্রতিপত্তির দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। Tolstoy তাঁ'কে তেমন উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত নয় বলিয়াই মনে করিতেন, খুঁজিলে অন্যান্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃকও এমন মত ব্যক্ত হইয়াছে দেখা যাইবে। Shakespeareর সমস্ত নাটক অপেক্ষা কালিদাসের

শকুন্তলাই শ্রেষ্ঠ। ইহা ভারতের প্রাচীন যুগের শান্তিপূর্ণ সমাজের অপূর্ব্ব আদর্শ-চিত্র! ভারতে আর তপোবন কেহ দেখিবেনা; তা'র সংস্রবে যে জীবনাদর্শ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, জগতের বক্ষ হ'তে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। দাড়িম্ব-বীজের মত স্নেহরসে-পূর্ণ, কোমল-কঠিন প্রাণ সেই কণ্বমুনিকেও আর কেউ দেখিবে না। তাঁ'র শিষ্যবৃন্দও অদৃশ্য হইয়াছে। প্রকৃতির কোলে পালিতা শকুন্তলা, তা'র সখীদ্বয়—তরুলতা-পাতা-মৃগশাবকের সহিত একপ্রাণা, সরলতা পবিত্রতার মূর্ত্তি বালিকাদেরও—আর কেউ দেখিবে না। জগত-বক্ষ হ'তে তা'রা চিরকালের জন্য অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিনই তা'র সংসার-জ্বালাযন্ত্রণাদগ্ধ শান্তি-ভিখারী প্রাণ, এই শান্ত তপোবনের চিত্রের দিকে চাহিয়া আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইবে। Shakespeare ষোড়শ শতাব্দীর ইয়ুরোপের কবি, সে-দেশ-কাল-সুলভ সাধারণ তামসিক সব ভাবে তাঁ'র গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ; কালিদাস সমস্ত জগতের সকল যুগের কবি, সাত্বিক ভাবে প্রণোদিত শান্ত-রসাস্নিগ্ধ তাঁর শকুন্তলা—চিরকালের জন্য, অতুলনীয়।

ইতিপূর্ব্বে Balzacর Eugenie Grandet পড়িয়াছিলাম, এবার Tragedy of a Genius পাঠ করা গেল। দু'খানাই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। Grandetএ কৃপণের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু এখনকার দিনে তেমন কৃপণও দেখা যায় না, আর দেখা গেলেও সে সমাজের এমন কিছু নয়, যার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য লোক উৎসুক। কৃপণ,—নিজ কার্পণ্যহেতু অকর্ম্মণ্য; সমাজের সে কিছু নয়, বর্ত্তমান সমাজ তার জন্য চিন্তিত নয়, চিন্তা করিবার অবসরও নাই।

Tragedy of a Geniusএ প্রতিভাশালী ব্যক্তি তা'র খেয়াল Hobbyর বশবর্ত্তী হইয়া কেমন সর্ব্বস্বপণ হইয়া অভিষ্ট লক্ষ্য

সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং যত দিন পর্য্যন্ত সাফল্য তা'কে বরণ না করে, ততদিন সমাজের লোকের কাছে কি প্রকার উপহাসাস্পদ, বিড়ম্বিত, নির্য্যাতিত হইয়া থাকে, তাই দেখান হইয়াছে। Balthazar নামে এই বইতে যে প্রতিভাসম্পন্ন Chemist রাসায়নিক-পণ্ডিতের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তার চিত্রটি ফুটিয়াছে ভাল। প্রতিভাশালীর কি দুর্দ্দশা! তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব, মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাদর্শন ও তাঁকে সম্যক আদর করিবার লোক কোথায়? সমসাময়িকদের মধ্যে কে তাকে চেনে, বোঝে?

Genius প্রতিভা এক প্রকার ব্যধি-বিশেষ, অনেকটা madness পাগলামির ন্যায়। Balthazar জগতের আদি-দ্রব্যের The Absoluteর অনুসরণ করিতে যাইয়া, তাঁর অগাধ সম্পত্তি, যশ মান প্রতিপত্তি সব হারাইলেন। তাঁর অবহেলায় ও একপ্রকার তাঁর মমতাবিহীন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া, তাঁর সাধ্বী পতিপরায়ণা স্ত্রী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি লক্ষ্যসাধনে পূর্ব্বেরই ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা, অবিচলিতচিত্ত। স্ত্রীর মৃত্যুকালের কথাগুলি হৃদয়-বিদারক, কিন্তু মধুর এবং অতি-সত্য। তিনি স্বামীকে বলিয়া গেলেন, "প্রতিভা উন্মাদকতার ন্যায়। তোমার জীবদ্দশায় তুমি সুখী হইবে না, তোমার সন্তানদের তুমি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া যাইবে; জগতের যত প্রতিভাশালী লোকদেরই এমন অবস্থা—যশ মৃতের প্রাপ্য। বিজ্ঞানই তোমার প্রাণ। প্রতিভাশালীর Great menর স্ত্রী পুত্র কেউ নয়। কর, তুমি তোমার দরিদ্রতার পথই অনুসরণ কর। তোমার যা চরিত্র-সম্পদ, তা সাধারণ লোকের আয়ত্বাধীন নয়। তুমি স্ত্রী কিম্বা পরিবারের জন্য নও—তুমি সমস্ত জগতের। বৃহৎ বৃক্ষের মত তুমি চারিদিকের মাটীর রস আত্মসাৎ কর, আমি নিকটের ক্ষুদ্রলতা, তোমার মত উপরে মাথা তুলিতে পারিলাম না;

তাই, [illegible] জীবন যাপন করিতেছিলাম, আজ শেষ-সময় সব বলিয়া গেলাম। তোমার স্ত্রী মরিতে চলিল, তোমার সন্তানদের দিকে চাহিও, তাদের অবহেলায় মারিও না, তাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিও না।” Balthazar স্ত্রীর মৃত্যুকালের অনুরোধও রাখিতে পারিলেন না, অথচ স্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। কোনও প্রকৃত Geniusই পারেন নাই। অবশেষে, সন্তানেরাই একপ্রকার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, জ্যেষ্ঠা কন্যা সংসারের কর্ত্রী হইলেন, তাঁর ইচ্ছানুসারেই তাঁকে চালিত হইতে হইল, ধন ঐশ্বর্য্য অর্থ-সমাগম হ্রাস-প্রাপ্ত হইল, তথাপি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি তাঁর Hobbyর চর্চ্চা করিয়া গেলেন। লোকের কাছে তিনি শেষকালে ঘৃণ্য, পাগল বলিয়াই বিবেচিত হইয়া গেলেন, তার প্রকৃত মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য কেউ বুঝিল না। এমনই ; একযুগে যিনি পাগল, অন্য যুগে তাঁরই মূর্ত্তি পূজিত হয়। ক’জন প্রতিভাশালী জীবদ্দশাতে যশোমাল্যে ভূষিত হইয়া থাকেন ?

কিন্তু যার হৃদয়ে অভিষ্ট-সাধনে এই Geniusর উন্মাদকতার একাগ্রতার ভাব দেখা দিয়াছে, তারই, শুধু তারই, জীবন-যাপন সার্থক। যে দেশে, যে জাতিতে এমন সব লোকের আবির্ভাব হয়, সে দেশ ও সে জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কথনো অর্থ-চিন্তায়, কথনো বা লোকনিন্দা বা মান-ভয়ে, সাধারণ লোক না মিটায় আত্মার প্রাণের ক্ষুধা, না যোগায় দেহের আহার, তাই আজীবন সর্ব্ববিষয়ে Stunted growth অর্দ্ধ-মানুষই থাকিয়া যায়। Balthazar-চরিত্রে যে জীবনাদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, বঙ্গের অদ্বিতীয় Genius বৈজ্ঞানিক-জগতের-শিরোভূষণ জগদীশচন্দ্রের মুখেও সে দিন সে কথাই শুনিতেছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, “ভয় করিতেছ সমস্ত জীবন দিয়াও অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না ? তোমার কি কিছুমাত্র সাহস নাই ? দ্যূত-ক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া

জীবনের ধন, পণ করিয়া নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহাক্রীড়ার জন্য ক্ষেপণ করিতে পার না? হয় জয় কিম্বা পরাজয়।”

২০.৮.১৬।—রবীন্দ্রনাথের নূতন বই ‘ঘরে বাইরে’ শেষ করা গেল। অবশ্য ইহা উপন্যাস-আখ্যা প্রাপ্ত, কিন্তু একে উপন্যাস বলিব, না মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-বিষয়ক দার্শনিক গ্রন্থরূপে অভিহিত করিলে সঠিক হয়, ইহাই বিবেচ্য। এ-পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় তো এমন কোনও বই পড়ি নাই, অন্য ভাষায়ও নয়—Grand book।

লিখিতে হইলে, এমন বইই লেখা উচিত। কাল পাঠ শেষ হইয়াছে, কিন্তু প্রথম হতে প্রাণের ভিতর যে তরঙ্গের আন্দোলন অনুভব করিতে-ছিলাম, এখনও থামে নাই। এতদিন ধরিয়া বাঙ্গালা-ভাষায় যে সকল উপন্যাস লেখা হইয়াছে, তার অধিকাংশই স্কুল-কলেজের ছাত্র ও স্ত্রীলোকের পাঠেরই উপযোগী। সতীধর্ম্ম, প্রেমের হা-হুতাশ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, পতিপ্রেম, কান্নাকাটি এ-সবই তাদের অধিকাংশের মামুলি ধরণের আখ্যান বস্তু। ‘ঘরে বাইরে’ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জিনীষ। বলিবার বিষয় বিভিন্ন, নিয়মও বিভিন্ন।

সাধারণ লোকের, অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের, বুঝিবার বা উপভোগ করিবার বই এ নয়। এমন কি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যাঁরা, বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত নন, তাঁরাও এর প্রকৃত মর্য্যাদা কতদূর বুঝিবেন, সন্দেহ। ত্রিশ বছরেও আমরা রবীন্দ্রনাথের সম্যক মর্য্যাদা করিতে শিখিলাম না, আমাদের জ্ঞানচর্চ্চার প্রকৃষ্ট নিদর্শন! রবীন্দ্রনাথ ‘গীতাঞ্জলি’ লিখিয়া জগৎবরেণ্য কবি, কিন্তু এর লেখকের তুলনায় ‘গীতাঞ্জলির’ কবিকেও যেন ছোট বলিয়া মনে হয়।

ইহার সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম

কবিবরের নিজচরিত্র ও বঙ্গবিভাগ-আন্দোলন উপলক্ষে তিনি যে অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন, ভুলিতে হইবে। সে-সম্পর্কে কালের কষ্টি-পাথরে তাঁর যে চরিত্রটী ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেশবাসীর চক্ষে তেমন চিত্তা-কর্ষক নয়। সে-সময়কার ঘটনাবলী লইয়াই গ্রন্থ রচিত। তাঁর পূর্ব্বপ্রকাশিত মতামত ও কার্য্যের সঙ্গে গ্রন্থোক্ত মতের অনেক সময় পার্থক্য দৃষ্ট হয়,—যা চোখে বড় বাজে। সে যাক্—তাঁর চরিত্র-বিশ্লেষণে প্রয়োজন নাই। তিনি যে নিত্য নূতন ভাবের ডালি ধরিয়া দিতেছেন, তা উপভোগ করিয়াই আমরা কৃতার্থ।

একটী কথা—গ্রন্থের ঠিক প্রতিপাদ্য বিষয় কি, পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া উঠিতে পারা গেল না। কবিবর 'ঘরে বাইরে' অর্থে ঠিক কি বুঝাইতে চান, তা মাঝে মাঝে অস্পষ্ট আব্ছায়ার মত চোখেব কাছে ধরা দিলেও, গ্রন্থ শেষ করিতেই সব যেন গোলাইয়া গেল। অথবা বলিতে হয়, আগাগোড়া বইয়ের কোনও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নাই।

মাসিক পত্রিকাদিতে গ্রন্থে অশ্লীলতার অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া দোষারূপ করা হইয়াছে। কৈ, তেমন কিছুই তো দেখিলাম না। এক স্থানে রাবণের সম্পর্কে সীতার উল্লেখ আছে। স্থানটীতে আমিতো দোষের কিছু পাইলাম না। যে লোকের মুখে কথা কয়টী বিবৃত হইয়াছে তাতে সীতার কোনও গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। হায়! বাঙ্গালার শিক্ষিতাভিমানী পাঠক!

গ্রন্থের ভাষা অপূর্ব্ব। লেখা এক এক স্থানে এমনি ভাবে-ভরা, এমনি জমাট-বাঁধা, এমনি অন্তর্নিহিত-নীরব-শক্তিতে-পরিপূর্ণ, সতেজ-রসে অভিষিক্ত, যে পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাইতে হয়, ইহা কবিতা নয়, গদ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতারই মত ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীর সমাহিত-চিত্তে পড়িবার জিনিষ। লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও ভাবুক হইতে

হইবে, তা না হইলে এর অপরূপ মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। ফরাসী লেখক Joubert যাকে adorned brevity বলিয়াছেন, এই গ্রন্থ তার পূর্ণ-আদর্শ-স্বরূপ।

অন্যান্য উপন্যাসের মত ইহা ঘটনাবহুল নয়। রবীন্দ্রনাথ Lyric Poet গীতি-কবিতা লেখক। খুব বড় গল্প তিনি কখনও জমাইয়া উঠাইতে পারেন নাই। মধুসূদন বা নবীনচন্দ্রের মত তিনি কোনও মহাকাব্য লেখেন নাই, সে শক্তি তাঁর আছে কি না, সন্দেহ। অল্পপরিসর গীতি-কবিতা বা ছোট-গল্পের ভিতরই তাঁর শক্তি ক্রীড়া করে। সে শক্তির বিকাশ—ভাবের গভীরতা ও নির্ম্মলতায়, সৌন্দর্য্যের অপরূপ বিশ্লেষণে, মানবহৃদয়ের গূঢ়ভাবসকলের অনিন্দ্য পরিস্ফুটনে এবং ভাষার মনোহরণ লালিত্য, মাধুর্য্য ও ভাবব্যঞ্জকতায়।

মোটামুটী তিনটি চরিত্র লইয়া গ্রন্থ রচিত—নিখিলেশ, তার স্ত্রী বিমলা, বন্ধু সন্দীপচন্দ্র। তাদের পার্শ্বে আরও দুটি চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,—নিখিলেশের বৃদ্ধ মাষ্টার চন্দ্রনাথ, সন্দীপের শিষ্য অমূল্য। প্রত্যেকটীই এক একটী Type আদর্শ-বিশেষ।

নিখিলেশ—রাজপুত্র, রাজা। বিদ্বান্, ধীর, স্থির। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক কম, সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা কম, সকল কথাও কাজের ভিতর কেমন যেন একটা অবাস্তবতার ভাব মিশ্রিত। দেহের তুলনায় মাথাটা বড়, বিশেষ না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কোনও কাজে হাত দিতে ইচ্ছুক নয়। অনেকটা দার্শনিকের মত—'আইডিয়া বিহারী'। খাঁটি লোক, কিন্তু কাজের সময় বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তার বন্ধুবর শক্তি-প্রয়াসী, সে মুক্তি-অভিলাষী। 'মুক্তিই হচ্ছে মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ—তার কাছে আর কিছুই না, কিছুই না।" স্ত্রীকে সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দিয়াছে, তাকে কোনও বিষয়ে বাধা

দিতে অনিচ্ছুক। সত্যান্বেষণে রত; 'সত্য' যা, শুধু তারই উপর দেশের ভবিষ্য মঙ্গল-প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক—এই 'সত্য' কথাটা তার মুখে সর্ব্বক্ষণই লাগিয়া আছে। কিন্তু হায়! জানে না সে, জগতে 'সার সত্য' কিছুই নাই—ইহা কবির কল্পনা, জড়ামরণভীতিগ্রস্ত মানবের সম্মুখে মায়া-মরীচিকা বিশেষ। যদিই বা থাকিয়া থাকে,—কারও হাতে ধরা দেয় নাই, দিবে কি না সন্দেহ। সে জানে না Expediency সময়-বুঝিয়া-চলাই, অনেক ব্যাপারে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। কবির সহানুভূতি নিখিলেশের প্রতি কিন্তু পাঠক তাকে অকর্ম্মণ্য ভাবুক জ্ঞানে হৃদয়ের পূর্ণ প্রীতি-অর্ঘ্য দিবে না। 'আজন্ম স্কুল-বয়'—এ সকল অতি বুদ্ধিমান লোকদ্বারা, যারা Reality ছাড়িয়া কেবল Ideaকেই ধরিয়া আছে, সংসারে কোনও কাজ হয় না, বরং সময়ে অসময়ে খোলা naked নীতি ও ধর্ম্মের বচন উদ্ধৃত করিয়া অন্যের কার্য্যে বাধা দিয়া তা নষ্ট করে।

বিমলা—কল্পনা-প্রধানা বঙ্গ-রমণী, সুশিক্ষিতা, মাধুর্য্যময়ী। চরিত্রটী অনুপম সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, প্রতি-পদেই ভয় হয় সন্দীপের দৃঢ় হস্তে পড়িয়া সর্ব্বস্ব না বিসর্জ্জন দিয়া বসে। এতদিন সে 'ঘরের' অসূর্য্যম্পশ্যা রাজবধূ ছিল। স্বামীর উদারতাগুণে ও সন্দীপচন্দ্রের সম্পর্কে সে যখন স্বগৃহের দ্বারদেশে আসিয়া 'বাইরের' বৃহত্তর জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং সন্দীপচন্দ্র যখন তাকে বঙ্গের ভাগ্য-বিধায়িত্রী দেবীরূপে অভিহিত করিল, তখন সে সত্য সত্যই আপনাকে অসীমশক্তিসম্পন্না বলিয়াই মনে করিতে লাগিল। তখন হতে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত সে এক মোহের ভিতরই যেন ডুবিয়া রহিয়াছে—স্বামী, ধন, জীবন সবই তুচ্ছ, দেশের কাজে নিজেকে যে নিঃশেষিত করিতে পারিতেছে না—ইহাই একমাত্র দুঃখ। চরিত্র-গৌরবে, নিঃস্বার্থপরতায়, শক্তিতে, দুর্ব্বলতায়, সর্ব্বোপরি ভগ্নী-হৃদয়ের অফুরন্ত ভালবাসায় বিমলা দেবীই বটে। যাঁরা সতীশিরোমণি জনক-

নন্দিনীকেই রমণী-জীবনের একমাত্র আদর্শ বলিয়া মনে করেন, তাদের কাছে এ চরিত্র তেমন ভাল লাগিবে না। বিমলা, ফরাসী বিরাঙ্গনা জি য়ান ডি আর্কের অনেকটা অনুরূপা, ভাব-বিভোরা-তন্ময়া। এরা ভাবের সেবায় সবই দিতে পারে কিন্তু পুরুষের নীচাশয়তার স্পর্শে ম্লান ও সঙ্কোচিত হইয়া পড়ে।

চন্দ্রনাথ—নিখিলেশের বৃদ্ধ মাষ্টার। গ্রন্থ-প্রারম্ভে এই শান্তশিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি মিতভাষী লোকটী হৃদয়ের কত না শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শেষে দেখা যায়, ইনি প্রকৃত মাষ্টারই বটেন, সংসার অনভিজ্ঞ, নিষ্ফল বুদ্ধি দিতেই প্রস্তুত, মূলতঃ ভীরু, কাজে কিছু নয়। নিখিলেশের মুখ দিয়া কবি যতই কেন প্রশংসা করুন না, ইনি শ্রদ্ধা অপেক্ষা ঘৃণাই অধিকতর উৎপাদন করেন।

অমূল্য—নব্যবঙ্গের দোষে-গুণে-পূর্ণ কিশোর বালক। নিঃসহায় বালক, —সরল, সুন্দর, সাহসী—চরিত্র সৌরভে ইহার দোষও গুণ বোধ হয়।

সন্দীপচন্দ্র (কি বিদঘুঁটে নাম—অর্থ কি? একি কোনও পূর্ব্ব বঙ্গবাসী সুপরিচিত লোকের নামান্তর?) গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র, 'গোরার' কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এমন চরিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই, অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। ইচ্ছা শক্তির পূর্ণ অবতার—ইহার এক একটী কথা হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, নিতান্ত যে কাপুরুষ তার মনেও সাহস, উৎসাহ জাগিয়া উঠে। জার্ম্মেণ দার্শনিক Nietzsche যাকে Superman অতিমানুষ আখ্যা দিয়াছেন, ইনি তা'ই। তাঁর মতে তিনিই Superman, যিনি দৈহিক বলে শক্তিমান্, মানসিক বলে শক্তিমান্, শক্তিপ্রয়াসী, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, প্রয়োজন হলে যে নির্দ্দয়তা ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও পরাঙ্মুখ নয়। আত্মাভিমান তার চারত্রাংশ,—জীবন আনন্দময়, উপভোগ্য, ইহাই তার মটো motto। নিট্‌সের মতে বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা মানুষকে দুর্ব্বল, ক্ষীণাঙ্গ, সর্ব্ব-

বিষয়ে শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে। তাই তিনি বলিয়াছেন, যাতে শক্তির উন্মেষ হয়, সমাজে Superman-সমূহের আবির্ভাব হয়, আমি সে-মতেরই প্রচার করি। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ Nietzscheর দর্শন হতে সন্দীপচন্দ্রের চরিত্রের আভাস পাইয়াছেন। ইনি তাঁর Will to Powerর পূর্ণ অবতার। যা সে চায়, প্রাণের সহিত চায়; কোন বাধা বিঘ্ন মানিবে না, পরের দুঃখ-কষ্টে মন গলে না, নিজের স্বার্থসাধন করিতে যাইয়া সৎ-অসৎ কোনও কার্য্যেই পরাঙ্মুখ নহে। Nietzscheর যিনিই যত বিদ্বেষী না হোন,—বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে তাঁর শিষ্যানুশিষ্যের অভাব নাই। ইঁহারা শক্তি-মন্ত্রের উপাসক। সন্দীপের ও চরিত্র নাই, শক্তি আছে। সে প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে জানে, তাই সে প্রভু,—তার ইচ্ছার বেগ সামলান কঠিন। সত্যের কথা উঠিতে সে নিখিলেশকে বলিতেছে, 'সত্য জিনিষটা ওর মনে একটা প্রেজুডিসের মত দাঁড়িয়ে গেছে। আমি ওকে কতবার বল্‌চি যেখানে মিথ্যাটা সত্য, সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমি এই ধর্ম্মনীতিকেই জেনেছি, সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।'

Nietzscheর মতে মানব-সমাজে কতকগুলা নীতি-নিয়ম অন্যায়রূপে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে, যেমন দয়া Pity, ধৈর্য্য Patience ইত্যাদি। এরা ঠিকই কতদূর মূল্যবান, তা বিবেচনার বিষয়; Transvaluation of Values এ-সকলের প্রকৃত-মূল্য-নির্দ্ধারণের প্রয়োজন। বর্ত্তমান মানব সমাজে ও সাহিত্যে, গুণের বেশে অনেক মহাদোষ বিচরণ করিতেছে; যাদের বন্ধু ভাবিতেছি, ভাবিয়া দেখিতে গেলে তারা শত্রু। যাকে আমরা দয়া বলি, তা অনেক সময়ই দৌর্ব্বল্য; ধৈর্য্য, অলসতাব রূপান্তর। সন্দীপের কথায়, 'আমরা যাকে দয়া বলি, সে কেবল নিজের পরেই দয়া, পাছে নিজের দুর্ব্বল মনে ব্যথা লাগে সেই জন্যেই অন্যকে আঘাত করিতে পারি না—এই ত হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত।'

আমাদের দান অনেক সময়েই লোকের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে, রমণীর সতীত্বকে এত উচ্চাসন দিয়াছি যে এক মাত্র তার দিকে চাহিয়া তাদের আঁধার খাঁচার পাখী করিয়া রাখিয়াছি, অপদার্থ অশিক্ষিত কুলপুরোহিত পালনে আমাদের সমাজ গুরুভারে প্রপীড়িত, 'মোটা ভাত, মোটা কাপড়' নীতির অনুসরণ করিতে যাইয়া, একপ্রকার নগ্নতা ও অনশনকে আমরা বরণ করিয়া নিয়াছি—কত কি বলিব? সকল সমাজেরই, বিশেষতঃ আমাদের সমাজের, অনেক বিষয়ের Transvaluation of valuesর দরকার। এ-ভাব হতে দেখিতে গেলে, সন্দীপের অনেক কথা, যা প্রথমতঃ নিতান্তই বিসদৃশ মনে হয়, তা পরিষ্কার, সামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হইবে। তার সঙ্গে সব-বিষয়ে একমত হওয়া অসম্ভব কিন্তু যেমন Nietzsche-দর্শনে, তেমন তার কথার ভিতর মাঝে মাঝে এমন সব সত্য নিহিত রহিয়াছে, যে ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্যে অভিভূত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখে Nietzsche-দর্শন প্রকারান্তরে প্রচার করিয়াছেন। ডোষ্টয়ফেস্কী তাঁর Crime and Punishmentএ নায়ক Roskollnikoffর মুখেও সন্দীপের ন্যায় অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে মনে হয়, চরিত্রসকল আমাদের বর্ত্তমান সমাজের ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই যে চিত্রিত। চাহিলেই সন্দীপকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়, অমূল্যকেও, বুঝি বিমলাকেও। আর নিখিলেশ? তিনি কি কবির নিজ-চিত্রের মানসমূর্ত্তি? বোধ হয়, একটু Natural স্বাভাবিক-ভাবাপন্ন করিতে যাইয়া, সন্দীপ-চরিত্রের শেষভাগে কাপুরুষতার ঈষৎ কলঙ্ক অর্পিত হইয়াছে। হোক্, তাও এ-চরিত্র ভীষণতায়, মধুরতায় অপূর্ব্ব, অভিনব।

রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে আর একখানি অতি-শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরত্নে বঙ্গভাষা শোভিত হইল।

২২.৮.১৬।—একটী অতিসুন্দর-চরিত্র সাহিত্য-সেবকের জীবনী পাঠ শেষ করা গেল। ফ্রান্সের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মন্টিগনাক সহরে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যোসেফ জুবেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সামান্য অবস্থাপন্ন ডাক্তার ছিলেন। বাল্যে টলোজের স্কুলে আট বৎসর পাঠ করেন। পরে সেখানে কিছুকাল শিক্ষকের কাজ করেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করিতে বধ্যে হন। তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। তৎপর দুই বৎসর গৃহে কঠিন পাঠে নিযুক্ত থাকেন। ১৭৭৮ সনে তিনি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য রাজধানী প্যারিস নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে তৎকালের প্রসিদ্ধ লেখক বিশ্ববিশ্রুত ডিডেরো, ডালেমবার্ট, মারমণ্টেল, লা-হার্পের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় তিনি প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্য গ্রেণ্ড-মাষ্টার Grand-master ফোনটেনের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। এই অল্প বয়সেই, তাঁর সম্বন্ধে কথিত হইত, যে তিনি যশ-লাভ অপেক্ষা নিজেকে উন্নত করিবার জন্যই অধিকতর ইচ্ছুক ও যত্নশীল ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য কখনও ভাল ছিল না, দেহ পূর্ব্বাপরই নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, এই চিররোগিরাই সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁর আদর্শ ছিল অন্যরূপ,—লোক দেখাইবার অপেক্ষা, নিজের ভিতর নিজেকে ফুটাইয়া তোলাকেই, তিনি অধিকতর শ্রেয় মনে করিতেন। জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানচর্চ্চাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন—লোকসমক্ষে বিদ্যার প্রসার দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাই তাঁর জীবনের বিশেষত্ব। তাঁর বন্ধু সুবিখ্যাত লেখক শ্যেটোব্রায়েণ্ড Chanteubriandর কথায়, তিনি আজীবন নিজেকে গোপন করিয়া চালাইয়াছেন।

এমন লোকের জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে বলিবার তেমন কিছুই নাই। তা সত্ত্বেও দুটী ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের Constituent Assembly দেশের সর্ব্বত্র Justice of the Peace-পদ সম্বন্ধে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত করেন। মন্‌টিগনাকের অধিবাসীরা চরিত্রবান, সরল, অধ্যয়নশীল জুবেয়ার সম্বন্ধে এমনই উচ্চ অভিমত পোষণ করিতেন, যে তাঁর অনুপস্থিতেও তাঁকে তাঁদের নগরের Justice of the Peace মনোনীত করেন। নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জুবেয়ার এই পদ গ্রহণ করেন এবং দু'বছর কাজ করেন। তিনি এমন সততা ও দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়াছিলেন, যে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকে তা ভুলিতে পারে নাই। কার্য্য-শেষে নাগরিকগণ আবার তাঁকে মনোনীত করে কিন্তু জুবেয়ার ভাবিলেন, তাঁর যা কর্ত্তব্য, সম্পন্ন করিয়াছেন—পূর্ব্বের নির্জ্জন-জীবনকেই তিনি আবার বরণ করিয়া নিলেন।

তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ঘটনা, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সভার Executive Committeeর সভ্যপদ-প্রাপ্তি। ১৮০৯ অব্দে নেপোলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন করেন এবং ফোনটেনকে গ্রেণ্ড-মাষ্টার পদে নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ান তাঁকে কার্য্যকরী সভার সদস্য মনোনয়ন করিতে বলিলে, তিনি দুজন প্রথিতযশা ব্যক্তির পরেই জুবেয়ারের নাম উল্লেখ করেন এবং তদুপলক্ষে লেখেন,—যদিও অন্য দুজনের মত ইনি তেমন লোকসমাজে পরিচিত নন, তথাপি এঁর নিযুক্তি সম্বন্ধেই আমি বিশেষ মত দিতেছি। এঁর চরিত্র বুদ্ধিমত্তা উচ্চধরণের, আপনি এ বিষয়ে আমার মত গ্রহণ করিলে পরিতুষ্ট হইব। নেপোলিয়ন তাঁর অনুরোধ রক্ষা করিলেন—জুবেয়ার কাজে নিযুক্ত হইলেন।

১৭৯৩ সনে, যখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর, তিনি বিবাহশৃঙ্খলে

আবদ্ধ হন। এখন হতে তাঁর স্ত্রীর পিত্রালয় ভিলেনেভি ও প্যারিস—এই দুই স্থানেই তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয়। যখন প্যারিসে থাকিতেন, তখন সেণ্ট হনোরি ষ্ট্রীটের একটী উচ্চ কক্ষে বাস করিতেন। কক্ষটী আলোকোদ্ভাসিত ছিল, যেখান হতে মৃত্তিকা অপেক্ষা তাঁর প্রিয় আকাশ ও আলোই অধিক দেখা যাইত। যত্ন, রুচি, বিচক্ষণতার সহিত সংগৃহীত গ্রন্থরাজিতে সুসজ্জিত এই কক্ষে তাঁর আবেগ-আড়ম্বরশূন্য জীবনের সুখাংশ অতিবাহিত হয়।

এই সময় ম্যাডাম বোমেণ্টের সহিত তাঁর পরিচয় হয়। তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী মণ্টমরিনের কন্যা। ফরাসী বিদ্রোহের সময় তাঁর পিতা নির্দ্দয়ভাবে নিহত হন, কয়েকমাস পরে তাঁর মা ও কনিষ্ঠ ভাই গিলিওটিন Gullio-tineএ প্রাণ হারান। অত্যল্পকাল পরে তাঁর ভগ্নী কারাগারে জ্বরে মারা যান। ১৭৯৪ সনের গ্রীষ্মকালে জুবেয়ারের কানে তাঁর হৃদয়-বিদারক কাহিনীর সংবাদ পৌঁছে। তিনি তখন ভিলেনেভির সন্নিকটে জনৈক দরিদ্র দ্রাক্ষা-বিক্রেতার গৃহে লুক্কায়িত অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। জুবেয়ারের সঙ্গে তাঁর সেই গৃহে সাক্ষাৎ লাভ হয়। তাঁর দর্শনে তিনি এই সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে পারিলেন, উচ্চবংশ ও বুদ্ধিমত্তার সমাবেশে রমণী-চরিত্র কি অপূর্ব্ব শোভায় ভূষিত হইয়া উঠে। জুবেয়ার তাঁকে তাঁর গৃহে আগমন করিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু ম্যাডাম বোমেণ্ট অস্বীকৃত হন।

অল্পকাল মধ্যেই দেখা সাক্ষাৎ, গ্রন্থ বিনিময় ও চিঠী পত্রাদির ব্যবহার বশতঃ দুই পরিবারের ভিতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। ম্যাডাম বোমেণ্টের ভিতর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্যারিসের উচ্চবংশের সুমার্জ্জিত আচার ব্যবহার ও বুদ্ধিমত্তা সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে, পিত্রালয়ে বাসকালীন তিনি প্রতিবৎসর সাতহাজার ইউকাছমুদ্রা পুস্তক কিনিতে ও

বাঁধাইতে ব্যয় করিতেন। জুবেয়ার যখন তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি ক্যাণ্টের দর্শন পাঠে নিমগ্ন। যে অত্যাচার তিনি ভোগ করিয়াছিলেন, তার ফলে চিরকালের জন্য স্বাস্থ্য হারাইয়াছিলেন। তাঁর ধর্ম্ম বিশ্বাস, এমন কি ভগবানে বিশ্বাস পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছিল। এখন হতে গ্রন্থপাঠ ও সৎচিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করাই, তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য-চর্চ্চাতেই সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতেন, জুবেয়ারের সঙ্গে সে সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। ছয় বছর পর্য্যন্ত পোলাইন ডি বোমেণ্টের সঙ্গে আলাপ, গ্রন্থালোচনা ও জ্ঞানচর্চ্চা জুবেয়ারের জীবনের নির্দ্দোষ আনন্দের উৎস ছিল। তাঁর প্রাণে পুনর্ব্বার জীবনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করাই, জুবেয়ারের চিন্তার বিষয় ছিল। তিনি বলিতেন, যতক্ষণ জীবন আছে, তাকে ভালবাসাই উচিত—ইহাই কর্ত্তব্য। জুবেয়ারের জীবনের যা কিছু মধুরতা ও কমনীয়তা—ম্যাডাম বোমেণ্টের সঙ্গে আলাপের দরুণই অনেকাংশে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ছয় বছরের শেষে শ্যেটোব্রায়েণ্ডের সঙ্গে ম্যাডাম বোমেণ্টের পরিচয় হইলে, জুবেয়ারের সহিত তাঁর ঘনিষ্টতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তখন হতে জুবেয়ার-পরিবার বৎসরের কিয়দংশ প্যারিসে ব্যয় করিতেন; উদ্দেশ্য, ম্যাডাম বোমেণ্টের সান্নিধ্যে বাস। এই সময়কার রচিত তাঁর পত্রাবলী হতে এমন অনেক অংশ উদ্ধৃত করা যায়, যাতে কবি কাউপারের চিঠির লঘুগতি, সুরসিকতা, মিষ্টত্ব অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাদের অপেক্ষাও জুবেয়ারের পত্রাবলী স্থানবিশেষে মধুর। এক চিঠির একস্থানে তিনি ম্যাডাম বোমেণ্টকে লিখিতেছেন, যাদের জন্য নির্জ্জন-জীবনের প্রতি ভালবাসা-হারা হইয়াছ, অধঃপাতে যাক্ তারা। ঘূর্ণায়মান বায়ুর ভিতর অহরহ তারা ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া বেড়াই-

অভিলাষী, কিন্তু জানে না, শুধু ঝড়ের ক্রীড়নক তারা। যে হট্টগোলের ভিতর তারা বাস করিতেছে, তাতে তোমার অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

অন্য পত্রে লিখিতেছেন, সুখ-শান্তি-ধ্বংসকারী এমন কিছুই নয়, যেমন মনের প্রবল প্রবৃত্তি। নতজানু হইয়া বলিতেছি, শান্তভাবে জীবন-যাপনকে ভালবাসিতে শিখ, শান্তিকে শ্রদ্ধা কর—ইহাই জীবনে ভুল না করার, দুঃখ হ্রাসের উপায়।

১৮০০ সনে শ্যেটোব্রায়েণ্ডের সঙ্গে ম্যাডাম বোমেণ্ট পরিচিত হন এবং তখন হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর মহা-উপাসক ও ভক্ত-শিষ্যস্বরূপ ছিলেন। জুবেয়ার এই জন্য মনে যে কষ্ট না পাইয়াছিলেন, তা নয় কিন্তু তথাপি তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার হ্রাস হয় নাই। শ্যাটোব্রায়েণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ম্যাডাম বোমেণ্ট রোমনগরে গমন করেন এবং সেখানেই ত্রিশবছর বয়সে তাঁর জীবনান্ত হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর জুবেয়ার বাইশ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল প্রতিবৎসরের অক্টোবর মাসটী জুবেয়ারের পরিবারে ম্যাডাম বোমেণ্টের স্মৃতিচর্চ্চায় অতিবাহিত হইত। জুবেয়ার কোনও বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, আমার দুঃখের কথা তোমায় জানাইব না। নয় বছর পর্য্যন্ত এমন কোনও বিষয়ই আমি চিন্তা করি নাই, যার সঙ্গে তার স্মৃতি কোন না কোন প্রকারে জড়িত ছিল না।

প্রকৃত প্রেম এমনি, কোনও প্রকার কলুষতার চিহ্ন মাত্র নাই, যার আলোচনায় প্রাণ নির্ম্মল হয়।

ম্যাডাম বোমেণ্টের মৃত্যুর পর, ম্যাডাম ভিণ্টিমিলি নামে আর একটী বিদুষী নারীর সঙ্গে জুবেয়ার বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। এই বিদুষী সাহিত্যামোদী রমণীগণ প্যারিসের সাহিত্য-সমাজের একটী বিশেষত্ব।

কিন্তু পোলাইনের প্রতি জুবেয়ারের প্রাণে যে ভালবাসার উদ্রেক হইয়াছিল, ম্যাডাম ভিন্টিমিলির প্রতি তেমন হওয়া অসম্ভব ছিল।

ক্রমে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ লেখক বা রাজনৈতিক হইয়া সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিলেন কিন্তু জুবেয়ার ছায়াতেই পড়িয়া রহিলেন। তাঁর শরীর এত দুর্ব্বল ও কৃশ ছিল, যে তিনি এতদিন কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। হৃদ্‌রোগ ও পেটের পীড়ায় অনেক সময় তাঁকে কষ্ট পাইতে হইত। হিন্দুদের মত নিতান্ত অল্পাহারী ছিলেন এবং আহারাদি বিষয়ে নিয়ম মানিয়া চলিতেন। কখন কখন অত্যধিক চিন্তা, পাঠ বা বাক্যালাপের পর, তিনি দিন কতক নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিতেন, তখন কোনও কাজই করিতেন না বা কারো সঙ্গে আলাপ করিতেন না। এমন যাঁর শরীরের অবস্থা, তাঁর পক্ষে ধারাবাহিক কোনও গ্রন্থ রচনা অসম্ভব। কিন্তু তিনি পাঠ করিতেন যথেষ্ট এবং চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন। যা পড়িতেন, তারই নোট রাখিতেন। অতি সুন্দর চিঠি লিখিতেন। সর্ব্বোপরি অতি সুন্দর ভাবে কথাবার্ত্তা ও গল্প করিতেন। বয়সের সঙ্গে জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি হইলে, বন্ধুবর্গ তাঁর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য রিউ সেণ্ট হোনরির কক্ষে মিলিত হইতে লাগিলেন। প্রায়ই শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি তাঁদের আহ্বান করিতেন, কারণ বেলা তিনটার পূর্ব্বে প্রায়ই তিনি শয্যা ত্যাগ করিতেন না। যে দিন শরীর অসুস্থ থাকিত, তাঁর স্ত্রী দ্বারে প্রহরীর মত দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁর মুখনিঃসৃত শান্তিসুধা-বচন-বারি-পান-পিপাসী অতিথিদিগের গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেন—অনেক সময়ই অকৃতকার্য্য হইতেন। ফোনটেন তাঁর পরামর্শ ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও গুরুতর কাজই করিতেন না। যখন তিনি ভিলেনেভিতে বাস করিতেন, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের যুবক পাদ্রীরা তাঁর লাইব্রেরীতে পাঠ

করিবার জন্য ও তাঁর সঙ্গে আলাপে উপকৃত হইবার জন্য, তাঁর কক্ষে একত্র হইত। সর্ব্ববিষয়ে তিনি স্বাধীনমতাবলম্বী ছিলেন, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। অনেকটা শান্তিপ্রয়াসী রক্ষণশীল ধর্ম্মপ্রবণ দার্শনিকবিশেষ ছিলেন। বয়সের সঙ্গে জড়াজীর্ণতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; বন্ধুগণ মধ্যেও কতকজন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; অন্যান্য এমনভাবে রাজনীতির—যা জুবেয়ার ঘৃণা করিতেন, ভিতর ডুবিয়া গেলেন, যে তাঁদেয় সহিত তাঁর আর বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু বার্দ্ধক্যসুলভ কর্কশতা তাঁর চিত্তকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। ১৮২৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। সেই বৎসর ৪ঠা মে তারিখে সত্তর বৎসর বয়সের সময় তাঁর জীবনের অবসান হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর শ্যাটোব্রায়েণ্ড লিখিয়াছিলেন, কোথায় এখন সেই মণ্ডলী? অহো! যদি নিজের জন্য চিরদুঃখ রচনা করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তা হলে বন্ধুকর্ত্তৃক নিজেকে পরিবেষ্টিত করিও। ম্যাডাম বোমেণ্টের মৃত্যু হইয়াছে, সেনেডলির মৃত্যু হইয়াছে, ম্যাডাম ভিণ্টিমিলির মৃত্যু হইয়াছে! পূর্ব্বে আমি দ্রাক্ষা-উৎপাদন-কালে জুবেয়ারের সঙ্গে ভিলে-নেভিতে দেখা করিতাম। ইয়নি-নদীর ধারে পাহাড়ের উপর আমি তাঁহার সাথে বেড়াইয়া বেড়াইতাম; সে দ্রাক্ষোদ্যানের ভিতর ব্যাঙের ছাতি অন্বেষণ করিত এবং আমি মাঠ হতে ক্রকাস ফুল আনয়ন করিতাম। সকল বিষয়ই আলাপ হইত, বিশেষতঃ ম্যাডাম বোমেণ্ট সম্বন্ধে—চির-কালের জন্য অপসৃত! আমরা যৌবনের স্মৃতি ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা মনে করিতাম। সন্ধ্যায় আমরা ভিলেনেভিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম। দূরে, পাহাড়ের উপর বনের ভিতর প্রসারিত একটী বালুকাময় পথ জুবেয়ার আমার নিকট নির্দ্দেশ করিত, যে পথ দিয়া ফরাসীবিপ্লবের সময়, যে গৃহে ম্যাডাম বোমেণ্ট লুক্কায়িত ছিল—সে গৃহে সে গমন

করিত। বন্ধুবরের মৃত্যুর পর, আরও তিন চারিবার সেন্‌স দেশের ভিতর দিয়া গিয়াছি। রাজপথ হতে পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইত। জুবেয়ার আর সেখানে ভ্রমণ করিতেছে না; যে মাঠে, যে দ্রাক্ষালতাবলীর সন্নিকটে, যে উপলখণ্ডের স্তুপের কাছে সে উপবেশন করিত, সবই নয়নে পতিত হইত। ভিলেনেভির ভিতর দিয়া যাইবার সময় আমি জনহীন রাজপথ দিয়া বন্ধুবরের পরিত্যক্ত রুদ্ধদ্বার গৃহের দিকে দৃষ্টি করিতাম। শেষবার আমি রাজদূত স্বরূপে রোমে যাইতেছিলাম। অহো! সে যদি তখন জীবিত থাকিত, তা হলে তাকে ম্যাডাম বোমেণ্টের সমাধি-ক্ষেত্রে লইয়া যাইতাম। কিন্তু ভগবান অনুগ্রহ করিয়া জুবেয়ারের নয়নসমক্ষে আর এক রোমের স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। তার সাথে আর এ মর্ত্তধামে দেখা হইবে না! আমিই তার কাছে যাইব, সে আর ফিরিয়া আসিবে না!

সমসাময়িক মনস্বীগণের উপর যাঁর এমন প্রভাব, তিনি যে কেমন মনস্বী ছিলেন—সহজেই অনুমেয়। জীবদ্দশায়, তাঁর কোনও লেখাই সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। বস্তুতঃও তিনি বাইরের লোকের জন্য নয়, নিজ চিত্ত-বিনোদনের জন্যই লিখিতেন। ড্রয়ার ও বাক্সের ভিতরে তাঁর কাগজপত্র সঞ্চিত ছিল। তা' কোনও দিন লোকসমক্ষে প্রকাশিত হইবে মনেও স্থান দেন নাই। মৃত্যুর পর, তাঁর স্ত্রী স্বামীর অনিচ্ছায় সে সকলকে লোক-লোচনের গোচরীভূত করা প্রথমতঃ সঙ্গতঃ মনে করেন নাই কিন্তু নিজ শেষদিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, ততই এমন মহৎ-হৃদয়ের স্মৃতি যাতে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের তিরোধানের পরেও জীবিত থাকে, এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধে, কিয়দংশ শুধু তিনি তাঁদের দেখিবার জন্য মুদ্রিত করেন। জুবেয়ারের মৃত্যুর চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তা প্রকাশিত হয়। অত্যল্পকাল মধ্যেই গুণী পাঠকদিগের ইহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমালোচক-রাজ সেণ্টবাভ

Sainte Beuve তার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎপরে তাঁর লেখার সহিত পরিচিত হইবার জন্য লোকের এমন আগ্রহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁর সমস্ত লেখা ও পত্রাবলী মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, তিনি জগতের সর্ব্বত্র বিদিত গ্রন্থকার।

তাঁর লেখা Pensees of Joubert নামে ফরাসী সাহিত্যে সুবিখ্যাত। তিনি যে বিষয় পাঠ করিতেন বা চিন্তা করিতেন, তার সম্বন্ধে ছোট ছোট কথায়,—অনেকটা সূত্রাকারে—নিজ মনের ভাব লিখিতেন। ইহাদের সমষ্টিই—এই Pensees অথবা চিন্তা। ইহাদের ভিতর দিয়া, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, ধর্ম্ম, লোকচরিত্র—ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। এমনই গভীর ভাবাত্মক, স্নিগ্ধ ও সুমধুর, এমনই কবিত্বপূর্ণ ভাষায় রচিত—যে পড়িতে পড়িতে ধীরে ধীরে প্রাণ শান্তির-ভাবে মহত্ত্বের-ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁর লিখিত পত্রাবলীর ভিতরও এমন সব ভাবের প্রাধান্য।

তাঁর আদর্শ ছিল—যত দূর সম্ভব ক্ষুদ্রাকারে অল্প কথায়, মনের ভাব প্রকাশ করা। তিনি বলিয়াছেন, যদি কোনও লেখক একটী সমগ্র গ্রন্থকে একটী পৃষ্ঠার ভিতর, সমগ্র পৃষ্ঠাকে একটী বাক্য ও বাক্যকে একটী মাত্র কথায় প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষায় উৎপীড়িত, তবে সেই ব্যক্তি আমি। আমি ভাষাকে সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করি, শব্দকে নয়; যতক্ষণ পর্য্যন্ত যে আলোক-কণার প্রয়োজন, তা গঠিত হইয়া কলমের মুখে ফুটিয়া না উঠে, ততক্ষণ আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। জ্ঞানকে আমি মুদ্রার মত প্রচলিত করিতে চাই, অর্থাৎ নীতিবাক্য ও প্রবাদ—যা লোকে অনায়াসে মনে রাখিতে পারে এবং ভবিষ্যবংশের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতে পারে, তা' রচনা করিতে আমি অভিলাষী। তাঁর আকাঙ্ক্ষা

অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে। প্রবাদের মত সূত্রাকারে রচিত তাঁর অনেক কথা ফরাসী সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে।

অনেক বিষয়েই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে কথাগুলি এমন সুন্দর এবং ভাব এমন নির্ম্মল—যে পাঠে মুগ্ধ হতে হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—দর্শনের ভগবান, একটী ভাববিশেষ; কিন্তু ধর্ম্মজগতের ভগবান, স্বর্গ-মর্ত্তের সৃষ্টিকর্ত্তা, মানুষের কার্য্য ও চিন্তার বিচারপতি—শক্তি।...তাঁর বাণী উপলব্ধি করিতে হইলে, অন্তরে নীরবতার প্রয়োজন; তাঁর আলো দর্শন করিতে হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে হইবে এবং অন্তরাভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে হইবে।

জগতের ভিতর তাঁরাই একমাত্র সুখী—জ্ঞানী যাঁরা, সৎ যাঁরা, ধর্ম্মাত্মা যাঁরা। তিনজনের ভিতর আবার ধার্ম্মিকই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী।... নয়ন মুদ্রিত কর; তা' হলেই দেখিতে পাইবে।

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বলিতেছেন—আমাদের স্মৃতিশক্তি যা' ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, তা অপেক্ষা মনে অনেক চিন্তা স্থান পাইয়া থাকে। অনেক সত্যই মন উপলব্ধি করে, কিন্তু কি প্রকারে, তা বুঝাইয়া উঠিতে সক্ষম নয়। আত্মার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎবেগে তাকে আলোকিত করিয়া এমন সব ভাব চলিয়া যায়, যা সে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না।... অন্তরের ভিতর আমরা যথোচিত অনুসন্ধান করি না। শিশুর ন্যায় পকেটে যা আছে, তা' অবহেলা করিয়া হাতে অথবা সম্মুখে যা আছে, তার বিষয়ই ভাবি।

কল্পনার সম্মুখেই মহৎ সত্যসমূহ—প্রকৃতি, তার গতি এবং উদ্দেশ্য—প্রকটিত হয়। বিচারশক্তির উপলব্ধির বহির্ভূত ইহারা—শুধু কল্পনার দ্বারাই দ্রষ্টব্য।

অনেক মহৎ হৃদয় ও শ্রেষ্ঠ প্রতিভা লোকসমাজে অনাদৃত থাকিয়া

যায়—কারণ এমন কোনও প্রচলিত মানদণ্ড নাই, যার দ্বারা তাদের পরিমাপ করা যাইতে পারে। ইহারা মূল্যবান রত্নসদৃশ, যাদের মূল নির্দ্ধারণের জন্য কোনও কষ্টিপাথর আবিষ্কৃত হয় নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদ যেমন মনকে ছোট করে, এমন কিছুই নয়।

যে লোকের ভিতর কোনও দোষ নাই, সে হয় মূর্খ, নয় কপটাচারী। এদের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করাই কর্ত্তব্য।

যৌবনের কল্পনা ও বার্দ্ধক্যের চিন্তা—মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সারাটী জীবন পরচিন্তাতেই আমাদের অতিবাহিত হয়,—অর্দ্ধেক ভালবাসিতে, অর্দ্ধেক নিন্দায়।

তাকেই লোকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবে, পুরুষ হলে যাকে সে বন্ধুস্বরূপ গ্রহণ করিত।

সাবধানতা ব্যবসায় পরিচালন পক্ষে প্রয়োজন; আরম্ভের পক্ষে অন্তরায়।

যে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতে জানে না, পরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কাজে নিজেকে নি শেষ কর, কথায় বাঁচাইয়া চল। কাজে শিথিলতাকে ঘৃণা কর; বাক্যে প্রাচুর্য্য, উষ্ণতা ও বাচালতাকে ভয় করিয়া চল।

'ভগবানকে ভয় কর'—অনেককেই পুণ্যাত্মায় পরিণত করিয়াছে; ভগবানের অস্তিত্ব খুঁজিতে যাইয়া অনেকেই নাস্তিক হইয়াছে।

আমি; কোথা হতে, কোথায়, কেন, কি ভাবে—ইহাই দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমষ্টি—অস্তিত্ব, উদ্ভব, স্থান, উদ্দেশ্য ও উপায়।

দর্শন মনকে বিশেষরূপে দৃঢ় করে। এই জন্যই দেখা যায়, দার্শনিকের ন্যায় নির্দ্দয়-প্রকৃতির লোক অল্প।

রাজশক্তি Government নিজ হতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, জোর করিয়া কেউ সৃষ্টি করে না।

স্বাধীনতা—স্বাধীনতা! সর্ব্ববিষয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হোক্; আপনা হতেই যথেষ্ট স্বাধীনতা দেখা দিবে।

বাক্য,—সুন্দর হওয়ার পক্ষে যা' প্রয়োজন, তা অপেক্ষাও বেশী ভাব ব্যক্ত করিবে অথচ যা বলিবার তাও যেন সম্যক প্রকাশিত হয়। প্রাচুর্য্যের সঙ্গে অল্পতা, ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের সমাবেশের প্রয়োজন; ধ্বনি ক্ষুদ্র হইবে কিন্তু অর্থ অনন্তের ভাবে পূর্ণ থাকিবে। প্রত্যেক তেজোময় পদার্থেরই এমন স্বরূপ। প্রদীপের আলো যার উপর পড়ে, তাকে আলোকিত করে, সঙ্গে সঙ্গে আরও বিশটী জিনিষকেও আলোকিত করিয়া তোলে।

যে সকল যুগে লেখককেরা প্রত্যেক বাক্য ওজন করিয়া ও গণিয়া ব্যবহার করিয়াছে, তা'ই সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

সুসজ্জিত স্বল্পাক্ষরতা—রচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রী।

যেমন চিত্রের পক্ষে বার্ণিস, সেই প্রকার পালিস ও ঘষামাজা রচনার পক্ষে। এরাই রচনাকে বাঁচাইয়া রাখে, স্থায়িত্ব ও অমরত্ব দান করে।

প্রতিভা কার্য্যারম্ভ করে; কিন্তু একমাত্র শ্রমশীলতাই তাকে সমাপ্ত করিয়া তোলে।

মনের পক্ষে কাজের ন্যায় অলসতারও প্রয়োজন। অত্যধিক লেখায় প্রতিভা নষ্ট হয় এবং একেবারে না লিখিলে তাতে মরিচা ধরে।

যা লিখিয়া নিজে খুব আনন্দ না পাও, তা' লিখিও না। ভাবোচ্ছ্বাস লেখকের চিত্ত হতে অল্পেতেই পাঠকের প্রাণে প্রবিষ্ট হয়।

বাক্য ও ভাবের অমিতব্যয়িতা নির্ব্বোধ হৃদয়ের পরিচায়ক। শ্রেষ্ঠত্বেই মহত্ত্ব, প্রাচুর্য্যে নয়। শব্দ-মিতব্যয়িতা শ্রেষ্ঠ লেখকের পরিচায়ক।

কোনও লেখাই সুন্দর নয়, যার রচনায় পরিশ্রম অথবা ভাবনা ব্যয়িত হয় নাই।

কত উদ্ধৃত করিব?

ইংরাজ কবি ও সমালোচক ম্যাথিও আর্নল্ড জুবেয়ারকে কবি কোলরিজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁর অপেক্ষা তিনি ভাবসম্পদে শ্রেষ্ঠ। বলিবার ভঙ্গিমাও অতুলনীয়। জুবেয়ারের অনুকরণে ফরাসী ও জার্ম্মেণ সাহিত্যে এক্ষণে পেন্‌সি লেখকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁর সমকক্ষ কেহই নহেন। তাঁর বিষয় বলিতে যাইয়া, অনেকটা তাঁরই সম-প্রকৃতি-বিশিষ্ট Amiel তাঁর সুবিখ্যাত জার্ণেলে বলিয়াছেন, জুবেয়ারের দর্শন, সাধারণ সাহিত্য ও লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মৌলিকতা শুধু বিশেষ বিশেষ বাক্যে ও রচনার মাধুর্য্যে। কোনও বৃহৎ দৃশ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নাই; ইতিহাসের নিগূঢ় ভাব কিম্বা আত্মদর্শন সম্বন্ধে তাঁর নূতন বলিবার বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু তাঁর নিজ ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিহত-দ্বন্দ্বী। বন্ধুবান্ধবের ভালবাসা, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপার প্রভৃতি যে সকল ক্ষেত্রে কল্পনা ও ভাবের প্রয়োজন, তিনি বর্ণনায় ও সমালোচনায় অপূর্ব্ব।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাঁর মত লেখকের আবির্ভাব হয় নাই; শীঘ্র হইবে এমন সম্ভাবনাও নাই। Pensee লিখিয়া সফলতা লাভ তাঁর পক্ষেই সম্ভবপর—যিনি চিন্তাশীল; যাঁর জ্ঞান গভীর, লিখিবার ভাষা সুন্দর, সুসংযত, ও ভাবে পরিপূর্ণ; জীবন যাঁর শান্ত, আড়ম্বরশূন্য, বাগ্দেবীর নীরব সাধনায় যাঁর জীবন অতিবাহিত; এবং একাধারে যিনি গভীর দার্শনিক অথচ সংসারের কাজকর্ম্ম ও লোকজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জুবেয়ারের জীবন ও উপদেশ বাঙ্গালী লেখক সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয়। প্রাণে যা প্রকৃত আনন্দ দান করে, শুধু তা লইয়াই সাধারণ্যে উপস্থিত হইব,—প্রত্যেক লেখকের ইহা আদর্শ হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য, যে রচনাগঠনে বিশেষ সময় বা চিন্তার প্রয়োজন হয়

নাই—তার জীবন অনেক সময়ই ক্ষণকালস্থায়ী। আরও স্মরণ রাখা উচিত—বাক্য-ভাবের সংযম ও ভাষার মাধুর্য্য, সাহিত্যের প্রাণ। বাঙ্গালা-সাহিত্য তবেই সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত ও সুষমাভূষিত হইয়া উঠিবে—যদি জুবেয়ারের মত সংসারের ধন মান প্রতিপত্তির দিক হতে মুখ ফিরাইয়া লেখক সাহিত্য-চর্চ্চায় নিমগ্নচিত্ত হন—যা উচ্চ, জীবনবর্দ্ধক, সাহসের সহিত সে সকল ভাবকে বরণ করিয়া নেন এবং ধীর সমাহিত-চিত্তে সুসংস্কৃত সুসংযত ভাবব্যঞ্জক ভাষায় তা প্রকাশ করিতে যত্নপর হন। ক্ষণকালস্থায়ী যশ নয়—যা অক্ষয়, তা'ই যেন তাঁদের কাম্য হয়।

২৩.৮.১৬।—ফরাসী দেশে যে বাস্তবতা-মূলক উপন্যাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, তার পূর্ণবিকাশ ও পরিণতি দেখিতে হইলে, অর্দ্ধ-সভ্য রুশিয়ার দিকে দৃষ্টি করিতে হয়। সেখানকার জন-সাধারণ বহুযুগ ধরিয়া বিসদৃশ শাসন-চক্রের নীচে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইতেছিল। রাজ্য পরিচালনায় তাদের কোনও প্রকার হস্ত ছিল না; সার্ফ‌ডাম নামক ক্রতদাস প্রথার বিধানানু-সারে ধনী, দরিদ্রের জীবন-মরণের নিয়ামক ছিল, ও অর্থ যা তা ভূস্বামি-গণ, সম্রাট ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও পোষ্যবর্গের বিলাসবাসনা চরিতার্থতায় ব্যায়িত হইত। যদি কথনও কেউ এই বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলিত, নির্জ্জন সাইবেরিয়ার মেরু-প্রান্তরে ভীষণ কারাগারে তাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত। ক্রমে, ইয়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশের ভাবসকল প্রচলিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে, জনসাধারণের পক্ষ হতেও প্রতিবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। রুশিয়ার গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস—রাজা প্রজা, ন্যায় অন্যায়, ধনী নির্ধন, প্রবল দুর্ব্বলের সংঘর্ষের ইতিহাস। এর ফলে অবশেষে প্রজাশক্তি জয়যুক্ত হইয়াছে ও রাজা অন্তর্হিত হইয়াছেন। যে লেখকদের চেষ্টায় রুশিয়ার অন্তর্নিহিত দুঃখ দৈন্য,

অত্যাচার অবিচারের ভয়াবহ কাহিনী জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল এবং যার দরুণ সভ্য সমাজের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁদের মধ্যে রুশিয়ার ঔপন্যাসিক—টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, ডষ্টয়ফেস্কি, গোর্কি প্রভৃতির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এঁদের লেখার ভিতর দিয়া যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানব-জীবনের মহত্বের ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, তাই ক্রমে সমস্ত রুশিয়াকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ফরাসী উপন্যাসে সমাজের অন্যায়-শাসনে নিষ্পেষিত দরিদ্র-দুর্ব্বলের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কি ব্যালজাক, কি জোলা, Realistic ঔপন্যাসিক হইলেও প্রকৃত দুঃখের সহিত পরিচিত হইবার তাঁদের তেমন সুযোগ হয় নাই। টুর্গেনিভ, গোর্কি, ডষ্টেয়ফেস্কি—অনেকেরই কারাগারে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। জীবনে নানা প্রকারে যে সকল দৈব-দুর্বিপাক ও যাতনা এঁরা ভোগ করিয়াছিলেন, সমস্ত যেন জমাট্ হইয়া এঁদের লেখায় বিরাজ করিতেছে। এঁদের লেখায় ভাষার তেমন লালিত্য নাই, শুধু সত্যের ভয়াবহ বিকট বিসদৃশ স্বরূপ দেখাইয়া এঁরা লোকের মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। এঁরাই প্রকৃত পক্ষে বাস্তবতা-মূলক উপন্যাস লিখিয়াছেন; এঁদের এক এক জনের জীবনই এক একখানা এমন উপন্যাসের খণ্ডাংশ।

বাঙ্গলায় যে উপন্যাস-যুগের সূচনা হইয়াছে, তার উৎপত্তির উৎস ইংল্যাণ্ডে। অপূর্ব্ব-প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের এ-ধারার প্রবর্ত্তক। কিন্তু তিনি যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান বাস্তবতা-মূলক উপন্যাসের দিনে আর তা তেমন আনন্দ দান করিতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় স্কটের প্রভূত প্রতিপত্তি। তাঁরই অনুকরণে, তাঁর প্রথম গ্রন্থ দুর্গেশ-নন্দিনী ও অন্যান্য গ্রন্থ রচিত। এ-সকল কল্পনা-প্রধান উপন্যাসে, সত্যের সমাবেশ নিতান্তই কম। লেখক নিজেই অনেকাংশে তাঁর বর্ণিত জগৎ

ও চরিত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, জীবনে যে সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব; তাই, দেবীচৌধুরাণী, মৃণালিনী, সীতারাম, রাজসিংহ, ইন্দিরা প্রভৃতি যে সকল উপন্যাস এক সময় বাঙ্গলার পাঠকদের মহা-আদরের জিনিষ ছিল, ক্রমে ক্রমেই অন্তঃসারশূন্য গল্প-স্বরূপে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা হতে বহির্ভূত হইতেছে।

বাঙ্গালী লেখক, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল ও আর দু একখানি গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র তাঁর লেখায় প্রকৃত বাঙ্গালীর তেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিও নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রাণ-প্রসারতা ছিল না বলিলেও চলে। যে সাম্য উদারতার বাণী পূর্ব্বে রামমোহন প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন ও তাঁর সময়ে কেশবচন্দ্র প্রচার করিতেছিলেন—তার ক্ষীণ পরিচয়ও তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বর্ণনীয় বিষয়ের ভিতরও তেমন নূতনত্ব কিছু নাই। সেই মামুলীধরণের রাজা, বাদসাহ, ওমরাহের কাহিনী; সেই প্রাচীন কালের সতীধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার। রমণীর সম্মুখে যে বিশালকার্য্যক্ষেত্রের দ্বার খুলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, যেখানে সে পুরুষের মত সমান অধিকার পাইবার জন্য উদগ্রীব, সে বিষয়ের সঙ্গেও তাঁর কোনও সংশ্রব নাই। প্রাচীনভাবে-পুষ্ট সমসাময়িক লোক তাঁর লেখায় মোহিত হইয়াছিল, এখনো সে মোহ সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই কিন্তু তাঁর প্রভাব যে দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, সন্দেহ নাই। যাঁরা শুধু লোকমতের দিকে চাহিয়া লেখেন, চিরকালই তাঁদের এ দশা। সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থায়ী যশ, অনেক সময়েই মৃতের জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে।

বঙ্কিম-যুগের আর একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য ও তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত ঔপন্যাসিক—রমেশচন্দ্র। ভারত-ইতিহাসের এমন সব গৌরবময় অংশের ভিতর তিনি তাঁর গল্পের বিষয় স্থাপন করিয়াছেন, যে আপনা হতেই পাঠে

প্রাণ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁর ভাবের গভীরতা নাই। চরিত্র সকলও মাটিতে গড়া পুতুল; বাইরের চাকচিক্যে, সাজ-সজ্জায় ভূষিত, কিন্তু প্রাণহীন। এ-সময়েরই অন্য গ্রন্থ 'স্বর্ণলতা,'—বাঙ্গালীর সরল গার্হস্থ্য জীবনের সুন্দর করুণ-কাহিনী। ইহার সঙ্গে গোল্ডস্মিথের ভিকার অব উয়েকফিল্ড Vicar of Wakefieldর তুলনা হতে পারে, কিন্তু উভয়ের কোনটীকেই ঠিক উপন্যাস সংজ্ঞাভুক্ত করা যায় না। এই শ্রেণীর অন্তর্গত 'রায় পরিবার' ও 'অনাথ বালক'। বাঙ্গালার স্কুল-কলেজের ছেলেদের ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য-যুবক এবং বৌদের পাঠের উপযুক্ত বই—সে-সবের কল্যাণে ঘরে ঘরে পতিভক্তির যথেষ্ট চর্চ্চা হইতেছে কিন্তু নারী-মূর্ত্তিতে প্রকৃত মানুষ সৃষ্ট হইতেছে না।

বর্ত্তমানকালে রবীন্দ্রনাথের জগৎব্যাপী যশ। যেমন কাব্যক্ষেত্রে, তেমনি বাঙ্গালার গন্ধ-সাহিত্যেও তিনি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁর 'ছোট গল্পের' তুলনা নাই। সে ক্ষেত্রে মোপাশাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু মনে হয়, কালে যেমন কাব্য-ক্ষেত্রে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী-লেখকের প্রতিভার সম্মুখে ইয়ুরোপকে পরাভব মানিতে হইবে। এমন সব প্রাণের নিগূঢ় কথা, কে এমন কবিত্বপূর্ণ গরিমাপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিবে? তাও বলিতে হয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় বাঙ্গালার প্রাণের কথা ব্যক্ত হয় নাই, বাঙ্গালীর প্রকৃত জীবন বর্ণিত হয় নাই। সে যে রেলে ষ্টীমারে, রাস্তা-ঘাটে অত্যাচারিত হইতেছে; অর্দ্ধাশনে, ওলাউঠা, ম্যালেরিয়ায়, বসন্তে মরিতেছে; সে যে নিতান্ত দরিদ্র; নিঃসহায়; সে যে জমীদার মহাজনের ভয়ে অস্থির; জাতিভেদের বিষময় ফলে, লোকের বাহির, কুকুরেরও অধম; সে যে অশিক্ষিত; অসার সামাজিক তর্ক-বিতর্কে নিমজ্জিত; আশাশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, দুর্ব্বল, কুসংস্কারগ্রস্ত; সে যে ত্যাগ ও অসারত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিতে

করিতে দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে; কোথায় বাঙ্গালার বিশ্ববিখ্যাত লেখকের লেখায় বাঙ্গালীর প্রকৃত জীবন-চিত্রের সমাবেশ?

রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান, কলিকাতাবাসী, দরিদ্র-জীবনের সঙ্গে মিলিবার মিশিবার সুযোগ তাঁর নাই। এ-সকল ভাব তাঁর লেখায় ফুটিবে কেমন করিয়া? তাঁর রচিত 'চোখের-বালি,' 'নৌকাডুবি' ও 'গোরাকে' বিশ্লেষাত্মক বাস্তবতা-মূলক উপন্যাসের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়া থাকে ও এ-ক্ষেত্রে তিনি যে পথ-প্রদর্শক এদের দেখাইয়া তা'ও বলা হয়। কিন্তু সত্যই কি Realistic উপন্যাসের আখ্যা পাইবার দাবী এদের আছে? প্রথম দুটী নিতান্ত অস্বাভাবিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। 'চোখের-বালিতে' 'বিনোদিনী' ও 'নৌকা-ডুবিতে' 'কমলা' যে সকল কাণ্ডকারখানার ভিতর দিয়া নিজ নিজ নারী-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছে, তা' বাস্তব-জগতে নয়, কল্পনার কুহেলিকার ভিতরই সম্ভব। বস্তুতঃ, এ-দুখানি গ্রন্থ ভাষার-লালিত্য-গুণেই লোকচিত্ত হরণ করে, উপন্যাসের উপকরণ এদের ভিতর তেমন নাই। 'গোরা' শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ কিন্তু ঘটনার নিতান্তই অভাব। বিনয়ের গৃহ হ'তে গোরার গৃহে এবং সেখান হ'তে পুনঃ বিনয়ের গৃহে প্রত্যাগমন—হাঁটিতে হাঁটিতে পাঠকের যেন ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া পড়ে। তা ব্যতীত গ্রন্থে অনেক অসার চীৎকার ও বক্তৃতা আছে, যা প্রাণ স্পর্শ করে না। গ্রন্থশেষে আনন্দময়ীর উদ্দেশে উক্ত, 'তুমিই আমার মা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ', গোরার মুখে স্থাপিত এই কথাগুলি নিতান্ত-উপন্যাসের মতই বলিয়া বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ গীতি-কবিতা লেখক, বড় কিছু লেখা তাঁর পক্ষে তেমন সম্ভবপর নয়। 'ঘরে বাইরের' ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভা যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন আর কোনও গ্রন্থে নয়; যেমন ভাষা, তেমন ভাব— বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস।

উপন্যাসের কার্য্য-ক্ষেত্র, বিশাল বিস্তৃত। বাঙ্গালায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর উপন্যাস-রচনা, কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ, গৃহাবদ্ধ বাঙ্গালীর জীবন-পরিসর নিতান্ত ক্ষুদ্র; দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালীর সামাজিক-জীবনের নিয়মানুসারে পুরুষ ও রমণীর যদৃচ্ছা-মিলন এবং তার ফলে যে প্রেমের ভাবের উদয় হয়, তার বিকাশ একপ্রকার অসম্ভব। বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসও তেমন গৌরবময় নয়, যে স্কটের মত কোনও ঔপন্যাসিক ঐন্দ্রজালিক তুলিকায় বর্ণনা করিয়া জগৎবরেণ্য হইবেন। কঠিন ব্যাপার, কিন্তু প্রতিভা, উদ্যমের কোন্ দাবী অপূর্ণ রহিয়াছে? শুধু বাস্তবতা-মূলক উপন্যাস লিখিলেও চলিবে না, কারণ বাঙ্গালীর বর্ত্তমান বা অতীত জীবনের ভিতর এমন সুমহান্ সত্য খুব কমই আছে, যাকে ধরিয়া সে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। যদি কোনও জাতির পক্ষে আদর্শ-মূলক উপন্যাসের প্রয়োজন থাকে, তবে এই সাহস-উদ্যম-উচ্চাদর্শ-বিহীন জাতির। সমস্ত জগৎ ভরিয়া যে সাম্য প্রেমের মহামন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, তার ভাবে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন পুষ্ট করিতে হইবে। প্রাচীনকে বহুল ভাবে ত্যাগ ও সংস্কৃত করিয়া, নবীনের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হইবে। যদি নবজীবনের রসে জাতিকে উদ্বোধিত করার কারও ক্ষমতা থাকে, তা সাহিত্যেরই আছে এবং সে-ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভিতরও উপন্যাসের সর্ব্বাগ্রে স্থান।

২৫·৮·১৬।—ভারতবর্ষে বিবাহবিধি ধর্ম্মের একাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। পূর্ব্বপুরুষকে পিণ্ড দান করার জন্য নাকি পুত্রের প্রয়োজন! এবং তাকে লাভের জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন! মনুর বিধিমতে রমণী—বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন, স্বাধীনভাবে বাস করার কোনও অবস্থাতেই তার ক্ষমতা নাই। স্বামী কি পুত্র, বাপ কি

ভাই, কারো কোনও সম্পত্তিতে নির্ব্যূঢ়সত্ত্বে অধিকারিণী হইবার তার অধিকার নাই। একমাত্র স্ত্রীধনরূপে যৎসামান্য কিছু দানস্বরূপে অর্জ্জন করার তার ক্ষমতা। স্বামী-মনোনয়নেও কোন অধিকার নাই। পিতা বা তাঁর অভাবে অন্য আত্মীয় তাকে যার হাতে সঁপিয়া দিবে, তাকেই দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতে সে বাধ্য, হোক্ সে অন্ধ, খোঁড়া, হোক্ সে বৃদ্ধ; কুষ্ঠগ্রস্ত। দশ বছর বয়সের আগেই তার বিবাহ সম্পন্ন হওয়া প্রশস্ত ব্যবস্থা! এদিকে স্বামী যতটা ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, এবং অন্য স্ত্রীলোকের সহিত বিনা বাধায় মিলিত হ'তে পারে। স্বামীকে যদৃচ্ছা বিবাহ করার ক্ষমতা দান করিয়া, বিধবাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা না করিয়া এবং আজীবন তাকে গৃহাবদ্ধ রাখিবার বিধি প্রচলিত করিয়া, সমাজ এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। জগতে কোথাও চিরবৈধব্য প্রথা বর্ত্তমান নাই; স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের এমন প্রভুত্ব এবং অত্যাচারও কোথায় নাই।

এক্ষণে পাশবিক বলের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। সমাজ রাজ-বিধির নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতেছে। সর্ব্বত্রই জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রমণীরও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সমস্ত সভ্য সমাজেই সে যে পৃথক জীব, তারও যে পৃথক সত্তা আছে—এ সত্য গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে ইয়ুরোপ, আমেরিকায় রমণী পুরুষের ন্যায় স্বাধীন; সম্পত্তি অর্জ্জন ও দান করার অধিকার-প্রাপ্ত। ইংল্যাণ্ড রক্ষণশীল দেশ, সেখানেও রমণী পার্লিমেণ্টে ভোট দেওয়ার ও তার সভ্য হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে; সে দিন বেশী দূর নয়, যে দিন স্ত্রীলোক পুরুষ একত্র হইয়া একযোগে রাজ্যশাসন যন্ত্র পরিচালন করিবে। সে-সব দেশে জীবিত জাতিদের বাস, যাদের বিজয়-গৌরবের কাহিনীতে জগৎ মুখরিত। সে সকল দেশে পুরুষের মত নারীও

সুশিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। পুরুষের ভাবে পুরুষ, রমণীর ভাবে রমণীকে মানুষ হইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে; দেখা যাইতেছে, রমণী পুরুষ অপেক্ষা জ্ঞানে বা বিদ্যায় কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নয়। যাদের ভিতর হ'তে জর্জ্জ ইলিয়াট, ম্যাডাম কুরি, অ্যানি বেসাণ্ট, সরোজিনী নাইডুর মত বিদুষীর আবির্ভাব, তারাও নিকৃষ্ট?

ইয়ুরোপে এক্ষণে বিবাহ-বন্ধন-ছেদন Divorce-প্রথা অপ্রতিহত-ভাবে প্রসারিত হইতেছে। আমাদের চোখে অর্থাৎ যারা স্ত্রীলোকেরও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলিয়া যে একটা কিছু আছে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, এ-প্রথা নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যারা ন্যায়ের কাজল চক্ষে পরিয়া দৃষ্টি করিবে, তাদের কাছে এর ভিতর দোষণীয় এমন কিছু আছে মনে হইবে না! পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ে স্বেচ্ছায় বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হইবে, এবং যেখানে একের অন্যের সঙ্গে বাস অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে এবং উভয়েরই সে ব্যাপারে সমান ক্ষমতা থাকিবে, এতে দোষের এমন কি রহিয়াছে? এ-সব সময় স্বামীকে অন্য স্ত্রী গ্রহণে কেউ আপত্তি করিবে না, কিন্তু স্ত্রী যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তা হ'লে তাকে সমাজ দেশান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিবে, কোন্ ন্যায়-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিধি? যাই হোক্, যতই শিক্ষা-বিস্তৃতির সঙ্গে জ্ঞানালোকে রমণী-হৃদয় প্রদীপ্ত হইবে, তার চিত্ত-নিহিত মনুষ্যত্বে এবং নিজ শক্তি ও অস্তিত্বে সে বিশ্বাসবতী হইবে, ততই সে তার পৃথক অধিকার দাবী করিবে, এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, এই বিবাহ-বন্ধন-ছেদন-প্রথা Divorce বা এ-প্রকার কোনও প্রথা সমাজে প্রচলিত হইবেই।

এই যে ইয়ুরোপে ভয়াবহ যুদ্ধব্যাপার চলিতেছে, তাতে সমাজ-শাসনে স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য পুরুষের পক্ষে কতদূর প্রয়োজনীয়, তা

প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হইতেছে। পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া গিয়াছে এবং রমণী তাদের স্থান অধিকার করিয়া শাসন-যন্ত্র পরিচালনে সাহায্য করিতেছে। বস্তুতঃ, সে সকল দেশের রমণীও যদি পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষিত ও স্বাবলম্বন-ভাবাপন্ন না হইত, তা হ'লে এ-যুদ্ধ পরিচালন অসম্ভব হইত। যখন সে-সব দেশের রমণীদের দিক হ'তে নিজ-দেশের দিকে মুখ ফিরাই, তখন দেখিতে পাই, এক নিবিড় আঁধারে সমস্ত দেশ ঢাকা, এক অনবচ্ছিন্ন মূর্খতার ভিতর নারী-সমাজ নিমজ্জিত। নারী-মূর্ত্তিতে কি শক্তি-সমূহেরই না অপচয় হইতেছে!

মানব-সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দৃষ্ট হইবে, সময়-বিশেষে এক একটী প্রশ্ন সমাধানের জন্য বিষম গুরুভাবে এর কাছে উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান জাতি, যুক্তি ও বিচার দ্বারা, যথাসময়ে এর যথাযথ সমাধান করিবার চেষ্টা করে, এবং তার কল্যাণে নূতন ভাব-সঞ্জীবনীতে পুষ্ট হইয়া উন্নতির পথে, জীবনের পথে, অগ্রসর হয়। আর যারা দৃষ্টি-প্রসারতার অভাব-বশতঃ তেমন ভাবাপন্ন নয়, যুক্তি অপেক্ষা পাশবিক বলকেই নীতি-শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট নিয়ম মনে করে এবং শুধু তার সাহায্যেই সমাজ-শাসনে অভিলাষী, তারা এ সকল সমস্যাকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, নেহাৎ ঠেকাপক্ষে পাশ কাটিয়া সময় কাটায়, কিন্তু তাদেরও সন্ধ্যায়, দিবসের কাজের হিসাব দিতে হয়, এবং হিসাব দিতে যাইয়া সময়বিশেষে জগত-পৃষ্ঠা হ'তেই চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইতে হয়।

সত্যের একটি ধর্ম্ম, যে তা মুক্ত আলোতে আসিয়া আপনা হ'তেই প্রকাশিত হ'তে চায়, চিরকালের জন্য তাকে চাপিয়া রাখা যায় না। যতই কেন পুরুষ চেষ্টা না করুক, রমণী একদিন তার ন্যায্য অধিকার পাইবেই। তার জীবন-সমস্যা-সাধনে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে হইবেই। সত্য, পুরুষের পক্ষে ইহা নিতান্ত ক্লেশকর, কিন্তু কতদিন

আর নারী পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া তার জীবন-গতি নির্ণয় করিবে? পুরুষের অত্যাচারে তার পূর্ণ-বিকাশ হয় নাই। কি বিবাহ, কি সম্পত্তি-অর্জ্জন, কি শিক্ষা, কি আচার ব্যবহার, সামাজিক সকল ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন। এ-সব-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার পুরুষের ন্যায়তঃ কোনও অধিকার নাই। শুধু পুরুষের সুখ-ভোগ-বিলাসের কাঠ-খড় যোগাইবার জন্য রমণীর সৃষ্টি হয় নাই, নিজ সত্তা বলিয়া তারও একটা জিনিষ আছে, যাকে ফুটাইয়া তুলিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব-স্বাদের আনন্দ তাকে উপভোগ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যেই নারী-সমস্যা ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় একটী বিষম সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাস্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। সেখানে এর সমাধানের চেষ্টা হইতেছে এবং হইবেও। এ-দেশে অবশ্য তেমন উৎকটভাবে ইহা দেখা দেয় নাই, তার কারণ আমাদের রমণীরা অধিকাংশই অশিক্ষিত, কিন্তু সমস্যা যত শীঘ্র পূর্ণ হয়, ততই মঙ্গল। তা না হ'লে অতীতে যেমন, এখনও যেমন, ভবিষ্যতে তেমন—রমণীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পুরুষও—রসাতলে গিয়াছে, যাইতেছে এবং যাইবে।

২৩.১০.১৬।—আজ রবীন্দ্রনাথের জগৎ-জোড়া যশ। সত্যই কি তিনি সে যশের উপযোগী?

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন-ধরণের কবি। মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, ও হেমচন্দ্র, বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যের কবিত্রয়, অল্প বা অধিক পরিমাণেই হোক্, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতির বংশধর; তাঁদেরই রীতি, বিধি, সংস্কার, আদর্শ—এঁদের লেখায় অভিব্যক্ত। ভাষারও বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণকারী। ভারতচন্দ্র ও মধুসূদনের ভাষায় যে মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য আছে, নজরে পড়ে না,

অন্ততঃ, বলিবার নিয়ম-সম্বন্ধে। ভাষার গায়েই ভাবটী লাগিয়া রহিয়াছে; কথাটী বলিতেই ভাবটী, নিতান্ত পরিচিত সরল, আপনিই বাহির হইয়া আসে, বুঝিতে কোন প্রকার কষ্ট করিতে হয় না।

বরং, রবীন্দ্রনাথের কতক তুলনা হ'তে পারে বৈষ্ণব-কবিদের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথেরই মত কেমন মাজা-ঘষা সম্পদশালী ভাবে-ভরা ভাষা বিদ্যাপতির, কিন্তু বৈষ্ণব-কবি প্রেম ব্যতীত অন্য বিষয় লইয়া নাড়া-চাড়া করেন নাই, তাঁর জগৎ এক-চন্দ্রের আলোতেই উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথের মত জটিল তত্ত্ব-সমূহ সম্বন্ধে জল্পনা করার তাঁদের অবকাশ হয় নাই। তাই, নানা ভাবের তান-লয়ে মিশ্রিত রবীন্দ্রনাথের লেখার মত, তাঁদের কবিতা, এমন অপূর্ব্ব-রূপে ঝঙ্কারময়ী নয়। নিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের হস্তধৃত বীণার মত, রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে যখন যে প্রকারে ইচ্ছা, ফুটাইয়া তুলিতেছেন। এমন শব্দ-সম্পদ, মধুরতা কোমলতা ও গভীর নির্ম্মল ভাব যার প্রাণ, আমাদের অন্য কোনও কবির ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা হ'তে গৃহীত শব্দ-যোজনা দ্বারা যেমন তাঁর ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তেমনি দেশের সাধারণ লোকের নিত্যব্যবহৃত নূতন শব্দেরও তাঁর লেখায় কেমন সমাবেশ! প্রাচীনে নূতনে, সরলে কঠিনে, গম্ভীরে হাল্‌কায় মিশ্‌ খাইয়াছেও কেমন সুশ্রীভাবে! তাঁর ভাষা মধুর, তা' কোমল, সংযত ও অন্তর্নিহিত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বলীয়ান্‌; বিশেষ করিয়া, তা' পবিত্র-ভাবোদ্দীপক ; উপনিষদের ভাষার মত শুভ্র, নির্ম্মল।

তাঁর ভাষা ভাব-পরিপূর্ণ, suggestive ভাব-ব্যঞ্জক, পুষ্পকলিকার মত অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-সুগন্ধে ভরপুর। তিনি যা বলেন, তা অপেক্ষাও suggest ভাবোদ্রেক করেন অনেক বেশী ; যতই চিন্তা করা যায়, ততই যেন আলোক-পুঞ্জের মত ভাব-সৌন্দর্য্য বিকশিত হ'তে থাকে। তাঁকে বুঝিতে হইলে, ভাবিতে হয় ; সাধারণ লোকের পাঠের জন্য তাঁর লেখা

নয়। ইংল্যাণ্ডে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কিট্‌স, ব্রাউনিং প্রভৃতি যে ধরণের কবি, তিনিও তদ্রূপ। কবিত্ব-হিসাবে তিনি বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস অপেক্ষা, তাঁদের সঙ্গে এক বংশসম্ভূত বলিলেই বোধ হয় অনেকটা ঠিক্ হয়।

Abstract অশরীরি বিষয়কে Concrete বাস্তব-রূপ দান করিয়া, চোখের কাছে ধরিয়া দিবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। এই একটী গুণ, যা তাঁর কবিতাকে এত সৌষ্ঠব দান করিয়াছে। এ বিষয়ে শেলী বোধ হয় তাঁর পথ-প্রদর্শক, কিন্তু তিনি তাঁর অপেক্ষা কত অধিক শক্তিশালী!

বিষয় সম্বন্ধে কি বলিব? তিনি নানা বিষয়ই লিখিয়াছেন। কিন্তু, এ-সম্পর্কে বলিতে হইবে—অবাস্তব বিষয়েই তাঁর কল্পনা খেলে ভাল; বাস্তবতার কঠিন স্পর্শে তা' যেন কতকটা প্রাণহীন, মলিন হইয়া আসে; অবাস্তবতার আকাশেই তাঁর প্রকৃত বাসস্থান। কিন্তু, সত্যই কি অবাস্তব তা'? বাস্তবতার কঠোর কর্কশ স্পর্শে ক্লিষ্ট দীর্ণ মানব-প্রাণ কোন্ দূর-দেশের, কোন্ 'সুদূরের' দিকে চিরকাল চাহিয়া আছে? অবাস্তব যে সময়বিশেষে বাস্তব অপেক্ষাও বাস্তব, সত্য।

ইংরাজীতে যাকে Lyric Poet গীতি-কবিতা-লেখক বলে, তিনি তাই। আমাদের দেশে তাঁর পূর্ব্বে Lyric Poet তেমন কেউ দেখা দেন নাই বলিলেও চলে। সংস্কৃত-সাহিত্যে এ-শ্রেণীর কবি নাই; এক গীত-গোবিন্দ, তাকেও Lyric বলা চলে না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের ছোট-ছোট কবিতা, তাদেরও ঠিক গীতি-কবিতা বলিতে ইচ্ছা করে না। অবশ্য বৈষ্ণব-কবিদের স্থান স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁদের বিষয় এক বই দুই নয়।

সত্য, ভাষা ভাব ও রচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি অনেক সময় ইয়ুরোপীয়

কবিদের অনুসরণকারী। কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি বাঙ্গলার কবি, ভারতের কবি; ভারতের বেদান্তের ভাব ও বৈষ্ণবের আত্মহারা প্রেম তাঁর কবিতার স্তরে স্তরে জড়িত, তার সঙ্গে বর্ত্তমান-যুগের বিবর্ত্তন-বাদ একত্র হইয়া তাঁর লেখাকে এমন গভীর ভাবাত্মক করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের প্রাচীন পুরাতন আত্মা নূতন বেশ ধারণ করিয়া কেমন অত্যুজ্জ্বল নয়ন-নন্দন মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছে! তাঁর কবিতা তেজস্কর না হইলেও দুঃখমূলক নয়, ভগবানের প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথকে বুঝিলেই বর্ত্তমান ভারতের নিগূঢ় আত্মার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়,—মহত্ত্বের আধার, idealism আদর্শ-অনুসরণের-ভাবে অনুপ্রাণিত, নূতন-অদম্য-আকাঙ্ক্ষা-আশা-উদ্বেলিত। কবির কথায়,—

যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে।
(ওরে) অগাধ বাসনা অসীম আশা,
জগৎ দেখিতে চাই।
জাগিয়াছে সাধ—চরাচর ময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই।
পরাণের সাধ তাই।

বহুযুগ হ'তে 'অমৃত'-সন্ধান-তৎপর ভারত, যখন যা কিছু তার

অংশস্বরূপে বহু সাধনায় লাভ করিয়াছে, পরকে বিলাইয়া নিজে ভোগ করিয়াছে ও তাতেই আপনাকে সুখী, ধন্য মনে করিয়াছে। ষষ্ঠবর্ষ-ব্যাপী কঠোর জপতপের অবসানের পর সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন এবং জীবনের উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস তাঁর চোখের সুমুখে প্রকটিত হইয়া পড়িল, তখন তাঁর প্রথম চিন্তাই হইয়াছিল, কেমন করিয়া নিজের মত ভাই-বোন্‌দেরও দুঃখ-যন্ত্রণা হ'তে উদ্ধার করিবেন। অন্যান্য সত্যের সঙ্গে, এই সত্যও তাঁর জ্ঞান-চোখে ধরা দিয়াছিল যে, সকল জীবের প্রতি প্রেম-মৈত্রীভাব পোষণ করিতে করিতে ও তাদের সেবায় জীবন-যাপনের ফলে, কালে চিত্ত-মধ্যে এমন অনাবিল সুখ, শান্তি, আনন্দ উদ্গত হয়, যে সামান্য দুঃখের মলিনতার ক্ষুদ্রাংশটুকুও আর তখন তাতে দৃষ্ট হয় না। ইহাই নির্ব্বাণ অবস্থা,—যখন বাসনা-আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়া আসে, শত্রু-মিত্র আত্মীয়-অনাত্মীয় জ্ঞান দূর হইয়া যায়, উপরে-নীচে বামে-দক্ষিণে প্রাণের মধ্যে এক মহাপ্রেমের মৃদু-বাতাস বহিতে থাকে, এবং নির্ম্মল আনন্দ পূর্ণচন্দ্রের মত হৃদয়-প্রদেশ আলো করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। এমন ভাবাপন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী, বুদ্ধ—প্রাণ যাঁর দর্শনে আপনা হ'তেই পায়ে লুটাইয়া পড়ে, যাঁর চারিদিকে সর্ব্বক্ষণ আনন্দ ও পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। শিষ্যদের উদ্দেশ করিয়া বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—যাও তোমরা জগতের হিতার্থে, লোক উদ্ধারার্থে, দয়ার ভাবে প্রাণ পূর্ণ করিয়া নাও—এই মহাধর্ম্ম প্রচার কর। ইহাই মহৎ-ভারতের ধর্ম্ম—পর-পীড়ন নয়, কারো ধন-বিত্ত কাড়িয়া নিয়া তাকে দাসে পরিণত করা নয়; পরের দুঃখ-মোচন, আত্মশুদ্ধি সম্পাদন যার একমাত্র কাম্য,—ইহাই প্রকৃত জ্ঞানী মনুষ্য-নামধারী জীবশ্রেষ্ঠের জীবন। গুরুর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ও তাঁর উপদেশ মাথায় ধারণ করিয়া, শিষ্যগণ এই মহাধর্ম্ম,—লোক-সেবা, দুঃখী-

দরিদ্র-সেবা, আর্ত্ত-পীড়িত পশু-পক্ষীর সেবা যার প্রধান অঙ্গ, এক মহা-সাম্যের ভাবে সকল লোককে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গাঁথিয়া তোলা ও জ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত সংশয় সন্দেহ ও দুঃখ-জাল ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি যার লক্ষ্য,—ভারতবর্ষ হ'তে আরম্ভ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্বে চীন, জাপান, কোরিয়া, সাইবেরিয়া, এমন কি ব্যারিং প্রণালী পার হইয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত, ও অন্যদিকে পারস্য, তুর্কিস্থান, সিরিয়া, মিশর ও গ্রীসে প্রচার করিয়াছিলেন। এক সময় ভারতীয় আদর্শে, ভারতীয় সভ্যতায় সমস্ত এশিয়া আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। জগতের ইতিহাসে এমন ভাবে সভ্যতার আলো আর কোন জাতি কর্ত্তৃক বিকীর্ণ হয় নাই—ভারতীয় সভ্যতার ইহাই বিশেষত্ব।

*

বহুযুগের অবসানের পর, সুপ্ত-নিদ্রিত ভারত বুকের ভিতর আবার যেন, কি এক মহা-জাগরণের স্পন্দন অনুভব করিতেছে। কিন্তু পাষাণ-কারাগারে বন্দী ভারত, চারিদিকেই তার বন্ধনের শৃঙ্খল!

'কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদ-প্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।
অহো কি মহান্ সুখ অনন্তে হইতে হারা,
মিশাতে অনন্ত প্রাণে, অনন্ত প্রাণের ধারা!
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন!

* * * *

'কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয়!
পাষাণ-বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,

বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা
সারা প্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়াবে জগৎহিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা।"

আমি যাব'—আমি যাব'—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা-গান ;
উদ্বেগ অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ,
'ওরে চারিদিকে মোর,
একি কারাগার ঘোর !
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর !

নানা-রূপে—কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, জ্ঞানের নানা বিভাগ ও সেবার ভিতর দিয়া, আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিবার জন্য ভারত আবার উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে,—আত্মোৎকর্ষে, জগৎ পরিচর্য্যায় আপনাকে বিলাইয়া দিবার জন্য সে অস্থির-চিত্ত ; জগৎ-কল্যাণের জন্য তার জ্ঞান-বাণী, প্রকৃত-সাম্যের বাণী ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া যে প্রয়োজন। বেদান্ত—ভগবান ও মানবের একত্বে বিশ্বাস তার বর্ত্তমান ধর্ম্ম ; ভারত-প্রীতি, জগৎ-প্রীতি তার প্রাণের একাঙ্গ ; আদর্শ অনুসরণের মহৎভাবে idealismএ তার প্রাণ পরিপূর্ণ। জ্ঞানী-ভারতের,—যে ভারতই ভবিষ্যতে তার অজ্ঞান কুসংস্কারপূর্ণ অচল অংশকে, নূতন জীবনের

আলো-প্রদানে মহৎ করিয়া তুলিবে—ইহাই ধর্ম্ম, ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই মহত্তর ভারতের মূর্ত্তি—তার নিগূঢ় আশা, আকাঙ্ক্ষা idealism কেমন স্থানে স্থানে বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে! তাঁর লেখা পড়িতে পড়িতে কত সময় এই প্রাচীনে-নবীনে মিশ্রিত মহৎ-ভারতের সঙ্গে আত্মার যোগ অনুভব করিয়া কত না আনন্দ অনুভব করিয়াছি!

কিন্তু, তাও মনে হয় বাঙ্গালার প্রাণ-ক্ষুধা যেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়াও পূর্ণরূপ ব্যক্ত হয় নাই। কি যেন কিসের অভাব, শিকলে পা-বাঁধা, তেজ-বীর্য্যের অভাব—রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার Representative poet প্রতিনিধি-কবি নন, বাঙ্গালার মুখপাত্র নন। যে দুর্জ্জয় বাসনা বাঙ্গালী যুবকের প্রাণে মাথা আছড়াইয়া মরিতেছে, কে তারে গুঁথে শব্দ যোজনা করিয়া জগৎ-সভায় প্রকাশ করিবে? সে শক্তি কা'র, সে সাহস কা'র, তেমন জ্বালাময়ী ভাষার উপর ক্ষমতা কা'র?

আজ যে রবীন্দ্রনাথের জগৎব্যাপী যশ সম্মান, তাও ক'জন বাঙ্গালী তাঁর কাব্যগ্রন্থ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে? সে-দিন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট চন্দ্রভরকারের লিখিত একটী প্রবন্ধে পড়িতেছিলাম, বাঙ্গালার পথে ঘাটে কৃষক সকল তাঁর রচিত গান গাহিয়া বেড়ায়। মান্দ্রাজ হ'তে প্রকাশিত Indian Review পত্রিকায়ও এই ধরণের কতক ছত্র পড়িলাম। যাঁরা বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের কিঞ্চিৎ সংবাদ রাখেন, চাষাভূষার সঙ্গে মিশেন, তাঁরা জানেন, এ-মন্তব্যের মধ্যে কতটুক সত্য নিহিত। হ'তে পারে তাঁর গান বা কবিতার দু একটী টুক্‌রা, কোনও সৌখীন পল্লীযুবকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু ইহা সত্য, তিনি কৃষকদের কবি নন। তাদের সঙ্গে, তাঁর কবিতার,—কোনও সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। তাঁর গানের, কবিতার ভাব, ভাষা, এমন কি, বিষয়ও তাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। কে কবে কোন্ পল্লী-সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের গান

গাহিতে গাহিতে কৃষকদের আনন্দ-মত্ত হ'তে দেখিয়াছে? তিনি অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কৃষকদের কবি ন'ন, তাঁর ও তাদের প্রাণের যোগ নাই, তাদের সুখ দুঃখ আশা ভাবনার সঙ্গে তিনি পরিচিত নন, তারা চিনেও না তাঁকে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কবি, তাদেরই কামনা ভাবনা তার কবিতায় ব্যক্ত; তারাই যে নব্য-ভারতের প্রাণ।

সচরাচর দুই শ্রেণীর কবিতাই সাধারণ লোকের প্রিয়—এক, প্রেম-কবিতা; অন্য, ধর্ম্ম-সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাঁর ব্যবহৃত ভাষা তো দুর্ব্বোধ্যই বটে; তা' ব্যতীত, তাঁর লেখায় তেমন গভীর ভাবের সমাবেশ নাই, তা' 'বসন্তের বাতাসটুকুর মত ছুঁয়ে যায় নুয়ে যায়', কিন্তু প্রাণ মাতায় না। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত তিনি প্রেম-পাগল ন'ন। তাঁদের লেখনীর মুখে যে প্রেম-উন্মাদিনী রাইর বিচিত্র মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁর লেখায় কি তেমন কারো দর্শন পাওয়া সম্ভবপর—রাই যে তাঁদেরই আজন্ম কামনার শারীরি মূর্ত্তি, তাঁদের বাসনা গলাইয়া গলাইয়া তার সৃষ্টি। শুধু কি তাঁদেরই কামনা, সে যে জগতের চিরজন্মের মূর্ত্তিময়ী বাসনা। নিখিল-সোহাগিনী রাজনন্দিনী রম্যা রাধিকা! কোথায় তার তুলনা? রবীন্দ্রনাথের কবিতা অতি সুন্দর, কিন্তু প্রেমের আত্মহারা ভাব তাতে তেমন নাই, প্রাণ তাতে তেমন আলোড়িত হয় না। তাঁর ধর্ম্ম-সঙ্গীতও তদ্রূপ। বেশ মিষ্টি, কথার গাঁথুনি ভাল, কিন্তু অনেকটা প্রাণহীন। এমন কি রামপ্রসাদ বা বাউল সঙ্গীতের সাদা-সিধা গানের ভিতর যে প্রাণব্যাকুলতা আছে, তা তাঁর গানে নাই। কথা হইতেছে, বাঙ্গলা-সাহিত্যে প্রেম ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কয়েকজন কবি গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁরা নিজেরা প্রেমোন্মাদ বা ধর্ম্মোন্মাদ। তাঁদের লেখা নিজ-প্রাণের কথায় পরিপূর্ণ।

চণ্ডীদাস কি রামপ্রসাদ—চেষ্টা করিয়া কিছু লেখেন নাই, প্রাণ হ'তেই পাহাড়ের বুকে ঝরণার জলের মত আপন বেগে কথা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। রামপ্রসাদ ব্যতীত আরও কত 'সাধকের' শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতে বাঙ্গালা-ভাষা অলঙ্কৃত। সে সকল গানের সঙ্গে ভাব-ব্যাকুলতায় রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা হয় কি? প্রেম-গান সম্বন্ধে আমার বোধ হয়, তিনি সময়বিশেষে নিধুবাবু অপেক্ষাও নীচে; ধর্ম্ম-সঙ্গীত সম্বন্ধে রজনীকান্তও বুঝি তাঁর অপেক্ষা সময়বিশেষে শ্রেষ্ঠ। যাঁরা কোনও গানের মজলিসে এক সময় কবিত্রয়ের রচিত সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাঁরাই এ উক্তির সত্যতা অনুভব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে তেমন-ভাবের প্রেমিক নন—যাঁরা প্রেমাস্পদের জন্য সম্পদ, মান, যশ বিসর্জ্জন দিয়াছেন; তেমন ধর্ম্ম-পাগল নন, যাঁরা ভগবান-সঙ্গের আশায় ধনবিত্ত সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীবেশে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি প্রাণের কোমল পর্দ্দায় আঘাত করেন, অঙ্গুলি-সঞ্চালনের গুণে তা হ'তে যে স্বর নির্গত হয়, অতি মিহি, মিষ্টি, কিন্তু প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত সে স্বরের প্রবেশের যেন শক্তি নাই; জলবক্ষে সামান্য তরঙ্গ-লীলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করাইয়া শীঘ্রই তা মিশিয়া যায়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা মিরাবাইএর প্রাণ-ব্যাকুলতা তাঁর লেখায় নাই।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ধরণের কবি? মোটেই নয়। তাঁর সমকক্ষ কবি কোন সাহিত্যেই আমার চোখে পড়ে না। শুধু ভাব-ব্যাকুলতাই লেখাকে অমরত্ব দান করে না; তাঁর বলিবার পদ্ধতি, ভাষা, সবই কেমন সুন্দর, অনন্যসাধারণ! তাঁর তুলনা একমাত্র তিনিই। যে কোনও বিষয়েই তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, প্রত্যেকটীকে কেমন একটী নূতন আলোকপাতে ভূষিত করিয়া তুলিয়াছেন; বিশেষ করিয়া, এমন পবিত্র-ভাবোদ্দীপক কবিতা আর কারো হাতে রচিত হয় নাই; ফুল যেমন

নির্ম্মলতা-গুণে বিমল ভাবের সঞ্চার করে, তাঁর কবিতাও তেমনি নির্ম্মলতা ও সৌন্দর্য্যমাখা হইয়া কেমন পবিত্রতার উদ্রেক করে! তাঁর মাহাত্ম্য সম্যক্ বুঝিতে হইলে, তাঁর রচিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও গূঢ় রহস্যজাল জড়িত কবিতাগুলির সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয়! শুধু তাও নয়, প্রেম, ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধীয় অন্যান্য কবিতাও বারংবার পাঠের প্রয়োজন। তাঁর 'জীবন-দেবতা' সংশ্লিষ্ট কবিতাসমূহের তুলনা কোথায়? বর্ত্তমানের যুগ-আকাঙ্ক্ষা যুগ-ভাব সকল যেন তাতে জমাট্ হইয়া আছে,—সবই আবার কেমন মনোহররূপে প্রকাশিত!

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে ইহাই বুঝিতে পারিতেছি, যে সংশয়রূপ প্রেতাত্মা বর্ত্তমানের শিক্ষিত মানবের প্রাণের ভিতর বাসা করিয়া বসিয়া আছে, যার তাড়নায় সংসারের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের মূলতত্ত্ব-উদ্ঘাটনে বিফল-প্রয়াস হইয়া সে জীবন অসহনীয় মনে করিতেছে,—তার হাত হ'তে তিনিও উদ্ধার পান নাই। এ সম্বন্ধে তাঁর লিখিত সব কবিতা আমারই প্রাণের নিগূঢ় কথা দিয়া যেন রচিত, কিন্তু এমনভাবে ভাবিবার আমার শক্তি কোথায়? বহু বৎসর পূর্ব্বে 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় কোন মৃত আত্মীয়াকে উদ্দেশ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন,

গিয়াছে কি আছে বসে,
জাগিল কি ঘুমাল সে,
কে দিবে উত্তর?
পৃথিবীর শ্রান্তি তারে
ত্যাজিল কি একেবারে,
জীবনের জ্বর?

এখনি কি দুঃখে সুখে
কর্ম্মপথ অভিমুখে
চলেছে আবার ?
অস্তিত্বের চক্রতলে
একবার বাঁধা পলে
পায় কি নিস্তার ?

এ মহা-প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? বিশ্বাস-ভক্তিহারা এই বৈজ্ঞানিক যুগের—ইহাই যে মূল প্রশ্ন, যুগ-ক্রন্দন। কবি কি উত্তর পাইয়াছেন ইহার ? কেউ কি পাইয়াছে ?

কে যে, কি উদ্দেশে কবিকে পূর্ব্বাপর চালনা করিতেছে, তাও যে তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না,—অন্য কা'র হাতে যন্ত্রী স্বরূপ তিনি ? সেই অন্তরবাসিনী কৌতুকময়ীকে উদ্দেশ করিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
* *
অন্তর-মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই, সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীত-স্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।
* *

তুমি সে ভাবায়ে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়া মুরতি কি কহিছে বাণী!
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি!
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।

* *

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে!

* *

কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

* *

যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?

* *

ক্ষ্যাপার মতন কেন এ জীবন?
অর্থ কি তার, কোথা এ ভ্রমণ?
চুপ ক'রে থাকি শুধায় যখন
দেখে তুমি হাস বুঝি।

কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে,
আমি যে তোমারে খুঁজি।

জীবনের অর্থ কি,—এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? আমি তো পাইলাম না। কে বলিবে, কে আমায় আজীবন চালাইতেছে, আর কি উদ্দেশে কোথায় আমায় লইয়া চলিয়াছে? কবি আবার বলিতেছেন,—

রাথ কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব,
বলে দাও মোরে অয়ি।
আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার?
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীত-ঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্ম-মাঝে।
* * *
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে?
* * *
হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর?

এ প্রশ্নের উত্তরই বা কি ?

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহা-মন্দির তলে ?
নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশি-দিনমান,
যেন সচেতন বহ্নি সমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে ?
অর্দ্ধনিশীথে নিভৃত-নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে,
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে ?
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে,
তোমার বিজন নূতন এ পথে,
কেন রাখিলে না সবার জগতে
জনতার মাঝখানে ?
জীবন পোড়ান এ হোম-অনল,
সে দিন কি হবে সহসা সফল ?
সেই শিখা হ'তে রূপ নির্ম্মল
বাহিরি আসিবে বুঝি।
সব জটিলতা হইবে সরল,
তোমারে পাইব খুঁজি।

বৃথা আশা! জটিলতা তো দূর হইবার নয়, আঁধারের ভিতর হ'তে আলোক-কণার মত বাহির হইয়া আঁধারেই যাইয়া মিশিতে হইবে—ইহাই মানব-জীবনের ইতিহাস; কৌতুকময়ীর হাতে ক্রীড়নক রূপেই দুর্জ্ঞেয় জীবনলীলা শেষ করিতে হইবে। এ-হেন সংশয়মূলক প্রশ্ন যাঁর প্রাণে একবার স্থান পাইয়াছে, তাঁর পক্ষে আবার কেমন করিয়া এমন সারাজীবন ধরিয়া ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন সম্ভবপর? এও যে এক দুর্জ্ঞেয় সমস্যা! বিশ্বাস, সংশয়ের সমষ্টি মানুষের জীবন—কবি কি সংশয়-মুক্ত হইয়াছেন? না, ভগবানের উদ্দেশে-রচিত তাঁর কবিতা-গুচ্ছ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস-ভক্তিরূপ-মূল-শূন্য, কেবলি কথার জাল, প্রাণের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক নাই তাদের?

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার কেমন করিয়া সম্যক্ বর্ণনা করিব? এমন ক্ষমতা আমার নাই। এমন কবি আর জগতে দেখা দেন নাই। কে তাঁকে বিশদরূপে বুঝিয়া বুঝাইয়া ধন্য হইবে? একাধারে দর্শন, কাব্য, প্রেম, ভক্তি, ধর্ম্ম—সমস্তের মিলন তাঁর লেখায়; মনে হইতেছে, যেন তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত বিশাল সমুদ্রের অপার সৌন্দর্য্য দেখিয়া নির্ব্বাক্ অবস্থায় বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় পুলকিত হইতেছি—ভাষার এমন শক্তি নাই, সে আনন্দ সঠিক ভাবে প্রকাশ করে; প্রতি শব্দ, প্রতি কথা, প্রতি বাক্য হ'তে অপার সৌন্দর্য্য-রাশি নানারূপে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ-সব দেখা যায়, ভোগ করা যায়—কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া অন্যের কাছে ধরিয়া দেওয়া, সাগর-সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণের ন্যায়—অসম্ভব। কেবল সমালোচকের সঙ্গে এই মাত্র বলিতে পারি,—'এই ভাবপুঞ্জের মহাসাগরে ঝাঁপ দাও—চিত্ত-কলেবর ধৌত স্নাত শুদ্ধ হইবে, স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিবে, চরিত্র গঠন করিতে শিখিবে। এই শুভ্র-চিন্তারাশির অপরূপ মণ্ডল হইতে নিঃশ্বাস গ্রহণ কর—অন্তঃকরণ পূত-পবিত্র স্নিগ্ধ হইবে।…ভাবুক রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য আলোচনা কর—এই বিংশ-শতাব্দীর 'অভঙ্গ'—'কীর্ত্তন'—

'মাল্সীকে'—বাঙ্গালীর এই 'গ্রন্থ-সাহেবকে' জীবনের উপদেষ্টা কর—প্রকৃত মানুষ হইতে পারিবে, বিংশ-শতাব্দীর জন্য তোমার যে গুরু কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা পালন করিবার উপযোগী মানুষ হইতে পারিবে।' আমার প্রতি-রজনীর পাঠ্য রবীন্দ্রনাথ, তাঁর তুলনা কোথায়? অতুল্য কবি, জগতের অতুল্য সম্পদ!

৫·১১·১৬।—অনেক দিন হ'তে অনুকরণ-যোগ্য আদর্শ-পুরুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু ঠিক মনের মতন আদর্শ যেন কোথাও পাইতেছিলাম না। এখন দেখিতেছি, মিছামিছি অন্যত্র খুঁজিয়াছি। আমাদের দেশেই, যে সকল যোগী-পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁদের অপেক্ষা চরিত্র-বলে কে শ্রেষ্ঠ? আদর্শ-অনুসরণে কি একাগ্রতার পরিচয়ই না তাঁরা দিয়াছেন! কেবল কি ধর্ম্মোদ্দেশ্য-সাধনে, কেবল কি ভগবানলাভের জন্য, লোকে আজীবন এমন চেষ্টা করিয়াছে? কি সঙ্গীত-শাস্ত্রের দিকে, কি আয়ুর্ব্বেদ বা অঙ্কণ-বিদ্যার দিকে দৃষ্টি কর—যাঁরা যশোমন্দিরে স্থান পাইয়াছেন, প্রত্যেকেই যোগীর তন্ময়তা, একাগ্রতা লইয়া নিজ নিজ লক্ষ্য-লাভের জন্য ধন-মান-পদ সর্ব্বস্ব, এমন কি, স্ত্রী-পুত্র সমস্তকে বিসর্জ্জন দিয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। এমন একাগ্রতা, অধ্যবসায় কোনও দেশেই আর দৃষ্ট হয় নাই, এমন সফলতাও কোন দেশের লোককেই বরণ করে নাই। অতীতের সে-সব মহাপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপের দিকে চাহিলে, বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হ'তে হয়। তাঁদের হাতে-গড়া গ্রন্থ বা ভাস্কর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিলে, আমার অনেক সময়ই মনে হয়, অতীন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন তাঁরা, বর্ত্তমানের লোক অপেক্ষা শক্তি, জ্ঞানে এত শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যে তাঁদের আমাদেরই মত মানুষ বলিতে সাহস হয় না। কপিল কণাদের মত দার্শনিক কৈ, বাল্মীকি ব্যাসের

মত কবি, পাণিনির ন্যায় বৈয়াকরণিক, অশ্বঘোষের মত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারক, চরক-সুশ্রুতের মত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থকার কোথায়? এঁদের তুলনা জগতে নাই, সকলেই যোগী।

যে দিন ভারতে পুনর্ব্বার কাজে-কর্ম্মে এই যোগীর তন্ময়তাভাব দেখা দিবে—সে দিন হ'তে সে আবার বড় হইবার দিকে অগ্রসর হইবে। তাঁরা যেমন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, একাগ্রচিত্তে আদর্শ অনুসরণে অগ্রসর হইতেন, তেমন হইতে হইবে। যোগীর তন্ময়তার ভিতর, আত্মাকে ডুবাইয়া দাও।

১২·৫·১৭।—"জাপানীদের গৃহস্থালী অতি সুন্দর; কাঠের ক্ষুদ্র ঘর, জানালা ও দ্বার কাগজের, ঘরের মেজে মাদুরে আবৃত, মাদুর প্রায় একহাত পুরু, তাহার উপর তাহারা ক্ষুদ্র আসন বা প্রশস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদির উপর জানু পাতিয়া বসে। বিছানা, কাপড়, চোপড় গুছাইয়া দিনে দেওয়ালের মধ্যের দেরাজে রাখে, রাত্রিতে দেরাজ হইতে বাহির করিয়া মেজেতে বিছানায় পাতিয়া শয়ন করে। আমাদের গৃহের মত তাহাদের গৃহে অনাবশ্যক গৃহসজ্জার প্রাচুর্য্য নাই। এই জাতি যেমন পরিষ্কার, তেমন শৃঙ্খলাপ্রিয়; গৃহসজ্জা বাসন প্রভৃতির বাহুল্য নাই বটে, কিন্তু যে কয়টী আছে, তাহা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। জুতা দ্বারে রাখিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার নিয়ম; বিদেশীয় জন, যাঁরা বাঁধা জুতা পরেন, তাহাদের জুতার উপর কাপড়ের জুতা পরাইয়া, তাঁহাদের গৃহমধ্যে লওয়া হয়"—শ্রীমতী অবলা বসু, 'মুকুল', চৈত্র ১৩২২।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে জাতির উন্নতি অবনতির মানদণ্ড ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নোংরা জাতির চরিত্র সর্ব্ব-বিষয়ে শিথিল—এ-সব জাতির এক্ষণে জগৎ-সভায় আর স্থান নাই।

২৭.৫.১৭।—নবকৃষ্ণ ঘোষের লেখা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনী পড়া গেল। আঁধার রাত্রিতে আকাশ-পথে মাঝে মাঝে যেমন দু-একটী shooting star নক্ষত্রকে, চারিদিক ক্ষণকালের জন্য প্রদীপ্ত করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে দেখা যায়, মানুষের সমাজেও এই প্রকার জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলাম, তাঁর 'হাসির গানের' সম্পর্কে। তারপর, তাঁর রচিত নাটক সকলের কল্যাণে, অতি দ্রুতগতিতে তাঁর নাম বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। হঠাৎ, একদিন তাঁর 'দেশের গান' সঙ্গীতে, তিনি বাঙ্গালার একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছোট-বড় সকলের প্রিয় ও পরিচিত হইয়া পড়েন। ইহার পর, তাঁর অন্য বঙ্গ-বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'আমার জন্মভূমি' তাঁকে সকলের সহিত আরও সুপরিচিত করিয়া দেয়। কিছু পরে একদিন সংবাদ প্রচারিত হইল, দ্বিজেন্দ্রলাল অকস্মাৎ হৃদ্‌-রোগে মারা গিয়াছেন! জ্যোতিষ্ক আঁধার আকাশে মিশিয়া গেল!

তাঁকে না ভালবাসিত, এমন বাঙ্গালী নাই। তাঁর সাহস, তাঁর মধুর রিত্র, স্বদেশ-প্রীতি, তাঁকে সকলের কাছেই প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁর অকাল অন্তর্ধান বাঙ্গালীর প্রাণে বড়ই বাজিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ-সম্পর্কে যে প্রবল 'স্বদেশী'* বন্যায় বাঙ্গালী-প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সেই ভাব যেমন তেজোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ও সঙ্গীতে প্রকাশিত হইতেছিল, এমন আর কোনও লেখকের লেখায় নয়। তিনি খাঁটী patriot স্বদেশ-হিতৈষী, তাই তিনি এমন জনপ্রিয় ছিলেন।

কান্দিতে যখন সাবডিভিশনাল অফিসার ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে

একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেখানে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে তাঁর সঙ্গে আমারও আহারের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সুমিষ্ট-স্বরে গীত কয়েকটী 'হাসির গান' শুনিয়াছিলাম। হাসিতে হাসিতে সকলেই কুট্‌কাট্‌ হইতেছিল। তাঁর 'দেশের গান' যে দিন কলিকাতায় প্রকাশিত হয়, তখন আমি সেখানে পীড়িতাবস্থায় শয্যাগ্রস্ত-ভাবে বাস করিতেছিলাম। পাঠমাত্রেই গানটীর নূতনত্ব ও বিশেষত্ব আমাকে কেমন অভিভূত করিয়াছিল। আমি রসিক...বাবুকে তখন বলিয়াছিলাম, এ-গানটী কার লেখা? দেখ্‌বেন, ইহা আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হবে। কিছুদিন পরেই দেখিতে পাইলাম, যেখানে সেখানে সেই গান গীত হইতে লাগিল।

নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান তেমন উচ্চে নয়, তবে তাঁর এ-ক্ষেত্রে লেখাও উপভোগ্য, সন্দেহ নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখার প্রধান গুণ সরসতা। তাঁর wit কাকেও কষ্ট দেয় না, অথচ প্রাণস্পর্শী। তিনিই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা-ভাষার প্রথম এবং এ-পর্য্যন্ত প্রকৃত wit। ইন্দ্রনাথও এ-দিকে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর wit সোজা কথায় wit নয়, ভাঁড়ামি।

দ্বিজেন্দ্রলালের অকস্মাৎ তিরোধান বাঙ্গালীর পক্ষে মহাশোকের কারণ। বাঙ্গালা-সাহিত্য তাঁর কাছে অনেক আশা করিয়াছিল। যত দিন বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাঁর গান দুটী জীবিত থাকিবে, তাঁকে বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। 'আমার জন্মভূমির' তুল্য গান কোনও সাহিত্যেই দেখিতেছি না।

।থানার লেখা নেহাৎ মন্দ নয়, তবে আরও ভাল হইতে পারিত।

২৪-৬-১৭।—দুটা মিছা-দেবতার সেবা করিতে যাইয়া, ভারত অপদার্থ

হইয়া আছে এবং সকলের লাথি-গুঁতো খাইয়া মরিতেছে—একটা ব্রাহ্মণ দেবতা, একটা পতি-দেবতা। কি দেবতা! বাইরে অন্যের হাতে কতরূপে অপমানিত, যার তার কাছে লাঞ্ছিত, আমাদের কাছে আসিলেই, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেই, দেবতায় পরিবর্ত্তন! ব্রাহ্মণের সেবাতেই নাকি অন্য সব বর্ণের ত্রাণ—ভীরু বল-সাহস-শূন্য ব্রাহ্মণের সেবায়! এই ব্রাহ্মণের হাতে জাতিভেদের উৎপত্তি, যার বিষময় ফলে সমাজ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ছিন্ন-ভিন্ন হীন হইয়া আছে। অন্য প্রকাণ্ড মিথ্যা—স্বামী, স্ত্রীর দেবতা—তার সেবাতেই স্ত্রীর ত্রাণ! এই নীতির অনুসরণ করিতে যাইয়া, স্ত্রী আঁধার-খাঁচার পাখীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—মূর্খা; এরই কুফল বৈধব্য, সতীদাহ-প্রথা। যতদিন না এ-দুটা ভুয়া দেবতার দেবত্ব লোপ হইবে, ততদিন বৃথা চেষ্টা—দেশোন্নতির। সে-দিন কি কখনো আসিবে? মনে তো হয় না।

২৬.৬.১৭।—দিদি—উপন্যাস, নিরূপমা দেবী প্রণীত। অনেক দিন হ'তেই, বইখানার নাম শুনিয়া আসিতেছি। স্ত্রীলোকের লেখা বাঙ্গালা-উপন্যাসের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পড়া গেল।

গল্পটী একটী সপত্নীঘটিত ব্যাপার লইয়া রচিত। অমরনাথের দুই স্ত্রী,—প্রথমা সুরমা, গল্পের নায়িকা 'দিদি'; দ্বিতীয়া চারু। প্রথমটী জমীদারের কন্যা, পিতাই তার সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ দেওয়াইয়া ছিলেন। দ্বিতীয়টী দরিদ্রকন্যা। জমীদার-পুত্র অমরনাথ পাঠ্যাবস্থায় বন্ধুবর দেবেন্দ্রের সঙ্গে বেড়াইতে যাইয়া চারুর মায়ের পীড়ার উপলক্ষ্যে তাঁর দর্শন-লাভ করে। মা মৃত্যুকালে তাকে অমরের হাতে সঁপিয়া দিয়া যান। অমর তাকে কলিকাতায় লইয়া আসে ও অবশেষে বিবাহ করে। তাঁর পিতা জমীদার হরনাথ বাবু এতে মহা-কোপান্বিত হন এবং অমরনাথ তাঁর

একমাত্র পুত্র হইলেও, তার মুখদর্শনে বিরত হন। তিনি বিপত্নীক, পুত্রবধূ সুরমার উপর যে পুত্র অকারণে এমন অত্যাচার করিল, তাতে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। শ্বশুরের পুত্রবধূর প্রতি ব্যবহারটী অতি সুন্দর, করুণ-রসোদ্রেক, হৃদয়গ্রাহী। অবশেষে সচরাচর যা হয়, তাই হইল—পিতা-পুত্রে মিলন হইল। চারুকে সঙ্গে লইয়া, অমরনাথ পীড়িত পিতার গৃহে প্রবেশ করিল, তখন তাঁর শেষ অবস্থা। পিতা-পুত্রের শেষ মিলনটীও বড়ই হৃদয়স্পর্শী। পিতা মারা গেলেন, এবং পুত্র জমীদার হইয়া সংসারের ভার নিলেন। এখান হ'তেই ধরিতে গেলে, বই প্রকৃতরূপে আরম্ভ।

সুরমা অতি বুদ্ধিমতী নারী, কিন্তু স্বামীর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে ক্রমে সংসারের ভার ছাড়িয়া দিলেন। স্বামী চারুকে লইয়াই মজিয়া রহিলেন; পরিত্যক্তা সুরমা ব্যথিতচিত্ত হইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। সেখানেও সুখ নাই। পিতার একমাত্র কন্যা, অতুল ধনের সম্পত্তি; কিন্তু হিন্দু-রমণী স্বামী-ছাড়া কবে আপনাকে সুখী মনে করিয়াছে? কতদিন সেখানে গেল। শেষে অন্তর্দাহনে জ্বলিয়া পুড়িয়া চারু ও তার সন্তানদের দেখিবার জন্য আবার স্বামী-গৃহে উপস্থিত হইল। প্রাণে শান্তি নাই, সুখ নাই। ক্রমে ফিরিয়া যাইবার সময় আসিল, চারুর সঙ্গে শেষ দেখা হইল, অবশেষে অমরনাথের সহিত দেখা করিতে গেল; ইচ্ছা, যাইবার পূর্ব্বে তাকে মনের কথা-কয়টী চোখা-চোখা ভাবে খুলিয়া বলিয়া যাইবে। শেষটায় কিন্তু কি জানি কেমন হইয়া গেল। ৪৩৫ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ গ্রন্থ, শেষ-পৃষ্ঠার পুর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ পর্য্যন্ত পাঠেও মনে হইতেছিল—এই! এর আবার প্রশংসা! শেষ-পৃষ্ঠাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

সুরমা অমরনাথকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছে,—একটা কথা আছে, যাবার দিন যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে—যে কথার উত্তর তখন দিই নি—আজ তার উত্তর দিয়ে যাব।

অমরনাথ উত্তর করিল, উত্তর ত দিয়েছিলে।

'সে উত্তর ঠিক নয়, আজ উত্তর দিচ্ছি—নারীর দর্প, তেজ, অভিমান, কিছু নেই, আছে কেবল—

অমর রুদ্ধস্বরে বলিল, বল—আছে কেবল—কি? প্রতিশোধ—অমোঘদণ্ড—নিক্তির মাপে প্রতিশোধ।

আরও কয়েক লাইন। সুরমা সহসা নতজানু হইয়া স্বামীর পদমূলে বসিয়া পড়িল। দুই হাতে অমরের পা দু-খানা ধরিয়া অশ্রুবাষ্প-বারিসিক্ত মুখ উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, কেবল এইটুকু আর কিছু নয়। আমায় কোথায় যেতে বল? আমার স্থান কোথায়? আমি যাব না।

এই শেষ লাইনটীতে বইখানা বাঁচিয়া গেল। এই 'না' শব্দটী হ'তে নারী-প্রাণের যে গভীর প্রেম, অসহায় দুঃখোদ্দীপক অবস্থার ভাব বিকীর্ণ হইতেছে, তার আলোকে সমস্ত বইখানা শেষ হ'তে প্রথম পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ ও মধুময় হইয়া উঠিয়াছে।

বইখানাতে আরও গুটীকয়েক ক্ষুদ্র চরিত্র ও বিষয় আছে, কিন্তু কোনটীই তেমন ফোটে নাই। অমরনাথ ও সুরমার একের প্রতি অন্যের ব্যবহারও কেমন যেন অবাস্তবতার ভাবে জড়িত—ঠিক গোপনীয় কথাটী যেন পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হ'তে পারে নাই। মূল বিষয়ও—দ্বিপত্নী-সমন্বিত পরিবারের সুখ-দুঃখ—বর্ত্তমান যুগের সহানুভূতি পাইবার অনুপযুক্ত, দ্বিপত্নী-যুক্ত পরিবার সমাজ হ'তে যে প্রায় অদৃশ্য হইয়া আসিল। সাহিত্যে তেমন স্থায়ীরূপে স্থান পাইবার উপযুক্ত নয় তাই এই বই। তাও বলিতে হইবে, সুমিষ্ট ও সুন্দর চরিত্র বিশ্লেষণ জন্য বইখানা সুপাঠ্য হইয়াছে। চারুর চরিত্রটী সরল, মধুর; সুরমা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, তার নিঃসহায় অবস্থার জন্য প্রাণ আপনা-আপনি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়—প্রেমময়ী হিন্দু-রমণী, স্বামীকে সে শত চেষ্টা করিয়াও ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। বইখানা সুন্দর!

২৭.৬.১৭।—বাঙ্গালী! জীবনাদর্শ বদলাও। অপরিজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুমি যে আজ ভারতের সকল জাতির আগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ, তার কারণ তুমি তাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে পচা-প্রাচীনকে বর্জ্জন করিয়া, নূতনকে ধরিয়া চলিয়াছ—সে আদর্শ, মূলতঃ রামমোহন কেশবচন্দ্রের প্রদর্শিত সাম্যমৈত্রীর পথ—সে আদর্শ কর্ম্ম-মুখী, জ্ঞান-বিজ্ঞানমুখী। তুমি কেন ব্রাহ্মণ-দাস প্রাচীনকালের রামচন্দ্রকে অনুসরণ করিবে, আঁধার দেশের অধিবাসী শঙ্করের অনুসরণ করিবে? ভারতকে এই নূতন-যুগে প্রকৃত পথে চালাইবার ভার তোমারই উপর অর্পিত,—তাই তো তোমার ললাটেই নতূন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো প্রথম পতিত হইয়াছে। তোমারই দেশে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব, যুগ-বাণীবাহক কবীন্দ্র রবীন্দ্রের অভ্যুদয়। সমগ্র ভারতে নূতন মানুস তোমাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে—জ্ঞানসেবক, অক্লান্তকর্ম্মী, নীরব, দৃঢ়চিত্ত, স্বদেশ-সেবায় আদর্শ-সেবায় সর্ব্বস্ব-ত্যাগী, সংসার-বাস যারা বাঞ্ছনীয় মনে করিবে,—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কুসংস্কার হ'তে নির্ম্মুক্ত, জাতিভেদরূপ কুসংস্কার হ'তে নির্ম্মুক্ত। তোমার হস্তেই ভারতের ভবিষ্যৎ অর্পিত।

২১.৭.১৭।—Emersonর লেখা ও জীবনীর ভিতর—চিন্তাশীলতা, মিষ্টত্ব ও নির্ব্বাকারত্বের একটী ভাব, যেন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। সে-দিন তাঁর জীবনী পড়িতেছিলাম—বেশ চরিত্রটী। Sweetness মধুরতা ও Calmness শান্তভাব, তাঁর বিশেষত্ব। সাহস যথেষ্ট, কিন্তু কারো সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ নাই। তাঁকে শেষ-বয়সে Seer of Concord বলিয়া লোকে অভিহিত করিত। তাঁর গ্রন্থাদি পড়িলে, তাঁকে Seer ঋষি বলিয়াই মনে হয়,—সমস্ত জীবন-সমস্যা যাঁর পুরণ

হইয়াছে, যাঁর স্বরূপ দিব্যধামে অশান্তি, সংশয়ের সামান্য চিহ্নটাও নাই। Carlyle, Seer of Chelsea নামে বিদিত, কিন্তু Seerর লক্ষণ তাঁতে তেমন নাই,—সংসার-বিরক্ত, পরছিদ্রান্বেষী, খিট্‌খিটে-মেজাজ misanthrope। ভাবেও এমার্সন কার্লাইল অপেক্ষা বড়। তাঁর রচনা উজ্জ্বল, বাহুল্যবর্জ্জিত, রত্নের মত সুশ্রী—বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ভাব প্রকাশিত হইতেছে। যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা নাই; তাঁর নিজ চিত্তহরণ মনমুগ্ধকর সত্ত্বা personality সে অভাব পূরণ করিয়াছে, তাঁর সমস্ত লেখার ভিতরই তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। তিনি optimistic, অন্তিমে-সুখ ইহাই তাঁর মত। কার্লাইলের লেখায় অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর, চীৎকার, অযথা কটূক্তি, ভৎর্সনা,—অনেকটা পূর্ব্বকালের Diogenesর মত কিন্তু Diogenesর আন্তরিকতার অভাব। এমার্সন এশিয়ার ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শন পাঠ করিতেন; তাঁর লেখায় অনেক সময় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের গভীর মূল তত্ত্বের [illegible] পাওয়া যায়। প্রাচ্যের কর্ম্মবহুল জীবনের সঙ্গে প্রতীচ্যের গভীর সাত্ত্বিক [illegible]শ্রিত হইয়া—এমার্সনকে এক জীবন্ত-দেবতায় পরিণত করিয়াছে। অতি সুন্দর, মনোমোহন, ভক্তি-শ্রদ্ধা-উদ্রেককারী সে চরিত্র! প্রাচীন ইয়ুরোপের কাছে নব্য-আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—এই দেবচরিত্র ও তাঁর লেখা!

২২.৭.১৭।—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রমুখ দেশীয় চিত্রকরগণ বছর কয়েক যাবৎ [illegible]শীয় বিষয় লইয়া দেশীয়ভাবে চিত্র আঁকিতেছেন। অতি আনন্দের বি[illegible] এঁদের যশ এক্ষণে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, [illegible] বিদেশে যশ অর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালী-জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, এঁদের অঙ্কিত চিত্র [illegible] বাঙ্গালীর চি[illegible] তেমন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রথমতঃ,

যদিও এ সকল চিত্র প্রাচীন সাত্ত্বিকভাবে অনুপ্রাণিত, তথাপি একটি মহৎ দোষে কলুষিত। চিত্রে প্রকৃতি natureকে ঠিক ভাবে অনুকরণ করা হয় না, দেখিলেই মনে হয়, ঠিক্ জীবন্ত নয়, মন-গড়া সংসার-ছাড়া কিছু। দ্বিতীয়তঃ, চিত্রকরের সাহসের অভাব। কি ভাব যে চিত্রে প্রকাশিত হইবে, তিনি নিজেই যেন তা জানেন না। প্রায় প্রত্যেক ছবিরই মূর্ত্তি সকল অর্দ্ধনিমিলিতনেত্র, পাছে কি ভাব ফুটিয়া উঠে, এ-ভয়ে চোখ মেলাইতে চিত্রকরের সাহসে কুলায় না—সবই কেমন ভয়ে সঙ্কোচে আড়ষ্ট। এ-সকল চিত্রে আমাদের জাতীয় জীবনেরই প্রতিবিম্ব দেখিতেছি; প্রাণে তেমন আনন্দ নাই, সাহস নাই, আত্মনির্ভরতা-আত্মসম্মান তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। চিত্র তাই আবছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট। এত দোষ সত্ত্বেও কিন্তু ইয়ুরোপের অঙ্কিত চিত্র অপেক্ষা এ-সব আমার লাগে ভাল। সে-দেশের চিত্র নিতান্তই যেন সংসারের সামান্ত মাটী-কাদা দিয়া রচিত, দর্শনে তেমন কোনও গভীর শ্রদ্ধা বা প্রশান্ত সাত্ত্বিকভাবের উদ্রেক হয় না—সুন্দর, [illegible] সন্দেহ নাই, কিন্তু [illegible]ক নয়।

শ্রীযুত প্রমথনাথ চৌধুরী বাঙ্গালা-সাহিত্যে লিখিত ভাষার স্থলে কথ্য ভাষার প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়া—বাঙ্গালা ভাষার মহা উপকার সাধন করিতেছেন। সংস্কৃতের-ব্যাকরণের বিভীষিকা-উৎপাদক জালে বাঙ্গালা ভাষার দেহ এখনো এমন জড়িত, যে সে একপ্রকার গতিবিহীন, সহজভাবে নড়াচড়া একপ্রকার অসম্ভব। এ-ভাষাকে লইয়া [illegible]কের বাজারে চলাফেরা কষ্টসাধ্য। বাঙ্গালী এক্ষণে বর্দ্ধমান দ্রুত উন্নতিশীল জাতি, কিন্তু তার ভাষাটী নিতান্তই প্রাচীন রকমের। প্রমথনাথ ভাষার যে সংস্কার করিতে চাহেন, তা কিন্তু ঠিক সমীচীন মনে হয় না—তিনি এক extreme হতে অন্য extremeএ যাইয়া পৌঁছিয়াছেন। এমনি হয়, ও

হওয়াই উচিত, তা না হলে লোকদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। সাহিত্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কথিত ভাষা ও লিখ্যভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু ঠিক দুটীতে মিলিয়া যে একইরূপ কখনো ধারণ করিবে, মনে তো হয় না। কোন সাহিত্যেই কথিত-ভাষা সম্পূর্ণরূপে লিখিবার ভাষারূপে ব্যবহার হইতে দেখিতেছি না। এমন যে বিশ্বব্যাপী ইংরাজী-সাহিত্য—যার ভিতর দিয়া বর্ত্তমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মঠ জীবন্ত-জাতির মনের ভাব প্রকাশিত হইতেছে—তাতেও আগাগোড়া চলিত-ভাষা ব্যবহৃত হয় না। প্রমথনাথ নিজে যে ভাষায় লিখেন, ঠিক সেই প্রকার সমাস, তদ্ধিত, প্রত্যয় সমন্বিত ভাষাতেই কি তিনি আলাপ করেন? রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ লেখায় যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাই কি ঠিক তাঁদের কথিত ভাষা? কি প্রমথনাথ, কি তাঁদের—যা কিছু এ-বিষয়ে নূতনত্ব মূলতঃ ক্রিয়া-পদ ব্যবহার সম্বন্ধে, কিন্তু যাঁরা ভাষা লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা জানেন যে, সকল সময় কলিকাতা-সহরের ব্যবহৃত 'খেলুম', 'গেলুম', 'বল্লুম' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়া লেখার গাম্ভীর্য্য ও dignity মহত্ত্ব বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠে। এতো গেল গদ্যের কথা। পদ্যেও কি পূর্ব্বাপর কথিত ভাষা ব্যবহৃত হইবে? বাঙ্গালা-ভাষা নানাপ্রকার সমাস, সন্ধি, তদ্ধিত, প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া নিজ কলেবরের বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য সাধন করিতেছেন। সমাস ও সন্ধির অভাব, ইংরাজী-ভাষার মহা-অভাব বিশেষ। প্রমথনাথের মতানুযায়ী হইলে সমাস প্রভৃতি বাদ দিতে হয়, এবং এ-পর্য্যন্ত মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সময়-বিশেষে যে সকল সুন্দর সুন্দর অভিনব সমাস প্রত্যয়াদি নিবদ্ধ পদ রচনা করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন, সে সকলকে ত্যাগ করিতে হয়।

প্রমথনাথ কোন এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন (ভারতী, মাঘ, ১৩২৩),

"আমাদের মৌখিক ভাষাও শিল্পীর হাতে প'ড়লে যে কতদূর সরাগ ও সতেজ হ'তে পারে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র ভাষা। অত শক্তিশালী অত শ্রীসম্পন্ন গদ্য বাংলা-সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে কখনো লেখা হয় নি।" 'ঘরে বাইরের' ভাষা কি মৌখিক ভাষা? দু-চারিটী ক্রিয়াপদ ও অন্য দুচারিটী শব্দ ছাড়া, 'ঘরে বাইরের' ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা অন্য কোনও বইয়ের ভাষার বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাইতেছি না। কোন্ বাঙ্গালী 'ঘরে বাইরের' ভাষায় কথা বলেন? কথা বলা দূরে থাকুক্, ক'জন ভাবিয়া চিন্তিয়াই এমন লিখিতে পারেন?

কেবল মৌখিক ভাষাকে লইয়াই যদি সাহিত্যকে চলিতে হয়, তা হ'লে তার উন্নতি অসম্ভব। সচরাচর লোকে যে-সকল শব্দের সাহায্যে কথাবার্ত্তা বলে ও ভাব প্রকাশ করে, তেমন প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেও, তার সংখ্যা বেশী নয়। সাহিত্যই দিন দিন শব্দ-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। কখনো কোন শক্তিমান্ লেখকের হাতে নূতন শব্দ গঠিত হইয়া ক্রমে তার চল্‌তির সঙ্গে কথিত-ভাষায় স্থান নিতেছে, আবার কথিত ভাষাও সাহিত্যে অহরহঃ স্থান পাইতেছে—পাইবেই তা। মোটকথা, ইহা সুনিশ্চিত, লেখক যতটা কথিত-ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন, সে অনুপাতে তার লেখা বিনা আয়াসে বোধগম্য হইয়া চিত্তস্পর্শী হইয়া থাকে, সহজেই প্রাণে যাইয়া তা পৌঁছে, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, কেবল কথিত ভাষার দ্বারা সব সময় মনের ভাব সর্ব্বাপেক্ষা মোহনরূপে প্রকাশিত হ'তে পারে না। প্রমথনাথের উদ্যম বাঙ্গালী ভাষার পক্ষে মহাহিতকারী সন্দেহ নাই, সংস্কৃতের শিকলের বাঁধ হ'তে মুক্ত করিয়া ভাষাকে গতি-সম্পন্ন করিয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট পন্থা তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন,—এজন্য বাঙ্গালী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং ভবিষ্য বাঙ্গালা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁর নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'জাপান-ভ্রমণ' পড়িতেছিলাম। সাধারণ চিঠিতে, ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, যেখানে সেখানে, অস্থানে, তিনি দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, অথচ এ-সব আলোচনা দর্শন নামের উপযুক্ত নয়,—ভিত্তিবিহীন জল্পনা-কল্পনা। সোজা জিনিষিকেও তিনি খামকা জটিল ও নীরস করিয়া তোলেন। তিনি এত দেশ বেড়াইলেন, নানা দেশের নানা লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁর যেমন সুযোগ হইয়াছে, এমন কোনও ভারতবাসীর ভাগ্যে হয় নাই—সমস্তের বিবরণ কেমন কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারিত, কিন্তু সে-দিকে যেন তাঁর দৃষ্টিই পড়ে না, তিনি থাকেন মনোকল্পিত ভাব আলোচনায় ব্যস্ত, বাড়ীতে বসিয়াও যার চর্চ্চা অনায়াসে চলিতে পারে। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত একেবারেই চিত্তাকর্ষক নয়—অবস্তবতার দেশে লোকে কত ঘুরিবে? সোজা কথায় ভাব প্রকাশ করিতে তিনি জানেন না, কেবল কথার প্যাঁচ্—মনের কথা যেন প্রকাশ হ'তে চায়ই না। ভাব এবং ভাষারও মাঝে মাঝে এমন জটিলতা বাঁধিয়া যায়, যে ভাষার দিকে চাহিলে ভাব খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হয়, আর ভাবের দিকে দেখিতে গেলে ভাষা যেন হাত-ছাড়া হইয়া যায়।

প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভ্রমণ-কাহিনীর তুলনা করিয়াছেন। কা'র সঙ্গে কা'র তুলনা? একজন তেজের, উৎসাহের আধার, বলদৃপ্ত, পুরুষকারের পূর্ণ-দীপ্তি-বিমণ্ডিত, প্রতি কথা হ'তে যেন অগ্নিকণা বিক্ষিপ্ত হইতেছে, আর একজনের ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব, অস্পষ্টতা, মিহি মেয়েলি সুর। তবু প্রবন্ধে নূতন বিষয় অনেক জানা গেল। জাপানীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কবিবর তাদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা ও বাক্-সংযমের প্রশংসা

করিয়াছেন। সে দেশে, 'যে লোক নিতান্ত গরীব, সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা ক'রেও এক-আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।' লোক-সকল কথা খুবই কম বলে, এমন কি, ছেলেরা পর্য্যন্ত কাঁদে না—কবিবর একটী ছেলেকেও কাঁদিতে দেখেন নাই। জাপানীদের বাড়ী-ঘর তেমন বড় নয়—যা আছে তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাগুণে মনোরম। সকল বিষয়েই মিতাচারী, কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না, তর্ক করে না, রোগে-শোকে সকল সময়ই নিস্তব্ধ।

'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে' বিপিনবিহারী গুপ্ত কবিবরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-লাভের ও যখন তিনি 'সাধনার' সম্পাদক ছিলেন, তখন কি প্রকারে সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন, তার বর্ণনা দিয়াছেন। কবিবর বলিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তখন আমার সাধনাই ছিল। নৌকার উপর থাকিতাম। সঙ্গে যে লোক ছিল, সে প্রত্যূষে এক বাটি ডাল সিদ্ধ করিয়া টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইত। আমি সেই ডালটুকু খাইয়া লিখিতে বসিতাম। সমস্ত দিন লিখিতাম, অপরাহ্নে পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার সময় খানকয়েক লুচি খাইতাম, এক Sittingএ পাঞ্চ-ভৌতিক ডায়েরী, গল্প, কবিতা অনর্গল লিখিয়া যাইতাম, তাহার পর ইজি-চেয়ারে শয়ন করিতাম। নৌকা নদীর উপর অশ্রান্তভাবে চলিতে থাকিত। এমন সাধনা ক'জন করিয়াছেন? আর এমন অদ্ভুত ক্ষমতাই বা কা'র?

২৯.৭.১৭।—মানুষ যুগে যুগে কা'কে পূজা করিতেছে? ভগবানকে? কিন্তু তিনি কি আছেন? কেমন তিনি? মানুষেরই রচিত মূর্ত্তি; যেখানে যখন যে ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে, তিনি তাই।

কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানামধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি দৃষ্ট হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভগবান সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হন।

নিতান্ত ব্যাকুব, গোবেচারী ভগবান! সর্ব্বশক্তিমান্ ত্রিকালজ্ঞ তিনি, ধর্ম্মের এমন গ্লানি হ'তে দেন কেন, দুষ্কৃতদেরই বা মাথা উঠাইতে দেন কেন, আর তার পরে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্মই বা হ'ন কেন? শ্লোকটী শ্রুতিমধুর, কিন্তু নির্জ্জলা মিছার সমষ্টি। এমন কত সব মিছার স্তরই না সব সাহিত্যের বুকে জমা হইয়া আছে! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বেই ভারতে কি অধর্ম্মের রাজত্ব ছিল, পরেই বা এমন কি ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল? দুর্য্যোধন কর্ণই বা যুধিষ্টির অর্জ্জুন অপেক্ষা এমন কি নিকৃষ্ট চরিত্রের ছিল? আর তাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু ছিল, যার ধ্বংসের জন্য স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হইয়াছিল? কৃষ্ণ স্বয়ং, যিনি ভগবানরূপে নিজেকে প্রচার করিতে ইচ্ছুক, তিনিই বা এমন কি সাধু ছিলেন—শক্তিসম্পন্ন ক্রূরপ্রকৃতির চক্রী।

ধর্ম্মস্থাপন প্রভৃতি ও সব বড় বড় কথা কিছুই নয়। সংসার চিরকাল শক্তির উপাসক, তার কাছে অবনতমস্তক, তার শিষ্য। শক্তিশালী কৃষ্ণ তাই কুরুকুল ধ্বংস করিয়াও ভারতের ঘরে ঘরে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

এই সব শক্তিধর পুরুষই মানুষের দেবতা, প্রকৃতপক্ষে এঁদের পূজা করিয়াই তারা ভগবানের সেবা করে। এঁরা যখন দেখা দেন, তখনই

এক প্রাচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, নূতন আশাবাণী প্রচারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবন প্রাচীন খোলস বদলাইয়া নূতন কলেবর ধারণ করে, নূতন বোল বলিতে থাকে। মানুষের উন্নতির, সভ্যতার ইতিহাস এঁদেরই জীবনেতিহাস। এঁরাই কোথাও বুদ্ধ, কোথাও মহম্মদ বা যীশুখ্রীষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সমাজকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইয়া গিয়াছেন।

কি যে কি একটী শক্তি লোক-সত্ত্বার মধ্যে ক্রীড়া করে, যে একজন আপনা হ'তেই রাজা হইয়া দাঁড়ায়, আর বাকী লক্ষ তার প্রজা হইয়া তাকে পূজা করিয়া আপনাদের ভাগ্যবান মনে করে। এই শক্তিশালীর মাথায় রাজ-মুকুট পরাইয়া, দেশবাসী ধন্য কৃতার্থ হয়। এমন না হ'লে কি সামান্য ব্যারিষ্টারের সন্তান নেপোলিয়ান ফরাসী সম্রাট্-পদে উন্নীত হইতে পারিত ?

এই যে এত বছর ধরিয়া চারিদিকে সাম্য মৈত্রীর ভাব প্রচারিত হইতেছে, নরহত্যা পাপকার্য্য বলিয়া বিবৃত হইতেছে, তথাপি আজও যদি শৌর্য্যবীর্য্যশালী নেপোলিয়ানের মত নরহন্তার আবির্ভাব হয়, তা হ'লে ধরণী এতদিনের বোলচাল ভুলিয়া তার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে।

মানুষ এ-সব শক্তিপুঞ্জদেরই শিষ্য, কাপুরুষের নয়, কপটের নয়। যারা স্বকার্য্য-সাধনে সর্ব্বস্বপণ-ধন-জীবন, এমন কি যশ-সম্বন্ধে—যা সময়বিশেষে জীবন অপেক্ষাও মহার্ঘ্য,—উদাসীন, তারাই নরের দেবতা। তারাই ভগবান, ভগবান আর কিছু নয়, কিছু নয়।

৩০.৭.১৭।—বাঙ্গালীর দাম্পত্য-জীবন অত্যল্পকাল মধ্যেই নিতান্ত কবিত্ববিহীন হইয়া পড়ে। তার কারণ স্বামী স্ত্রী উভয়েই জানে না কি প্রকারে জীবনের সরসতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। স্ত্রীটী নিরক্ষরা বা স্বল্পাক্ষরা, গ্রাসাচ্ছাদন ও সন্তানপালনের ঊর্দ্ধে তার দৃষ্টি প্রায়ই যায় না। স্বামীও

অনেকটা তদ্রূপ। কবিত্বের উৎস, জ্ঞান-চর্চ্চা। উভয়েরই তার সঙ্গে সম্পর্ক কম। সংসারে প্রবেশ করিতে না করিতেই স্বামীটী বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন এমন ঘোরতর সংসারী হইয়া উঠে, যে সাহিত্য-চর্চ্চা, কাব্য-চর্চ্চা, সঙ্গীত-চর্চ্চা, চিত্রকলা-চর্চ্চার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিও করে না। ফলে, যৌবন-উন্মেষে যে সব প্রেমের সুকুমার ভাব হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তা শুকাইয়া যায়। তার পর হ'তে বাঙ্গালী পিতা মাতা নিজেদের ও সন্তানদের ব্যারাম পীড়া সামান্য সুখ দুঃখ সংসার লইয়া এমন বিব্রত হইয়া পড়ে, যে কবিতা বলিয়া একটা জিনিষ তাদের জীবনে আর দেখা যায় না, এবং একটী অকাল বার্দ্ধক্যের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'তে থাকে, আর একজন ক্ষীণাঙ্গী দুর্ব্বলদেহা কুৎসিৎ কর্কশ নারীতে দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হ'তে থাকে। এ-জীবন কি সুখের, বাঞ্ছনীয়?

প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত, স্ত্রী স্বামীর কাছে বিবাহ-রজনীর প্রেমাস্পদ থাকিবে; স্বামীকে দেখিয়া স্ত্রীও সকল সময় প্রেম-বিহ্বলা হইবে। এ অবস্থা অটুট্ রাখিতে হইলে, শুধু ভালবাসিলেই হইবে না, স্ত্রীর যে সকল জিনিষ আকাঙ্ক্ষিত, তা তাকে দিতে হইবে; শোভন পরিচ্ছদ, নূতন অলঙ্কার,—কত খুঁটির জোরে যে প্রেম-মন্দিরকে স্বস্থানে রাখিতে হয়, বাঙ্গালী-দম্পতী তার তেমন সংবাদ রাখে না। স্ত্রীরও জানা উচিত, রমণী পুরুষের চিত্ত হরণ করে, প্রধানতঃ তার দেহিক সৌন্দর্য্য দ্বারা। সুশ্রী পোষাক-পরিচ্ছদ-অলঙ্কারে প্রতি সন্ধ্যায় দেহকে তার অভিসারিকার সাজে সাজাইতে হইবে। যতদূর সম্ভব, তাকে সুন্দরী হইতে হইবে, তবেই তো দর্শনে স্বামীচক্ষে আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। উভয়ের ভিতর মিথ্যা প্রবঞ্চনা থাকিবে না, একের অন্যের প্রতি ব্যবহার সরলতা ও প্রীতি-পূর্ণ হইবে, জিহ্বা সকল অবস্থাতেই সংযত থাকিবে, ও শ্রদ্ধার ভাবে একে

অন্যের প্রতি পূর্ণহৃদয় হইবে। জ্ঞান-চর্চ্চা, যে খাদেই জীবন-গঙ্গায় মধু প্রবাহিত হইয়া থাকে, উভয়েরই হইবে সৎকাজে সদুদ্দেশ্য-সাধনে দুজনকে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বোপরি বিরাজ করিবে প্রেম, তার রজতধারায় উভয়ের প্রাণ সব সময় আলোকিত থাকিবে। তবেই তো জীবন মধুর বোধ হইবে। মাঝে মাঝে বিরহেরও প্রয়োজন, বছরের কিছু কাল একে অন্য হ'তে দূরে থাকিবে। বিরহ যে প্রেমের প্রাণ-বায়ু, কেমন তাকে সঞ্জীবিত করিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলে!

৫·৬·১৮।—'Fit our young people for life'—is the cry of the new American. জীবন-পরিচালনের জন্য যুবকদের তৈয়ের করিয়া তোল,—ইহাই নব্য-আমেরিকার শিক্ষার মূলমন্ত্র। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আমেরিকা বিজ্ঞানসম্মত অর্থকরী শিক্ষার দিকেই দিন দিন অধিকতর মনোনিবেশ দিতেছে—প্রাচীনকালের ল্যাটিন-গ্রীক ভাষা-জ্ঞান আহরণের দিকে দৃষ্টি কমিয়া আসিতেছে। আমেরিকাতেই বর্ত্তমান কালোপযোগী আদর্শ মানুষ রচিত হইতেছে—স্বাস্থ্যপূর্ণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চটপটে, স্ফুর্ত্তিপূর্ণ, উদ্যমপূর্ণ, সাহসী, স্বাধীনচিত্ত, কর্ম্মক্ষম, কার্য্য-ব্যস্ত, অর্থোপার্জ্জনাকাঙ্ক্ষী, সৎকাজে অকাতরে অর্থব্যয়শীল—সুশ্রী, সুন্দর যুবক যুবতী। জীবন-যুদ্ধের জন্য Fit উপযুক্ত করিয়া দেওয়া—ইহাই হইবে সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি কি এমন শিক্ষা পাইয়াছিলাম? ক'জন এদেশে এমন শিক্ষা পাইয়া থাকে?

৪·৮·১৮।—অনেকদিন হ'তেই রুশিয়-ঔপন্যাসিক Turganev টুর্গেনেভের উপন্যাস পাঠের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি তাঁর Virgin Soil ও On the Eve পড়িলাম। তেমন ভাল লাগিল না, অথচ দুখানাই নাকি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

প্রথমটীতে রুশিয়ার Revolution ও Nihilist Partyর সৃষ্টির সূচনার কথা আছে। উপন্যাসের পক্ষে এ-সব নূতন বিষয়। রুশিয়ার ঔপন্যাসিকদের প্রধান বিষয়ই রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় চর্চ্চা। এদের সঙ্গেই যে গোড়ায় মানবজীবন জড়িত, এবং এ-জন্যই সে দেশের উপন্যাস এমন জীবন্ত এবং মনোরাজ্যের উপর পূর্ব্বাপর এমন অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। ইহাই রুশিয়-সাহিত্যের বিশেষত্ব; কোন কপোল-কল্পিত মামুলি অযথা প্রেমের ছড়াছড়ি তাতে দৃষ্ট হয় না।

Vigin Soil গল্পের Hero, Nezdenov, কলেজের ছাত্র, যাদের নূতন-কর্ষিত হৃদয়-ক্ষেত্রেই প্রথম সর্ব্বদেশে Revolutionর বীজ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কলেজেরই নব্য যুবকের ন্যায় Nezdenovএর প্রাণে সৎ আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু কাজ করিবার শক্তি নাই, তেমন সাহসও বুঝি নাই, অনেকটা হ্যামলেটের ধরণের, যারা কথা ও ভাবের জালে জড়িত হইয়া অসফলতাকে বরণ করিয়া নেয়। বরং Mariana চরিত্রটী কথঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক। বড় ঘরের মেয়ে, বিদুষী, চরিত্রবতী, দেশোদ্ধারের জন্য স্থিরসঙ্কল্পা, প্রত্যেক Revolution-এই এমন সব নারীর আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। Solomon নামে Factory Manager স্বরূপে আর একটী চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। একে শুধু উদ্যমপূর্ণ দেশভক্ত Enthusiastic Patriot না দেখাইয়া, অনেকটা সংসারাভিজ্ঞ দেখান হইয়াছে, কিন্তু তেমন কিছুই Practical নয়। মোটের উপর গ্রন্থের চরিত্র ও ঘটনাবলী স্কুল কলেজের ছেলেপুলে ও তাদের কাণ্ড-কারখানা বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় গ্রন্থ On the Eve আরও নিকৃষ্ট। তাতে Insarov নামক একজন বুল্‌গেরিয়ান্ যুবক Patriotর কথা আছে। বিশেষত্ব চরিত্রে তেমন কিছুই নাই। বরং তার অপেক্ষা তার প্রেমমুগ্ধা Elena Nilkola-

evna নামে রুশিয়ান বালিকাটী মিষ্ট-চরিত্র। শেষটায় দুজনের বিবাহ হইয়াছিল, এবং এলেনা স্বামীর সঙ্গে রুশিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসে। কালে যক্ষ্মারোগে স্বামীর মৃত্যু হয়।

দুটী গ্রন্থেই দেখিলাম, রমণী-প্রেমে জড়িত হইয়া নায়ক জীবন-উদ্দেশ্য হ'তে চ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল ও অবশেষে বিফল-মনোরথ হইয়াছিল। সাধারণতঃ নারীর সঙ্গে মিলন পুরুষের পক্ষে শক্তির অপচয়কারক। যে কোন বৃহৎ ব্যাপার সমাধা করিতে চায়, রমণীর দিক হ'তে তাকে মুখ ফিরাইতে হইবে। তা না হ'লে অকিঞ্চিৎকর প্রেমে মজিয়া লক্ষ্যচ্যুত হইতে হইবে।

৮·৯·১৮।—আজ প্রাতে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, তার পর কতক্ষণ বন্ধ ছিল। দুপুরবেলা, আহারের পর একটু ঘুমাইয়াছিলাম, উঠিয়া দেখিলাম, আকাশ আবার মেঘে ভরিয়া আসিয়াছে, চারিদিক ম্লান শ্যাম-বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মনো…(কাছে চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছে) বলিতেছিল এবং আমারও বোধ হইতেছিল, বেশ মধুর দৃশ্যটী। বলিতে বলিতে, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আমি রাস্তার দিকে চাহিয়া আছি, ও যে সকল লোক যাতায়াত করিতেছে, তাদের দিকে দৃষ্টি করিতেছি। দেখিতে দেখিতে আমার মনে হইতেছিল, এমন-ধারা কত শত সহস্র বছর ধরিয়া তো এই ধরণী বিদ্যমান, কিন্তু যারা এর বক্ষের উপর একসময় বিচরণ করিয়াছিল, তারা আজ কোথায়? আমরাই বা ক'দিন পরে কোথায় চলিয়া যাইব? মাঠের উপরকার ঝড়ের বাতাসের মত কোথা হ'তে উঠিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে সব? কেমন করিয়া যা' তা হ'তে অসারত্বের বাষ্প বাহির হইয়া আমাকে অল্পেতেই জর্জ্জরিত করিয়া তোলে! কিছুই তেমন ভাল লাগিতেছে না—না কাজ, না অ-কাজ।

মেঘ গুড়্ গুড় করিয়া ডাকিতেছে—কিন্তু প্রাণের ভিতর তার আহ্বানে কোনও হৃদয়-তন্ত্রী তো বাজিয়া উঠিতেছে না।

১৬.৯.১৮।—বন্ধুবর জ্ঞান…বাবুর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর কথার সঙ্গে পরিচিত হইলাম। তিনি লিখিতেছেন,—"রবি বাবুর সমস্ত লেখার, এমন কি, আত্মজীবনী এবং পত্রাবলীরও এই একটা বিশেষত্ব যে উহা যথাসম্ভব impersonal বিশ্বমানবের বুঝিবার। তাঁহার হাতে দেওয়া জিনিষ যথাসম্ভব কম local ও personal, এই বিরাট বিশাল standpoint আর কোন বাঙ্গালী লেখকের নাই, এইখানেই রবি বাবুর বিশেষত্ব। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে local হইতে universalএ, personal হইতে impersonalএ, particular হইতে universalএ লইয়া যান, এই জন্যই তাঁহার রচনায় ভূমার যেরূপ একটী উদার স্বর শুনিতে পাই, তাহা বড়ই অপূর্ব্ব মনে হয়, হৃদয়ের সমগ্র-তন্ত্রীগুলির উপর তাহা আঘাত করিতে থাকে, তাহার উদারতায় বিশ্বের রহস্য যেন উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।"

প্রকৃত তত্ত্ব, কেমন সহজ সুন্দর ভাবে বিবৃত! বন্ধুবরকে আমি কতবার বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি। বোধ হয়, না লিখিয়া তিনি ভুল করিলেন।

১৭.৯.১৮

প্রাণারাধ্য বন্ধুবর মনো…র উপহার—

"রূপে ভরল দিঠি
সোঙরি পরশ মিঠি,
পুলক না তেজই অঙ্গ।

মোহন মুরলি রবে
শ্রুতি পরিপূরিত,
না শুনই আন পরসঙ্গ।
সজনি, অব কি করব উপদেশ।

কানু অনুরাগে মোর,
তনু মন মাতল,
না শুনে ধরম নব লেশ।
নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণ গণে,
বান্ধল মঝু মনে,
ধরম রহব কোন ঠাম।
গৃহপতি তরজনে
গুরুজন গরজনে
কো জনে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ,
যদি হয়ে অনুরত,
পুছত গোবিন্দ দাস।”

এমনি; এমনি মজিতে হইবে, প্রেমাস্পদের রূপে, গুণে—ধ্যানে। তবেই তো অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যাইবে।

২২.৯.১৮।—ইংরাজি-সাহিত্যে কার্লাইলকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া

হইয়া থাকে—লেখার জন্য যেমন, তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যও তেমন। তাঁর জীবনি পাঠ করা গেল।

ইতিপূর্ব্বে তাঁর Hero and Hero-worship পড়িয়াছিলাম। বেশ ভাল লাগিয়াছিল, বিশেষ করিয়া রচনার ভঙ্গীটী। কেমন চাঁছা ছোলা, সোজা, সতেজ বাক্যশ্রেণী অথচ ভাবে-ভরা, কবিত্বময়। কিন্তু বইর প্রতিপাদ্য বিষয়টী যেন সব জায়গায় মানায় নাই। যে কারণে মহম্মদ Hero, সে নিয়মে কি Shakespeareও Hero? Heroর প্রধান লক্ষণ, ভাব-সেবা, তার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন। Shakespeare কি Hero?

তাঁর Past and Presentও পড়িয়াছি, Sartor Rasartusও। কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা লেখা, ভাল ভাল কথা যথেষ্ট, কিন্তু কেমন যেন শ্রেণীবদ্ধ নয়—সবই যেন ওলট্ পালট্। নিট্‌সে তাঁর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, Carlyleর কোনও Philosophy নাই—অব্যবস্থিতচিত্ত অর্দ্ধ-দার্শনিক; অনেকটা ঠিক্। অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর, চীৎকার। তাঁর French Revolution বারবার পড়িতে যাইয়া তেমন অগ্রসর হ'তে পারি নাই, অথচ এখানাই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সাধারণ বিষয়ও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লেখা—অনাবশ্যক শব্দসম্ভার, মনে হয় সংসার-ছাড়া কোন্ এক বিকৃত মস্তিষ্কের দেশে আসিয়া পড়িলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে রত্নের মত উজ্জ্বল কেমন সব বাক্য ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। যাঁরা Lamartine's History of the Girondists পড়িয়াছেন, তাঁদের কাছে তেমন ভাল লাগিবার নয়।

কার্লাইলের নিজ-জীবনেও Heroর কিছু উপাদান ছিল। পূর্ব্বাপরই তাঁর বিশ্বাস ছিল, সাহিত্য-চর্চ্চাকেই তাঁর জীবনের সম্বলস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রেই তাঁর মূল শক্তি; এর উপর নির্ভর

করিয়াই নানা কষ্টের ভিতর দিয়া বাগ্দেবীর সেবাতেই তিনি সারাজীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। এক একখানা বই লিখিতে কত পরিশ্রমই না করিতে হইয়াছে—Cromwell লিখিতে তিন বছর, Frederick লিখিতে চৌদ্দ বছর অতিবাহিত হয়। তা ছাড়া, যে সকল যুদ্ধক্ষেত্র বা কার্য্যক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁদের নাম জড়িত, সে-সব দর্শনেই বা কত সময় ব্যয়িত হয়! Frederick the Greatর জীবনী ও তদানীন্তন জার্ম্মেনী ও ইয়ুরোপের সহিত অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য প্রায় দুই হাজার বই একত্র করেন এবং পাঠ-কক্ষ তাঁর Heroর মূর্ত্তি ও তিনি যে সকল স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তার ছবিতে সজ্জিত করেন।

সংসারের দিকে দৃষ্টি ছিল না, গ্রন্থ-চর্চ্চাতেই ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁর স্ত্রীও প্রতিভা-সম্পন্না রমণী ছিলেন এবং কার্লাইলের প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া, তাঁর সঙ্গে জীবনসূত্রে গ্রথিত হন। কিন্তু, ক্রমে স্বামীর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। মনের দুঃখে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে স্ত্রীলোক আত্ম-শান্তি চায়, সে যেন কোনও গ্রন্থকারকে বিবাহ করে না। এ-সব কথা শুনিলে দুঃখ হয়, আনন্দও হয়,—এমন তন্ময়তা না থাকিলে কি শ্রেষ্ঠ লেখক হওয়া যায়।

কার্লাইলের মত life-work জীবন-কাজের ভিতর কে এমন ডুবিয়াছিল? যে কক্ষে বসিয়া তিনি লেখা পড়া করিতেন, কারো সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না, কোনও শব্দ হওয়ার উপায় ছিল না। জীবনের প্রথম অবস্থায় Craigeinputtock নামক জনবিরল নির্জ্জন পল্লীতে তিনি বাস করিতেন, সেখান হ'তে শেষে লণ্ডনে আসেন। যখন প্রথমোক্ত স্থানে অবস্থান করিতেন, তখনকার একদিনের জার্নেলে লিখিয়াছিলেন, আমি অনেক সময়ই মনে করিয়াছি, জীবতাবস্থায়

নিজেকে সমাধিস্থ buried করিয়া রাখি, যশ, সফলতা সব ভুলে যাই। পঞ্চাশ-পৃষ্ঠাব্যাপী দুটী প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই, আমার বছরের সংসার-খরচ চলিয়া যাইবে। তা ছাড়া আমি যখন লোক কর্ত্তৃক বিস্মৃত হই, তখনই যেন আমি সবচেয়ে ভাল কাজ করিতে পারি, I do my best—আমার মাথার উপর ও চারিদিকে তখন অনন্ত আকাশ ও ভগবান। তাঁর সম্বন্ধে লর্ড মর্লে বলিয়াছেন, তিনি সকল সময়ের জন্যই শ্রেষ্ঠ নৈতিক শক্তি moral forceর আধার।

এ-সকল লোকের জীবন-চরিত পাঠে, আমার পক্ষে জীবন উপভোগ্য ও সংসার-বাস সুখের মনে হয়।

১.১২.১৮।—কাল Modern Reviewতে বন্ধুবর জ্ঞান…বাবু লিখিত Intellectual Life জ্ঞান-জীবন শীর্ষক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠে বড়ই তৃপ্ত হইলাম। যাঁরা জ্ঞান-সেবী, কি ভাবে তাঁদের জীবন যাপন করা উচিত, নানা লেখা হ'তে সে বিষয়টী বেশ সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

এ-দেশে যাঁরা জ্ঞান-চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে চান, তাঁদের জীবন-রক্ষা ও সংসার-পরিচালনের জন্য,—অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। তা না হ'লে, দুরবস্থার পরিসীমা থাকিবে না। এখানে যাঁরা জ্ঞান-দেবীর সেবক, তাঁরা নিতান্তই আত্মার ক্ষুধায় তার আশ্রয় নেয়। কিন্তু পেটের তাড়না কিনা সকল তাড়নার মধ্যে ভীষণ, তাই তা নিবৃত্ত করিতে যাইয়া, অভাগার সমস্ত সামর্থ্য ও উদ্যম নিঃশেষিত হইয়া যায়—হা হুতাশ ও নিষ্ফল বিলাপ এবং intermittent সাময়িক উত্তেজনার ভিতরই, প্রাণ-আকাঙ্ক্ষা নিভিয়া যায়; যদি বা কোনও ফল প্রসব করে, তা'ও অনেক সময় দরিদ্রের পঙ্গু সন্তানের ন্যায়,

কারো পক্ষে চিত্তাকর্ষক হয় না। অবশ্য, সব জিনিষেরই ভাল একটা দিকও আছে। যশ ও অর্থের—বিশেষতঃ অর্থের দিকে চাহিয়া যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়, তা অনেক সময় পরের চোখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিত হইয়া থাকে, পাঠ-উপযোগী স্থায়ী কিছুর সঙ্গে তাতে পরিচিত হওয়া তেমন সম্ভবপর নয়। বর্ত্তমানে ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় গ্রন্থ-রচনাও অর্থার্জ্জনের একটী ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে! সে-সব দেশে যেমন তেমন একটী Sensational Detective Story বা Novel লিখিতে পারিলেই, ধনকুবের হওয়া যায়। এতে ফলে দাঁড়াইতেছে, গ্রন্থকার অর্থের লোভ ত্যাগ না করিতে পারিয়া, যা তা লিখিয়া সাধারণের সম্মুখে যখন তখন উপস্থিত হন। এক একজনের রচিত গ্রন্থ-সংখ্যা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়, কিন্তু সে-অনুপাতে তাদের তেমন গুণ নাই—প্রায়ই অন্তঃসার-শূন্য, দু'দিন হৈ চৈ করিয়া অন্তর্হিত হয়। বাঙ্গালায় যাঁরা সাহিত্য-সেবা করেন, প্রাণের তাড়না মিটাইবার জন্যই অনেকে তা করেন। তাই তো, এত অল্পকাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্য এত রত্নরাজিতে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞান-সেবক—সাধক, যোগী। যোগী যেমন সমস্ত বিষয়-বাসনা হ'তে মনকে সঙ্কুচিত করিয়া, ভগবানের আরাধনায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন,—তাকেও তেমন অভীষ্টসাধনে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিতে হইবে। এখন specialisationর দিন, একটা বিষয়-সম্বন্ধে তাকে specialise করিতে হইবে; তা না হ'লে আজ এটী, কাল ওটীতে হাত দিয়া কোনটীতেই সে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। ঔপন্যাসিক যে, তাকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সব পাঠ করিতে হইবে, তাঁদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে - কি ভাবে লিখিতেন, বাস করিতেন। তা ছাড়া, সংসার-নাটকের সঙ্গেও

তাঁর বিশেষরূপে পরিচিত হওয়া দরকার। সেখানে .কোন্ actor অভিনেতা, ছোট বড়, কে কি ভাবে নিজ নিজ part অংশ অভিনয় করিয়া গেল, তার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভাষার সঙ্গেও তার বিশেষ সম্বন্ধ ;—মনোগত ভাব যাতে তার সাহায্যে সর্ব্বোত্তমরূপে ফুটিয়া উঠে, তারও প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তারপর, লেখককে যশ প্রতিপত্তি, এমন কি, অর্থের প্রতিও অনেকটা indifferent উদাসীন হইতে হইবে। নিন্দাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। শুধু আদর্শানুযায়ী execution লেখা হইতেছে কি না, তার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি তা হয়, তা হ'লেই জীবনের mission উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল।

উদ্দেশ্য-যাপন করিতে যাইয়া বন্ধু বান্ধব, এমন কি, স্ত্রী পুত্র, বিরক্ত হোক্ বা অসন্তুষ্ট হোক্,—কিছুরই দিকে সে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। নীরবতাকে বরণ করিয়া নিবে ; গ্রন্থরচনায় যখন ব্যাপৃত থাকিবে, সামান্য শব্দও যেন তাকে বিচলিত না করে। যোগী-চিত্ত বিক্ষিপ্ত হ'লে কি সেখানে আরাধনার বস্তু আবির্ভূত হয় ? তাকে সব সময়ই মনে রাখিতে হইবে—সে যোগী, সাধক।

হয় তো অনেক দিন চলিয়া যাইবে—সঙ্গীরা তার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সংসার-মাঝে সে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, গৃহে প্রণয়িনীর মুখ ভার হইয়া আছে, গৃহ শৃঙ্খলাশূন্য—এমন দিনে দেখা যাইবে, তার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তার হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং আকাশ তার যশ স্তুতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের সব কষ্ট—সবই দূর হইয়া যাইবে। অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া, মানব-সমাজের হাতে জ্ঞান-আনন্দের এক মহা অমর উৎস অর্পণ করিয়া, সে চলিয়া যাইবে। যদি তাও না হয়, জ্ঞান-চর্চ্চায় সময় সময় যে আনন্দ

সে পাইবে, তা ও সংসারের সমস্ত দুঃখ তাড়নার ভিতর তাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। জ্ঞান-সেবক যে, সাধক সে—তার কিসের দুঃখ?

৮.১২.১৮।—টেনিসেনের কবিতা কলেজে যখন পড়িতাম, তেমন ভাল লাগে নাই। অনেকটা সাধারণ ধরণের ভাব—মিষ্টি-কথার গাঁথুনি, প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত তেমন পৌঁছে না। টেনিসনের জীবন-চরিত পাঠে পূর্ব্বের ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল।

তাঁর নিয়ম ছিল, কিছু লিখিয়া বন্ধুদের ভিতর পাঠের জন্য circulate বিতরণ করা, তাঁদের মনঃপুত হ'লে ছাপাইতেন। এমনভাবে পরের দিকে চাহিয়া যিনি লেখেন, স্থায়ী যশ তাঁর জন্য অনেক সময়ই নয়। লেখককে যদি সাধারণ লোকের মতামতের দিকে চাহিয়াই লিখিতে হয়, যদি নূতনই কিছু তিনি দান না করিতে পারেন, তা হ'লে তাঁর বিশেষত্বই কি, প্রয়োজনীয়তাই বা কি?

যাঁরা প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ লেখক,—তাঁরা সাধারণ লোক অপেক্ষা এতটা উর্দ্ধে, যে অনেক সময়ই প্রকৃত মাহাত্ম্য না বোঝার দরুণ জীবদ্দশাতে তাঁদের প্রকৃত সমাদর হইয়া ওঠে না। সেক্‌সপিয়ার ও মিল্‌টনের ভাগ্যে এমন ঘটিয়াছিল। এঁদের পাঠক তৈয়ের করিয়া লইতে হয়। তাই, বৃদ্ধ-বয়সে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যশভূষিত হইয়াছিলেন। একই কারণে, রবীন্দ্রনাথের এদেশে এখনো তেমন প্রতিষ্ঠা হয় নাই। জ্ঞান-রাজ্যের যে হাওয়া তাঁর লেখার ভিতর দিয়া প্রবাহিত, তা ক'জন বাঙ্গালী পাঠকের মনকে স্পর্শ করিয়াছে, তাঁকে সম্যক্‌রূপে বুঝিবার লোক কই? নিরক্ষর চাষাভুষার কবি তো তিনি নন্‌। টেনিসনের সমসাময়িক কবি ব্রাউনিং দুর্ব্বোধ্য ও তাঁর ব্যবহৃত ভাষা জটিল বলিয়া টেনিসনের তুলনায় উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, টেনিসনের কবি-যশ দ্রুতবেগে

ম্লান হইয়া আসিতেছে, পক্ষান্তরে ব্রাউনিংএর বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। টেনিসন নিজেও বলিয়াছেন, ব্রাউনিংএর অপেক্ষা Greater Brain বড় মাথা লইয়া ইংল্যাণ্ডের কোনও কবি জন্মায় নাই। শব্দসম্পদ অপেক্ষাও নূতন চিন্তা এবং ভাব, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সকল লেখকের পক্ষেই তা। ইহার অভাবেই টেনিসন কাব্য-জগতে নীচে নামিয়া যাইতেছেন।

২৪·১২·১৮।—অনেক সময়ই সামান্য আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বলিয়া ধরিয়া নিয়াছি। একদিকে জীবন-বাঞ্ছিত, অন্যদিকে আত্মার সর্ব্বশক্তির নিঃশেষ—এমন হ'লেই পাওয়া যায়। অনেক সময়ই মনে করিয়াছি, এত করিয়া ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু পাইলাম তো না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, তেমন ইচ্ছা করিনি, তেমন শক্তি ব্যয় করিনি,—তাই পাইনি। অনেক স্থলে হয় তো প্রেম, বা অন্য কিছুর মোহে, বা কিছুর ভয়ে, আকাঙ্ক্ষিত পথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছি। এমন নয়; যদি চাও, প্রাণ দিয়া, আশা আকাঙ্ক্ষা মান সম্ভ্রম লজ্জা ভয় অর্থ প্রতিপত্তি সবে জলাঞ্জলি দিয়া, চাও—নিশ্চয় তা হ'লে পাইবে।

৯·১·১৯।—Nevinson লিখিত The Growth of Freedom পড়া গেল।

এক্ষণে সর্ব্বত্রই দিন দিন প্রজা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। Absolute Monarch, Devine Right of Kings—ও-সবের দিন ফুরাইয়াছে। সকল মানুষের সমান অধিকার—এ-ভাবটী সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। Individualisim সাতন্ত্র্যের ভাবটীরও প্রসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, মানুষ ভগবানের বিশেষ আদরের পাত্র, তার জন্যই

জগৎ-সৃষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে Physics, Chemistry, Geology, Astronomy, Biology, Anthropology, Zoology প্রভৃতি নানা বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে, উপরোক্ত ধারণা সর্ব্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে, এখন মানুষও অন্যান্য প্রাণীশ্রেণীর অন্তর্গত জীববিশেষ বলিয়া গৃহীত। জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন, উদ্ভিদ্, মানুষ কিম্বা অন্যান্য প্রাণীতে মূলতঃ বিশেষ প্রভেদ নাই—একই মত শিরা, উপশিরা সকলের, সুখ দুঃখ হর্ষ আনন্দ। কোথায় রহিল তা হ'লে মানুষের বিশেষত্ব, তার অবিনশ্বর আত্মা?

অন্য প্রাণী-জগৎ ছাড়িয়া, মনুষ্য-জগতে প্রবেশ করিলেও এই সমতার স্বরূপই দৃষ্ট হয়। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র—একই ভাবে সকলের দেহ মন গঠিত এবং উভয়েই জন্মগত একই ভাবে পিতামাতার গুণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহা এখন সর্ব্ববিদিত সত্য। কারো ভিতর পার্থক্য নাই,—একই রক্ত-মাংসের শরীর, একই রূপ শক্তি, সুখ-দুঃখ ভোগ করিবার ক্ষমতা। তবে কেন একই সমাজভুক্ত হইয়া একজন জন্ম হ'তেই অসীম ধনের ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে, আর কেনই বা আর একজন অজ্ঞানতা, আঁধার, দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া পঙ্গু হইয়া থাকিবে? যে সমাজে ধনী-দরিদ্র, প্রবল-দুর্ব্বল—এ পার্থক্য দিন দিন লোপ পাইয়া, অর্থ ও ক্ষমতা সকলের মধ্যে যথাসম্ভব সমানভাবে স্থান পাইতেছে, সকলকেই মানুষ হইবার, বড় হইবার সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হইতেছে,—তাহাই আদর্শ-সমাজ, তার দিকেই এখন সমস্ত সভ্য-সমাজের দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া আছে। বিলাসী, অকর্ম্মণ্য ধনীর দিন ফুরাইয়া আসিতেছে।

Sir Henry Campbell Bannerman বলিয়াছিলেন, Self-government is better than good government—রাজনীতি-

ক্ষেত্রে ইহাই সকল পতিত জাতির মূল সূত্র। নিজভাবে জাতি সকলকে নিজ শক্তি উদ্বোধিত করিতে দেওয়া—ইহাই জগৎ-নীতির শ্রেষ্ঠ নীতি। কিন্তু, এ ভয়াবহ আত্ম-প্রতিষ্ঠা, সংগ্রামের দিনে যার যার স্বার্থ লইয়াই সব জাতি বিভোর—পতিত দরিদ্রের মাথায় ভর করিয়াই যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে হইবে। নিঃসহায় দুর্ব্বলের ক্রন্দনের কে সংবাদ নেয়? তাও বলিতে হইবে, নানা বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া মানবত্বের স্বাধীনতার সূর্য্য-আলো দিন দিনই বিস্তার লাভ করিতেছে।

২৬.১.১৯।—যারা আজ এ-ফুলে, কাল ও-ফুলে মধু খুঁজিয়া বেড়ায়—সে-সব সাহিত্য-ভ্রমরের দ্বারা কোনও স্থায়ী কাজ হইয়া উঠে না। পল্লব-গৃহীতার পরিণাম—আত্মগ্লানি।

রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতা পাঠ করিতেছিলাম,

যেটুকু তোর অনেক আছে,
যেটুকু তোর আছে খাঁটি।
তার চেয়ে লোভ করিস্ যদি,
সকলি তোর হবে মাটি।
একমনে তোর একতারাতে,
একটি যে তার সেইটে বাজা,
ফুলবনে তোর একটী কুসুম,
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর বেড়া, সেথায়
আনন্দে তুই থামিস্ এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া,
সেই কড়ি তুই নিসরে হেসে।

লোকের কথা নিস্‌নে কানে,
ফিরিস্‌ না আর হাজার টানে,
একতারাতে একটী যে তার,
আপন মনে সেইটী বাজা।

এইভাবে একমনে একটী তার আজীবন বাজাইয়াই রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইহা সকলের পক্ষেই, আমার পক্ষেও, সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট পথ।

রাণা—,৩০·৮·১৯।—পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছি।

কোন্‌ দিকে চলিয়াছি—উন্নতি না অবনতির? বার্দ্ধক্যের ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা মাঝে মাঝে গায় আসিয়া লাগিতেছে, দেহ নীচের দিকে নামিতেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কি এক আশার আলো চোখের কাছে আলেয়ার মত সব সময় বিরাজ করিয়া মনকে উপরের দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিয়াছে। কোথা হ'ত এ-আশার উৎপত্তি,—এ-যাত্রার কোথায় শেষ? অর্থপূর্ণ কোন শেষ আছে কি?

৩১·৮·১৯।—অনেকদিন হ'তে Ibsen পড়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল—পড়িতেছি। তাঁর Pillars of Society ও Ghosts পড়িলাম। ভালই লাগিল,—বোধ হইল, মন-মেঘের আরও এক পর্দ্দা কাটিয়া গেল। বেশ সব বই, খাঁটি সত্য কথা, ঝর্‌ঝরে ভাবে লেখা। Ibsen নিজেও নাকি মনে করিতেন Doll's House, Ghosts, Pillars of Society প্রভৃতি এ-সব ছোট নাটিকায়ই নাকি তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখা—অন্যান্যেরও তাই মত।

Pillars of Societyতে দেখান হইয়াছে, সমাজে সুনীতির নামে

যে সকল নিয়ম আচার প্রচলিত, অনেক সময়ই তা ভণ্ডামির রূপান্তর। অনেকদিন হ'তে এ-সবের চর্চ্চা করিতে করিতে আমরা এদের প্রকৃত সত্য-স্বভাব ধরিতে পারি না। Rorland নামে যে একটী পাদ্রীকে অবতারণা করা হইয়াছে, তাঁর পক্ষে যা আছে, তাই ভাল, Conventional moralities প্রচলিত মানান-সই নীতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তিনি সর্ব্বদা শশব্যস্ত। নূতন কোনও পরিবর্ত্তনের নামে তিনি শিহরিয়া উঠেন। স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেছেন, সমাজ যাতে pure পবিত্র থাকে, সে-দিকেই আমাদের দেখিতে হইবে, নূতন অপরীক্ষিত সব ব্যাপার, যা বর্ত্তমান ধৈর্য্যশূন্য যুগ আমাদের উপর জোর করিয়া চাপিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, তাদের হাত হ'তে সমাজকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। রাজ-পথের হট্টগোলের ভিতর, যেখানে সামান্য সব জিনিষ লইয়া রৌদ্রের ভিতর লোক সকল খাটিয়া মরিতেছে, তাতে প্রবেশ করিয়া কি লাভ? আমরাই আছি তার চেয়ে বেশ—ছায়ায় বসিয়া, বাইরের দিক হ'তে পিঠ ফিরাইয়া। গ্রন্থের প্রধান চরিত্র—Bernick সমাজের একটী স্তম্ভ Pillar of Society। লোকের কাছে, তাঁর কত সম্মান, কত আদর! কিন্তু শেষটায় দেখা গেল, যৌবনে তিনি স্ত্রীলোক-ঘটিত একটা কেলেঙ্কারীতে জড়িত ছিলেন এবং পরের ঘাড়ে সে-দোষ ও চুরীর অপবাদ চাপিয়া, সাধুর মুখোস্ পরিয়া সমাজে মহা সম্মানের সহিত বাস করিতেছিলেন। অবশেষে, লোকের কাছে সব প্রকাশ করিয়া, নিজের কাছে যেন বাঁচিয়া গেলেন। সমাজের বাঁধা নীতির মধ্যে নয়, মানুষকে স্বাভাবিকরূপে গড়িয়া উঠিতে দেওয়া—ইহাই Ibsenর শিক্ষা।

Ghosts নাটকখানা Pillars of Society অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধরণের। সোজা কথায়—ইহা Tragedy of Heridity, মস্ত একটী বৈজ্ঞানিক সত্য, ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

লোকের বিশ্বাস—শিক্ষা ও যত্ন দ্বারা সমস্ত পাপ ও দোষ দূর করিয়া, নির্ম্মল নূতন মানুষ গড়িয়া লওয়া যায়। প্রকৃতই কি তা সম্ভবপর? বাল্মীকির মত কবি, বা নেপোলিয়ানের মত বীর কি চেষ্টা করিয়াই তৈয়ের করা যায়; জন্মগত যে নির্ব্বোধ, চেষ্টা করিয়াই কি তাতে প্রতিভার সঞ্চার করা চলে? এ-সব যে হয় না—লোকে বেশ বোঝে। কিন্তু যাকে আমরা চরিত্র-দোষ বলি, জন্মই যে অনেক সময় তার মূলে—তা আমরা বুঝি না।

Ghostsএ Oswald Alving নামে যে চরিত্রটী অঙ্কিত করা হইয়াছে, সে পানাসক্ত চরিত্রশূন্য পিতার পুত্র, কিন্তু তার মা তাকে বাল্যকাল হ'তে ইচ্ছা করিয়া গৃহ হ'তে অন্যত্র শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর Mrs Alving তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, এবং সর্ব্বত্র স্বামী মহা চরিত্রবান্ লোক ছিলেন এ মত যাতে প্রকাশিত হয়, তার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন—একটা কৃত্রিম পুণ্যের আলোকে স্বামীর স্মৃতিকে জড়িত করিয়া পুত্রের চোখের সুমুখে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থার শেষে, পুত্র Oswald স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই দেখা গেল, পিতার সব দোষই যেন তার ভিতর অলক্ষিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁরই মত সে চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী, এবং ইহাও প্রকাশ পাইল, পিতা গৃহের যে দাসীর সঙ্গে প্রেম-অভিসারে রত ছিলেন, তার কন্যার সঙ্গে পুত্রও সে-দোষে জড়িত! এ-সব দেখিয়া গৃহ-পাদ্রীকে উদ্দেশ করিয়া Mrs Alving বলিতেছেন,—'আমার এক এক সময় মনে হয়, আমরা সকলেই Ghosts প্রেতাত্মা। কেবল যে বাপ-মার দেহ হতে জন্মের সঙ্গে উত্তরাধিকারীস্বরূপে যা আমরা পাইয়াছি, শুধু তাই নয়, সব মৃতভাব ideas ও প্রাণশূন্য প্রাচীন সংস্কার—সমস্তই আমাদের ভিতর বিচরণ করিতেছে—আমাদের জড়াইয়া আছে, আমরা তাদের প্রভাব হতে মুক্ত হ'তে পারি না। যখনি কোন সংবাদ-পত্র হাতে নেই, মনে হয়, রাজ্যের

এমনি সব প্রেতাত্মাগুলিকে লাইনের ভিতর দিয়া glide বিচরণ করিতে দেখিতেছি; সমস্ত দেশব্যাপী এই প্রেতাত্মাদের বাস,—সমুদ্র-তীরের বালুকণার সমষ্টির মত thick পুরু।' কথাটী সত্য, অতি সত্য এবং এ-সত্য সমাজে গৃহীত হয় নাই বলিয়াই পাপ-পুণ্য দোষী-নির্দ্দোষী সম্বন্ধে বিচারে ভুল হইয়া থাকে। স্বাধীনতা, স্বাধীন-ইচ্ছা Free willর গুণ গাহিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু মূলতঃ, স্বাধীনতা কতটুকু, কোথায়? পিতা-মাতার দেহ-ভাব দিয়া গড়া আমি, যার দেহ আবার সমাজের মৃত, জীবন্ত নানা ভাবের আধার—স্বাধীনতা আমার কোথায়? কত পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার পিতা পিতামহদের দেহের ভিতর দিয়া আমাতে আসিয়া মিশিয়াছে! আমি যে Heridity জন্মের হাতের পুতুল। যতই কেন চেষ্টা না করি, বেশী দূরে যাইবার আমার উপায় নাই, পিছনের দড়ির টানে নিজ কোটরে আসিয়া প্রবেশ করিতেই হইবে। চরিত্রোন্নতি ভুল ধারণা, আসল মানুষটী পূর্ব্বাপর একই থাকিয়া যায়, Environment পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যা কিছু খোসা বদলাইয়া উপরের ক্ষণিক চাকচিক্য। এর উপর যখন Freud-প্রচারিত Psycho Analysis শাস্ত্রে বিবৃত, মনের Subconsious regionর—যেখানে যাইয়া ধীরে ধীরে আমার অলক্ষিতে সমস্ত জীবনের অর্জ্জিত সংস্কার ক্রমে জমা হইতেছে এবং যারাই প্রকৃত পক্ষে আমাকে চালনা করিতেছে—বিষয় মনে করি, তখন সত্যই অবাক্ হইয়া ভাবি, কে আমি, কি আমি? আমার নিজ অস্তিত্ব, ইচ্ছা কোথায়? পরের হাতের ক্রীড়নক আমি!

অনেকের মতে Ghostsই Ibsenর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কিন্তু এ-স্থান অধিকার করিয়া লইতে ইহার বিশেস সময় লাগিয়াছে। যারা Conventional moralities বাঁধা-নীতি নিয়মের ভক্ত, তাঁরা অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে এমন কুৎসিত বৈজ্ঞানিক সত্য ললিতকলার

বহির্ভূত। এ-বিষয়ে Goetheর মত, কোনও সত্য-ঘটনাই কবিত্ববিহীন নয়, যদি কি প্রকারে তা ব্যবহার করিতে হইবে, কবি জানেন। বস্তুতঃই Ibsenর বইখানা পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি ; মস্ত একটা সত্যের,—যদিচ বিকট, বিসদৃশ,—সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেল।

১৪.৯.১৯।—অনেক দিন হ'তে Maxim Gorkyর Comrades উপন্যাসখানার নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম—পড়িলাম।

রুশিয়ান্ লেখকদের লেখা যতই পড়িতেছি, ততই আমার মনে হইতেছে, ইয়ুরোপের পশ্চিমাংশের—ফ্রান্স, জার্ম্মেণি ও ইংল্যাণ্ড—লোক সকল শুধু ভাবের জল্পনা কল্পনা করিয়া বেড়ায়, আর তার ফল ফলে অর্দ্ধ-ইয়ুরোপীয় অর্দ্ধ-এশিয়াটিক্ রুশিয়াতে। কথা হইতেছে, ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ডের কোন লোকের অবস্থাই তেমন শোচনীয় নয় ; সে-সব দেশের দরিদ্রের তুলনায়, অন্য দেশের অবস্থাপন্ন লোকও অনেক সময় দরিদ্র। শূন্য পেটই হইতেছে, সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের আকর ; তাই দেখা যাইতেছে, দরিদ্র, নিরন্ন রুশিয়ায় তা' যেমন ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, এমন আর কোথাও নয়। অত্যাচারী কুসংস্কারগ্রস্ত Czar জার ও তাঁদের আত্মীয় Grand Dukeদের শাসনে সেখানকার নিম্নশ্রেণী যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নিষ্পেষিত হইয়া আসিতেছিল। গরু মহিষের মত তারা এক জমীদারের হাত হ'তে অন্য জমীদারের কাছে বিক্রীত হইত—তাদের সাধারণ নাম ছিল Souls। শিক্ষা ছিল না, vodka মদ্যপানে বিভোর-চিত্ত হইয়া দুঃস্বপ্নের মত কোন প্রকারে পশু-জীবনটা কাটাইয়া দেওয়া—এই ছিল তাদের সাধারণ ইতিহাস। কিন্তু সে-দিন তাদের ফুরাইয়াছে। যে সকল প্রতিভাশালী লেখকদের চেষ্টায় রুশিয়ার পায়ের হাজার বছরের শিকল খসিয়া পড়িয়াছে, গোর্কি তাঁদের অন্যতম।

এই সব নিম্নশ্রেণীর-লোক workmen লইয়াই Comrades লেখা। পাঠে কি-ভাবে তাদের ভিতর, তাদের এবং জনকয়েক অভিজাত-বংশ-সম্ভূত মহানুভব নর-নারীর চেষ্টায়, সাম্য স্বাধীনতার ভাব দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তার বিশেষ আভাস পাওয়া যায়। জার ও প্রজার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ, সন্দেহে workmenদের গ্রেপ্তার, তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার—সবই বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থে চরিত্র-চিত্রণ নাই বলিলেও চলে, সে-দিকে তেমন চেষ্টাও নাই, কিন্তু লোকের মুখে মাঝে মাঝে এমন সব কথা দেওয়া হইয়াছে, যে পড়িলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

গ্রন্থের নায়ক Pavel মদ্যপায়ী শ্রমজীবীর সন্তান। তাঁর পিতা Michael Vlasov কারখানা Factoryতে শ্রমজীবী ছিল। তার জীবনে ও পশু-জীবনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কোন প্রকারে আহারের সংস্থান করা, মদ খাওয়া, স্ত্রীকে সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে প্রহার করা—এ-ভাবে দিন কাটাইতে কাটাইতে সে মারা গেল। স্ত্রী, তার জন্য যৎসামান্য কাঁদিয়াছিল, পুত্র পেভেলের সঙ্গে তিন বছর পূর্ব্বে ঝগড়া করিয়া সে কথা বন্ধ করিয়াছিল, সে একটুও কাঁদিল না। অন্যান্য শ্রমজীবীরা বলাবলি করিতে লাগিল, Vlasov মরে নাই,—জন্তুর মত ধীরে ধীরে পচিয়া পচিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে rotted away। ফ্যাক্টারীর কল্যাণে এমন ভাবেই শ্রমজীবীদের জীবন যাইতেছিল, Michael Vlasov শতেকের একজন।

Pavelও বাপের পথেই অনুসরণ করিতেছিল, মদের নেশায় মাতিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অন্যান্য Comradesর সাহচর্য্যে, তার জীবনে অকস্মাৎ এক মহাপরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তার বয়স সতের। পোষাক পরিচ্ছদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তার দৃষ্টি পড়িল এবং কাজ-কর্ম্মেও তাকে উদ্যমশীল দেখা যাইতে লাগিল। তাদের

জীবন কেন এমন বিসদৃশ, তা বুঝিবার জন্য সে গ্রন্থ-পাঠে মনোনিবেশ করিল এবং workmenদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কাহিনী জানিবার জন্যও সচেষ্ট হইয়া উঠিল। মাকে উদ্দেশ করিয়া সে একদিন বলিল, আমি এখন বুঝিতেছি, পিতা তার জীবনের wretchedness কষ্ট-দরিদ্রতার প্রতিশোধ লইয়াছে তোমার দেহকে পীড়ন ও প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া। সর্ব্বক্ষণই ইহা তাকে তাড়না দিয়াছে, কিন্তু কোথা হ'তে কেমন করিয়া যে এ-প্রতিশোধের ভাব উত্থিত হইয়াছে, তা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। ত্রিশ বছর ফ্যাক্টারীতে সে খাটিয়াছিল, যখন সে প্রথম নিযুক্ত হয়, তখন ফ্যাক্টারীর মাত্র দুটী পাকা বাড়ী ছিল, এখন সে স্থলে সাতটী হইয়াছে। কলকারখানারই উন্নতি হয়—কিন্তু মানুষ তাদের জন্য শুধু খাটিয়া খাটিয়া মরিয়া যায়।

কেন তাদের জীবন এমন কষ্টময়, কঠিন—জানিবার জন্য Pavel উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল এবং অবশেষে এই সত্যে উপনীত হইল, প্রচলিত জার-চালিত সমাজের নিয়মাধীনে তাদের অন্য ভাবে জীবন-যাপন অসম্ভব। ধনীদের, ভাগ্যবান্‌দের দ্বারাই সমাজ চালিত হইতেছে, দরিদ্র যে, চিরদরিদ্র থাকাই তার অবশ্যম্ভাবী, উপরে উঠিবার তার কোনও সুযোগ নাই; হয় তাকে অর্দ্ধাহারে বর্ব্বর পশুর মত জীবনপাত করিতে হইবে, নয় চোর বদ্‌মায়েসরূপে ধৃত হইয়া জেলে পচিতে হইবে। পুলিশ, সৈন্যসান্ত্রী, বিচারকের দল—সকলেই এই সকল ধনীর, জারের অর্থে পুষ্ট হইয়া, এই সামাজিক রীতিনীতিকে অব্যাহত ও অটুট রাখিবার চেষ্টা করিতেছে—এই জার-চালিত শাসন হ'তে মুক্তিলাভের জন্য দরিদ্রদের সংঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। Comrades এই সংঙ্ঘের সঙ্গী কর্ম্মীগণ।

যাতে সমাজে ধনীদের ন্যায়, দরিদ্রদেরও মানুষ হইয়া বাঁচিবার ও বড় হইবার সমান অধিকার পাইবার দাবী গ্রাহ্য হয়—সে-সব ভাব প্রচারেই

Pavel ও তার সঙ্গীদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই জার-শক্তির সংঘর্ষে আসিয়া কেউ বা সাইবেরিয়াতে প্রেরিত হইল, কেউ বা জেলে প্রাণত্যাগ করিল—এ-সব লইয়াই গ্রন্থ রচিত। পড়িয়া যে খুব আনন্দ পাইলাম মনে হয় না, তবে রুশিয়ার অন্তর্নিহিত জ্বালা-যন্ত্রণার অনেকটা পরিচয় পাওয়া গেল।

৯.১১.১৯।—পূজার পূর্ব্বেই Turgenevর Fathers and Sons পড়িয়াছিলাম। ইহাই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ; বইর প্রধান চরিত্র Bazarov তাঁর রচিত চরিত্রমধ্যে সর্ব্বপ্রধান। Bazarov—Nihilist. Latin nihil, nothing—a man who accepts nothing—নত্ববাদী। কিছুতেই তার বিশ্বাস নাই, কারো বা কোনও মতের কাছে মাথা নোয়াইবে না সে, Reason বিচারবুদ্ধিকেই সব কাজে সে একমাত্র চালক বলিয়া মনে করে। Bazarovর মুখে গ্রন্থকার যে সকল কথা দিয়াছেন, মাঝে মাঝে বড়ই প্রাণস্পর্শী। একস্থানে সে বলিতেছে—'আত্মসম্মান ও নিজ মনুষ্যত্বের মহত্ব personal dignityর জ্ঞান, যে সমাজের লোকের ভিতর উন্মেষিত হয় নাই, তার ভিত্তি সুদৃঢ় নয়। মানুষের চরিত্রই প্রধান জিনিষ—পাহাড়ের মত তা অটুট্, সুদৃঢ় হওয়া দরকার। আমার নিজের ভিতর যে মনুষ্যত্ব আছে—পোষাক, পরিচ্ছদ, চালচলন, আচারব্যবহার—সকলের ভিতর দিয়া আমি তাকে সম্মান করিয়া চলি।' আর একস্থানে বলিতেছে, 'যা হিতকারী বলিয়া অনুভব করি, শুধু তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা অগ্রসর হই। বর্ত্তমানে, ভাঙ্গাই তাই প্রধান কাজ, যেহেতু The ground wants clearing first, সর্ব্বাগ্রে জমীকে আগাছা উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।' Pavel Petrovitchকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

'রুশিয়ার জাতীয় কি পারিবারিক জীবন-সম্বন্ধে এমন একটা প্রতিষ্ঠান institution কি দেখাইতে পার, যা সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হওয়া উচিত নয়?' Bazarovর মৃত্যুকালের কথাগুলিও সুন্দর,—'বড়র পক্ষে ভদ্র-ভাবে মরাই এই শেষ মুহূর্ত্তের একমাত্র সমস্যা, কোনও চিন্তা নাই, কিছু-তেই আমি ভয়ে লেজ গুটাইব না I am not going to turn tail.'

ইংরাজীতে যাকে Hero বলে, Bazarovর কথাবার্ত্তা চালচলন তাদের কথা স্মৃতিপথে জাগাইয়া দেয়। ভাবের উপাসক—কিন্তু ভাব কার্য্যে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই জীবন-মধ্যাহ্নে অসম্পূর্ণ অবস্থায় এরা অপসারিত হইয়া যায়, এবং পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে এরূপ অকস্মাৎ ভাবে চলিয়া যায় বলিয়াই, এমন মধুর ও চিত্তাকর্ষক। Bazarov-চরিত্রে কপটতা নাই; সাহস তার প্রাণবায়ু, বিপদের ভিতর বাস করাই তার স্বাভাবিক অবস্থা; অন্যের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী না হইয়া, অন্যের সঙ্গে hostility অনৈক্য সৃষ্টি না করিয়া, সে চলিতে জানে না; প্রাচীন প্রাণশূণ্য সংস্কার-সকলকে বিনাশ করাই তার কাজ; লোকনিন্দাকে, এমন কি, প্রশংসাকে যে অবজ্ঞা করিয়া চলে—বাতাস ও স্রোতের বিরুদ্ধে বিচরণশীল; নিজ কাজে সম্পূর্ণরূপে যে আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছে; একাকী নিঃসঙ্গ-অবস্থায় বাসেই তার আনন্দ। সম্মান, সফলতা, লোকমতকে ঘৃণা করিয়া চলে সে; এমন কি, ভালবাসাকেও তার এবং নির্দ্দিষ্ট কাজের মধ্যে আসিতে দেয় না। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন দেয়ালের দিকে চাহিয়া নির্ভীকচিত্তে তাকে গ্রহণ করে—জনসাধারণ বাইরে হয় তো তখন Heroর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে আনন্দধ্বনি করিতেছে।

Bazarov কি? কোন সমালোচক বলিয়াছেন, He is the bare mind of science first applied to politics রাজনীতিক্ষেত্রে

সর্ব্বপ্রথম-নিযুক্ত খোলা-বিজ্ঞানে-গড়া আত্মা। জার্ম্মেণ বিজ্ঞানও রুশিয়ার ভাবগাঢ়তা তার জন্মদাতা। মূলতঃ, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-যুগের সংশয়-বাদী আত্মা—he stands for the sceptical conscience of modern science। তার আবির্ভাব—দু'টী ধর্ম্মের দিকে পথ নির্দ্দেশ করিতেছে; একটী—যার ভিত্তি বিশ্বাস ভক্তি, যা অতীতের, যা চলিয়া যাইতেছে; আর একটী—যা দিন দিন বর্দ্ধিত, সজীব হইয়া উঠিতেছে, যার ভিত্তি বিজ্ঞান। তার প্রধান কাজ, মানুষ যে-কিছুকে এতদিন পর্য্যন্ত পবিত্র, সত্য মনে করিয়াছে, বিজ্ঞানের দ্বারা তার পরীক্ষা test করিয়া অসত্য হইলে তা হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়া, কোনও প্রাচীন রীতি-নীতির দাস নয় সে। সে নিজেই তার নিজ বিধি law। যে-সব প্রেম ও কর্ত্তব্যবন্ধন, বলবানের অগ্রসরে বাধা দেয়—সমস্তকেই সে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। যুগযুগান্তরের কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়া আবির্ভূত বিজ্ঞান-সৃষ্ট সম্বুদ্ধ আত্মা—গতানুগতিকের অত্যাচারমূলক-স্বপ্নের কুহেলিকা হতে পূর্ণরূপে মুক্ত সে। একাকী নিঃসঙ্গ দণ্ডায়মান সে বধির indifferent আকাশের নীচে—Bazarov বর্ত্তমান বিজ্ঞানযুগের মানব চরিত্রের type আদর্শ। সাধারণ লোক Bazarovর সঙ্গে মিলিত হ'তে সর্ব্বক্ষণই সন্ত্রস্ত—সাধারণ লোক তাকে প্রকৃতরূপে বোঝে না, তাকে দলপতিরূপে গ্রহণ করিয়া চলিতে অনিচ্ছুক। ভাব ও সাহসেরই সে উপাসক—অন্য কারও, কিছুরই নয়।

Turgenevর এই বইখানা উপন্যাস হিসাবে তেমন উচ্চস্থান পাইবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু শুধু Bazarov চরিত্রের সমাবেশের জন্য ইহা অমর হইয়া আছে ও থাকিবে। সম্পূর্ণরূপে original নূতন ধরণের চরিত্র। নিহিলিষ্টদের রুশিয়ার রাজনৈতিক জগতে আবির্ভাব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে নির্দ্দেশ দেখা যায়। রুশিয়া পূর্ব্বাপর ভাবোপাসক—এদের

হাতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সে-সমাজ আবার নূতন রূপ ধারণ করিতেছে। Bazarovকে ভোলা কঠিন।

১৯.১.২০।—The United States of America লাল লাজপত রায়ের লেখা সুন্দর বই। পাঠে বর্ত্তমানকালের আমেরিকান্‌দের বেশ একটী মনোরম চিত্র চোখের কাছে ভাসিয়া উঠে—সদা-কার্য্যশীল, চট্‌পটে, ব্যবসা-বাণিজ্য-লিপ্ত, ধনী, স্ফূর্ত্তিতে-ভরা-প্রাণ। বিমর্ষভাব, অকারণ গাম্ভীর্য্য, মলিনতা নাই। অর্থ এদের দেবতা, কিন্তু তার দাস নয়, জীবন সুখে সম্ভোগে কাটাইবার জন্যই একে পেতে চায় এরা; যেমন অভূতপূর্ব্ব রোজগার—তেমন ব্যয়, তেমন অভূতপূর্ব্ব দান। এমন স্ত্রী-স্বাধীনতা কোন দেশে নাই, সকল কাজেই তারা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে টক্কর দিয়া চলিয়াছে। শিক্ষাবিভাগে সংখ্যায় তারা পুরুষের অপেক্ষাও বেশী। সব সভ্যজাতির যা প্রধান লক্ষণ,—লোকগুলি বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেশ-হিতার্থে কত অজস্র অর্থই না ব্যয় করিতেছে, কিন্তু সবই কেমন well organized—আমাদের দেশের মত যে সে হাত পাতিলেই দেওয়া নাই, অন্যায়রূপে অর্থব্যয় নাই।

কিন্তু তাও বলিতে হইবে—ক্ষুদ্রচেতা। যা কিছু স্বার্থত্যাগ, পরহিত—নিজেদের লইয়া; নিগ্রোদের উপর কি অমানুষিক অত্যাচারই না এরা পূর্ব্বাপর করিয়া আসিতেছে! Lynching প্রথার বিষয় ভাবিতে গেলে, এরা সভ্য নামের উপযুক্ত কি না, তাই সন্দেহ হয়। আর তাদেরই বা কি দোষ দিব? এদেশে ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালাদির প্রতি পূর্ব্বাপর যে-ভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের শম্বুক শূদ্রের প্রতি ব্যবহার—এসব কথা ভাবিলে মনে হয়, সভ্যতা বলিয়া যে জিনিষের এমন তারিফ করিয়া বেড়ান হয়, কিছু নয় তা,—

স্বার্থ self interestই সকলের মূল, তার উপরই মূলতঃ সমাজ, জাতি গঠিত।

বইর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক স্থান, যেখানে পতিত নিগ্রোরা তাদের অবস্থা-উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, তার বর্ণনা আছে। এই উপলক্ষ্যে মহাপ্রাণ Booker Washington কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত Tuskegee Institute নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এখানে বলিতে গেলে, একটী জাতির ভবিষ্যৎ গঠিত হইতেছে। এই Instituteর উদ্দেশ্য, ইহার প্রত্যেক ছাত্রেরা যেন কোনও সৎকাজ দ্বারা নিগ্রো-সমাজের উপকার সাধন করিতে পারে। এর জন্য মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হাত—তিনটীরই যাতে সমানভাবে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তার চেষ্টা হইতেছে। যাতে ছাত্রদের মধ্যে intelligent economy জ্ঞানমূলক মিতব্যয়িতা, পরিশ্রমশীলতা, আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাব, শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে কাজ করার শক্তি, ভদ্রতা ইত্যাদি গুণ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়—Tuskegee তার চেষ্টা করিতেছে। Tuskegee and its People নামে Emmet Scottর লিখিত বইর কথায়, বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত স্বাধীনতালাভ সম্ভবপর নয়, পরিশ্রমশীলতা ব্যতীতও স্বাধীনতালাভ অসম্ভব এবং চরিত্র ব্যতীত পুরুষের পক্ষে—শক্তি-ক্ষমতালাভ ও রমণীর পক্ষে মাধুর্য্য।

এই স্কুলে Military Discipline সামরিক নিয়ম প্রবর্ত্তিত—সময়-মত ছাত্রেরা নিদ্রোত্থিত হয়, ড্রিল্ করিয়া পড়িতে যায়, আহার করে, ভজনালয়ে প্রবেশ করে। সবই বাঁধা নিয়ম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে কি তীব্র দৃষ্টি, তা Booker Washingtonর বক্তৃতার নিম্নের উদ্ধৃত অংশ হ'তে বুঝা যাইবে।

তিনি এক রাত্রিতে ছাত্রদের উপদেশ দিতেছিলেন—সভ্যতা-সম্বন্ধে

কা'কেও শিক্ষা দিতে যাইয়া তুমি একটী বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে পার, যে দরজার হুড়কাটীও যদি ঢিলা হইয়া পড়ে, তাতেও যেন সে নিজেকে অসুখী ও অসন্তুষ্ট মনে করে। সব সময়ই দৃষ্টি রাখিবে, যে ঘরে ছাত্র ও শিক্ষকেরা মিলিত হয়, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে,—কি বাহির, কি ভিতর। মেঝে ঝাড়াপোছা হওয়া চাই, প্রত্যেক জিনিষ, ঘরের আস্‌বাব furniture ভাল করিয়া যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর হয়, এবং যেখানে পারা যায় চুণ ও রংএর ব্রাস গৃহে লাগান হয়। জানিও, চুণের ব্রাস এবং রঙ্গের পাত্র Paint Pot, সভ্যতার নিদর্শন। সব সময়ই নজর রাখিবে, তোমার গৃহ এবং গোলাবাড়ী Farm House যেন বাসের উপযুক্ত হয়। যদি একান্তই রং দিতে না পার, অন্ততঃ তা'তে চুণের পোঁচরা দিও। যদি শিক্ষক স্বরূপে কোনও স্কুলে নিযুক্ত হ'তে যাও, তা' হ'লে এক সপ্তাহ সময় নিবে, তা'কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে। দেখিবে, আঙ্গিনাটী পরিষ্কার করা হইয়াছে, কাগজের টুক্‌রাটী অপসারিত হইয়াছে, দরজার স্ক্রুগুলি ঢিলা হয় নি এবং দরজার, জানালার আয়না সব ঠিকমত লাগানো হইয়াছে। তারপর স্কুল-গৃহে রং দিবে, চুণকাম করিবে,—যেন দেখিয়া মনে হয়, মানুষের বাসোপযোগী। এমন কি, দরকার হইলে, যতদিন পর্য্যন্ত জানালার আয়না ঠিক না হয়, ততদিন স্কুল বন্ধ রাখিবে।...সব সময়েই কার্য্যশীল হইবে ও সব জিনিষই সব সময় in good repair ভালরূপে মেরামত করিয়া রাখিবে। যা' তুমি স্পর্শ কর, জীবনে যে কোনও বিষয়ের সম্পর্কে তুমি আস,—তোমার শরীর, তোমার পোষাক পরিচ্ছদ, তোমার গৃহের ভিতর বাহির—সবই সকল সময় এই প্রকার সংস্কৃত অবস্থায় রাখিবে। তা' হ'লেই তুমি vigorous উৎসাহ-উদ্যমপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং সমস্ত বিপদকে পরাস্ত করিতে পারিবে।

এই সম্পর্কে নিগ্রোদের অন্যতম নেতা Du Boisএর লেখা হ'তে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"আমাদের মধ্যে Organisation [হায়! মনোমত বাঙ্গালা শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না, এ জিনিষটা যে আমাদের নাই-ই।] কতক অগ্রসর হইয়াছে—আরো দরকার। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অমূল্য সম্পদ—স্বাধীনতা কেনার সস্তা উপায়, It is the cheapest way of buying the most priceless of gifts—freedom।"

লজপত রায়ের বইখানা পড়িতে পড়িতে এবং আমেরিকার ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ-সম্ভোগ, ক্ষমতা, জীবনানন্দের দিকে চাহিয়া একটী কথাই কেবল মনে জাগিতেছে—আমরা কি ঠিক পথে এতদিন চলিয়া আসিয়াছি? সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া, তার দিক হ'তে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকাতেই কি প্রকৃত মনুষ্যত্ব? কিছুতেই যে কোন কাজে আর মনকে বসাইতে পারিতেছি না! এ-ভাবে চলিতে চলিতে যে জগতের পৃষ্ঠা হ'তে একেবারে অদৃশ্য হইবার উপক্রম হইলাম! লালা লজপত রায়ও বলিয়াছেন, প্রাচীন আর্য্যেরা, যাঁরা ভারত জয় করিয়াছিলেন, এ-জাতির মূল পত্তন যাঁরা করিয়াছিলেন, তাঁরা তো এমন ভাবাপন্ন ছিলেন না। এই যে নশ্বরতার ভাব, যার গৌরব আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হ'তে মুটে মজুর পর্য্যন্ত গাহিয়া বেড়ায়—কবে আমরা এর হাত হ'তে মুক্তি পাব? না, সমস্ত জগৎ ভরিয়া আমরা এই বিষ ছড়াইয়া সকলের বিনাশ-সাধন করিয়া যাইব? এমন বুদ্ধিমান জাতি—কিন্তু কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত! মরণের পথে চলিয়াছি আমরা। কবে মুখ ফিরাইব? ফিরাইব কি কখনো?

১৫.২.২০।—বেশ একখানা ভাল বই পড়িলাম, Norwegian Johan Bojerএর লেখা—The Power of a Lie.

কিছু পূর্ব্বে এঁর আর একখানা বই The Great Hunger 'মহাক্ষুধা' পড়া গিয়াছিল। তার নামটাই আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। বইতে খুব ভাল ভাল বড় বড় কথা আছে, সমস্ত বিশ্বের সবই—কি উদ্ভিদ্, কি প্রাণী জগৎ—সবই যে এক বিরাট্ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে এবং সকলেই তার fuel কাষ্ঠখণ্ডরূপে নিঃশেষিত হইতেছে, তার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা-উদ্দীপক কথা আছে, কিন্তু 'মহাক্ষুধাটী' যে কি, তা খুঁজিয়া বইখানাতে পাওয়া গেল না। সত্যই জগৎ—কি এক 'মহাক্ষুধায়' জর্জ্জরিত! কি ইহা, কোথায় বা এর নিবৃত্তি? উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠা এবং তার অপেক্ষাও শেষ লাইন লেখাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। গ্রন্থকার শেষটায় সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করিয়া দিলেন, সবই কেমন অস্পষ্ট আবছায়ার মধ্যে মিলাইয়া গেল। তা'ও, বইখানা মোটের উপর নেহাৎ মন্দ লাগে নাই।

The Power of a Lie তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—একবার পড়িলে আবার পড়িতে মন যায়। গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের, স্থিতিস্থাপকতার ইহা এক প্রকার মাপকাঠি বলা যাইতে পারে। যে বই যতটা ভাল, তা'কে তত বেশী বার পড়া যায়; সাধারণ বই একবারের বেশী স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করে না। Hall Caine ভূমিকায় Bojerএর বইখানাকে, This is a Great Book বলিয়াছেন। সত্যই বইখানা Great; French Academy হ'তে ইতিমধ্যে crowned হইয়াছে।

বইর প্রতিপাদ্য বিষয়—মিথ্যার বিষময় ফল; এক মিথ্যার ফল, আর এক মিথ্যা—এ-প্রকারে একটী সামান্য মিথ্যা হ'তে মহা অনর্থের উৎপত্তি হয়। গ্রন্থে নরওয়ের তুষারাবৃত ভূমি ও দৃশ্য সকলের মনোহর সব চিত্র রহিয়াছে, বর্ণনা মাঝে মাঝে বড়ই হৃদয়গ্রাহী। চরিত্র-চিত্রণও বড়ই সুন্দর, সবই কেমন জীবন্ত, যেন চোখের কাছে ভাসিতেছে।

অনাবশ্যক অস্পষ্টতা বা কথার ঘোরপ্যাঁচ নাই, সবই কেমন ঝর-ঝরে—বাঙ্গালা উপন্যাসের বিপরীত। মাঝে মাঝে প্রায়ই ভাবি—বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতর এতটা অনাবশ্যক ঘ্যানঘ্যানানি কোথা হ'তে আসিয়া জুটিল, স্ফূর্ত্তি বলিয়া একটা জিনিস যেন নাই। পূর্ব্বে এতটা ছিল না—রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় এর মূল কারণ। Knut Norby, তার স্ত্রী ও পরিবারের চিত্রগুলি কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! Wangerএর চিত্রটী অতি স্বাভাবিক, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মধুর—তার স্ত্রী Frau Wanger। বড়ই দুঃখের উদ্রেক করে—এই মূর্ত্তিটী! Hall Caine বলিয়াছেন, যতদিন স্মৃতি জীবিত থাকিবে, ততদিন একে ভুলা দুষ্কর; সত্যই।

অনেক দিন এমন উপন্যাস পড়া হয় নাই। কিন্তু শেষ একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। Hall Caine বোধ হয় বইটাকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি ইহার Moral বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। Moral কিছু নাই—ইহা যে Realistic novel। ইংরাজ-পাঠক এখনো মামুলি নিয়মে উপন্যাসের ভিতর moral খুঁজিয়া বেড়ায়।

১৬.২.২০।—আজ ফাল্গুনের চারি তারিখ, কিন্তু কয়েক দিন বৃষ্টি হওয়াতে খুব শীত। এখন চারিদিক মেঘ করিয়া আছে, বোধ হয় শীগ্‌গিরই বৃষ্টি নামিবে। তাও শীত ফুরাইয়া আসিতেছে, কোকিলের ডাক শুনা যাইতেছে, চারিদিক হ'তে পাখী আসিয়া দেখা দিতেছে। আমার পাঠ-গৃহের পাশের গেঁদা-গাছের ফুলগুলি সব শুকাইয়া উঠিতেছে। আর ক'দিন? মৃত্যুর ডাক পড়িয়াছে—মাস-কয়েকের জন্য ফোটা, মাস-কয়েক লোকচিত্ত আকর্ষণ করিয়া চিরকালের জন্য এরা মাটীতে মিশিয়া যাইতেছে! সবই জগতের এমন! গাছ, পাখী, মানুষ সকলের একই

কাহিনী। Appeared—Disappeared, দর্শন—অদর্শন; এমিয়েলের কথায় সকলেরই এই জীবন-ইতিহাস। আমার পরমারাধ্য দেবচরিত্র বাবা! স্নেহ-পরায়ণ মেঝদাদা, বাল্যবন্ধু হেমচন্দ্র, প্রাণপ্রিয়া···সবাই এমনিভাবে দেখা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন! আর কি কখনো তাঁদের সঙ্গে এ জীবনে বা এর পরে কখনো দেখা হইবে? তাঁদের সে দেহ আগুনে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে! কেমন করিয়া দেখিব আর তাঁদের সে সব মূর্ত্তি? তাঁদের আত্মা! তাই কি আছে? কই, এ পর্য্যন্ত আত্মা-মূর্ত্তিতেও তাঁরা কারো সঙ্গে দেখা দিলেন না। আমার দেহ অবসানের পরেই কি আসিয়া আমার প্রেতাত্মার সঙ্গে দেখা দিবেন? এও কি সম্ভব? কি আশায়, কোন্ উদ্দেশ্যে, কি অবস্থায় তাঁরা এখন আছেন? আছেন কি? ভ্রান্ত কল্পনা! আশার ছলনা! আলো নিবিয়া গিয়াছে জন্মের মত—আর জ্বলিবে না। কোথায় অবিনশ্বর আত্মা? ভ্রান্ত মানুষ!

ভাবিতেছি, কেমন করিয়া অল্পেতেই অবিনশ্বরত্বের ভাবটী আমার প্রাণকে অধিকার করিয়া বসে। এ রাক্ষসের কবল হ'তে উদ্ধার পাইবার আমার উপায় নাই, আমাকে ধীরে ধীরে ইহা উদরস্থ করিতেছে—করুক্।

* * * *

মাস-কয়েক হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী মারা গিয়াছেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ—ইঁহারা চারিজন ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল খুঁটী। শেষ খুঁটী, যার জোরে ক্রম-পতনশীল ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ দালান এতদিন কোন প্রকারে সম্মান বজায় রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তারও অন্তর্ধান হইল। আর ক'দিন এ ধর্ম্ম নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব individuality বজায় রাখিতে পারিবে? প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম যে ইহার মূল-ভাব সকল গ্রহণ করিয়া—ইহার পৃথক্ অস্তিত্বের কারণের অভাব প্রমাণ করিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মূলতঃ একটী খিচুরী ধর্ম্ম। এতে উপনিষদের অবিনশ্বর আত্মা

আছে, আবার জন্মান্তর-বাদ নাই; সে বিষয়ে ইহা খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুগামী। ইহার উপাসনা-পদ্ধতিও কতক খ্রীষ্টানদের, কতক প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের পথানুযায়ী; মৎস্য মাংস বর্জ্জন পদ্ধতি বৈষ্ণবমত সম্বলিত। মোট কথা—না রামমোহন, না দেবেন্দ্রনাথ, না কেশবচন্দ্র—কেহই তেমন ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন না; যে যার ইচ্ছানুসারে পরের অনুকরণ করিয়া কতকগুলি মনগড়া মত ও নিয়মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যেন কোন Debating Societyর rules রচনা করা। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থাদি এই প্রকার নানামতের সমন্বয়। আত্মা ও ভগবান তো বিজ্ঞানের ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ প্রায়। তা'ও হিন্দুধর্ম্মের পুতুল পূজা কিছু বুঝি, কারণ তা'তে সম্মুখে কোন একটা মূর্ত্তিকে মধ্যস্থ রাখিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি করা হয়। সবই অবশ্য অর্থশূন্য। কিন্তু নিরাকার ভগবান! সে আবার কেমন? তাঁর উদ্দেশে কাকুতি-মিনতিপূর্ণ প্রার্থনাই বা কি? নিরাকারকে কি-প্রকারে কিরূপে কল্পনা করা যায়? ব্রাহ্মেরাই বোঝেন —আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য।

কলেজের দিনে শিবনাথের কত বক্তৃতা শুনিয়াছি, কত ভগবানের কথা বলিতেন—যেন তাঁর সঙ্গে কত দেখা-সাক্ষাৎ! তাঁর 'আত্মজীবনচরিত'— ঠান্‌দিদির গল্পের বই—তার মধ্যেই বা ভগবানের দয়ার কত ব্যাখ্যা! কিন্তু কৈ শেষটায় যে তাঁকেও অন্য দশজনেরই মত মরিতে হইল! কি লাভ হইল এমন সারাজীবন ভগবান্ ভগবান্ করিয়া কাঁদাকাটি করিয়া? সব ভ্রান্তের দল। Tragedy এর মধ্যে এই, নিজে কিছু না পাইয়া ও না বুঝিয়াও পরকে এ-পথে আনিয়া তারও সর্ব্বনাশ-সাধন। সর্ব্বনাশ বৈ কি? অ-কাজে শক্তি নষ্ট—সর্ব্বনাশ আর কাকে বলে? সেই তারা···দাদার চিনি খাওয়ার কথাই মনে হইতেছে; চিনির স্বাদ কেউ পায় না, কেবল পরের কাছে বাহাদুরী লইয়া বলিয়া বেড়ানো।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক আঁধার করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। বাল্যকালের গ্রামের বাড়ী-ঘরের কথা মনে হইতেছে। কত ছোট ছিলাম, বড় হইয়াছি, বুড়ো হ'তে চলিয়াছি— আর ক'দিন? ক'দিন?

২২·২·২০।—Balzacএর Country Doctorএর প্রথম উল্লেখ দেখিয়াছিলাম—বন্ধুবর জ্ঞান···র 'গ্রহে···'র সমালোচনায়। তখন থেকেই পড়িবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ছিল; পড়া গেল। যেমন দেখিতেছি, এই বইখানা পূর্ব্বে পড়া থাকিলে, 'বি···' চরিত্রকে আরো ফুটাইয়া তোলা যাইত।

এ-পর্য্যন্ত Balzacএর তিনখানা বই পড়া গেল—Eugenie Grandet, Tragedy of a Genius ও Country Doctor। প্রত্যেকটীর প্রধান চরিত্রই এক একটী ভাবের Type বিশেষ—Grandet কৃপণের সেরা, Balthazar প্রতিভাবান্ লোকের চরম আদর্শ, এবং Benasis আদর্শ-চিকিৎসক। এই তিন জনের একজনকেও ভোলা যাইবে না। ক্রমে ক্রমে আমার Balzacএর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িতেছে।

Country Doctor গ্রাম্য-ডাক্তার Benasis প্রণয়ঘটিত কু-সু নানা ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া, জীবনের মধ্যভাগে Grenebole সহরের কিছু দূরে পাহাড়ের উপত্যকায় অধিষ্ঠিত লোকবিরল এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। সেখানকার দরিদ্র কুসংস্কারগ্রস্ত অধিবাসিদিগের আর্থিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতির চেষ্টায় তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয় এবং তাঁর চেষ্টায় স্থানটী কালে শস্যশালী ও ধন-জনে পূর্ণ হইয়া উঠে। প্রথম বয়সের প্রণয়িনীর গর্ভে তাঁর একটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। সংসার-বিতৃষ্ণ হইয়া

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, আমি দেশমাঝে এমন নাম রাখিয়া যাইব, এমন জয়যুক্ত নাম, যেন কেউ আমার সন্তানের উপর জন্ম-কলঙ্কের সামান্য কোনও দাগ রহিয়াছে, এ-কথা মনেও না আনিতে পারে। কিন্তু দুঃখ, ঐ সন্তানটীও বাঁচিল না। তখন তাঁর ইচ্ছা হইল, নিজ হাতে জীবনান্ত করা। ক্রমে ক্রমে Stoic Philosophyর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। Stoicদের উপদেশ,—তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। কেমন করিয়া এই স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, শিক্ষা কর। কর্ত্তব্যের ভিতর তোমার passions প্রবৃত্তিকে বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া, তাদের হাত হ'তে মুক্ত হও; তরওয়াল ও বিষের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখিয়া মানুষের অত্যাচার হ'তে মুক্ত হও; কি পর্য্যন্ত ভাগ্য-তাড়না সহ্য করিবে তার সীমা পূর্ব্ব হ'তে ঠিক করিয়া, তার প্রভাব হ'তে মুক্ত হও; সমস্ত কুসংস্কার হ'তে মুক্ত হও; মন-স্বাধীনতা লাভ কর এবং যে gross কদর্য্য সংস্কারবশে মানুষ জীবনকে ধরিয়া রাখিতে চায়, তাকে দমন করিয়া সমস্ত ভয়-বন্ধন হ'তে মুক্ত হও। এই Stoic দর্শনের সঙ্গে খ্রীষ্টানের প্রেমভাব সংযোজনা করিয়া পরহিতার্থে জীবন যাপন করাই Benasis ঠিক করিলেন।

তাঁর মনে হইতেছিল তখন, তাঁর Fellowmen দেশবাসিদের সাহায্যের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর সমস্ত-ধমনী-মুখে রক্তস্রোতে জীবন-শক্তি বাহির হইয়া আসিতেছিল, তাদের সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, তাঁর ভবিষ্যৎ destiny ভগবান অঙ্গুলি দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিলেন। এক সময় তিনি তাঁর সন্তানের মাকে ভালবাসিয়াছিলেন, কি মমতায় তাঁর মাতৃ-প্রাণ পূর্ণ ছিল, তার আভাস তিনি পাইয়াছিলেন। এখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, তেমন যত্ন ও তেমন ভালবাসা একটী গ্রামের সেবায় তিনি ব্যয় করিবেন, নিজেকে

তিনি Sister of charity দয়া-ভগ্নীতে পরিণত করিবেন এবং সে-স্থানের পীড়িত দরিদ্রের পীড়ার যাতনা ও দুঃখ-ক্ষতের উপশমে আপনাকে নিযুক্ত করিবেন।

Benasis বলিতেছেন, আমি নীরবতা ও submissionএর পথ গ্রহণ করিয়াছি। The Fuge, late, tace, of the Carthusian brother—আমার জীবনের মূলমন্ত্র। সংসারের দিক হ'তে আমার মৃত্যু —কিন্তু এই গ্রামটার আমি প্রাণ, ইহার সেবাই আমার ভগবদুপাসনা। যে কাজে আমি হাত দিয়াছি এবং যা আমি ভালবাসি, ইহার সেবাতেই সব প্রকাশিত হইতেছে—সে কাজ, সুখ-আনন্দের বীজ বপন করা, যা আমার নাই, অন্যকে তা দান করা। সংসারের বাইরে, এ-সকল চাষাদের ভিতর, এই এগার বছর চাষা-জীবন যাপন করিতে করিতে আমিও চাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছি—মুখের চেহারা তাদের মত বদ্‌লিয়া গিয়াছে, সর্ব্বক্ষণ সূর্য্যের প্রখর তেজের সংস্পর্শে আমার দেহ কেমন ধূসর-বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাদের পোষাক গ্রহণ করিয়াছি, ভাষা, চালচলন, সকল বিষয়ে তাদের অনায়াস-লভ্য easy-going negligence অমনোযাগীতা অনাসক্তি। পারিপার্শ্বিক কোনও বিষয়ের দিকে আমার আর দৃষ্টি নাই, এক চিন্তাই আমার প্রাণে সব সময় বিরাজ করিতেছে, একটী মাত্র লক্ষ্য। ইচ্ছায় আমি শেষ-মুহূর্ত্তকে ডাকিয়া আনিতে চাই না, কিন্তু কোন দিন যখন পীড়া আসিয়া আক্রমণ করিবে, তখন বিনা দুঃখ অনুতাপে আমি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিব।

Benasisএর মুখে তাঁর জীবন-কাহিনী শুনিতে শুনিতে Colonel Genastas আপনা হ'তে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন,—'আমি যখন পেন্‌সান্ নিব, তখন আমিও এমন কোন দূরাগম্য ক্ষুদ্র গ্রাম খুঁজিয়া নিব, তোমার

মত তার মেয়র হইয়া থাকিব এবং তোমার আদর্শ অনুসরণ করিব।'
কথাগুলি যেন আমারই প্রাণ-প্রতিধ্বনি।

এ-হেন Doctor Benasisএর অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে মৃত্যুসংবাদ যখন পাওয়া গেল, তখন সত্যিই আমার মনে হইতেছিল,—মুহূর্ত্তে সব আঁধার হইয়া গেল! কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই, এই মহাশোকের ভিতর দিয়া যে দাগ হৃদয়ে চিরকালের জন্য রাখিয়া গেলেন তিনি, তার কথা ভাবিয়া Balzacএর প্রতিভার পূজা না করিয়া পারিলাম না।

এ-পর্য্যন্ত আর একখানা মাত্র বই পড়িয়াছি, যাতে বর্ণিত একটী চরিত্রের কথা মনে হইতে, আমার চিত্তে এমনি ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। Les Miserableএর Good Bishopএর বিষয় যখনি আমার মনে পড়ে—সৌম্য প্রশান্ত প্রেমবীর, তখনি মুহূর্ত্তে আমিও যেন ক্ষণকালের জন্য হইলেও দেবভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। Doctor Benasisএর চরিত্র সত্য সত্যই আমার মনের এতদিনকার সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষাকে ঠিক কাজের খাদে বহিয়া যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। সত্যই দিল কি? আদর্শ চিকিৎসক!

মধুর গ্রন্থ—অতি মধুর ও মহৎ!

Benasis একস্থানে বলিয়াছেন, আমি ধন বা যশের প্রত্যাশী নই, কথনো প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতার আশা করি না।

কিন্তু কৃষকেরা যে-ভাবে কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি দেখাইয়াছিল—তা অবর্ণনীয়। তাঁর মৃত্যুর পরে, গ্রামের সকলে মিলিয়া তাঁর শবের উপর এক অত্যুচ্চ মাটীর স্তূপ রচনা করে এবং তৃণের দ্বারা এই কথা ক'টী তার উপর লিখিত হয়।

D. O. M.

Here lies

The Good Monsieur Benasis

The Father of as all

Pray for Him!

সত্যই, তাঁকে তারা পিতা বলিয়াই জ্ঞান করিত। কে তাঁর হিতার্থে প্রার্থনা না করিবে?

Benasis সম্বন্ধে La Fossense বলিয়াছিলেন, এমন লোকের মনে কে কষ্ট দিবে—যিনি ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি? আমি এখানকার অনেককে জানি, যারা মনে করে প্রাতে যদি তিনি তাদের ক্ষেতের কাছ দিয়া চলিয়া গিয়া থাকেন, তা হ'লে শস্য তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিবে।

২৯.২.২০।—বিনয় সরকারের 'বর্ত্তমান জগৎ' নামক বইতে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, ও ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব চিত্র আছে—তাতে সে-সকলকে বিশেষ বড় ব্যাপার বলিয়া মনে হইল না। জনকয়েক অধ্যাপকের বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে—যাঁরা নিজ নিজ গবেষণায় পূর্ণ-নিমগ্ন। এঁদের জীবনগুলি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু দেখা গেল ভারতীয়-সভ্যতা সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তবে দু একজন এমন পণ্ডিতও আছেন, যাঁদের গৃহ ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থরাজিতে পরিপূর্ণ—যেমন Vincent Smith, Pargiter। অধ্যাপক Geddesএর—যিনি নগর-নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধে নব্য-বিজ্ঞানের পত্তন করার চেষ্টায় ব্যাপৃত—গৃহের চিত্রটী চিত্তহারী। বইখানা খুব মন ঢেলে লেখা,—অতি সুন্দর সরস সৎভাবোদ্দীপক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। অধ্যাপক সরকার যদি যেখানে

যেখানে গিয়াছেন—আর না গিয়াছেনই বা তিনি কোথায়, এমন পরিব্রাজক আমাদের দেশে আর কই?—এবং ভবিষ্যতেও যাইবেন, এমনভাবে তাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় করিয়া দেন, তা হ'লে তাদের দৃষ্টি খুলিবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যও পরিপুষ্ট হইবে। এক'দিন বইখানা পাঠে বড় সুখে সময়টুকু কাটাইয়াছি। তবে দুঃখের বিষয়, সরকারের সঙ্কীর্ণদৃষ্টি,—প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার তিনি বড়ই পক্ষপাতী, অনেকটা বর্ত্তমানের বৈদান্তিক-স্বামীদের মত।

২৮.৩.২০।—কাল বিকাল হ'তে মেঘ করিয়া আছে। সন্ধ্যায় খুব ঝড় দেখা দিয়াছিল। তার পর সারাটী রাতই কখনো অল্প অল্প বৃষ্টি, কখনো জোরে বাতাস-বৃষ্টি হইয়াছে। আজ ভোরেও মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইয়াছে। আহারের পর কতকক্ষণ বিছানায় পড়িয়াছিলাম। এখনো বৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে দম্‌কা বাতাস দেখা দিতেছে। আকাশটা ম্লান, মেঘ সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া আছে, তাই কোন স্থানটাই খুব কালো নয়। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে, কেমন গম্ভীর!—সপ্‌সপ্‌ বৃষ্টি-বাতাসের শব্দ হইতেছে। বেশ ভাল লাগিতেছে, অথচ মনটা উদাসভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কেমন একটা অনিত্যতার, ব্যর্থতার ভাব মনের ভিতর কোথা হ'তে জাগিয়া উঠিতেছে। সুখ-সম্ভোগের পাশে পাশেই বিয়োগ-দুঃখ হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে—তাই সুখ এমন মধুর।

২৯.৩.২০।—খুব পড়া যাইতেছে। তিনখানা বই শেষ করা গেল—Meredithএর Egoist, Kropotkinএর Russian Literature—Ideals and Realities ও Bojerএর The Face of the World.

ইংরাজী সাহিত্যে Meredithএর খুব নাম, classicএর অন্তর্গত। অনেকের মতে Egoist তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস, কিন্তু পাঠে তেমন কিছুই রস পাইলাম না। ভাষাটা শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু খোসা ছাড়াইয়া মূল ভাবটীর সাক্ষাৎ পাইতে বিশেষ একটু কষ্ট পাইতে হয়। লেখার ভঙ্গী অনেকটা কার্লাইলের কথা মনে করাইয়া দেয়। Egoistএর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি?—এদের দৃষ্টি-প্রসার ছোট, টাকা-পয়সা পদমর্য্যাদা লইয়া বিভোর, spiritual আধ্যাত্মিক কোনও কিছুর দিকে চোখ নাই, একমাত্র নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতার দিক্ হ'তেই সংসারকে দেখিতে অভ্যস্ত, পরের দুঃখ কষ্টের চিন্তা নাই। সংসারে এমন লোকের সংখ্যাই বেশী,—ideas ভাবের যারা ধার ধারে না। যত রাজা মহারাজা, রায়বাহাদুর, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, উকীল, বাবু গয়রহ—অধিকাংশই এ দলের অন্তর্ভুক্ত। Sir Willoughby নামে যে চরিত্রটী আঁকা হইয়াছে—ইনি এই শ্রেণীরই অন্তর্গত।

* * * *

Kropotkinএর বইখানার প্রশংসা শেষ করিয়া উঠা যায় না।

Mazzini লিখিয়াছিলেন, অনেকের বিশ্বাস French Revolution—Liberty, Fraternity ও Equality সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল; তা নয়, আসল কথা, ফরাসী-সমাজে যে সকল ভাব ক্রমে ক্রমে পুষ্টিসাধন করিতেছিল ও ধূমায়মান অবস্থায় ছিল, তাদের পরিণতি এই Revolution; তার অবসানের পর হ'তেই সে সমাজের পতন অবস্থা। Lamartineএর মতেও Robespiereএর মৃত্যুর সঙ্গে Race of Giants বীরবংশের শেষ এবং Race of Pigmies বামনদের আবির্ভাব; এমন কি, তাঁর মতে নেপোলিয়ানও বুঝি এ-শ্রেণীর

অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ভিতর ভাব কোথায়, তিনি তো French Revolutionএর হন্তা। ইহার পরেও ফ্রান্সে সমাজ-সম্বন্ধে কতক ভাব প্রচারিত হইয়াছে—কিন্তু এখন আর তাকে ইয়ুরোপের ভাব-কেন্দ্র বলা যায় না। আর সাম্য মৈত্রী প্রভৃতি ও-সব বোল্‌চালের মূল্যই বা কি, পূর্ব্বাপরই তো একই ভাবে পরদেশ জয় করিয়া লুণ্ঠন করিয়া ফরাসীরা নিজ-দেশের ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। ইয়ুরোপের ভাব-কেন্দ্র এক্ষণ অর্দ্ধ-সভ্য অর্দ্ধ-অসভ্য রুশিয়াতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ভাল হোক্, মন্দ হোক্, এ যুগ রুশিয়ার যুগ নামে অভিহিত হইবে।

রুশিয়ার গত একশ' বছরের ইতিহাস—ভাবের ideasএর সঙ্গে অত্যাচারের সংঘর্ষ ; ফলে, অত্যাচার অবশেষে পরাভূত হইয়া অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। রুশিয়ার সাহিত্যের ইতিহাস—এই ভাব-ক্রীড়ার ইতিহাস। রুশিয়ার সাহিত্য অল্প কয়েকদিনের সৃষ্টি, কিন্তু এর ভিতরই ইহার প্রভাব জগতে সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। গগল, গন্‌চারফ, পুস্‌কিন, টুর্গেনিভ, টলষ্টয়, ডষ্টয়ফেস্কি, চেকভ, গোর্কি, বছর বছর রুশিয়াতে এঁদের লিখিত গ্রন্থ লক্ষ লক্ষ বিক্রী হয়—ইয়ুরোপ আমেরিকাতেও এদের প্রচার দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এমন popularity জন-প্রিয়তার মূল কারণ কি ?

প্রধানতঃ, উপন্যাসের মধ্য দিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে রুশিয়ার বিশেষত্ব প্রকাশিত হইতেছে। যুগযুগান্তর হ'তে রুশ-জাতি জার ও তাঁর আত্মীয়দের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া আসিতেছিল। রুশিয়ার সাহিত্য—অত্যাচারিত, পদদলিত দুর্ব্বলের নিস্ফল ক্রন্দন, রুদ্ধ-রোষ, প্রতিহিংসা, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইতিহাস। ইয়ুরোপের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সম্মিলন হেতু সময় সময় যে সব সাম্য-স্বাধীনতার ভাব সে-জাতির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তা বাইরে প্রকাশ পাইবার কোনও সুযোগ পায় নাই। সভাসমিতি পার্লিয়াম্যাণ্ট, যার ভিতর দিয়া লোকে মনের ক্ষোভ রোষ

প্রকাশ করিয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হ'তে পারে, এমন কিছুরই ব্যবস্থা ছিল না, সবই ছিল রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যে শক্তি জড় হইতেছিল, তাকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত করিয়া নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া কারো সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তাই শত শত বছরের পুঞ্জীভূত দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া যেন রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশে যে সকল বিষয়, সংবাদপত্র ও Blue Booksএ লিপিবদ্ধ ও আলোচিত হইয়া থাকে—এখানে তা' সাহিত্যেব ভিতর দিয়া ললিতকলার কলেবরে প্রচারিত হইয়াছে। এমন সব মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আর কোনও সাহিত্য এমনভাবে ব্রতসাধনে অগ্রসর হয় নাই।

রুশিয়ার লেখক ও পাঠক উভয়েই জানে, প্রাণের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যতদিন আপনাকে মিশাইয়া না দেওয়া যায়, ততদিন সুখ নাই—এই প্রকার চেষ্টাতেই মানবাত্মার পূর্ণানন্দ। রাজনৈতিক বা সামাজিক যে কোনও প্রশ্নই সমাজকে আলোড়িত করিয়াছে, রুশিয়ার সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক লেখকই একাধারে Idealist ও Realist, আদর্শ অনুসরণ করিতে যাইয়া অনেককেই কারাগারে বা সাইবেরিয়াতে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে। Art for Art's sake—এ-সব কথার এ-সাহিত্যে বিশেষ কোনও স্থান নাই। Artএর ভিতর দিয়া প্রাণ-আকাঙ্ক্ষা বিবৃত করা, তার সাহায্যে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হওয়া, সমাজের স্বদেশের কাজে তাকে লাগানো—ইহাই তার উদ্দেশ্য। প্রত্যেকে Realistও বটে। যা' লিখিয়াছেন, তার সঙ্গে অনেকেই বিশেষভাবে পরিচিত। Dostoiffesky বা Gorky এমন কতজন কত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়া, কারাগারের অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিয়া—সার সত্যের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁদের গ্রন্থ তাঁদেরই নিজ-জীবনের—অত্যাচারের

আঘাতে প্রপীড়িত—কাহিনী। জগতের যে কোন স্থানে কোন অবস্থায় অত্যাচারীর হস্তে লোক প্রপীড়িত হইতেছে বা হইবে—তারাই এ-সাহিত্যের দিকে চাহিয়া নিজ নিজ জীবনের দুঃখচিত্র ও আকাঙ্ক্ষা-সংশয়ের বিবৃতি দর্শনে প্রাণের অশান্তি নির্ব্বাণে কথঞ্চিৎ সক্ষম হইবে। শুধু উপন্যাসক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব অদ্ভুত।

বইখানা শুধু সাহিত্যের ইতিহাস নয়, পড়িতে পড়িতে চিত্ত নানা মহৎ-ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে।

১৮.৪.২০।—ছেলেদের কোনও খারাপ কাজের জন্য মন্দ বলিতে যাইয়া, মাঝে মাছে আমি থামিয়া যাই। Weismanএর Theory যদি ঠিকই হয়, তা' হ'লে Germ Plasm পূর্ব্বাপর অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে, পিতা হ'তে পুত্র এবং পুত্র হ'তে তার সন্তানে, এ-ভাবে স্থানান্তরিত হইয়াছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উক্তিই মনে হইতেছে,

জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।

* * *

পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।

* * *

হে চির-পুরাণো চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া;
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

বাইরের শিক্ষায়, চরিত্রোন্নতি মূলতঃ হয় অত্যল্পই। ছেলে যে মিথ্যা বলে, চুরি করে, অল্পেতেই রমণী-আসক্ত হয়—তার জন্য সে নিজে যতটা দায়ী নয়, যত তার পিতা-মাতা, পূর্ব্বপুরুষ। Ibsenএর Ghostsএর কথাই মনে পড়িতেছে। সকলেই দেহে পূর্ব্বপুরুষদের Ghosts প্রেতাত্মার দলকে লুক্কায়িতভাবে বহন করিয়া চলিয়াছে; লোক-ভয়, মান-লজ্জার ভাবের-নীচে তারা চাপা পড়িয়া থাকে,—সামান্য সুযোগ সুবিধা পাইলেই গজাইয়া উঠে। আমার জীবনেও তো কতভাবে কত চেষ্টা করিলাম—কিন্তু কৈ, খিট্‌খিটে মেজাজ তো কিছুতেই দমন করা গেল না, তেমনি ভয়, লাজুকতা—যৌবন-প্রারম্ভে যা ছিলাম, জীবনসায়াহ্নেও তাই।

এ-দিক হ'তে যখন ভাবি, তখন নিরাশ হ'তে হয়, আবার মনে সান্ত্বনাও আসে। আমার কোন্ দোষের জন্য আমি দায়ী—দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা? মোটের উপর ব্যাপারটা বোঝা কঠিন। যদি Environment পারিপার্শ্বিক, বাইরের শিক্ষার, কোনও মূল্যই না থাকে, Germ Plasmএর কোনও পরিবর্ত্তনই না হয়—তা হ'লে এত শিক্ষার জন্য চেষ্টারই বা দরকার কি? শুধু Germ Plasmএর পরিবর্ত্তন বা অপরিবর্ত্তনের উপরই কি মানুষের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে? শিক্ষার গুণে, বাইরের বেষ্টনীর উন্নতির সঙ্গে—মানুষের, জাতিরও তো উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু এও দেখিতে পাই নিজ সম্বন্ধে,—চেষ্টা করিয়া জোর করিয়া নিজেকে যেন উন্নতির মুখে ধরিয়া লইয়া চলিয়াছি, এমন সময় কোথায় কি হইল, উজান-জলের মাছের মত আবার যেখানে ছিলাম সেখানেই পিছাইয়া পড়িলাম। শিক্ষার গুণে Ghosts গুলি হয় তো ক্ষুণ্ণ অবস্থায় কিছুদিন এমনভাবে চাপা পড়িয়া থাকে কিন্তু মূলতঃ মানুষটীর উন্নতি হয় কি না, সন্দেহের বিষয়। মোট কথা—এই বিজ্ঞান-যুগে চরিত্রহীনতার জন্য কারো ঘাড়ে আর তেমন দোষ চাপানো যায় না।

২৬.৪.২০।—ক্রমে ক্রমে টুর্গেনিভের অনেকগুলি বই পড়িয়া ফেলিলাম। বাঙ্গালা উপন্যাসে শুধু প্রেম ও গৃহস্থালীর কথা—কত অল্পপরিসর তার দৃষ্টি। টুর্গেনিভের বইতেও প্রেম রহিয়াছে; তা'ই যে উপন্যাসের প্রাণ, কিন্তু তা ছাড়া আরও কত বিষয় বর্ণিত! যতই পড়িতেছি, ততই তাঁর লেখার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যাইতেছে। Plot বলিয়া একটা জিনিষ নাই বলিলেই চলে, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ বলিয়া যে একটা জিনিষের উপন্যাসক্ষেত্রে ইদানীং খুবই আদর, তাও তদ্রূপ—কিন্তু দু'চারি কথায় এমন দু'একটী চরিত্র ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে কিছুতেই আর তাদের ভোলা যায় না। Bazarovকে ভুলিতে পারা যাইবে কি? Rudin পড়িয়া শেষ করা গেল, তাকেও আর ভুলিতে পারিব মনে হয় না।

Rudin একটী নূতন ধরণের চরিত্র,—মন উচ্চ আদর্শে idlealএ পূর্ণ, কাজ অপেক্ষা কথায় বড়, এমন বর্ণনা করার ক্ষমতা যে লোকে তাকে Genius বলিয়া মনে করে—কিন্তু সংসারের কাজ-কর্ম্মে অকর্ম্মণ্য, নিস্ফল। তার কারণ, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্ব,—আদর্শকে ছোট করিয়া চলিতে নারাজ, তাই কারো সঙ্গেই বনিবনাও হয় না। Facts সত্যের সঙ্গেও পরিচয় নিতান্ত কম, জল্পনা-কল্পনাই বেশী। ভবিষ্যতের চিন্তা তার কম, নৈতিক চরিত্র যে খুব ভাল তা নয়, পরের টাকা যাচিত বা অযাচিতভাবে গ্রহণ করিতে নারাজ নয়, তবে নীচাশয়তা নাই। জীবনে তার শান্তি নাই, কি এক বৃশ্চিক আগাগোড়াই তার প্রাণ-মূলে হুল বিদ্ধ করিতেছে, তার তাড়নায় আজ এখানে কাল সেখানে, কখনো ভদ্রবেশে, কখনো ছিন্নবস্ত্রে, সারাটী জীবন সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই উৎসাহের অভাব নাই। অবশেষে প্যারিসের দুর্গপ্রাচীরের

সম্মুখে বিদ্রোহীদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যাইয়া তার প্রাণান্ত হইল।

তার বাল্যবন্ধু Zezhynov তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল, তুমি চিরকালই আমার নিকট enigma রহস্য-বিশেষ রহিয়া গেলে। তোমার এত ক্ষমতা, আদর্শ-অনুসরণে এমন অক্লান্ত চেষ্টা, অথচ এমন নিষ্ফলতা!

সামান্য স্থান বা কাজ Rudinএর চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তাই তার এমন পরিণাম। কোনটাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবার তার ক্ষমতা ছিল না। তাই তার এমন দুরবস্থা, কিন্তু এমন সব ভাবুকদের বিফলতার উপরেই ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগ রচিত হইয়া উঠে।

২৭·৬·২০।—Ibsenএর Doll's Houseই বোধ হয় তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা সুবিদিত গ্রন্থ। ক্ষুদ্র নাটিকা, কিন্তু এর ভিতর দিয়া এমন একটী সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, যে তাহাই ইহাকে অমর করিয়া রাখিবে। পড়িয়া যে খুবই আনন্দ পাইলাম এমন নয়। তবে, স্ত্রীলোকদের যে পুরুষেরা সর্ব্বত্রই Doll পুতুলের মত দেখে—সে ভাবটী বেশ ফুটানো হইয়াছে। পুতুলের ঘর, পুতুল-খেলাই—বর্ত্তমানে স্বামী-স্ত্রীর সংসার। যতদিন পর্য্যন্ত স্বামীর স্ত্রীতে বিশ্বাস, ততদিন তাকে সাজাইয়া গুছাইয়া সমাজে বাহির করিয়া নিজ মর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা, তাকে সুন্দরী সুশ্রী দেখিয়া নিজে আনন্দ উপভোগ করা; আর যেই তাতে কোনও প্রকার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি এক মুহূর্ত্তে এতদিনের বন্ধন, ভালবাসা, কোথায় উড়িয়া যায়! Doll's Houseএ Helmer এমন স্বামী,—সকল স্বামীর Type নমুনার-স্বামী সে। এই প্রকার ঘটনাচক্রে পড়িয়া তার স্ত্রী Nora আপনার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য গৃহত্যাগী হইয়া চলিয়া গেল, অর্থাৎ সে আর তার স্বামীর হাতের Doll পুতুল হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক হইল না। নাটক

হিসাবে, স্বাভাবিকতার দিক হ'তে এমনভাবে অকস্মাৎ স্বামী ও সন্তানদের ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াটা কেমন কেমন ঠেকে। তাও বলিতে হইবে, Ibsen এই ক্ষুদ্র বইখানার ভিতর দিয়া স্ত্রী-জীবনের দাসীত্বের ভাবটী যেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাতে অশেষ মঙ্গল হইবে। যারা রমণী-জীবনের সংস্কার ও উন্নতির প্রয়াসী, তাদের বইখানা পড়া উচিত। ভাবগুলি বেশ প্রস্ফুট, পরিষ্কার, প্রাণস্পর্শী এবং লেখা আগাগোড়া ঝর্‌ঝরে! বেশ বই।

১.৫.২০।—কান্নাকাটি শুনিলে অথবা মৃত্যু দেখিলেই—আমার কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয় ও খাঁচার ভিতরের পাখীটীর মত প্রাণটা কেমন ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। কি বিপদেই পড়া গিয়াছে! কেনই বা আমাকে সৃজন করা, কেনই বা ভালবাসা, সুখ-দুঃখের ভাবে ভরিয়া দেওয়া, কেনই বা জরা পীড়া মৃত্যু যাতনা? এই মৃত্যুর হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়ার তো কোনও উপায়ই নাই, অথচ সংসার-বাসের সমস্ত যাতনা আমাকে পোহাইতে হইবে। ভগবানকে ডাকিয়াও তো কোন লাভ দেখি না—মরিতে হইবেই, যাতনা পীড়া ভোগ করিতে হইবেই। আর ডাকিবই বা কেন তাঁকে? তিনিই নাকি আমার জন্মদাতা—আমার এত দুঃখ-যন্ত্রণার আদি কারণ। আমাকে কষ্ট দিয়া তাঁর কি সুখ? মায়া? এ কী দুর্ব্বুদ্ধি তাঁর? নিষ্কর্ম্মার যেন হাতে কোন কাজ নাই, তাই আমাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়া মজা দেখিতেছেন। কোন মতে চোখ বুজিয়া দিন ক'টা কাটিয়ে দেওয়া—কিসের সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ। দেশই বা কি, আত্মপরই বা কি, উন্নতি-অবনতিই বা কি, গ্রন্থ-চর্চ্চাই বা কি? যে অর্থবান্, ক্ষমতাশালী—তার দুটা দিন নাকি সুখে যাইবে, আমি না হয় কষ্টেই কাটাইব—কিন্তু তাকেও তো আমারই মত মরিতে হইবে—তেমনি পীড়া, তেমনি দুর্ভোগ। সংসারে দুটী জিনিষ মাত্র নিত্য

দেখিতেছি—Time and Space, কাল ও আকাশ। এ-দুটীর ভিতর হ'তে উত্থিত হইয়া, দিনকয়েক ডানা আছড়াইয়া, সকলকেই আবার এদের বুকে বিলীন হইতে হইবে—অনন্ত বিরাট মহাকাল মহাকাশ। সেদিনকার যুবকবৃন্দ, আজ বুড়া; এমন ভুবনমোহন মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের দাড়ি গোঁফ পাকিয়া প্রায় স্থবির অবস্থা আগত, সুপুরুষ জজ আশুতোষ চৌধুরীর কার্য্য হ'তে অবসরের সময় নিকটবর্ত্তী। গাছ, লতা, গরু, ভেড়া, মানুষ, যার দিকেই দৃষ্টি পড়িতেছে—ধীরে একই নিয়মে নিশ্চিত-গতিতে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে; দিনকয়েক, তার পর সবই মাটীতে মিশিয়া যাইবে,—Space ও Time তাদের কুক্ষীগত করিবে। শুধু কি মানুষের সম্বন্ধে 'আত্মা' বলিয়া বিশেষ অবিনশ্বর কিছু সৃষ্টি হইয়া এই মৃত্যুর রাজ্য হ'তে ভগবানের কোলে তাকে শেষটায় টানিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে? কি করিব, কিছুই যে ভাল লাগে না। আমার এ-অস্তিত্বের কি অর্থ, কি উদ্দেশ্য? চোখ বুজিয়া কাজে লাগিয়া থাকা, পিছনে বা সম্মুখের দিকে না চাওয়া এবং যখনি তলব হইবে, কোদাল মাটীতে রাখিয়া অম্লান-বদনে হাজির হইয়া চলিয়া যাওয়া—এ-ছাড়া উপায় নাই। প্রশ্ন করিও না; করিয়া উত্তর পাইবে না, উপরন্তু অনধিকার-চর্চ্চার জন্য মহা যাতনা ভোগ করিতে হইবে।

২.১.২১।—একটী মনের মতন সাহিত্য-সেবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেল—নরওয়ের ঔপন্যাসিক Knut Hunsman। Growth of the Soilএর লেখক—গত বছর Nobel Prize পাইয়াছেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান, প্রথম জীবনে চর্ম্মকারের এ্যাপ্রেন্টিস্ ছিলেন। শেষে আমেরিকায় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যান, কিন্তু সেখানে কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া, দেশে ফিরিতে বাধ্য হন। সে সময় তিনি Atheism সম্বন্ধে আন্দোলন

করিয়া বেড়াইতেন। অর্থাভাবে এক সময় মরিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণধারণের আকাঙ্ক্ষা শেষটায় বলবতী হওয়ায় সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। এ অবস্থায় Hunger নামক উপন্যাস লিখিয়া তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়েন। কিন্তু তিনি কখনো যশ মানের পক্ষপাতী নন। দেশবাসীরা যখন তার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক জন্মদিনে তাঁকে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিতে সচেষ্ট হইল, তখন তিনি লোকগঞ্জনার ভয়ে বনের ভিতর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। একাকী নির্জ্জন-বাসই তাঁর প্রিয়।

৩.১.২১।—Daily Newsএ একজন লিখিয়াছেন—(১) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে বাস করিবে (২) খুব খাটিবে (৩) যথেষ্ট ব্যায়াম করিবে (৪) উপযুক্তমত বিশ্রাম ও আনন্দ (৫) এবং বেশী না খাওয়া—ইহাই হইতেছে 'fit' উপযুক্ত হইয়া চলিবার পন্থা।

Fitness অর্থ—শরীরের প্রত্যেক অংশের efficient and harmonious working। যখন এ-অবস্থা হইবে, তখন তুমি নিজেকে প্রফুল্ল ও কার্য্যক্ষম বলিয়া বোধ করিবে এবং কাজে পরিশ্রম জ্ঞান হইবে না। সাধারণ খাদ্য, ক্ষুধা-উদ্রেককারী বোধ হইবে, ভাল ঘুম হইবে এবং ঘুম হ'তে উঠিয়া বেশ refreshed লাগিবে। মোটের উপর, বাঁচিয়া থাকা ভাল,—এ তোমার মনের ভাব হইবে। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা, এ-অবস্থায় জীবন কাটাইলে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়, কাজ বেশী হয় ও সুখী হওয়া যায়। আগাগোড়া এমনভাবে Fit হইয়া চলিবার চেষ্টা কর, হা-হুতাশ না করিয়া জীবনটাকে ভোগ কর।

১৩.১.২১।—কথা কহিতে যাইয়া মাঝে মাঝে আমি দাঁড়াইয়া থাকি;

ভাবি—আমি কে ? কি ? কেমন করিয়া কথা বাহির হইল ? কে, কিসে কথা বলিল ? এ-সবের কোনও উত্তরই পাইতেছি না। আমি কে, কি—কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না।

২০.১.২১।—আমাদের সমাজে সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সর্ব্বোচ্চ স্থান ; বিষয়-বৈরাগী,—পরের অহিত নয়, পর-হিতই যার কাম্য। পরহিংসা, পরদেশ জয়, পরকে পদানত করিয়া পরের মুখ-গ্রাস কাড়িয়া আনিয়া নিজে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকা—আমাদের ধর্ম্মে এ-সব নীতির আদরও নাই—স্থান নাই। এমন কি, স্বদেশী পরদেশী বলিয়া কোনও কথা আমাদের ভিতর প্রচলিত নাই ; যে দেশহিতৈষণার গর্ব্বে অন্য সব দেশ মাতিয়া উঠে, তারও স্থান নাই। স্বদেশই বা কি, বিদেশই বা কি,—যে আসিবে, সকলেই সমান-ভাবে স্থান পাইবে। এই সন্ন্যাসীর ভাব, নির্ম্মুক্ততার ভাব, পর-অহিংসা non-violenceএর ভাব—আমাদের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িতেছে। হিংসা করিয়া নয়, জোর করিয়া নয়, মারামারি কাটাকাটি করিয়া নয়—শুধু দেশকে ভালবাসিয়া, তার জন্য মান-সম্ভ্রম পসার প্রতিপত্তি, অর্থ—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া দেশকে মুক্ত করিতে হইবে। জ্ঞানই ভারতের একমাত্র সম্বল, এই জ্ঞানরাজ্যে তার বিশেষত্ব স্থাপন করিয়া আবার সকলের অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে ; ভালবাসাই তার অস্ত্র। জ্ঞানী প্রেমিক সন্ন্যাসীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে কার ইচ্ছা হইবে ? হইলেই বা কতদিন এ-ভাব চলিবে ? জ্ঞানের কাছে যে সমস্ত জগৎ নতশির। জগতের ভিতর ভারতেই প্রথম এ-বাণী প্রচারিত হইল ; যদি এ চেষ্টা সফল হয়, তা হ'লে জগতের ইতিহাসে এক নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া যাইবে—যার বক্ষ আর মানব-রক্তের ফোঁটায় কলঙ্কিত হইবে না। জগতের এই নব যুগের শিক্ষায় ভারতই প্রধান গুরু।

২১.১.২১।—মাঘের প্রথম ভাগ, কিন্তু শীতের প্রকোপ নাই বলিলেই চলে। রৌদ্রও বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে, গ্রামের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সরু পথ—দুদিকেই জঙ্গল, ভয়-ভয় করে, বড়ই নির্জ্জন। এ-দেশে ম্যালেরিয়ার দরুণ লোকসংখ্যা সর্ব্বত্রই কম, বনজঙ্গলও অধিক। সব গাছগুলি যেন শীতের শুষ্কতা অনুভব করিতেছে—ঝলসিয়া উঠিয়াছে। পোয়া গাছে কচি কচি পাতা দেখা দিবার উপক্রম করিতেছে। মাঝে মাঝে সজিনা-গাছে ফুল দেখা যাইতেছে, পথের ধারে আরও দুএকটী গাছে ফুল দেখিলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, পাখীর ডাক বড় শোনা গেল না। চারিদিকে রৌদ্র হাসিতেছিল, কিন্তু দৃশ্যটী আমার প্রাণের ভিতর কোনও স্পন্দন উঠাইল না।

এখানকার আম-বাগান ও সেগুন-বন বড়ই দেখিতে ভাল। তলাটা পরিষ্কার, মাথার উপর সারি সারি গাছের ডাল-পাতা, বেশ স্নিগ্ধ ছায়া। যখনই দেখি, পূর্ব্বকালের তপোবনের কথা আমার মনে হয়। সে-দিন বুদ্ধদেবের "মহা-পরিনির্ব্বাণ" কাহিনী পড়িতেছিলাম। তাঁর সম্পর্কে প্রায়ই আম-বাগান, বেনু-বনের সঙ্গে পরিচয় হয়—এ-সব স্থলেই শিষ্য-পরিবৃত হইয়া তিনি বাস করিতেন ও লোকশিক্ষা দিতেন; সে-দিন সহরের প্রান্তবর্ত্তী এমনি একটী আম-বাগানের পাশ দিয়া আমি যাইতে-ছিলাম, চারিদিক প্রফুল্ল বোধ হইতেছিল—কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের কথাই আমার মনে পড়িয়া গেল। তখন আপনা হ'তেই আমার হাত দুখানি তাঁর উদ্দেশে মাথায় উত্থিত হইল। কত যুগ হইল, তাঁর অন্তর্ধান হইয়াছে, কিন্তু এখনো এত ব্যবধানের মধ্য দিয়াও তাঁর সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি, তাঁর আদর্শ-জীবন, অমৃতবাণী—প্রাণে কেমন শান্তি আনিয়া দেয়! সে-মুহূর্ত্তটী আমার বড়ই সুখের ভিতর কাটিয়া গেল। এ-সব সময়ই আমার

জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত, যখন দেবত্বের রসাস্বাদন করিয়া দেহ-মন আমার ধন্য হইয়া যায়।

* * * *

আজ প্রাতে বাসার কাছ দিয়া, একদল লোক হরি-সঙ্কীর্ত্তন গাহিয়া যাইতেছিল। গানের একটী পদই আমার কানে পৌঁছিতেছিল,—'হরির নামে, গৌরাঙ্গ নাচেরে।' লোকগুলি গাহিতেছিল ও আনন্দে নচিতে-ছিল,—আমি চাহিয়া রহিলাম।

গৌরাঙ্গ এমন কি দিয়া গিয়াছেন, যা বাঙ্গালী কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মত, এমন মাধুর্য্য, ভালবাসার ভিতর দিয়া ভগবানকে লাভ করিবার জন্য আর কোন্ ধর্ম্মে চেষ্টা হইয়াছে? প্রেম সে ধর্ম্মের প্রাণ, আর শুধু প্রেম নয়,—সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য-প্রেমে মিলিয়া 'অপারা' রাধিকার সৃষ্টি। সুন্দর-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যেন আরও চিরমধুর হইয়া উঠিয়াছে; রাধিকারই রূপান্তর গৌরাঙ্গ। চিরারাধ্যকে গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তিরূপে লাভ করিয়া তাঁর স্পর্শে 'পদাবলী-সাহিত্য' নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়াছিলেন, সকলকেও মাতাইয়াছিলেন। এমন ভাবে যারা প্রাণ-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নিজেকে নিঃশেষ বিলাইয়া দিতে পারে, তারাই শেষটায় পায়; এমন সব-ভোলা লোকগুলির পিছনেই জগৎ চিরকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 'পদাবলী-সাহিত্যের' মাধুর্য্য আমাকেও দিন দিন কেমন আকর্ষণ করিতেছে—মনে হয়, যদি কিছু সার থাকে, তবে সুন্দরী রাধিকার আত্মহারা প্রেমের ভিতরই আছে। কেমন চিত্তহারিণী তার বিরহ-ব্যাকুলতা! কাকে চাহিতেছে আমার আত্মা? কে আমার প্রাণাস্পদ? আমার কৃষ্ণচন্দ্র কে? জগতের মধ্য-কেন্দ্র হতে কেও কি আমায় আকর্ষণ করিতেছে? যতই দিন যাইতেছে, ততই আমার প্রাণ

অন্তরমুখী শান্তিপ্রয়াসী হইতেছে, বাহির হ'তে ভিতরের দিকে প্রবেশ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের শিক্ষা, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শিক্ষা—হিংসা, দ্বেষ, মান, সম্ভ্রম, অর্থ প্রতিপত্তির সঙ্গে যাদের সংস্রব নাই,—আনন্দপ্রদ হইয়া উঠিতেছে। জানি না কোথায় এর শেষ? কিন্তু এও যে দেখিতেছি—জীবনের মধ্য-বিন্দুতে কাকেও যে বসাইতে পারিতেছি না।

২২.১.২১।—রবীন্দ্রনাথের বীণায় অনেক তার, অনেক সুর, সবই মিষ্টি, 'নিতুই নূতনের' তা'র সীমা নাই। বৈষ্ণব-কবিদের সম্বল—একটী-মাত্র তার, ও মাত্র একটী সুর। চণ্ডীদাসের হাতে এ সুর মিহি কন্‌কনে, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, আকুল করিয়া তোলে প্রাণ'। রাজকবি বিদ্যাপতি ইহা হ'তে যে সুর জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তা একাধারে উদার, বিপুল, মধুর—রাজনন্দিনী রাধিকার বিপুল বিরহব্যথায় পরিপূর্ণ হইয়া চিরকালের জন্য প্রাণস্প্রশা হইয়া আছে। সৌন্দর্য্য, প্রেম—দুটীতে এক মাধুর্য্য সাগরের মোহানায় আসিয়া মিশিয়াছে, যাতে স্নান করিয়া লোকে ধন্য হইয়া যাইতেছে—প্রেম ধর্ম্মে পরিনত হইয়াছে, প্রেমই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম প্রেম। যে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণের ভিতর অহরহঃ জাগিয়া রহিয়াছে, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশিয়া 'পদাবলী-সাহিত্যে' রাধিকা মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—'লাখ লাখ যুগ হিয়া-পরে রাখিলেও, হিয়া জুড়াইবার নয়'।

কথা হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ কতদিন টিঁকিবেন? বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তো অমর হইয়া আছেন—শুধু একটী তারে তান দিয়া। ভারতীয়-সাহিত্যের একটী প্রধান ধারা 'বৈষ্ণব-পদাবলী'; ভারতীয় ধর্ম্ম-জগতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গৌরবময় স্থান—তার মধ্যমণি কৃষ্ণ-রাধিকার আত্ম-হারা প্রেম। যতদিন সে-ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিবে, কিম্বা তারও বুঝি পরে—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঁচিয়া থাকিবেন। এমন বিশ্ব-মোহিনী প্রেম-উন্মাদিনী রাইর সঙ্গে আর কোথায় দেখা হইবে?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাণ্ডারের সম্ভার তাঁদের অপেক্ষা আয়তনে কত বড়! তাকেই আমার মনে হয়, শ্রেষ্ঠ ভাষা, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, যার গায় নির্ম্মলতা পবিত্রতা মিশিয়া রহিয়াছে, যা পড়িতে পড়িতে প্রাণের গায়ে আপনা হ'তে অলক্ষিতে পবিত্রতা মাখিয়া ওঠে। যে সাধুর দর্শন-মাত্রেই প্রাণে শান্তি পবিত্রতার ভাব আসে না, সে আবার কিসের সাধু? যাঁর চিত্ত পবিত্রতার আধার, তাঁর সর্ব্বাঙ্গে তা মিশিয়া থাকিবেই। যে ভাষার, লেখার অঙ্গ হ'তে এরূপ ভাব ফুটিয়া ওঠে না, তা আমার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের এক একটী শব্দ, বাক্য কেমন সুন্দর, কেমন নির্ম্মল; স্পর্শে মুহূর্ত্তে প্রাণের সমস্ত ময়লা ধুইয়া কেমন পবিত্র ও সৌন্দর্য্যময় হইয়া ওঠে! রাধিকা নাই সত্য, কিন্তু তারই অনুরূপা জীবনের দেবতা-রূপে যে জীবন-সঙ্গিনীর বর্ণনা আছে, তার অনুরূপা কোথায়? তারই সঙ্গে, জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে চলিয়া আসিয়াছি। আজও সে কৌতুক-বেশে দেখা দিয়া যায়,

মাণিকের হার পরি এলোকেশে
নয়নের কোণে আধ হাসি হেসে
এসেছে হৃদয়-পুলিনে।

কোথায় সে? কে সে?

ওগো কোথা মোর আশার অতিত
ওগো কোথা তুমি পরশ চকিত!

সে যে আমার স্বপন-বিহারী; আমার সন্ধ্যার মেঘ, আমার শূন্য-গগন-বিহারী। তাকে চিনিয়াও চিনি না; আবার চিনি নাই বা কেমন করিয়া বলিব?

তোমায় জানি না চিনি না একথা বলত
কেমনে বলি?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও চলি!
জ্যোৎস্না-নিশীথে পূর্ণ শশীতে
দেখেছি তোমার ঘোম্‌টা খসিতে
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায় দেখিতে!
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছি আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ চকিতে!
রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়
তরু মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়,
কি মূরতি তব নীলাকাশ শায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি!

সর্ব্বত্রই সে—বাহিরে, ভিতরে; কিন্তু কৈ, সে হাতে ধরা দেয় কৈ? সে যে চির-সুদূর, তার দেখা পাইব কেমন করিয়া? সে যে দূর হতে ব্যাকুল-বাঁশরীতে ডাকিতেছে—কিন্তু কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার। তাও তাকে পাইবার জন্য প্রাণ কেমন উন্মনা হইয়া উঠে,

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী!
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তোমার
পরশ পাবার প্রয়াসী!

রুদ্ধ দুয়ারের কথা?

'সে কথা যে যাই পাশরি

আমার অন্তঃস্থলে কে আজীবন কাঁদিয়া মরিতেছে?

আমার মাঝারে যে আছে, কে গো সে
কোন বিরহিণী নারী?

জগতের ধন মান কিছুতেই তো সন্তুষ্ট তৃপ্ত নয় সে। 'অজানার' জন্যই সে আত্মহারা। কাকে চায় সে?

'অজানারা কবে আপনা করিব'
কহে বিরহিণী নারী।

কে আমায় আজীবন হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে, কে আমায় তার পিছনে পিছনে আজীবন লইয়া চলিয়াছে?

রাধিকারই ন্যায় চিত্তাকর্ষণীয়া আমার 'মানস-সুন্দরী,'—জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে যার আজীবন সন্ধান পাইতেছি ও

পাইতেওছি না। এরই পদতলে, আমার জীবনের সাধনা, বাসনা—আছড়াইয়া মরিতেছে। কার লেখার ভিতর দিয়া সকল সত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সত্য,—এই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জীবন আমার ধন্য হইয়া যাইবে? অমর রবীন্দ্রনাথ—আমার প্রাণের ব্যাকুলতা-ব্যথা-বিরহ-সঙ্কল্প-সন্দেহ-আশা দিয়া রচিত তাঁর লেখা। আর কার লেখার মধ্যে এমনভাবে 'আমাকে'—'আমি' দেখিতে পাইব? শুধু বর্ত্তমান যুগের নয়, সকল যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ।

২৪.১.২১।—এতদিন আকাশ ভরিয়া যে মেঘ জমা হইতেছিল, কাল তা ভাঙ্গিয়া দুপুর হ'তে সারাদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। শুষ্ক ধরণীর মাথা অনেকটা সিক্ত হইল। কাল বিকালের দিকে বেশ ভাল লাগিয়াছিল—আকাশটী স্নিগ্ধ গম্ভীর, ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, খুব শীত। এমন সময় মন আপনা হ'তেই ঘরমুখী হ'তে চায়, প্রিয়জনের কথা মনে জাগিয়া উঠে। রাত্রিতে বৃষ্টি একটু বাড়িয়াছিল, মাঝে মাঝে কপাট-জানালা নড়িয়া উঠিতেছিল—আমি বিনিদ্রনেত্রে বিছানায় পড়িয়া কত কি ভাবিতেছিলাম।

প্রাচ্য প্রতীচ্যের সভ্যতার কথাই মনে হইতেছিল। একটী বহির্মুখী—বাইরের জাঁকজমক প্রতিপত্তি লইয়া ব্যাপৃত; আর একটী অন্তর্মুখী—কেমন করিয়া প্রাণে পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ শান্তি আসিবে, তাই তার কাম্য; চিন্তা, নির্জ্জনতা নিঃসঙ্গতা তার প্রাণ। জীবন যে অনিত্য এবং ধন জন বিত্ত যে কিছু নয়—কে না জানে? কিন্তু বলদৃপ্ত উদ্দাম-উৎসাহপূর্ণ ইয়ুরোপ—এ-সব চিন্তা তাকে আলোড়িত করিবার সুযোগ পায় না। বাহির লইয়াই সে প্রধানতঃ ব্যস্ত; শক্তিও খুলিয়াছে, তার সে-ক্ষেত্রে কেমন! সর্ব্বাপেক্ষা যে বিরাট-প্রশ্ন ও বিরাট-সমস্যা আদিমকাল হ'তে মানুষের

চোখের কাছে দাঁড়াইয়া আছে—তার সাধনে তার তেমন যত্ন কৈ? এশিয়া সাহসে ভর করিয়া দৈত্যের কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে, মৃত্যুর হাত হ'তে উদ্ধার পাইবার জন্য—কত না চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অবশেষে হতাশের ভাবে দেহ-মন পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাও, এ সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া, যে সত্য শান্তির সন্ধান সে পাইয়াছে, প্রকৃত জীবনের সন্ধান পাইয়াছে—ইয়ুরোপ পায় নাই।

এশিয়াতে বহুশত পূর্ব্বে সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের প্রচার হইয়াছিল। দীন দুঃখী পতিত পাপী তাপী পশু পক্ষী সকলের প্রতি এক অপার করুণা ভালবাসায় ভরা বুদ্ধদেবের মহৎ বাণী। ফরাসী-দেশ হ'তেও সেই Liberty, Fraternity, Equalityর ভাব প্রচারিত হইয়াছিল—কিন্তু উভয়ের বাহির-প্রকাশে কত পার্থক্য! একটীর ফল,—প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের প্রেমের-বন্ধনে ন্যায়ের-শৃঙ্খলে ভাই-ভগ্নীস্বরূপে জগতের সমস্ত নর-নারীর মিলন-সাধন-চেষ্টা; আর একটীর,—ভয়াবহ রক্তমাখা নরমেধ যজ্ঞ। ইয়ুরোপ সেই ক্ষুদ্রতার পন্থাই অনুসরণ করিতেছে; তারাই আজ জগৎজয়ী, এশিয়া তাদের কাছে পরাস্ত। আজ আর বুদ্ধদেবের, অশোকের ন্যায়-বাণী, প্রেম-বাণী, সাম্য-বাণী এশিয়ার ঘরে ঘরে প্রচারিত হয় না। কিন্তু ক'দিন? পাশ্চাত্য-সভ্যতার আদর্শ লীলাভূমি ফ্রান্স সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—এত সব কু-ভাবের সমাবেশ করিয়া দেহকে কতদিন সুস্থ জীবিত রাখা যায়? ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশেরও একই অবস্থা—জন্মসংখ্যা মৃত্যু-সংখ্যা অপেক্ষা দিনদিনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। এশিয়া যে-সকল গভীর সাত্ত্বিকভাবের আলোচনা করিয়াছিল, বাহ্যতঃ হীনবল হইলেও মূলতঃ মহাশক্তির আধার তা—সত্য, প্রেম, শ্রদ্ধা, ন্যায়, নিস্পৃহতা, ভালবাসা—তার ফলে সে এখনো অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তার প্রাচীন সভ্যতার সুদৃঢ় বিশাল প্রাচীরে ইয়ুরোপের হাল

সভ্যতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ আসিয়া লাগিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। ইয়ুরোপের রোম গ্রীস কত জাতির জীবনান্ত করিয়া নিজেরা শেষ হইয়াছে; বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় সভ্যতারও বুঝি দাহনক্রিয়ার শেষ ধূম উদ্গারণ হইতেছে। চারিদিকেই অশান্তি, যুদ্ধ, রক্তারক্তি! এত সব মারা-ধরা কাটাকাটির ভিতর হ'তে মাঝে মাঝে যে Federation of the world জগৎ-সম্মিলনের কথা শুনা যায়, কার্য্যে তা পরিণত করিতে হইলে, এশিয়ার দিকেই আবার মুখ ফিরাইতে হইবে—ইয়ুরোপের ভুয়া Socialism বা কোনও ismএই কিছু হইবে না।

১·২·২১।—কেন লেখা? পরের জন্য, না নিজ চিত্তবিনোদনের জন্য? পরের দিকে চাহিয়া লিখিতে গেলে, পরের নিকট হ'তে যশ-মান পাইবার উদ্দেশে লিখিতে গেলে—সেও চাকরীর মতই অনেকটা ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সে-লেখার মধ্যে স্বাধীন-স্বচ্ছন্দগতি থাকে না, দাস-মূর্ত্তির ছাপ লইয়াই তাকে বাহির হ'তে হয়, নিজস্ব কমই থাকে। দাস-জীবনের ন্যায়,—কোনও মাহাত্ম্য নাই, গৌরব নাই; দু'দিন—তার পরেই লোকে ভুলিয়া যায়।

লোক-শিক্ষার জন্য লেখা? সমাজের উন্নতির জন্য লেখা? একটীমাত্র প্রাণী, আজীবন যার সঙ্গে বসতি—তাকেই ভাল করিয়া চিনিলাম না, কোন্ পথ যে তার পক্ষে ঠিক্, কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, তাই তাকেই ঠিকমত চালাইতে পারিলাম না, পদে পদে কত ভুল-ভ্রান্তি—পরকে চালাইব কেমন করিয়া? লোক-উন্নতি একটা ভুয়া-স্বপ্ন। আমার লেখায় কার চিত্তোন্নতি হইবে, কে নূতন দিব্যালোকে জীবন-পথ উন্মেষিত দেখিবে? প্রকাণ্ড জগৎ, প্রকাণ্ড মানব-সমাজ—কত ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া কোথায় কোন্ পথে সে চলিয়াছে। উন্নতি, অবনতি—

পাহাড়ের উপরে উঠিতেছি, না ক্রমে নীচেই গড়াইয়া ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি—কে বলিবে? বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, সব ধর্ম্মপ্রচারক, জগতের উন্নতি না অবনতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, কে বলিবে? এখন দেখিতেছি, কত অ-সত্যই না তাঁরা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ও-সব কিছু নয়। যা লিখা, নিজেকে আনন্দ দিবার জন্য। অন্যে পাঠে আনন্দ পায়, প্রশংসা করে,—খুব ভাল; যদি তা না হয়, তাতেও ক্ষতি নাই। আমার প্রাণের ভিতরটী কেমন, কিসে তার সুখ, আনন্দ, দুঃখ—তাই আমি বাহিরে ভাষার কলেবরে চোখের সুমুখে ধরিয়া দেখিতে চাই; কি চায় সে, কি চায় না সে,—কিসে তার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, দেখিতে ইচ্ছা। আমার এ-দেহের অন্তঃস্থলে, সারাটী জীবন কে এমন অতৃপ্ত দুর্ব্বার আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া আছড়াইয়া মরিতেছে, তার সঙ্গে একবার মুখোমুখী দেখা হইবে কি? সাহিত্য-চর্চ্চার মধ্য দিয়া কি তার কাছে পৌঁছান যায় না? জ্ঞানদেবী তাঁর দিব্যালোক-উদ্ভাসিত পথে কি তার কাছে আমায় পৌঁছাইয়া দিবেন না? না, তিনিই শক্তিহীন? আমার নিজেকে বোঝা,—এই আমার কাম্য হোক্, নিজেকে লইয়াই বিভোর থাকিব আমি। নিজ-ভাবে, যে ভাবে চলিলে আমি প্রকৃত সুখ পাই,—সে ভাবেই আমি চলিব! কিন্তু যেরূপ সাহিত্য-সেবা এখন আমি করিতেছি, তাতে তো শান্তি অপেক্ষা অশান্তিরই উদ্গীরণ হইতেছে; তার বিষের জ্বালায় দেহ মন কত না সময়ে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। পর-নিন্দায় আমি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি, যশে উৎফুল্ল হই। কবে এই যশমান-জ্বর মুক্ত হইব? মনের সমস্ত শক্তি অন্তর্মুখী হইবে; আত্মানন্দই উপাস্য হইবে—সেই আমার সাধনার ধন; যশ মান অর্থ-চিন্তা আমার সাহিত্য-চর্চ্চার ক্ষেত্র হ'তে চিরকালের জন্য অপসারিত হোক্। লোকে চিনিবে না,—না চিনুক্। আমি যোগী,—সাধক; চেনা-অচেনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই।

১০-৩-২১।—পতিত জাতি,—দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণই অতীতের দিকে। বর্ত্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন;—ভবিষ্যৎ? শাস্ত্রমতে আমাদের সুখের যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে; সুমুখে কল্কি, ধরাপৃষ্ঠ হ'তে অন্তর্হিত হইবার বিলম্ব নাই। কার্য্যতঃও আর কোন্ জাতি এমন দ্রুতগতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে?

পক্ষান্তরে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি ইয়ুরোপ—চির-নবীন, চির-পরাক্রমশালী। সে-দেশবাসিদের ধর্ম্মে কর্ম্মে মৃত্যু-কথাটী নাই। সর্ব্বক্ষণ, এক জয়ের আশা, নবজীবনের ভাব লইয়া তারা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে দেশ প্রচারিত বিবর্ত্তন-বাদ মৃত্যুর ভাব প্রচার করে না, স্বর্ণ-যুগ তাদের সুমুখে।

ঊনবিংশ শতাব্দী, ইউরোপের মহাগৌরবের কাল। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কত শত সহস্র ছোট বড় আবিষ্কারের দ্বারা এই অত্যল্প কাল মধ্যে ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। পদার্থ-বিদ্যা, ভূবিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র, কোন্ দিকে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় নাই? সে স্রোতের যেন বিরাম নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ডারুইন কর্ত্তৃক যে বিবর্ত্তনবাদ বিবৃত হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিজ্ঞানই অল্পাধিক পরিমাণে তার ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। জ্ঞানরাজ্যে এমন ব্যাপক-ভাব এ-পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। এর ভাবগ্রহণ করিয়াই প্রাণীবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞান পরিপুষ্ট হইতেছে।

Eugenics—এই বিবর্ত্তন-বাদেরই পরোক্ষ ফল। ডারুইনের Survival of the Fittest শক্তিমানের উদ্বর্ত্তন, এই সিদ্ধান্ত এর মূলসূত্র।

Eugenics অর্থ well-born সুজাত। কালক্রমে এই সুজাত-ভাবের সঙ্গে well-bred সুপালিত, এ ভাবটীও জড়ীভূত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এর নামকরণ হইয়াছে সুপ্রজনন-বিজ্ঞান। কবিবর রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়াছেন—সৌজাত্য-বিদ্যা। বর্ত্তমানে যে সকল নূতন নূতন বিজ্ঞানের

আবির্ভাব হইয়াছে—তার মধ্যে এই সুপ্রজনন-বিজ্ঞানকে সর্ব্বকনিষ্ঠ লিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। এমন কি, এখন পর্য্যন্ত, অনেকে একে বিজ্ঞান-আখ্যা দান করিতেও ইচ্ছুক নহেন।

সুজাত ও সুগঠিতকায়, সুপালিত, মানসিক দৈহিক বলে শক্তিমান্ সন্তান সন্ততি দ্বারা যাতে বংশ ও জাতির পরিপুষ্ট ও উন্নতি সাধিত হয় এবং যে সকল প্রভাবের ফলে জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির উৎকর্ষ সম্পন্ন হয়, তার আলোচনা করা এর উদ্দেশ্য।

Eugenicsএর জন্মদাতা Sir Francis Galton। তিনি নৃতত্ত্ববিৎ Anthropologist ও ভ্রমণকারী। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে Hereditary Genius নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সুবিখ্যাত হইয়া পড়েন। তিনি এই গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, বংশানুক্রমের Heredityর ফলে, কোন বংশে ক্ষমতাশালী প্রতিভাপন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করে; কোনও বংশ Degenerates অপকৃষ্টের দলে পূর্ণ হইতেছে। তাঁর ইহাও প্রতিপাদ্য ছিল—শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক—ও স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্য-বংশ উন্নত হয়। যে সকল তত্ত্বের অনুশীলনের ফলে ভবিষ্য-বংশ ও জাতির উন্নতি সাধিত হয়, সে শাস্ত্রের তিনি নামকরণ করেন—Eugenics।

এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে, যখন লোকের সহিত লোকের, জাতির সহিত জাতির সংগ্রাম সংঘর্ষ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে—এমন শাস্ত্র, যার উদ্দেশ্য জাতিকে বলশালী শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা, তা যে সকল সভ্য-জাতিরই দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিবে, আশ্চর্য্য কি? তাই অত্যল্প কাল মধ্যেই শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইয়ুরোপের অন্যান্য স্থানে Eugenicsএর বিশেষ চর্চ্চা হইতেছে।

সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের মূলভিত্তি—বংশানুক্রম Science of Heredity। এই জন্য বংশানুক্রম-বিজ্ঞানের জন্মদাতা Johan Mendalএর সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মত Mendel's Law মেণ্ডেল-সূত্র বা Mendelism নামে বিজ্ঞান-জগতে পরিচিত। এই সূত্র অনুসারে বংশানুক্রম কতকগুলি নিয়মাধীন। "অনেক সময়ে আদি জনয়িতার দুটীতে দুটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত গুণ থাকিলে, দ্বিতীয় পুরুষের সন্ততিতে একটী জনয়িতার বিশেষ প্রকৃতিটি character প্রকাশিত হয়, অন্য জনয়িতার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত প্রকৃতিটি, দ্বিতীয় পুরুষের সন্তানে প্রকাশিত না হইয়া তা আবার তৃতীয় পুরুষে দৃষ্ট হয়। আদি-জনয়িতার যে গুণটী দ্বিতীয় পুরুষে দেখা যায়, তাকে মেণ্ডেল Dominant প্রবল নামে অভিহিত করিয়াছেন; আর যেটী যাপ্য অবস্থায় থাকে, তাকে Recessive নাম দিয়াছেন।" নিয়মগুলি অধিকাংশ জটিল।

এই প্রসঙ্গে প্রফেসার Wiesmanএর মত ও বিবেচ্য। তাঁর মতে পিতামাতা প্রত্যেক হ'তে বিচ্ছিন্ন দুটী জীবকোষ Germ-cellsএর সংমিশ্রণে সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পিতামাতার কতকগুলি গুণ-দোষ আছে, যা এই জীবকোষের ভিতর দিয়া সন্তানে পর্য্যবসিত হয়, কতকগুলি হয় না। তিনি প্রথমটীর নাম দিয়াছেন, Germinal characters জননকোষজ গুণ; দ্বিতীয়টীর নাম,Somatic characters দৈহিক গুণ। এই জননকোষে Germ plasmএর কিয়দংশ সন্তানের জন্ম ও পরিপুষ্টি সাধনে ব্যয়িত হয়, কিয়দংশ সন্তানের দেহে বর্ত্তমান থাকে। ভবিষ্যবংশ এই অংশ হ'তে উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ ধারাবাহিকরূপে একই জননকোষের সাহায্যে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে।

'পিতামাতার দেহ ভবিষ্য-বংশের জীবকোষের রক্ষক Trustee

Wiesmanএর মত অনুসরণ করিতে যাইয়া, অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন, মানুষের নিজ Individuality ব্যক্তিত্ব কিছুই নাই। জীবকোষ তাকে যেমনভাবে গঠিত করিয়াছে, সে ভাবেই তাকে বর্দ্ধিত হইতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য মতে, বাপ-মার শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষের উন্নতি সাধিত হয়, কালে ভবিষ্যবংশ সুসন্তানে শোভিত হইয়া থাকে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেমার্ক Lamarck এ-মতের পৃষ্ঠ-পোষক। কোন্ মতটী যে ঠিক তা এক্ষণেও নির্দ্ধারিত হয় নাই। দুটীর ভিতরই সত্য নিহিত রহিয়াছে, Eugenics মতাবলম্বীদের ইহাই ধারণা।

সুপ্রজনন-বিজ্ঞান মোটামুটী দুই অংশে বিভক্ত। জীবকোষ-দুটীর সম্মিলনে কি ভাবে কি প্রকার গুণ লইয়া সন্তানের উৎপত্তি হয়, প্রথম অংশের বিচার্য্য বিষয় তা'। বংশানুক্রম Science of Heredity এই অংশের মূল ভিত্তি। মাতৃগর্ভে স্থান পাওয়ার পর হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল প্রভাব influences সন্তানকে গঠিত, বর্দ্ধিত বা তার ক্ষয়-সাধন করে, তাকে তার জীবন-সম্বন্ধীয় Nurture পোষণ-ব্যাপার বলা যাইতে পারে। এ-সমস্তই Eugenicsএর দ্বিতীয় অংশের বিবেচনার বিষয়। মানুষ এক দিকে জন্মগত প্রভাব Heredityর, অন্যদিকে এই Nurture পারিপার্শ্বিকের অধীন। পিতামাতা হ'তে সে যতই কেন গুণ প্রাপ্ত না হইয়া থাকুক, পারিপার্শ্বিক ঠিক না হইলে, সমস্তই নষ্ট হইবে; এমন কি, বিশেষ খারাপ হইলে সমূলেই বিনাশ সম্ভাবনা। আবার Nurture পোষণ-পালন যতই কেন ভাল না হউক, জন্মগতই যদি দোষ থাকে, তা হ'লে মূর্খ কখনও পণ্ডিতে পরিণত হইবে না, বানর মানুষে পরিবর্দ্ধিত হইবে না।

এ-জন্যই সুপ্রজনন-মতে লোকে জন্মগত কোনও দোষ লইয়া যাতে

আবির্ভূত না হয়, তার প্রতি সর্ব্বাগ্রে সমাজের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্তান-জনন সে সকল নর-নারীরই কর্ত্তব্য, যারা বলশালী, নিরোগী। কিন্তু, এ-জন্য যারা জন্ম হ'তে পঙ্গু, দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত, তাদের ত্যাগ করিতে হইবে, অথবা স্পার্টানদের মত মারিয়া ফেলিতে হইবে—এমন শিক্ষাও সু-প্রজনন দেয় না। বিবাহিত বা অবিবাহিত পিতামাতার সন্তানই হউক, প্রত্যেক জীবনই পবিত্র সামগ্রী, সমাজের পক্ষে মহা মূল্যবান্। প্রত্যেকেই সমাজ হ'তে যতদূর সম্ভব ভালরূপে প্রতিপালিত হইবার অধিকারী। কোন্ বালক ভবিষ্যতে কিসে দাঁড়াইবে, বিজ্ঞান এখনো নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় নাই। নিউটন, ডেকার্ট উভয়েই বাল্যকালে নিতান্ত রুগ্ন ছিলেন এবং প্রতিভার কোনও পরিচয় দেন নাই। জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয়ই বা বাল্যকালে কে পাইয়াছিল? প্রতিভাসম্পন্ন নরনারীর সম্মিলনেই যে প্রতিভাবান লোকের আবির্ভাব হয়, এমনও নয়। রবার্ট ব্রাউনিং ও ব্যারেট্ ব্রাউনিং সুপ্রসিদ্ধ কবিদ্বয়ের পুত্রে কোনও প্রকার প্রতিভারই বিকাশ দেখা যায় নাই। প্রতিভার উৎপত্তি ও স্ফুরণ—এখনো অজ্ঞেয়।

সুসন্তানের কথা মনে হ'তেই, সর্ব্বাগ্রে সন্তানের মায়ের কথা মনে হয়। সন্তানসম্ভাবিতা জননীর স্বাস্থ্য ও জীবিকা সম্বন্ধে সমাজের বিশেষ-দৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। তাদের প্রতি যত্নের অভাবে, অনেক সন্তান বাল্যেই মারা যায়; যারা জীবিত থাকে, তাদের ভিতরও কত খঞ্জ, দুর্ব্বল, অন্ধ, পীড়াগ্রস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। Havelock Ellis এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য সব লোক—অন্ধ, মূক, বধির, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত, পাপাত্মা, মূর্খ, মৃগীরোগাক্রান্ত ইত্যাদি—যাদের দ্বারা সমাজের কোনও উপকার হয় না, তারা সমাজ হ'তে যে প্রকার আদর যত্ন পায়, সন্তান-সম্ভাবিতা মা তার কিয়দংশও পায় না। মক্ষিকাদের মধ্যে রাণী-মক্ষিকা অর্থাৎ যে ভবিষ্যবংশের জনয়িত্রী, তার সুখবর্দ্ধন ও জীবিকা-

রক্ষার জন্যই অন্যান্য মক্ষিকারা জীবনধারণ করে। সন্তানের জন্মদানের পরেই অপদার্থ অকর্ম্মণ্য জনককে মারিয়া ফেলা হয়। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে এই অপদার্থেরা, অকর্ম্মণ্যের দল Drones মহাসম্মানের ভিতর লালিত-পালিত হইয়া থাকে। সামান্য প্রাণীজগতের ভিতর যে বুদ্ধির বিকাশ দৃষ্ট হয়, বুদ্ধিমান মানুষের সমাজে তাও হয় না !

আন্দোলনের ফলে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দরিদ্র জননীর সন্তান-প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে তত্ত্বাবধানের জন্য নানাবিধ সমিতি সৃষ্ট হইতেছে। এ-দেশে অবশ্য নাই।

সন্তানের জন্মগ্রহণের পর, যাতে তার ভরণপোষণের জন্য যথাবিধি সুবিধা থাকে, তার প্রতি দৃষ্টি করা সমাজের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। বালকদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ইংল্যাণ্ডে সার টমাস্ বার্ণোর নেতৃত্বাধীনে Society for the Prevention of Infant Mortality and the Welfare of Children under School নামে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। যাতে বিদ্যালয়ে বালকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা হইয়া তাদের রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকারের চেষ্টা হয়, তজ্জন্যও নানাপ্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে যাতে আলো ও বায়ু প্রবেশের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে, তার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া যাইতেছে। সেনাপতি Baden Powel স্থাপিত Boy Scout Move mentএর বিষয় এক্ষণে অনেকে শুনিয়াছেন। বালকেরা বাল্যকাল হ'তে অনেকটা কঠোর সামরিক নিয়মাধীনের ভিতর শিক্ষিত হইয়া নানাবিধ সৎকাজে নিজ নিজকে নিযুক্ত করিয়া কালে যাতে চরিত্রসম্পন্ন কর্ত্তব্যজ্ঞানী নাগরিক citizenএ পরিণত হয়, ইহাই এই সমিতির লক্ষ্য। এর অনুকরণে, Girl Guide Movement নামে বালিকাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চরিত্রোন্নতির জন্য ইংল্যাণ্ডে আর একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

ক্রমে, বালক কৈশোরাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কালকে মানব-জীবনের প্রধান কাল বলা যাইতে পারে। এই সময় তার যে দিকে গতি দেখা যায়—ভবিষ্যতে সে সেই দিকেই চলে। সুশিক্ষা, সৎসঙ্গ, ক্রীড়া, ব্যায়াম, সৎ আদর্শ, সকলই এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সন্তানদের হাতে, এ-সময়ে কুগ্রন্থ-দান কুকার্য্য। এই কিশোর বয়সেই—বালকদের দুইভাগে বিভক্ত হ'তে দৃষ্ট হওয়া যায়; এক ভাগ, যাদের জীবন-সূত্র, কাজে লাগিয়া থাকা; আর একাংশ, যারা হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে ইচ্ছুক। প্রথম শ্রেণীর লোকই জগৎজয়ী; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক যে সমাজে অত্যধিক, তার জগতে স্থান নাই—যেমন আমাদের।

যৌবনে-পদার্পণের পূর্ব্বে বালক-বালিকাকে স্বাস্থ্য ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য নিয়ম ও গুণ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। জাতির, বংশের উন্নতি ও মঙ্গলের সঙ্গে যে তার নিজ মঙ্গল জড়িত—এ-জ্ঞান তার প্রাণে উদ্বোধিত করিতে হইবে। জাতির দিকে চাহিয়া, কালে যে তাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, ভবিষ্য-সদ্বংশের জনয়িতা হইতে হইবে, ইহাও তার জানা দরকার। কি অবস্থায় তার বিবাহ করা উচিত ও কি অবস্থায় নয়, তাও তাকে জানিতে দিতে হইবে। প্রত্যেকেরই জানা উচিত, জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা অমূল্য-ধন এবং জাতির, বংশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি—সন্তান-জননশক্তির অবনতি।

গত চল্লিশ বছর হ'তে ইংল্যাণ্ডের জন্মের হার কমিয়া আসিতেছে। বাঙ্গলা দেশের তো কথাই নাই। কিন্তু আমাদের অত্যধিক মৃত্যু ও জন্মহ্রাসের এবং ইউরোপের জন্মহ্রাসের কারণ বিভিন্ন। জন্মের হারের অল্পতাবশতঃ ফরাসীদেশ ধ্বংসের পথে বসিয়াছে বলিয়া সকলেই নির্দ্দেশ করিতেছে। ইয়ুরোপের অন্যান্য সভ্যদেশেও এই ব্যারাম দেখা দিয়াছে। কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া Saleeby বলিয়াছেন, জীবন-সংগ্রামের

কঠোরতা বশতঃ এক্ষণ অনেকে ইচ্ছা করিয়াই পিতৃত্বমাতৃত্বের দায় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। অনেকে দুটী বা একটীর অধিক সন্তানের পিতামাতা হ'তে অনভিলাষী। বর্ত্তমান শিক্ষার ফলেও রমণীর সন্তানজননক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। লোকের চরিত্রাবনতিও সন্তান-হ্রাসের অনেকটা কারণ।

কতকগুলি পীড়াকে Saleeby, Racial Poison জাতিধ্বংসকারী-বিষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ম্যালেরিয়াই সর্ব্বপ্রধান। যে দেশে এ-বিষের সঞ্চার হইয়াছে, তারই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, প্রাচীন এথেন্সের ধ্বংসের প্রধান কারণই এই ভয়াবহ পীড়ার আবির্ভাব। এ-দেশের যে ইহা কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তা কারও অজানা নাই। কেবল যে ইহা অকালে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার করে এমন নয়, যারা বাঁচিয়া থাকে, তাদেরও শক্তিহীন বীর্য্যহীন করিয়া অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখে।

ম্যালেরিয়ার পরেই উপদংশ প্রভৃতি পীড়ার স্থান। ভবিষ্য-বংশের উপর এদের ভয়াবহ প্রভাব। উন্মাদকতা, কুষ্ঠ, মৃগী, যক্ষ্মা—বংশধ্বংস-কারী ভীষণ কত ব্যাধির জনয়িতা এরা। যারা এ সকল বিষে আক্রান্ত, তাদের সন্তানের জনয়িতা হওয়া উচিত কি না, বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

Eugenics-এর দৃষ্টি সমাজের উন্নতির দিকে। যারা সবল, সুস্থ, তাদের বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হওয়া, এর চক্ষে মহা দোষের বিষয়, আর যারা তা নয়, তাদের বিবাহে ইহা মহা বিরোধী। স্বজাতি-প্রীতিই এই শাস্ত্রের মূল উৎস। দেহ মনে সমানভাবে সুস্থ সবল সন্তানে পূর্ণ হইয়া যাতে জাতি শক্তিশালী হইয়া উঠে, তা' সর্ব্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইবে, এ-জন্য প্রয়োজন হ'লে নির্ম্মম হইতে হইবে।

বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে, পিতামাতার দোষ যেমন তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমন তার গুণও দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক কার্ল পিয়ার্শন যে সকল বংশলতা সঙ্কলিত করিয়াছেন, তা' হ'তে দেখা যায় যে, এমন এক একটী বংশ আছে, যা পূর্ব্বাপর প্রতিভাসম্পন্ন কর্ত্তব্যজ্ঞানী উৎসাহী লোক দ্বারা শোভিত হইয়াছে, আর একটী আবার মদ্যপায়ী, কুচরিত্র, দুর্ব্বলচিত্ত লোকে পরিপূর্ণ। শেষোক্ত বংশের আদি জনক-জননী প্রায়ই মদ্যপায়ী বা কুচরিত্র নরনারী। প্রত্যেক বংশেরই বংশ-তালিকা রাখার প্রয়োজন। যাতে কোনও প্রকার Racial poison-গ্রস্তা বা কুচরিত্রা নারীর সংযোগে বংশাবনতি না ঘটে, তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। স্ত্রী-নির্ব্বাচনে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। বিবাহের পূর্ব্বে তার বংশে কোনও প্রকার Racial poisonএর অস্তিত্ব আছে কি না, তা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। যার তার সঙ্গে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া অবিবেচকের কার্য্য। সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ সুগঠিতকায় সুশিক্ষিত চরিত্রবান্ উদ্যমশীল যুবক,—সুন্দরী স্বাস্থ্যপূর্ণা শিক্ষিতা নারীর পাণিগ্রহণ করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। প্রেমের ভাবে একে অন্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ে মিলিতে হইবে। এমন পিতামাতার সন্তানই সুস্থ, বলশালী, উদ্যমশীল হইবে আশা করা যায়। নিজ নিজ বংশোন্নতির দিকে সকলের দিকে দৃষ্টি থাকিবে। জাতির ভবিষ্য-দিকে চাহিয়া সকলকে চলিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত সভ্যদেশেই দর্শন-শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছে, কিন্তু কি-উপায় অবলম্বনে জাতি মানসিক ও দৈহিক বলে শক্তিমান্ হইয়া উঠিতে সক্ষম হয়, তার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও অনুসন্ধান হয় নাই। ফরাসী জাতি পূর্ব্বে কতবার জার্ম্মেণিকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে; সেই বীরজাতি কেন আজ জীবন-সংগ্রামে জার্ম্মেণির পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; জাপান কি উপায়ে দুর্দ্ধর্ষ জাতিরূপে অকস্মাৎ

জগতের রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইল ; রোমের কেন ধ্বংস সাধিত হইল ; হিন্দু-জাতিই বা কেন চিরমৃত হইয়া আছে ; স্পেন ও হলেণ্ডবাসিরাই বা কেন জগতের প্রধান-জাতির সংজ্ঞা হ'তে অন্তর্হিত হইল, এ-সব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে, জাতির কি কারণে উন্নতি হয়, কি কারণেই বা অধঃপতন হয়, তার সম্যক্ আলোচনা এ-পর্য্যন্ত হয় নাই। সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের লক্ষ্য, সে অভাব পূরণ করা।

অনেকে জার্ম্মেণ দার্শনিক নিট্‌সেকে সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের জন্মদাতা-স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁর Superman অতিমানুষ-আদর্শ এই সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। পুষ্টিকর খাদ্য ও জীবন-যাপন সম্বন্ধে উন্নত প্রণালী অবলম্বনের ফলে, যাতে সমাজে দৃঢ়দেহ সাহসী কার্য্যদক্ষ দৃঢ়চিত্ত লোকের আবির্ভাব হয়, তাই তাঁর কাম্য ছিল। Beyond thyself shalt thou build তোমার ভবিষ্যবংশ যেন তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হয়, ইহাই তাঁহার প্রধান শিক্ষা ও মন্ত্র ছিল। প্রত্যেক নরনারীরই এই মহৎ দায়িত্বের ভাব সুমুখে রাখিয়া সংসারে প্রবেশ করা উচিত।

বর্ত্তমানে জগতের সমস্ত সভ্যজাতিই এক নূতন বিশ্ববিজয়ের আশা লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সুপ্রজনন-বিজ্ঞান—বলিষ্ঠদেহ, বলিষ্ঠমনা, সুঠাম, সুন্দর, নরনারী সৃষ্টিই যার লক্ষ্য—কালে মানবের ভবিষ্য-ধর্ম্মের একাঙ্গভুক্ত হইবে—ইহাই তার প্রচারকগণের বিশ্বাস। এক নূতন আশার বাণী লইয়া এই নূতন বিজ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছে।

সবশেষে মনে হইতেছে,—সর্ব্বত্রই Eugenicsএর চর্চ্চা হইতেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও কি এ-শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা হ'তে পারে না যদি সুপ্রজনন বিজ্ঞান-চর্চ্চার কোনও স্থানে প্রয়োজন থাকে, তবে এ দে ,—মৃত্যুর লীলাভূমিতে।

৩১.১০.২১।—দিনকয়েক ধরিয়া কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া-কাহিনী' পড়া গেল। বইখানা হ'তে শেষ-নবাবী-আমলের প্রাচীন বাঙ্গালা-সমাজের—যাকে লইয়াই আমরা এমন গর্ব্ব নিয়া থাকি—বেশ একটা idea পাওয়া যায়।

জাতিটা কি অবস্থাতেই না তখন ছিল! কেবল যাগ-যজ্ঞ, মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধ, পূজা-পার্ব্বণ, ব্রাহ্মণ-সেবা, অতিথি-সেবা, বিধবার একাদশী—এ-সব বাজে জিনিষের চিন্তাতেই লোকের শক্তি নিঃশেষ হইত। ন্যায়ের চর্চ্চা কিছু হইত—নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে, কিন্তু তাও শাস্ত্রের চতুঃসীমা-বদ্ধ ছিল, তার বাইরে পা বাড়াইবার কারো সাহস ছিল না, বা সে-রূপের কোনও প্রেরণার অস্তিত্বও কারো মধ্যে স্থান পাইত না—স্বাধীন চিন্তা বলিয়া কিছু ছিলই না। সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ—এ-সকলেরও কিছু কিছু চর্চ্চা হইত, তাও সংস্কৃত ভাষাতেই; সাধারণ লোকের তাতে প্রবেশলাভ এক প্রকার নিষিদ্ধই ছিল। জাতিভেদের তখন পূর্ণ-প্রতাপ—ব্রাহ্মণ ভগবান্। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিলই না। বাঙ্গালী-জাতি বলিয়া কিছু একটা ছিল না বলিলেই চলে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই লোক তখন ব্যস্ত। সে, কি ধর্ম্ম? পুতুল গড়িয়া তার কাছে 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করা, হরির নাম লইয়া রাস্তায় রাস্তায় লাফান-ঝাঁপান, ব্রাহ্মণের পূজা; প্রকৃত ধর্ম্ম, যা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ফুটাইয়া তোলে, ছিলই না। যদি এ-ধর্ম্মে কিছু সারই থাকিবে, তা হ'লে মুসলমানেরা আসিয়া বিনা-রক্তপাতে এমন দেশ জয় করিয়া লইবে কেন? অন্যান্য জাতিরাই বা নিবে কেন? ভাবিতে গেলে, লজ্জায়, ঘৃণায় মরিতে ইচ্ছা হয়। এখনো সে ধর্ম্ম, সে-সব রীতি-নীতির অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে, আর তার জন্য কত বাহবাই না নেওয়া হইয়া থাকে—

যদি চ তাদের প্রভাব অনেকাংশে কমিয়া আসিয়াছে। যখন দেখি, নানা লোকের মুখে সেই প্রাচীন আর্য্যসভ্যতারই মহিমা কীর্ত্তন হইতেছে, তখন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কবে ব্রাহ্মণ তার কোষা-কুশী, যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র, শাস্ত্র লইয়া বিদায় লইবে? যতদিন পর্য্যন্ত এ সকলের শিকড়ের সামান্য অংশটুকুরও অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এ-দেশের ভরসা নাই। কথা হইতেছে, সে-দিন কি কখনো আসিবে? মনে তো হয় না।

১০।১১।২১।—বাল্মীকি গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বিরাজ করিবে, ততদিন তাঁর রামায়ণের বিনাশ নাই। এমন গর্ব্ব করিবার তাঁর যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

রাম যে কোনও জীবন্ত পুরুষ ছিলেন, বোধ হয় না; থাকিলেও এমন কেউ ছিলেন না, যাঁর নাম ভারতের অন্যত্র তেমন জানা ছিল। এক রামায়ণের প্রভাবে, সামান্য কোশল দেশের রাজপুত্র, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ভৃত্য, ভাইয়েরা, ভগবানের স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। কত পুত্র এখনো রামের অনুকরণে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেছে; কত স্ত্রী সীতাকে আদর্শজ্ঞানে স্বামীর অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়া নিজেকে ভাগ্যবতী সতীর আসনে অধিষ্ঠিতা দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছেন; লক্ষ্মণ ও ভরত আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত; হনুমান সেবকের চরম আদর্শ। রামায়ণ হ'তে এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে—রামই যার মধ্যমণি। জগতের কোন্ বইয়ের এমন প্রভাব দৃষ্ট হইবে? অথচ, গ্রন্থে ধর্ম্মপ্রচার হয় নাই—যেমন বাইবেল বা কোরাণে হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু বংশের জনকয়েক লোকের জীবন-কাহিনী, কিন্তু এমনই ভাবে লেখা, এমনই সত্যের সৌন্দর্য্যের স্তরে যাইয়া কাব্য পৌঁছিয়াছে, যে তার মাহাত্ম্যে প্রত্যেকেই এক একজন ধর্ম্মবীরে পরিণত হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্বকালে যাঁরা লিখিতেন,

নিতান্তই প্রাণের অন্তর্নিহিত তাড়নায়। বাল্মীকি, ব্যাস—জ্ঞান-তাপস; জ্ঞানদেবীর আরাধনাতেই জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। ফলে তাঁরা তো মহানন্দের অধিকারী হইয়াছিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লেখা যুগ যুগ ধরিয়া কত লোকের জীবনের আনন্দ-উৎস হইয়া আছে!

৭-১১-২১।—অনেক দিন হ'তেই ভাবিতেছি, কেন সুখ পাই না; জীবন হইবে সুখের আকর, তা না হইয়া যন্ত্রণার স্তূপে পরিণত হইয়া আছে;—কেন? কারণ যতটা বুঝিতেছি, তা এই—যে জীবনকে আগাগোড়া গড়িয়া লইয়া চলিয়াছি, সে তো ঠিক আমার জীবন নয়, 'আমি' নিজে তাতে কতটুকু! পরের সঙ্গেই যে আমার আ-জীবন বসতি। 'আমি' নিজভাবে নিজ-রস-পুষ্ট হইয়া গড়িয়া উঠিলাম কৈ? আমার ভিতর 'আমি' বলিয়া যা কিছু একটা ছিল,—তার উপর অনিচ্ছায় কত অবান্তর জিনিষের চাপ ও ছাপ আসিয়া পড়িয়াছে—'আমি'-যা-ছিলাম, যা-হওয়া-উচিত-ছিল এবং যা-হইয়াছি-'আমি'—তিনটীতে কত পার্থক্য এখন! বাল্যকাল হ'তে দাস-জীবনের জন্যই তৈরী হইয়াছি—সে-দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যা-কিছু শিক্ষা হইয়াছে। স্বাধীন-স্বচ্ছন্দগতি মানুষ হইয়া চলিবার জন্য তো তৈয়ের হই নাই। তাই, না চলিতে, না লিখিতে, না বলিতে—কোনও বিষয়েই এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই। আ-জীবন আমার প্রাণ অন্তঃস্থল হ'তে যা কিছু চাহিয়াছিল—বারবার হাত বাড়াইয়াও না পাইয়া সে আজ ম্রিয়মাণ হইয়া আছে, এবং অন্য সব বাইরের জিনিষে কোন প্রকারে আপনাকে জড়াইয়া দিন কাটাইতেছে।

স্বাধীনতার মুক্ত-বায়ুতেই সুখ; যার ভাগ্যে তার স্পর্শ-লাভ হয় নাই, সে সুখী হইবে কেমন করিয়া? তার জীবন, জীবনই নয়। স্বাধীনতা প্রাণের প্রাণ-বায়ু; যেখানে তার অভাব, প্রাণ-ফুল সেথায় ফোটে না,

মনুষ্যত্বের বিকাশও সে সব স্থানে হয় না। নিজেকে পূর্ব্বাপর সংরুদ্ধ করিয়াই চলিয়াছি; বাসনা, শক্তি, সবই এমন চিরটাকাল চাপ খাইতে খাইতে শেষে প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; যা কিছু আছে—বিবর্ণ, রক্তশূন্য। দেখো না, কোনও চাপের নীচের দূর্ব্বাদল, কেমন ফ্যাকাশে তার চেহারা, তাদের আর কি দূর্ব্বা বলিতে ইচ্ছা করে? দাসের ভিতর জীবন-চিহ্ন দেখা যাইবে কেমন করিয়া? এমন জীবনের আনন্দই বা কি, দুঃখই বা কি?

৯-১১-২১।—হিন্দুদের মত এমন আত্মা অনাত্মা লইয়া জল্পনা কল্পনা কোনও জাতি করে নাই। সংসার অসার, জীবন অনিত্য, সবমায়া ভ্রান্তি—এমন সব বড় বড় কথা কারো মুখে শুনা যায় না, অথচ এমন কাপুরুষ, এমন প্রাণ-কাতর জাতি জগতে দুটী খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। মরিতে আমরা সকল সময়ই শশঙ্কিত; এত যে লাথি গুঁতো খাইতেছি, ঝি, বৌ লইয়া গৃহে বাস দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতেছে, এত যে যে-ইচ্ছা মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিতেছে, না খাইয়া মরিতেছি—তাও প্রাণের মায়া কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না। দেহের প্রতি এ কি বিশ্রী মায়া!

এক সময় ভাবিতাম, যাদের মানসিক বৃত্তিগুলি তেমন পরিস্ফুট হয় নাই, যারা পশুর সান্নিধ্যে—তাদের মধ্যেই মরিবার ভয় কম। পশু যুদ্ধ করিতে যাইয়া মরিবার চিন্তা করে না; গুর্খাও নির্ভীক। জাপানীদের সঙ্গে গুর্খাদের চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে, তারাও মৃত্যু-চিন্তায় কোন অবস্থায় ভীত নয়। এখন দেখিতেছি—ভ্রান্ত ধারণা আমার। আমাদেরই মত সভ্যতার প্রায়-একই-স্তরে অধিষ্ঠিত, আমাদেরই দেশবাসী মুসলমান কেমন সাহসী! আমরা এমন ভীরু—আমাদের ধর্ম্মের জন্য, আমাদের শিক্ষার জন্য। ধর্ম্ম-বিধি পালন করিতে যাইয়া আমরা একপ্রকার

নিরামিশাষী, অহিংসার চর্চ্চা করিতে যাইয়া বলবীর্য্যহীন; দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ আমাদের আদর্শ মহাপুরুষ। দরিদ্র ভিক্ষুকের শিক্ষায় দেশব্যাপী যত ভীরু দুর্ব্বল ভিক্ষুকেরই সৃষ্টি হইয়াছে; মানুষ কৈ? সূক্ষ্ম তত্ত্ব-চিন্তার ফলে ইহাও আমাদের একপ্রকার মজ্জাগত অলক্ষ্য সংস্কারস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে,—মরা-টা, মনুষ্যজন্মের লোপ করা, ভুল; মানমর্য্যাদা আত্মসম্মান সবই তো নশ্বর, সে-সব রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণ দেওয়া অবিবেচকের কাজ। সত্যই, অনেক সময় আমারও মনে হয়—ভ্রান্ত যে, সেই এ-সব কারণে ইচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে—যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, তাই লাভ। কি কুধর্ম্মের চাষই আমরা করিয়া আসিতেছি!

১৬-১১-২১।—মাস কয়েক হইল Bengal Legislative Councilএ স্ত্রীলেকদের ভোট দিবার দাবী অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। সকল আপত্তির পর্দ্দা কাটাইয়া যেটী সকলের উপরে স্থান পাইয়াছিল, তা' এই যে, যদি বারবণিতারা ভোট দেয় এবং তাদের কেউ সভ্য মনোনীত হয়, তা হলে কি উপায় হইবে? কথা হইতেছে,—এই বারবনিতাদের সৃষ্টি হয় কিরূপে এবং এদের পোষণই বা করে কে? এদের সংস্পর্শ-দোষশূন্য লোকই বা ক'জন? এসব লোকদের মধ্যে কতজন হয় তো বেশ সাধু সাজিয়া ভোট দিতেছেন বা সভ্যপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। শুধু বারবনিতারা এমন কি দোষ করিল? আর যে-সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ বারবনিতা, সে সমাজে তাদেরই বা ভোট দিবার বা সভ্য হইবার অধিকার থাকিবে না কেন?

স্ত্রীলোক, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল। তাদের ভোগবিলাসের আগুনে পূর্ব্বাপর অসহায়াদের মানমর্য্যাদা, আত্মসম্মান, দেহ-বিক্রয় হইতেছে! এ-সামাজিক অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হ'তে নাই। সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, পুরুষের মত স্ত্রীলোকও অর্থ এবং সম্পত্তি অর্জ্জন ও রক্ষণ

সম্বন্ধে সমান সুবিধা পায়। স্বামীর আয়ের কিয়দংশ সব সময়ই মাসিক মাহিনার ন্যায় আইন-অনুসারে স্ত্রীর প্রাপ্য হইবে। স্ত্রীলোকেরা যদি স্বাধীন হয়, তা হ'লে বারবনিতাদের ঘৃণ্য ব্যবসা অবলম্বনে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে অনেকেই ইচ্ছুক হইবে না। বদ্‌মায়েস পুরুষ চিরকাল আর বদ্‌মায়েসিতে মজিয়া থাকে না; কুলটা স্ত্রীলোকের পক্ষেও যদি গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইবার অন্য সব সুবিধা থাকে, তা হ'লে এ-পথ অবলম্বনে অনেকেই কুণ্ঠা বোধ করিবে।

বর্ত্তমানে যে বিবাহ-বিধি এ-দেশে প্রচলিত, তা কি বিবাহ নামের উপযুক্ত? রমণী তো পুরুষের রক্ষিতা নারী-বিশেষ; তার ভোগের জন্য, বিলাসের জন্য, বংশ-রক্ষার জন্যই তার জীবনধারণ—স্বাধীনতার লেশ-মাত্র নাই, অর্থার্জ্জনের সামান্য সুযোগ নাই, আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

এ-বিবাহ-বিধির মূলোচ্ছেদ দরকার। সমসত্বাধিকারী নর-নারীর স্বেচ্ছায় প্রেমের আকর্ষণে মিলন—ইহাই হইবে বিবাহের আদর্শ। এখন যে বিবাহ-বিধি প্রচলিত, তাতে পুরুষেরই যত সুবিধা,—স্ত্রীতো তার দাসী মাত্র।

বর্ত্তমানের সভ্যতা! এ কি সভ্যতা? কেবলই মারা-মারি, হিংসা, দ্বেষ, জালিয়াতি, জুয়াচুরী, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, রক্তা-রক্তি; যতই দিন যাইতেছে, ততই এ-সব পশুভাব জ্বালাময় বিষাক্ত ঘায়ের ন্যায় সমাজ-দেহে ফুটিয়া উঠিতেছে। পুরুষ ও স্ত্রী,—কঠোরতা কোমলতা, শক্তি মাধুর্য্য—লইয়া মানব-সমাজ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত পুরুষের প্রাধান্যবশতঃ পুরুষোচিত ভাব সকলেরই তাতে বিকাশ হইয়াছে; রমণী-সুলভ ভাবগুলি—ভালবাসা, কোমলতা, বিনয়, মাধুর্য্য—তেমন দেখা যায় না। রমণীকে যে পূর্ব্বাপর দূরে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। মনুর মতে স্ত্রীলোক তো আমরণ নাবালিকা, স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোনও জিনিষ কোন অবস্থাতেই তার থাকিতে নাই। এ্যানি বেসেণ্ট, সরোজিনী নাইডু

চির-নাবালিকা! জগৎ ভরিয়া নারী-শক্তি কেমন সংরুদ্ধ হইয়া আছে! এ-ব্যবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইবে না? স্ত্রীলোক যদি পুরুষকে মানিয়া না চলে, তা হ'লে কি করিবে তারা? উচিতও তাদের তেম্‌নি চলা। স্বার্থমুগ্ধ পুরুষ কি কখনো নিজ সুবিধা ছাড়িয়া দিবে, যদি-না জোর করিয়া স্ত্রীলোক তা কাড়িয়া নেয়? Despotএর সর্ব্বদাই সকল-ক্ষেত্রেই একমূর্ত্তি।

২২.১১.২১।—আমেরিকা Low wages অল্প-পারিশ্রমিক ও Low standard of living নীচধরণের-জীবন-যাপন-প্রণালী ঘৃণা করে। সে চায়—সকলেই healthy স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থায় থাক্, সকলেই শিক্ষা পাক্ এবং প্রত্যেকেরই রবিবারের জন্য উপযুক্ত এক সেট পোষাক পরিচ্ছদ থাকুক্! এ-ভাবে চলিবার জন্য যা যা দরকার—তাই সে বোঝে। দরিদ্রভাবে বাস করার যেন আমরা আর বাহাদুরী না নেই। যে ক'দিন বাঁচিয়া থাকা—ভাল খাইয়া পরিয়া সুস্থদেহে সৎকাজে স্ফূর্ত্তির সহিত মনপ্রাণে মজিয়া থাকা—এই তো মানুষ-উপযোগী জীবন। আমাদের জীবন তো একটা সুদীর্ঘ-পীড়া—কেবলি হা-হুতাশ, ঘ্যান্‌-ঘ্যানানি, যা আছে তাতেও সুখী নই, এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় সর্ব্বদা ক্লিষ্ট।

২.১.২২।—সে দিন পুরাণো Modern Reviewতে রবীন্দ্রনাথের লেখা Message of the Forest 'বনের-বাণী' প্রবন্ধ পড়া গেল; বোধ হয়, এমনি কোন প্রবন্ধ গত বছর তিনি জার্ম্মেণিতে পাঠ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় সভ্যতার একটা মূল উৎসই—প্রকৃতি। ভারতবাসীর জীবনের সঙ্গে পূর্ব্বাপর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সে; পশু-পাখী, বৃক্ষ

লতা, সকলেই তার নিতান্ত নিজ-জন। নির্জ্জন তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জীবনের শেষভাগ শান্তিতে কাটানো—ইহাই তার জীবনাদর্শ। ভারতের ঋষির কাছে প্রকৃতি মুখর—কত শান্তি-কথা, বিমল আনন্দ-বাণী, অনন্ত-বাণী আবহমান কাল ধরিয়া কর্ণে বহন করিয়া আনিতেছে সে। হিমালয়ের মধুর অনন্তের ওপারের ডাক, কোন্ ভারত-বাসীর কাণে না আসিয়া পৌঁছিতেছে? কতজন এখনো সংসারের ধন-মান পরিবার প্রিয়জন বিসর্জ্জন দিয়া তার বক্ষে যাইয়া স্থান লইতেছে! ভারতীয় সভ্যতার চির-উৎস—হিমালয়।

এমন অপূর্ব্বসুন্দর সমুন্নত বিশাল মহান্ পর্ব্বতরাজি, এমন রজতশ্রী নদনদী, যাদের জলের প্রতিকণা শস্য-সম্পদের অঙ্কুর বহন করিয়া আনিতেছে, এমন স্নিগ্ধ কালো-মেঘ, রামধনু-আঁকা আকাশ, এমন বিমলেন্দু, যার শুভ্রহাসির ছটায় আকাশ প্রান্তর হাসিয়া উঠে, বড়ঋতু, সর্ব্বোপরি সর্ব্বজীবের প্রাণের মূল আধার প্রখর তীব্রোজ্জ্বল সূর্য্য—কোথায়? জগতের আর কোথায়? এরা সকলে মিলিয়া দেশবাসিদের মন পূর্ব্বাপর কেমন শান্তির ভাবে, আনন্দ, অনন্তের ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে! এমন চারিদিকের মমতা কোমলতা স্নিগ্ধতায় মাখা সৌন্দর্য্য-সম্ভারের ভিতর মন কি কোন কাঠিন্য কর্কশতাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, সংসারের সামান্য ধূলিকণাই কি তাকে বহুদিন আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে? ভারতীয় আত্মা, অনন্ত আনন্দ-শান্তির আধারের দিকে চিরকাল হাত বাড়াইয়া আছে। কোথায় সে অমৃত-নির্ঝর—ভারতের চিরসাধনার ধন?

ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, এমন কি শব্দ-শাস্ত্র পর্য্যন্ত এই অনন্তের ধ্যান ও ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। এখানেই ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব; সাধারণ সাংসারিক লোকের বিষয়বৈভব অর্থসামর্থ্যের

মোহে সে কখনো মুগ্ধ নয়। ভারতের রাজাও বার্দ্ধক্যে বনে গমন করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনপাত করিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করেন।

কি উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, কি কালিদাস বা ভবভূতির গ্রন্থাদি—সমস্তই পবিত্র তপোবনের সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় মুখর। তাকে ঘিরিয়াই ভারতীয় সভ্যতা বিকশিত, যেখানে পশুপক্ষী বৃক্ষলতা মানুষে মিলিয়া এক অখণ্ড জীব-প্রবাহে পরিণত হইয়াছে, কোমলতা ভালবাসা মমতা শান্তি স্নিগ্ধতা যার অঙ্গ। সেক্সপিয়ারের গৌরব বর্ণনায় পাশ্চাত্য দেশ মুখর, কিন্তু যতই বয়স বাড়িতেছে, ভিতরের মানুষটী নিজভাবে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, ততই যেন সেক্সপিয়ারকে আর তেমন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে হইতেছে না। চোর, ডাকাত, বদ্‌মায়েস, নরহন্তা, লম্পট, ভূতপ্রেতের ব্যাখ্যায়, Elizabethan যুগের যত তামসিক ভাবে, তাঁর গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ। মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ, জুয়াচুরী, ব্যভিচার ইত্যাদি কত বিষয়ের নিখুঁত বর্ণনাই না সে-সবের ভিতর আছে, চরিত্রচিত্রণও খুব পাকা হাতের, মাঝে মাঝে খুব সুন্দর সুন্দর স্থান passage রহিয়াছে, যা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সমস্ত সেক্সপিয়ার পাঠ-শেষেও মনে হইবে না, যে জীবন বিশেষ পুষ্ট হইল বা মধুরতর বোধ হইতেছে, মুক্তির নির্ম্মল আনন্দের আস্বাদ তাতে পাওয়া যায় না। শুধু জ্বালা যন্ত্রণা বা অশান্তি সৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদর্শন নয়। Tolstoyএর মতে,—We value only that art which purifies our thoughts and projects, raises up the soul, and increases the forces necessary to a life of labour and love, হৃদয়কে উন্নত করে, পবিত্র করে এবং সৎকাজ ও ভাবনার দিকে যে সাহিত্য উদ্বোধিত করে, তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। ইয়ুরোপীয়েরা practical সাংসারিক

জাতি, ক্ষুদ্র দৃষ্টি, সাধারণ ঘরকন্না লইয়া ব্যস্ত—তা'দের লেখাও অনেকটা তদ্রূপ, কথার কাটাকাটি, বাইরের চাক্‌চিক্য, কিন্তু মূলতঃ তেমন সারবান্ নয়। সে-সভ্যতার আবহাওয়ায় মুনি-ঋষির জন্ম হয় না, বৌদ্ধ-শ্রামণ বৈষ্ণব-সাধুর আবির্ভাব হয় না—যাঁরা মানব-প্রাণের চিরন্তন নিগূঢ় ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে যাইয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া দিবে। এশিয়া হ'তেই সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি; এশিয়ার কবি—বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, শাদি, হাফেজ, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। এঁরা যে সৌন্দর্য্য সাগরের, পবিত্রতার তীরে যাইয়া পৌছিয়াছেন—ইয়ুরোপের কোন্ কবি সেখানে পৌছিয়াছেন? ভারতের কবি বা চিত্রকর উভয়েই—সাধক, যোগী। যোগী বাল্মীকি, যোগী ব্যাস, এঁদের আদর্শচরিত্র—কাব্য-সেবায়, সৌন্দর্য্য-সাধনায়, অনন্ত-ধ্যানে যাঁরা তন্ময়। যে লেখায় জীবনে কিছু নূতন ঢেউ তুলিয়া না দেয়, মনকে সংসার হ'তে উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত বড় কিছুর দিকে না লইয়া যায়, যা-পাঠে মনের মধ্যকার নূতন কোনও অনাবিষ্কৃত আনন্দ-স্তরের সন্ধান না পাইলাম—সে কবির লেখার মূল্য কি? স্থায়িত্বই বা তার কতটা? রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপিয়ারের লেখার ভিতর এরূপ কিছুর তেমন পরিচয় পান নাই, তার আভাস প্রবন্ধে দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা এ-সব ভাবে আগাগোড়া মাখা,—সৌন্দর্য্য, ভক্তি, ধর্ম্ম, প্রেম—এমন কোন্ কবির লেখায় দৃষ্ট হইবে? এবং সকলকে আবরিয়া রাখিয়াছে এক অনিন্দ্য নির্ম্মলতা, এক বিপুল ব্যাকুলতা। সর্ব্বোপরি ভাষার কি গাঁথনি! আর কোথাও এমন নির্ম্মল গভীর পবিত্র সুন্দর কিছু রচিত হইয়াছে কি? রবীন্দ্রনাথ আদর্শ কবি, দ্রষ্টা, ঋষি; সত্য, শিবত্ব ও সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া যে অমৃতের সন্ধান লাভ উপনিষদের কাম্য—রবীন্দ্রনাথের লেখা পূর্ব্বাপর তাঁর দিকে পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। উপনিষদের ঋষিদের আত্মার সঙ্গে নূতন পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহ

মিলিত হইয়া, রবীন্দ্র-রূপে ভারতে কি অপূর্ব্ব বস্তুরই আবির্ভাব হইয়াছে! ধর্ম্মপিপাসু অমৃত-অনুসন্ধানকারী ভারতীয় আত্মার মানস-পুত্র রবীন্দ্রনাথ ভারতের আদর্শ কবি, যাঁর তুলনা জগতে নাই।

রবীন্দ্রনাথের Message or the Forest পড়িতে পড়িতে কত কথাই মনে জাগিতেছিল—হাল কর্ম্মবহুল পরশ্রীকাতরতামূলক পাশ্চাত্য সভ্যতা, আর প্রাচীনের বস্তুভারহীন ভাবমূলক অনন্ত-অভিমুখী সরল জীবন! জগতের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া, কোথা হ'তে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি আমরা! কোথায় বা এর শেষ?

২২-১-২২।—রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোণার তরী' 'চিত্রার' তুলনা নাই। 'চিত্রা' ও 'সোণার তরীতে' যেন তাঁর প্রতিভা চরমসীমায় যাইয়া পৌঁছিয়াছে—যেমন ভাব, ভাষা, তেমন বিষয়-বৈভব। সেদিন 'মানস-সুন্দরী' পড়িতেছিলাম, আর কেবলই মনে হইতেছিল, মানুষে কি এমন লিখিতে পারে! এ-যেন অমরার কোন বিশ্ব গায়ক কোন্ অনাদিদেবের হাত হ'তে বীণা লইয়া মনের আনন্দে তাতে ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার দিতেছেন, আর চারিদিক হ'তে সৌন্দর্য্য-কণা-সকল ফুলের পাপড়ির মত অবিশ্রান্ত ঝরিয়া পড়িতেছে, কখনো বা চারিদিক তান-লয়ে বাজিয়া উঠিতেছে, কখনো মধুর মূর্ত্তি ধরিয়া হাসিতেছে, কখনো বা অসীম সুগন্ধে ভরিয়া উঠিতেছে! 'উর্ব্বশী' সম্বন্ধেও সেই কথা। কবি আদিষ্ট পুরুষ; বাল্মীকি সম্বন্ধে তেমনি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, কালিদাস সম্বন্ধেও তাই। রবীন্দ্রনাথও যে সম্পূর্ণরূপে-নূতন-কিছু, সন্দেহ নাই; এমন কবি জগতে এ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয় নাই। দুঃখ, বাঙ্গালা এখনো এ মহাসম্পদের সম্যক্ গৌরব করিতে শিখিল না; দুঃখ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সাধারণ রাজনৈতিক-ক্ষেত্রের কাদায় নিজ-দেহ মাখিয়া

তাঁর মাহাত্ম্য সঠিক নির্ণয়ের উপায়, অনেকের পক্ষে দুর্গম করিয়া তুলিয়াছেন!

'সোণার তরী', 'চিত্রা' শেষ করিয়া 'কল্পনা' পড়িতে যাইয়া মনে হইল, বীণার তার যেন দু একটী ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে অদম্য আবেগ নাই, সে উদ্যম নাই, সে ব্যাকুলতা নাই, ভাষার সে রস-শব্দসম্পদ নাই—সবই অনেকটা নিষ্প্রভ, কেমন উদাসভাবে ভরা। এ সময়ের কিছু পর হ'তে যেন তিনি অনেকটা দুর্ব্বোধ্যও হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁর প্রায় সমস্ত লেখার ভিতর দিয়াই ভগবানকে লাভ করিবার এক ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তো তেমন ভক্ত নন; তাঁর মূল কামনার ধন,—যত না ভগবান, যত 'জীবন-দেবতা'। তাই শেষোক্তকে ঘিরিয়া যে কবিতাগুচ্ছ রচিত হইয়া উঠিয়াছে, তা যেমন প্রাণস্পর্শী, অন্যান্য কবিতা তেমন নয়। তা ব্যতীত, 'জীবন-দেবতাকে' বন্দনা করিতে যাইয়া, তিনি যে সকল ভাব প্রচার করিয়াছেন, তার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান যুগের আশা আকাঙ্ক্ষাকে যেরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাতে তিনি যেমন বর্ত্তমানের বিজ্ঞানপুষ্ট শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নিজ-জন হইয়া উঠিয়াছেন—এমন অন্য কোনও কবিতার সম্পর্কে নয়।

'সাধনার' যুগই—রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ। এ সময় তাঁর জীবন একাকী শিলাইদহে কাটিয়াছে; পদ্মার উপর 'বোটেই' তাঁর অনেক সময় অতিবাহিত হইত। নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনতার ভিতর নিজ প্রাণের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কি লোক গঞ্জনা-হট্টগোলের ভিতর হইয়া উঠে? এই 'বোটের' জীবনের সহিত 'সোণার তরী' ও 'চিত্রা' গ্রথিত। যেখানে নির্জ্জন পর্ব্বত নদী বা সাগরের সঙ্গে মানবাত্মার মিলন হয়, সেখানে-যে মহাবস্তুর সৃষ্টি হইয়া থাকে; রাস্তার ধাক্কাধাক্কির মধ্যে নয়। রবীন্দ্র-নাথ 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়া বিশ্ব-জোড়া স্তব স্তুতিতে মুগ্ধ হইয়া

আপনাকে 'শান্তিনিকেতন' ও 'বিশ্বভারতীর' হট্টগোলের ভিতর হারাইয়া ফেলিলেন! মনে হয়, যে অপার-সৌন্দর্য্য সাগর-তীরের দিকে তিনি ধীর সুনিশ্চিত পদে ক্রমে অগ্রসর হইতে ছিলেন, সে-দিক হ'তে মুখ ফিরাইয়া বাজারের বাইরের গোলমালের ভিতর মিশিয়া গেলেন। বোধ হয়, তিনি ভুল করিলেন।

পরশু হ'তে কোকিলের ডাক শুনিতেছি। আজ দুপুর হ'তে মাঝে মাঝে ঝাপ্‌টা হাওয়া উঠিতেছে, সজিনা ফুলগুলি ফুটিয়া গাছ ভরিয়া উঠিয়াছে, পাখীর ডাকও যেন বেশ শুনা যাইতেছে। বসন্তের আবির্ভাবের বেশী বিলম্ব নাই।

২৯-১-২২।—ভারতের নাট্যশাস্ত্রের কথা পড়িতেছিলাম। পাশ্চাত্য-সভ্যতার বাইরের চাক্‌চিক্যে চমক-লাগা-চোখ্‌ বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র, সেক্সপিয়ারকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'। তাই বটে! এমন সব অসার কথা এ-দেশবাসীর মুখে অনেক বাহির হইয়াছে, এতে নূতনত্ব কিছু নাই। আমরা নিজেরা যেমন নিজেদের অপরের কাছে অপদার্থ বলিয়া প্রকাশ করি, তারাও তেমন করে না—এ তো সর্ব্ববিদিত।

সেক্সপিয়ারের লেখায় এমন কি আছে, যা মনকে উচ্চগ্রামে লইয়া যাইতে পারে; যাকে আমরা শ্রেষ্ঠ সাত্বিকভাব বলি, তার সমাবেশ কোথায়? Elizabethan যুগের উপরের শ্রেণীর সাধারণ সাংসারিক ভাব লইয়া রচিত তাঁর সব লেখা—কত আজগুবি গল্প, সাধারণ রাজ-রাজার কাহিনী, লম্পট, বদ্‌মায়েসের জীবনী; অনন্ত ভাবের মুক্তি-নির্ব্বাণের ভূমানন্দের সামান্য গন্ধও নাই। সবই এ-জগতের

লাফালাফি, বাড়াবাড়ি, নাচানাচি। এখনকার দিনে ও-সব পড়িয়া লোকে এমন কি যে আনন্দ পায় বুঝি না। চরিত্র-চিত্রণ অবশ্য চমৎকার; কিন্তু সবই সাধারণ লোকের কথা, সাধারণ ভাবে লিখিত—মনকে উপরের দিকে লইয়া যায় না। কথায় যেমন পেট ভরে না, তেমন আত্মার ক্ষুধাও এ-সবে মিটে না, পাঠে স্থায়ী লাভ কিছুই তেমন হয় না।

কবিবর ভবভূতি সত্যই বলিয়াছেন,—আমাদের যাঁরা নিন্দা করিতেছেন, তাঁরা সংসারের কি জানেন? হয় তো, এমন কেউ আছেন বা ভবিষ্যতে দেখা দিবেন, যাঁদের রুচি আমাদেরই মত; কাল অনন্ত এবং এই জগৎও মহাবিস্তৃত।' অনন্তকালের আবর্ত্তনে ভারত আবার তার ন্যায্য গৌরবময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, উত্তরামচরিতের, তুলনা কোথায়? শকুন্তলা-পাঠে মনশ্চক্ষুর কাছে যে শান্ত তপোবনের চিত্র ফুটিয়া উঠে এবং তার সম্পর্কে যে গভীর সাত্ত্বিক-ভাবাত্মক রস, প্রাণ স্নিগ্ধ করিয়া তোলে, ইয়ুরোপীয় কোন লেখকের লেখায়—হ্যাম্‌লেট্ বা ফষ্ট পাঠে—কি তেমন হয়? কোথায় তুলনা এই তপোবনের, কোথায় কণ্বমুনির, প্রকৃতি-কন্যা প্রকৃতিগতপ্রাণা বালিকা শকুন্তলা, তার সখীদুজনের? এত যুগ পরেও যেন সব চোখের কাছে ভাসিতেছে দেখিতেছি—'মালীনি' তীরের সেই স্নিগ্ধ শান্ত কুটীর, মানুষ-পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা লইয়া রচিত, সংসারবিরাগী মহাতাপসের ক্ষুদ্র সংসার, তাঁর লালিত কন্যাত্রয়, মাতৃসদৃশা গৌতমী, হরিণ-শিশু ও তার মা, শকুন্তলার আসন্ন বিরহে আহার-নিবৃত্ত পাখীসকল, সখী বনজ্যোৎস্না। মহাকবি গেটে সত্যই বলিয়াছেন,—যদি নববর্ষার মুকুল ও বর্ষশেষের ফলের একত্র সমাবেশ দেখিতে চাও, যদি মর্ত্ত স্বর্গ উভয়কে এক নামে গ্রথিত দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তা' হ'লে তোমাকে 'শকুন্তলার' নাম উল্লেখ করিতেছি, তা হ'লেই সব বলা হইল। শুধু চরিত্র-চিত্রণ বা বর্ণনাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের

স্বরূপ নয়; রমণী-সৌন্দর্য্য বা সমস্ত শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের মত ইহা এমন কিছু যা প্রকাশ করিয়া বুঝানো যায় না, যতটা অনুভব করা যায়। ইয়ুরোপের মত এমন বিষয়-সর্ব্বস্ব সব-লোক ভারতে ছিল না, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে ও-সবের তেমন বর্ণনাও তাই নাই। ভারতীয় কবিদের লেখা পাঠে যেমন বিমল আনন্দে মন পূর্ণ হইয়া উঠে, যেমন উচ্চভাব তাতে খেলিয়া যায়—তা কি ইয়ুরোপীয় লেখকের লেখায় হয়? কালিদাসের মহাদেব ও উমা, ভবভূতির রাম সীতারই বা তুলনা কোথায় পাওয়া যাইবে? ভারতীয় জীবন সরল, আড়ম্বর বিহীন, প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেন তারই একাঙ্গের স্ফূর্ত্তিবিশেষ। ইয়ুরোপীয় জীবন অধিকাংশে কৃত্রিম artificial, জোর করিয়া তাকে জটিল করিয়া লওয়া হইয়াছে; গভীর আনন্দের তাতে সমাবেশ কম; আছে তার নামে—মারামারি, কাটাকাটি, পরদেশজয়, পরপীড়ন। ইহাই যদি মানুষের কামনার শেষ আকাঙ্ক্ষার ধন হয়, তবে বুঝিনা মানুষ অন্য জীব হ'তে কত শ্রেষ্ঠ। ইয়ুরোপ অল্প জলের মীন, উপর লইয়াই ব্যস্ত। যেমন এ পর্য্যন্ত সে-দেশে কোন ধর্ম্মগুরুর সৃষ্টি হয় নাই, তেমন উচ্চাঙ্গের কবিরও অভাব—কবি ও ধর্ম্মগুরু যে একই সুধাসমুদ্র হ'তে অমৃত আহরণ করিয়া জগতে বিলাইয়া থাকেন। অনন্ত সত্যের মুলাধার হ'তে উত্থিত ভারতের জ্ঞান-চিন্তা—তার কবি বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ অমর; যতদিন মানব-সভ্যতা বাঁচিয়া থাকিবে, প্রভাতের নির্ম্মল হিল্লোলের ন্যায় তাঁদের লেখা স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শে আত্মার আনন্দ দান করিবে।

২২.২.২২।—'মধুস্মৃতি' নামে নগেন্দ্রনাথ সোম লিখিত মধুসূদনের নব প্রকাশিত বৃহৎ বই—পড়া গেল। বেশ বই, অনেক জানিবার বিষয়

আছে, তবে ভাষাটী আরও সরল ও সহজগতি হওয়া উচিত। অতিপূর্ব্বে যোগেন্দ্রনাথ বসু লিখিত মাইকেলের সুবিখ্যাত জীবনচরিত পড়া গিয়াছিল, অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই বইখানা, তা অপেক্ষা লিপিচাতুর্য্যে অনেকটা নিকৃষ্ট; বলিতে কি, আমার মনে হয় যোগেন্দ্রনাথের রচিত অমন জীবনী ইংরেজি সাহিত্যেও আছে কি না সন্দেহ, আমি তো পড়ি নাই। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের বইখানাতে কল্পনার আশ্রয় কিছু বেশী নেওয়া হইয়াছে। এই বইখানা তার অপেক্ষা সঠিক সংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই মনে হয়, মাইকেলকে জানিবার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ। মোটের উপর 'মধুস্মৃতি' ও বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্থায়ী স্থান গ্রহণ করিল। মাইকেল অমর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে রচিত এই বই দুখানিও অমর হইয়া থাকিবে।

মাইকেলের জীবনী শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে পড়িতে নেপোলিয়ানের কথাই মনে হইতেছিল—উভয়েই যেন দুই বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক। প্রথম জীবন, দুজনেরই উজ্জ্বল, আনন্দময়—পরিণাম, কেমন শোচনীয়!

মনোমোহন ঘোষ মাইকেলের মৃত্যুর দুদিন পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটার সমাধিকার্য্য শেষ করিয়া যখন গভীর রাত্রিতে মৃত্যুশয্যাশায়ী মাইকেলের কাছে আলিপুরের জেনারাল হাসপাতালের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁকে উদ্দেশ করিয়া যে কথা কটী তিনি বলিয়াছিলেন, ভুলিবার নয়। 'মধুস্মৃতির' কথায়—

"তাঁহারা ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধুসূদনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মুমূর্ষু মধুসূদন মুদ্রিত নেত্রে শয্যায় শায়িত হইয়া আছেন। জনৈক বালকভৃত্য তাঁহার শয্যাতলে বসিয়াছিল। তাঁহাদের পদশব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র মধুসূদন চক্ষু চাহিয়াই অতি উৎকণ্ঠিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মনোমোহন, সকল তো ভদ্রোচিতভাবে সম্পন্ন

হইয়াছে? কোনও ক্রটী তো হয় নাই? কে, কে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি? মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, সকলই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে, কোনও ক্রটী হয় নাই। এই কথা শুনিয়া মধুসূদন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে মনোমোহনকে বলিলেন, তুমি তো সেক্সপিয়ার পড়িয়াছ—সেই কয়টী পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়? মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, কোন্ কয়টী পংক্তি? মধুসূদন—'লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুতে ম্যাক্‌বেথ যাহা বলেন। আমার স্মৃতিশক্তি লোপ হইয়া আসিতেছে, কোন কথাই আর আমার মনে হয় না।' এই বলিয়া তিনি ম্যাক্‌বেথ উক্ত—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time ;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

প্রভৃতি লাইনগুলি সুস্পষ্টরূপে আবৃত্তি করিলেন।

মৃতকল্প মধুসূদনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন বিচলিত হইয়া বলিলেন, এ সকল কথায় কাজ নাই। আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই। এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া মধুসূদন বলিলেন,

ডাক্তার পামার আজ যখন আমার প্লীহা-যকৃতের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর দুদিন মধ্যেই আমাকে ইহ-জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখ, আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ। You see Manu, my days are numbered, my hours are numbered, even my minutes are numbered। এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র দুটী তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত-মনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।...তদুত্তরে মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার পুত্রগণ এক মুষ্টি খাইতে পায়, তাহারা আপনার পুত্রদ্বয়কে না দিয়া কখনও খাইবে না।...এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া মনোমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া মধুসূদন আবেগে বলিয়া উঠিলেন, God bless you, my boy। তৎপরে মনোমোহন ও বন্ধুদ্বয় সাশ্রুনয়নে বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন।"

হৃদয়ের মহত্ত্বে, আবেগে, তেজস্বিতায়, শক্তিতে, দৌর্ব্বল্যে, ভ্রান্তিতে, দানশৌণ্ডতায়, অপরিণামদর্শিতায়, প্রতিভায়—দুঃখ-দারিদ্র্যনিপীড়িত, সদা অর্থ তাড়নায় প্রপীড়িত মধুসূদন অনন্যসাধারণ; তাঁর জীবন এক অপূর্ব্ব জিনিষ। বাঙ্গালী মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকে' ভুলিতে পারিবে না। বাঙ্গালা-সাহিত্য-বক্ষে মণির মত তা জ্বলিতেছে, চিরকাল সে স্থানে তাকে ধারণ করিয়া সে-সাহিত্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবে; মধুসূদনের বিষাদ-পূর্ণ জীবনকাহিনীও চিরকালের জন্য বাঙ্গালীর স্মৃতিরূঢ় হইয়া থাকিবে।

তাঁর জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে শোকে প্রাণ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে স্থায়ী যশ-লাভ ও স্থান অধিকার করিবার তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়িতেছিল। জীবন-চরিতাখ্যায়ক

লিখিয়াছেন,—'যখন কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইত, তখনই তিনি সেই উদ্দেশ্যকে ধ্রুবতারার ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতেন। .. সেই প্রচণ্ড প্রবাহকে অন্য পথে ফিরাইতে কাহারও সাধ্য ছিল না। ইহাই তাঁহার কবি-যশের মূলভিত্তি। তিনি যখন পুলিস-কোর্টে সামান্য বেতনে কাজ করিতেন, তখনও নিজ ব্যয়ে পণ্ডিতের ভার গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষা করিতেন।' আকাঙ্ক্ষা-বহ্নিতে নিজেকে তিনি পতঙ্গের ন্যায় সঁপিয়া দিয়াছিলেন; তাঁর জীবনের কষ্টের মূল ইহা, সাফল্যের মূলও ইহা। অর্থ-দাস তিনি কখনও ছিলেন না, সাধারণ লোকের মত ভাবিয়া চিন্তিয়া চলিতে জানিতেন না। অপরিণামদর্শী সত্য, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক যে-সব লোক ভবিষ্যতের জন্য হিসাব-পত্র করিয়া জীবন-যাপন করিয়া কুপুত্রের জন্য অর্থ জমাইয়া গিয়াছিলেন, কে আজ তাঁদের সংবাদ নেয়? আর মধুসূদনের, অমর-কবি মধুসূদনের? চিরকালের জন্য বাঙ্গালী-জীবনের সঙ্গে তিনি গ্রথিত হইয়া আছেন।

ফ্রান্সের ভারসেল্‌স নগর হ'তে বন্ধুবর গৌরদাস বাবুকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তার কিয়দংশ প্রত্যেক বাঙ্গালীর দৈনিক পাঠের বিষয় হওয়া উচিত :—

'সর্ব্বশেষে বলিতেছি, মাতৃ-ভাষার চর্চ্চা করা ও তাকে সমৃদ্ধশালিনী করিবার চেষ্টার অপেক্ষা মহত্তর কিছুই নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, মিলটনের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার জন্য কিছু করিয়া যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদেরও প্রত্যেক প্রতিভাবান্ লোককে প্রবুদ্ধ করে। আমাদের মধ্যে যদি কেহ পশুর ন্যায় বিস্মৃত না হইয়া পশ্চাতে নিজ নাম রাখিয়া যাইতে চান্, তাহা হইলে তিনি তাঁহার মাতৃভাষার চর্চ্চায় নিজেকে নিয়োজিত করুন।'

২২-৩-২২।—অনেকদিন হ'তেই আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, কেউ যে সাহসী বীর্য্যসম্পন্ন দুঃখে-অনুদ্বিগ্নমনা হয়, কেউ যে তেমন নয়—তা' তাদের জন্মগত দেহগত ধর্ম্ম; জোর করিয়া, বই পড়িয়া, Philosophyর চর্চ্চা করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া বিশেষ কিছুই লাভ করা যায় না। একজন যে কামভাব-বিবর্জ্জিত সাধুতে অনায়াসে পরিণত হইয়া উঠে, আর একজন যে হয় না—ইহারও মূল অনেকটা যার যার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, সাধুর নিজ বাহাদুরী, বিশেষ নাই। শিক্ষায়, চেষ্টায় লোকের মূল-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় যৎসামান্য, বোধ হয় কিছুই না। যদি হইত, তা' হ'লে আমার এতদিনে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত; আমি তো মূলতঃ পূর্ব্বাপর একই আছি—দুর্ব্বলচিত্ত, অল্পেতেই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ি। Heredity,—লোক-চরিত্র-সম্বন্ধে একপ্রকার সর্ব্বনিয়ন্তা।

আবার ইহাও ভাবিতেছি, আমাদেরই দেশের মুসলমানেরা আমাদের অপেক্ষা এতটা virile দুর্দ্ধর্ষ সাহসী ও ভবিষ্য-চিন্তা-সম্বন্ধে-উদাসীন হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? আহারের ভিন্ন ব্যবস্থা, ধর্ম্মপ্রভাব, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক নয় কি?

কেমন করিয়া যে মানুষ গঠিত হইয়া উঠে—বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

১৯-৮-২২।—দিনের দিন মনের মধ্যে এক বিষাদ-মাখা উদাসের ভাবই জমিয়া উঠিতেছে—কিছুই ভাল লাগে না, কোন কাজেই হাত দিতে ইচ্ছা করে না। ভাবিয়াছিলাম, বই লেখা ও বই পড়া, স্কুলের দিন হ'তে যে Hobby খেয়ালে সব চেয়ে আমি আমোদ পাই, তা'তে মজিয়া থাকিতে পারিলেই সুখে জীবন কাটানো যাইবে এবং তা'তেই তার পূর্ণ চরিতার্থতা হইবে। এখন সেই Hobbyও যেন আর আনন্দদায়ক বোধ হইতেছে না;

কেবলই মনে হইতেছে—মিছামিছি সব, বৃথা চেষ্টা, বৃথা শ্রম, ক'দিন আর, ষাট সত্তর বছরব্যাপী মানুষের সামান্য আয়ু, এর জন্য আবার এত জল্পনা-কল্পনা, এত গলদ্‌ঘর্ম্ম! নশ্বরতার ভাবটা দিন দিন বাড়িয়া, এখন সমস্ত দেহ, মন, কার্য্য বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে!

কেন এমন হইল, আর কিসেই বা এর প্রতিকার? মনে হইতেছে, Hobbyর পূর্ণ স্বাধীনভাবে চর্চ্চা করা হয় নাই, নানা চাপে ফেলিয়া বিকৃত-আকার বিকৃত-প্রকৃতি করিয়া একপ্রকার তার প্রাণ নিঃশেষ করিয়াছি, তাই এমন হইয়াছে; তাই তো সমস্ত প্রাণ জুড়িয়া তার স্থান নাই ও জীবনের উপর তার তেমন প্রভাব নাই। তাই কি? বোধ হয় তাই; নূতন নূতন গ্রন্থের ভাব-প্রবাহের স্রোতে যখনি ভাসিয়া যাইবার সুযোগ রুদ্ধ হইয়া আসে, তখনি যে দেখিয়াছি এই অসারত্বের ভাব বিশেষভাবে মনে ক্রমে ক্রমে জমিয়া উঠে।

এখন আমার পূর্ণ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, মানুষের চরিত্র, মানুষের আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ, এমন কি বৈষয়িক উন্নতি—সমস্তই প্রায় নির্ভর করে নিজ নিজ Heredity ও ঘটনাচক্র, যার উপর তার নিজের তেমন কোনও হাত নাই। নিজ ভাগ্য গঠনে, তার নিজ হাত খুবই কম। দেশের জল বায়ু, আহার ও জীবন যাপনের নিয়ম, আমাদের অন্তঃসারশূন্য যত-সব-অমূলক-ভিত্তিবিহীন-কল্পনার-উপর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম—জন্ম হ'তেই আমাদের ভিতর অসারতা বিষ ভরিয়া দিতেছে। কাজ-কর্ম্মে, পুঁথি-পুস্তকে সর্ব্বত্রই অসারত্বের প্রচার। আমরা শাকান্নভোজী; এমন আহারের কল্যাণে আমরা নিতান্তই ধীর, চিন্তাশীল, উদ্যমশূন্য। যে পরিমাণে এতে বুদ্ধির বিকাশ হয়, সে অনুপাতে কাজ করার শক্তির বিকাশ হয় না। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব এ দেশে যেমন সহজ, নেপোলিয়ান বা তৈমুরলঙ্গের তেমন নয়।

চিন্তাশীল বলিয়াই, আমাদের দৃষ্টি এ-জগতের অপর পারে পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু কোথাও স্থায়ী কিছুই যে নজরে পড়িতেছে না। এই স্থায়ী কিছু পাইবার জন্য ভারতবাসী সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসীতে পর্য্যন্ত আপনাকে পরিণত করিয়াছে—কিন্তু কৈ, কিছুই তো সে এ-পর্য্যন্ত পাইল না! যাকে স্থায়ী ভাবিয়া সে দৌড়াইয়া গিয়াছিল—সে যে কিছুই নয়, মরুভুমির মায়া-মরীচিকা। কোথায় অমৃত?

কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান—দৃষ্টি তাদের ক্ষুদ্র; দর্শন বলিয়া কোনও জিনিষের সে-সব ধর্ম্মে স্থান নাই; সংসার লইয়াই তারা তাই এমন মজিয়া থাকিতে পারিয়াছে। তারাও অহরহ মরিতেছে, কিন্তু তজ্জন্য কাতর নয়; ইতিহাসের কোণায় নিজ নিজ নাম যেমন তেমন করিয়া একটুকু রাখিয়া যাইতে পারিলেই, তারা আপনাদের ধন্য মনে করে। তাই তারা ইতিহাস লেখে। আমাদের চোখে ইতিহাসের তেমন কোনও মূল্য নাই—নশ্বর জগতের নশ্বর কাণ্ডকারখানা, কালস্রোতে খড় কুটার মত ভাসিয়া যাইতেছে সব; কিসের ইতিহাস, কেই বা তার লেখায় শক্তি অপব্যয় করিবে? সময় নাই তজ্জন্য।

খ্রীষ্টান বা মুসলমানের আহার-বিহারের নিয়মও, উৎসাহ-উদ্যমের সঙ্গে জীবন যাপন করিতে তাদের সর্ব্বক্ষণ প্রবুদ্ধ করিতেছে। অধিক পরিমাণে মৎস্য মাংস ভোজী; পূর্ব্বাপর উত্তেজনার মধ্যে তাদের জীবন চলিয়া যায়; সুদূর ভবিষ্যতের অনাবশ্যক চিন্তা, মন আলোড়ন করিতে পারে না। সিংহ ব্যাঘ্র কি কোনও চিন্তায় প্রপীড়িত? নিরামিশাষী রোমন্থনপ্রিয় গরু—হিন্দুরই অনুরূপ, যেন কত চিন্তা-প্রপীড়িত।

হিন্দুর, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমানের নব্যশিক্ষিত চিন্তাশীল হিন্দুর ধর্ম্ম, দর্শনের কূট-তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে তর্কের মুখে না টেকে ভগবান, না আত্মা পরমাত্মা, না অন্য কিছু; তাই তো জীবন দিন দিনই উদ্দেশ্যবিহীন

হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমানের চিন্তাশীল ব্যক্তির মূল স্বরূপই ইহা—ইহাই যুগমানবের মূর্ত্তি। অথচ, মৃত্যুভয় বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। অল্প বিপদেই কেমন আমি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি, দুরু দুরু প্রাণ কাঁপিতে থাকে, মরিতেও ইচ্ছা হয় না; মনে হয়, মরা একটা মস্ত ভুল, কিসের মান অপমান—যে কদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, তাই লাভ, আর সবই তো মিছা, নশ্বর। এ-সকল বোধ হয়, আমাদের vegetable diet শাকান্ন আহারের Immediate প্রত্যক্ষ ফল। মাস কয়েক পূর্ব্বে পত্রিকায় পড়িতেছিলাম—জাপানীরা প্রায় নিরামিশভোজী বলিয়া, তাদের মধ্যে আত্মহত্যা suicideএর পরিমাণ অনুপাতে অত্যধিক। কথাটী আমার নিতান্তই সত্য বোধ হয়—vegetable dietএ মনকে gloomy, morose বিষাদপূর্ণ করিয়া তোলে, ও নশ্বরতার দিকে টানিয়া নেয়, সন্দেহ নাই।

এই পীড়ার হাত হ'তে কেমন করিয়া মুক্তি পাওয়া যাইবে? কি করা? কি আর করা? চোখ বুজিয়া আগে পাছে না চাহিয়া পূর্ণ প্রাণের সহিত যাকে সৎকাজ মনে হয়, এমন কিছুর ভিতর ডুবিয়া থাকা, এ-ছাড়া উপায় নাই। আহার বা পোষাক পরিচ্ছদের উন্নতি—সব দিকেই দৃষ্টি-প্রসার দরকার। ভাবিয়া চিন্তিয়া লাভ নাই। কিন্তু তা কি আর এ জীবনে কখনো হইবে; আমি যা, তা যে অনেকাংশে জন্ম হ'তেই হইয়া আছি, এখন শক্ত মাটী, আর কি তাকে ভিন্ন আকার দেওয়া চলে? আমি কিছুতেই আর এ জীবনে সুখ দেখিতেছি না।

ঝিনা—,২০·৮·২২।—ভাদ্রের প্রথমভাগ, ক'দিন ধরিয়াই বৃষ্টি-বাতাস হইতেছে। ডোবা, খাল, বিল, সমস্তই জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি, আমাদের এখানকার মরা 'নবগঙ্গা' নদীটীতেও যৌবন-চঞ্চলতা দেখা

দিয়াছে। মাঠের ভিতরের ধানগাছ সব কেমন সজীব দেখাইতেছে, মাঠের প্রান্তদেশে গাছের সারিগুলি কেমন সুন্দর— সবুজ মাঠ, সবুজ গাছ লতা, চারিদিকেই সবুজের বাহার! এর উপর, যখন প্রাতে কি সন্ধ্যায় আকাশে কালো মেঘ জমিয়া উঠে, ধীরে বৃষ্টি পড়িতে থাকে, সন্‌সন্‌ বাতাস বইতে থাকে ও ধানগাছগুলির উপর ঢেউ খেলিয়া যায়—তখন দৃশ্যটী আরো সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এসব চেয়েও উপভোগ্য বর্ষা-রজনী—যখন ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসে, বাতাসে গাছপালা দুলিতে থাকে, চারিদিকে মত্ত দাদুরীর দল হর্ষভরে ডাকিতে থাকে ও নানাদিকের নানা গুঞ্জনে কত লুকায়িত বাসনা জাগাইয়া, শতেক যুগের রাগিণী মিশ্রিত হইয়া প্রকৃতি গীত মুখরিত হইয়া উঠে।

এ-সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও বৈষ্ণব কবিতা, বিশেষ করিয়া বিদ্যাপতির পদাবলী, পড়িবার ও উপভোগ করিবার জিনিষ।

বিদ্যাপতি! মহাকবি বিদ্যাপতি! আমার প্রতি-বর্ষার সহচর!

বিদ্যাপতি পড়িতে পড়িতে আমি প্রায়ই আশ্চর্য্যে অবাক্‌ হইয়া ভাবি—কৈ, কোথায়, ইংরাজী, সংস্কৃত বা অন্য কোন সাহিত্যে এমন লেখা, এমন অপূর্ব্ব রাধিকা-মূর্ত্তি? কৈশোর ও যৌবনের মোহনায় পড়িয়া, রাধিকা যখন একবার সরলা লজ্জাবিব্রতা কিশোরীরূপে, আবার নব-অনুরাগিণী আত্মবিহ্বলা যুবতীমূর্ত্তিতে ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে,—সে মনমোহিনীর তুলনা কোথায়?

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক-পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত প্রকাশ॥

*　　*　　*

দিনে দিনে অনঙ্গ আগরোল অঙ্গ ॥
মাধব পেখনু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা ॥

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন-কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই ॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর-আগে করু বাস ॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর,
ক্ষণে আঁচর দেই, ক্ষণে হোয় ভোর ॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট,
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ।

কৈশোর, যৌবন একাধারে দুটীতে মিশিয়াছে—বুঝা যাইতেছে না এখনো, কে বড়, কার প্রভাব বেশী? কে অধিকতর চিত্তহারিণী—কিশোরী,

শৈশব, যৌবনে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, দোটানার মাঝে পড়িয়া বালিকা আত্মহারা—কখনো কবরী বাঁধিতেছে, কখনো খুলিতেছে, কখনো সে স্থিরনয়না, কখনো 'ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে' কটাক্ষ হানিতেছে, চরণ চঞ্চল, চিত্তও সময় সময় চঞ্চল; 'মনসিজ' এখনো 'মুদিত নয়ান', কিন্তু স্তনমূল রক্তিমাভ হইয়া উঠিতেছে, অধর 'সুরঙ্গ' দেখাইতেছে, লোচনদ্বয়

মধুমত্ত কমল-লীন ভ্রমরের মত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তার উপর 'কাজলে-সাজান' 'মদন-ধনু' শোভা পাইতেছে। আসন্নযৌবনা, 'কো কহে বালা, কো কহে তরুণী', রাই কেমন অপরূপ-দর্শনা হইয়া উঠিতেছে!

শৈশব যৌবন দরশন ভেল
দুহুঁ দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহুঁ বান্ধায় কচ, কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ, কবহুঁ উঘারি॥
থির নয়ান অথির কিছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চলভান।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান

*　　*　　*

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী-মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজ পেখনু রাই॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন যুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু॥

মাধব তুয়া লাগি ভেটহু রমণী
কো কহে বালা, কো কহে তরুণী ॥

ক্রমে যৌবনের পূর্ণ বিকাশ হইয়া উঠিল।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল ॥
কর দুহুঁ লোচন দুতক কাজ।
হাস গোপত ভেল, উপজল লাজ ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহ নত করু মাথ ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ॥

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব, মাঝ ভেল ক্ষীণ ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমক দিল পীঠ ॥

চরণ চপলতার স্থলে লোচন এখন চঞ্চল হইয়া উঠিল, নব-যুবতীর লাজ আসিয়া দেখা দিল। এক্ষণে সর্ব্বক্ষণই আঁচলে হাত, কথা কইতে মাথা আনত হইয়া আসে। কটি ক্ষীণ হইল, পক্ষান্তরে 'কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব', স্তনযুগল এখন পূর্ণ আকার ধারণ করায়, বসন শাসন মানিয়া চলিতে চায় না, সুদীর্ঘ কেশরাশি বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে—বিলম্বিত ; এমন অবস্থায় স্নানান্তে-সিক্তবসনা উৎভিন্ন যৌবনা রাইর দিকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন :—

মাধব পেখলুঁ রমণী সন্ধান।
ঝাটসে ভেটলুঁ করত সিনান॥
তনু শুকবসন, তনু হিয়া লাগি।
যো পুরুখ দেখত, তাকর ভাগি॥
*   *   *
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥

এমন চিত্তাকর্ষণীয়, সুন্দর, পুরুষের পক্ষে জগতে আর কি আছে? এমন 'বরনারী'ও যদি বিলাসবাসনার উদ্রেক না করিবে, তবে কে করিবে? এর পায়ে কত যুগ ধরিয়া কত কামনা আছড়াইয়া মরিতেছে, কত মুনি আজীবনের ধ্যানভঙ্গ করিয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছে! বিশ্ব-প্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি অপরূপা রাধিকা!

স্নান-শেষে অপাঙ্গে ঈষৎ হাসিয়া কত স্বপ্নের জাল রচনা করিয়া কুহকিনী চলিয়া গেল—

গেলি কামিনী, গজহুঁ গামিনী,
বিহসি পালটী নেহারি।
ইন্দ্রজালক, কুসুম-সায়ক,
কুহকী ভেলি বরনারী॥
*   *   *
উরহি অঞ্চল, ঝাঁপই চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে, শারদ ঘন জনু,
বেকত কয়ল সুমেরু॥

পুনহি দরশনে   জীবন জুড়ায়ব,

টুটব বিরহক ওর।

চরণে যাবক,   হৃদয়-পাবক,

দহে সব অঙ্গ মোর॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি,   শুনহ যুবতি,

চিত থির নাহি হোয়।

সে যে রমণী   পরম গুণমণি,

পুন কি মিলব মোয়॥

সন্ধ্যায় যখন সেই অপরূপ-রমণী-মণি মন্দির হ'তে বাহির হইয়া গেল, তখন,—

যব গোধূলি   সময় বেলি

ধনি মন্দির বাহির ভেলি।

নব জলধর   বিজুরি-রেহা

দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥

ধনি অলপ-বয়সী বালা

জনু গাঁথনি পুহপ মালা।

গোরি কলেবর নূনা

জনু আঁচরে উজোর সোণা॥

কেশরী জিনিয়া, মাঝারি খিনি

দুলহ লোচন-কোণা॥

ঈষৎ হাসনি সনে

মুঝে হানন নয়ন-বাণে॥

কত উদ্ধৃত করিব আনন্দবিহ্বল-মুগ্ধ পাঠক? যেখান দিয়া যাই এখন পদস্পর্শ করিয়া যায়, রক্তপদ্ম বিকশিত হইয়া উঠে, যদি কখনো কোনও অঙ্গ প্রকাশ পায় চকিতে বিজুলী-তরঙ্গ খেলিয়া যায়, চোখ মেলিলে মনে হয়, যেন কমল-ফুল ফুটিয়া উঠিল, হাসিলে বোধ হয় অমৃতবৃষ্টি হইল, কটাক্ষমাত্রে সে কত কামনা জাগাইয়া তোলে,

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি-তরঙ্গ॥
কি হেরিলোঁ অপরুব গোরি।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন-বিকাশ।
তাঁহি কমল-পরকাশ॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন-শর লাখ॥
হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥

এখন সে ধনীর দর্শনে ত্রিভুবন আনন্দে অচৈতন্য হয়!

যুবতী,

অলখিতে মোহে হেরি, বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি॥
কাহার রমনী কোউহ জান।
আকুল করি গেও হমারি পরাণ॥

সত্যই, এমনি ভাবে বিশ্ব-মোহিনীর দর্শনে আঁধার-রজনী অকস্মাৎ কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; এমনি প্রাণ আকুল করিয়া ঈষৎ হাসিয়া পাশ কাটিয়া কে চলিয়া গিয়াছে!

কেমন বিদ্যাপতির লেখার বলিষ্ঠতা, তেজস্বিতা, তেমনি আনন্দরসে টস্‌টসে ও উপভোগের অপূর্ব্ব সামগ্রী। সবই কেমন জীবন্ত! সে-কালের কবি, কেমন করিয়া এত সব প্রেমের নিগূঢ় কথার—যে সকলকে আমরা আধুনিক যুগের নিতান্ত নিজস্ব বলিয়া গর্ব্ব করি—সংবাদ পাইলেন? এমন কি, রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে তুলনায় কত খাটো হইয়া পড়েন। বিদ্যাপতির রাধিকামূর্ত্তি—সৌন্দর্য্যে, লজ্জায়, বিরহব্যাকুলতায়, মিলনানন্দে জগৎ-সাহিত্যে অতুল্য! এমন প্রেম-উন্মাদিনী প্রাণের বিপুল-রসে-ভরা জীবন্ত মূর্ত্তির সঙ্গে আর কোথায় দেখা হইবে?

বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; চণ্ডীদাসও শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা! রামী ধোপানীরই রূপান্তর রাধিকা ও তার উপাসক দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ,—পক্ষান্তরে নিরুপমা রাজরাণী লছিমাদেবীর কটাক্ষকামী রাজকবির হৃদয়-রস-স্নিগ্ধ অপারা রাজবালা—কার সঙ্গে কার তুলনা! ভক্তিতত্ত্বের দিক হ'তে চণ্ডীদাসের লেখা শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে, কিন্তু কাব্যক্ষেত্রে বিদ্যাপতির পাশে দাঁড়াইবার উপযুক্ত নয়। মিথ্যা স্বদেশহিতৈষণা যেন আমাদের ভুল-পথে না লইয়া যায়; সাহিত্যে, জ্ঞানরাজ্যে তার স্থান নাই। তা' হ'লে তো প্রকৃত কাব্যানন্দের সম্ভোগ সম্ভবপর হইবে না। আর বাঙ্গালা ভাষা—যতই কেন তার প্রশংসা করি না, তাতে দুর্ব্বলা দরিদ্রা দুঃখিনীর কাকুতি মিনতির মিহি স্বরই প্রকাশ হয় ভাল; রাজনন্দিনীর বিপুল প্রেম-প্রবাহ সম্যক্‌রূপে ধারণ করিবার ভাষা বুঝি তা নয়, তাতে যেন সে শক্তি নাই, সরসতা নাই। বিদ্যাপতির ব্রজবুলি—রাজবালা

রাধিকার মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা—সবল, সরস। চণ্ডীদাসের ভাষা—সে তো নিতান্তই নিরন্ন দুর্ব্বল দরিদ্র ব্রাহ্মণের আভরণ-হীন দুর্ব্বল ভাষা। এক মধুসূদন—এমন কি, তাঁর ভাষাও তেমন সতেজ নয়—ছাড়া বাঙ্গালা ভাষা কারো হাতে সুদৃঢ় বলীয়ান্ রূপে দেখা দেয় নাই; যেমন জাতি, তেমনি ভাষা,—কেমন মিষ্টি, কিন্তু তেজশূন্য, শক্তিশূন্য। ভাবে, ভাষায়, রসসম্পদে—বিদ্যাপতি অতুলনীয় কবি। ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ কেহ নাই। অন্য কোন সাহিত্যেই আছে কি? কৈ, যতদূর দৃষ্টি যায়, চোখে তো পড়িতেছে না।

বর্ষা-রজনী। আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছন্ন, দু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। সজোরে বাতাস বহিতেছে। চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে। এক প্রেমের আলোকে চারিদিক আলো করিয়া, কে এমন রাত্রিতে অভিসারে চলিয়াছে? বৃন্দাবনের সেই নব-অনুরাগিণী রাজনন্দিনীর কথাই মনে হইতেছে।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥

ভীম ভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল-চরণা॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥

যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার॥
বিঘিন বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥

* * *

সব যোনি পালটি ভুলালি।
আওত মানবী ভাগত লোলী॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবধূ পরাভব সহই॥

২৫·১০·২২।—আমি আমার নিজ কোটরের ভিতর প্রবেশ করিব, অর্থাৎ অন্তের সঙ্গে, বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক যতটা সম্ভব কমাইয়া আনিব। পারৎপক্ষে, কারো সঙ্গে কথা বলিব না, পরের কাজে গায় পড়িয়া হাত দিব না, কাকেও উপদেশ দিব না, যে যে-ভাবে চলুক বাধা দিব না—নিয়মমত নীরবে শুধু নিজ কাজ করিয়া যাইব। এ তো গেল বাইর সম্বন্ধে; কিন্তু অন্তর-মহলটিকে আরো আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে। নিজগৃহ, Seat of culture জ্ঞান-চর্চ্চার আবাসস্থান হইবে,—স্ত্রী, পুত্র, সকলেই সকল কাজে active, energetic, forward উদ্যোগী, কর্ম্মঠ অগ্রগামী হইবে এবং বিশেষরূপে শিক্ষিত হইবে। যে যার ভাবে, কাজে সম্পূর্ণরূপে মজিয়া থাকিবে। পোষাক-পরিচ্ছদ চালচলন—সবই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক হইবে। আহারের উপকরণের বিশেষ করিয়া উন্নতি হইবে—সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য Health before everything, গৃহের প্রধান মন্ত্র হইবে। যে আহার দেহে স্বাস্থ্য আনে ও মনকে প্রফুল্ল

উৎসাহ-উদ্যমপূর্ণ করিয়া তোলে, তেমন আহার গ্রহণ করিতে হইবে। আর আমি নিজে—গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থ-লেখায় নিজেকে ডুবাইয়া দিব, যেন জ্ঞানালোকে প্রাণের ভিতরটী পূর্ণ আনন্দ-আলোকিত হইয়া উঠে,—প্রাণের আজন্ম সাধ মিটাইয়া নিব। দেখা যাক্—শেষ কোথায়, কি?

২৬.১০.২২।—লেখা হইবে ফুলের মত নির্ম্মল, সুন্দর; বিনা আয়াসে আপন-স্বভাবের অনুপ্রেরণায় আপনি ফুটিয়া উঠিবে। যে-লেখার মধ্যে চেষ্টার সামান্য গন্ধ পাওয়া যায়, যার সঙ্গে নিশাজাগরণের সংবাদ সংশ্লিষ্ট, কৃত্রিম বলিয়া তা তেমন চিত্তানন্দদায়ক নয়। স্বাভাবিকতা naturleness সমস্ত কলাশাস্ত্র artএর প্রাণ, Effort প্রয়াস এর সৌন্দর্য্য হানি করে। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা এমন প্রাণস্পর্শী—প্রাণের মূল হ'তে আপনার ভাবে আপনি-ফোটা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ই আমার মনে হয়—কার হাতের যেন বীণা, নানা তানলয়ে আপনা হ'তেই বাজিয়া উঠিতেছে, একটুকুও চেষ্টা নাই; যেমন বাতাস বহিতেছে, ফুল ফুটিতেছে, পাখী গাহিতেছে, এও যেন তেমনি প্রকৃতির একটী নিতান্ত স্বাভাবিক বিকাশ। তাঁর লেখা পড়িতে যাইয়া স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়, পূর্ব্ব হ'তে ভাবিয়া চিন্তিয়া এমন যে কেউ লিখিতে পারে, সম্ভবপর নয়। যেমন তাঁর মূর্ত্তি, তেমন তাঁর লেখা—রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব সৃষ্টি!

কিন্তু তাঁর ধর্ম্মবিষয়ক গান বা কবিতা সম্বন্ধে এমন কথা বলা সাজে না, প্রায়ই কষ্ট-কল্পিত, ধরিয়া বাঁধিয়া জোর করিয়া যেন ভক্তরূপে ভগবানের সান্নিধ্যে নিজেকে হাজির করা হইয়াছে, প্রাণও তাদের প্রতি তাই তেমন আকৃষ্ট হয় না। এ-কারণেই মাইকেলের লেখাও অনেক সময় ভাল লাগে না—Effect produce করার জন্য Homer, Virgil, Dante,

Milton হ'তে অনেক ভাব ও চরিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রায় সকল কবির সম্বন্ধেই এই মন্তব্য কম-বেশী প্রযোজ্য।

৬.১১.২২।—পর-সৌভাগ্য হিংসা করিতে যাইয়া, নিজ হাতের মুঠার অনায়াসলভ্য সুখও ভোগ করিতে পারিতেছি না—ইহাই অনেক জীবনের Tragedy। জগতের অনেক দুঃখই opportunitiesএর অপ-ব্যবহার misuse, বা অ-ব্যবহার not-use।

নিজেকে লইয়াই মত্ত থাক ; ব্যাকুব! যা আছে, তাই ভোগ কর। দূর রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া নিজ কুটীরকে অবহেলা করিয়া তাকে বাসের অনুপযুক্ত করিয়া তোলায় কি লাভ?

আপাততঃ জৈ...বাড়ীখানাকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করিয়া সুন্দর ও বাস করিবার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। সমস্ত কক্ষগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, জিনিষপত্র সাজাইয়া গুছাইয়া আয়না-ছবিতে সুশোভিত করিয়া তুলিতে হইবে—যেন গৃহে ঢুকিলেই প্রাণ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আবাস—এখানে পিতা, পিতামহ ও তাঁদের পূর্ব্বে কত পূর্ব্বপুরুষ বাস করিয়াছিলেন। পিতামহদেব! তাঁর সম্বন্ধে যা শুনিতে পাই—কোথায় এমন তেজস্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ভক্তিমান্, অতিথিপরায়ণ, মাতৃভক্ত লোক এখনকার দিনে? মা'র পীড়ার সময় দেখিবার ছুটী না পাওয়ায়, তিনি অতি আয়ের চাকরী ত্যাগ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভাইর নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিতে যাইয়া অপমানিত হওয়ায়, একপ্রকার প্রৌঢ়বয়সে অশেষ অধ্যবসায় সহকারে ইংরাজী শিখিয়া পরীক্ষায় পাশ করিয়া, কনিষ্ঠ ভাই গৌরবময় যে বিচার-বিভাগে কাজ করিতেন,—তাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গ্রামে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। পূজার সময় যখন গ্রামে

আসিতেন, প্রজারা তার পূর্ব্বেই রাস্তার ডোবা-খালের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রাখিত—ভয়, পাছে তাঁর নৌকা আসায় অসুবিধা হইলে কিলচড় খাইতে হয়। দূর হ'তে দামামার শব্দ শুনিলেই, গ্রামবাসিরা বুঝিত রায়…মুন্সীর নৌকা আসিতেছে। বাড়ীর ঘাটে নৌকা পৌঁছিতে, প্রজারা ও গ্রামের যত ছেলেপুলেরা যাইয়া আনন্দে জড় হইত। তিনি কুলপুরোহিতকে প্রণাম করিয়া, মা'কে প্রণাম করিয়া, ছেলেপুলেদের ও প্রজাদের ভিতর বাতাসা ও কলা বিতরণ করিয়া– নৌকা হ'তে অবতরণ করিয়া নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া হাস্যবদনে গৃহে প্রবেশ করিতেন। দুর্গা পূজার সময় অনাহারী থাকিয়া তাঁর ধ্যানধারণায় পূজায় তন্ময় থাকিতেন, 'মা' 'মা' করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেন। তখন মহিষ-বলি ছাড়া পূজা হইত না। শুনিয়াছি, একবার মহিষের যোগাড়ে বিলম্ব হওয়ায় পুরোহিতদের সঙ্গে রাত্রি পর্য্যন্ত নিরম্বু অবস্থায় স্থিরভাবে বসিয়া ছিলেন, মহিষের পরিবর্ত্তে পাঁঠা বলি দেওয়ার কেউ প্রস্তাব করিলে, রাগে মহিষের বদলে তাকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এমন অতিথিপরায়ণ ছিলেন, যে, ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে বাড়ী যখন শত শত অতিথিতে সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ থাকিত, তখন তাদের আহারের জন্য পূর্ব্ব হ'তে পুকুর হ'তে জাল দিয়া মাছ ধরাইয়া রাখিতেন, পাছে অতিথিদের শোবার কষ্ট হয় এজন্য বিছানার সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন, এমন কি, প্রয়োজন হ'লে—নিজের বিছানা ও মশারি অতিথির ব্যবহারে দান করিতেন। অতিথি তখনকার দিনে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপই ছিল। রায়…মুন্সীর কত কথা এখনো গ্রাম বৃদ্ধদের মুখে শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু বেশী দিন নয়, তাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সে-সব স্মৃতি লুপ্ত হইবে। বর্ত্তমানকালের আদর্শ অনুসারে, তাঁর চরিত্র-দোষও যথেষ্ট ছিল—কিন্তু গুণের তুলনায় তার পরিমাণ অতি অল্প। প্রাচীন সব আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মানুষ নূতন-

ভাবে গঠিত হইতেছে, কিন্তু তাও তাঁর কাহিনীর বিষয় যখনই শুনি, মনে কেমন আনন্দ হয়! খাঁটী অকপট দৃঢ়চিত্ত প্রকৃত মানুষ। আর কেমন বিশ্বাস, ভক্তি! সেই সরল বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া, ভক্তিতে প্রাণ ভরিয়া, ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া, পূজা পার্ব্বণে নিযুক্ত থাকিয়া, কেমন সুখেই না জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন! তাঁর কনিষ্ঠ-পুত্র আমার পিতৃদেব, তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। চরিত্রবান্, গম্ভীর, মহাপুরুষ! তাঁর তুল্য কাকেও দেখিতেছি না। আমরা তাঁর সন্তানগণ—কি সাহসিকতায়, কি চরিত্র-কাঠিন্যে, এমন কি দেহের বল, আকার সম্বন্ধে—সকল বিষয়েই কেমন খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছি! পিতামহদেবের পূর্ব্বের বংশের কারো সংবাদ আমরা জানি না, বংশের পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতিপূজা আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নাই! এই গৃহেই,—মেজ-দাদা ও আমরা বাল্যকালে খেলাধুলা করিয়াছি, কেমন সরল, স্নেহপরায়ণ ছিলেন! আমার বৌঠাকুরাণী দুজন—মহা সুন্দরী, সুরসিকা, হাস্যময়ী, স্নেহপরায়ণা—তাঁদের সঙ্গে কত আনন্দে কত সময় এখানে কাটাইয়াছি! মায়ের মতন স্নেহশীলা ধাই মা! কই তাঁরা সব আজ? একবারও তাঁদের কথা মনে করিবার সুযোগ হয় না—সময় নাই, সারাদিন কত কাজ আমার! এখানেই আমার প্রভা…আমার দেবী, অন্তিম-শয্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছিল। আমার প্রাণ শূন্য করিয়া কোথায় চলিয়া গেল প্রাণাধিকা আমার? আর তো এ-জীবনে তাকে দেখিতে পাইলাম না—এমন কি, স্বপ্নেও আর তাকে দেখিতে পাই না। 'আত্মা' রূপে সে কি আজও আমার দর্শন-প্রতীক্ষায় বাঁচিয়া আছে?

পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতি, যাঁরা চলিয়া গিয়াছেন—সকলের স্মৃতি জাগরূক করিয়া রাখিতে হইবে। বংশের একখানা ইতিহাস গৃহে স্থান পাইবে, বংশের সব ব্যক্তির প্রতিকৃতি রক্ষিত হইবে—একটী কক্ষ তাঁদের কীর্ত্তি-

কাহিনী-জীবনজড়িত জিনিষের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ইংরাজদের প্রাচীন বংশ সকলের কথা পড়িয়া থাকি, কত শত বছরের স্মৃতি তারা জাগরিত করিয়া রাখিয়াছে; দেশের জন্য বংশের জন্য কে কোন্ যুদ্ধে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, কে কবে কোন্ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কে কবে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রগর্ভ হ'তে কোন্ অসহায় বিপন্ন যাত্রীকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজ-প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কে কবে কোন্ গ্রন্থ রচনা করিয়া বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন—কোন কথাই ভুলিতে দেওয়া নাই। এই তো জীবন্ত মানুষদের জীবন। আর আমরা? সবই অসার অনিত্য মনে করিয়া, নিজ-জীবনও অসার এবং নিতান্ত অনোপভোগ্য-জ্ঞানে মুছিয়া ফেলি। প্রতি বছর, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি বংশ-ইতিহাসের চর্চ্চা হয় এবং বংশের সকলে মিলিত হয়—তা হ'লে জীবনের কত না একটী আনন্দের নূতন অধ্যায় খুলিয়া যায়!

কি সব Day-dream স্বপ্নমোহে আমি মাতিয়া গিয়াছি! থাক্—আজ এ-পর্য্যন্ত।

১৩.১১.২২।—প্রফেসার Thomson সম্পাদিত Outline of Science নামে বিশখণ্ডে প্রকাশিত Serialএর গ্রাহক হইয়াছি এবং মাঝে মাঝে পড়িতেছি। পড়িতেছি, পড়িতেছি—আর বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছি। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায়—মানবীয় শক্তি ও চিন্তা কতদিকেই না ধাবিত হইতেছে, বিজ্ঞান-সাহায্যে কি সব অচিন্তনীয় ব্যাপারই না সম্পন্ন হইতেছে! Astronomy, Steam, Electricity, Evolution, Aerial Flying, Meterology, Wireless Telegraphy, Bactriology, Photography, কত কি; যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, মনে হয়, কোন্ এক যাদুকরের স্পর্শে ধরনীর বক্ষ ভেদ করিয়া নানাদিক

হ’তে সহস্রধারায় সত্যের, তত্ত্বের আলোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কি অধ্যবসায় ও আনন্দের তাড়না লইয়া লোক সকল সাধনায় মগ্ন হইয়া আছে!

পড়িতেছি, আর আমার পতিত হতভাগ্য দেশের কথা ভাবিতেছি। অসারতা-বিষে জর্জ্জরিত জীর্ণ-দেহ হইয়া, জীবনকে সে নিতান্ত অসার ভাবিতেছে এবং অসারে আপনাকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে! এক সময় ছিল, যখন এই ভূমিতেও জ্ঞান-শিখা প্রখররূপে প্রজ্জ্বলিত ছিল, যখন সত্য-সন্ধানে মানুষ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, আজীবন সংসারের সুখসম্ভোগ ধনবান হ’তে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া—সাধনায় তন্ময় থাকিত। তাই তো দেখি, জগৎ সভ্যতার আদি-ইতিহাসে—কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, কি অঙ্ক, কি ব্যাকরণ, কি কাব্য, দর্শন, রসায়নশাস্ত্রে—ভারতের প্রধান ও সর্ব্বাগ্রে গৌরবময় স্থান। ক্রমে, দর্শনের চর্চ্চা করিতে করিতে বাহিরের দৃষ্টি অন্তরের দিকে নিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে—সংসার অসার, জীবন অনিত্য, ধনবান বিত্ত মূল্যবিহীন, এক ভগবান ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা, অন্য-দিকে সব-চেষ্টা, বৃথা-চেষ্টা শক্তি-অপব্যয়—এ-মহাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল! মোহ-বশে মনের মাঝে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া উঠিল, যে, অমৃতের আধারের সন্ধান সে পাইয়াছে, তা-পানে সে অমর হইয়া যাইবে। এখনো সেই মোহেই মজিয়া আছে সে, আফিংখোরের মত ঝিমিয়া ঝিমিয়া অসারত্বের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া সমস্ত দিক হ’তে হাত গুটাইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। ইয়ুরোপ সংসার-বিষয়-বিভোর, বিজ্ঞানবলে তাকে করায়ত্ত করিবার জন্য কতভাবে তার চেষ্টা! এই চেষ্টার উপরেই তো মানবীয় সভ্যতা এ-পর্য্যন্ত গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাই মানুষকে অন্য প্রাণী হ’তে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া তুলিয়াছে। যাতে জীবন-যাপন সুখকর হয়, দেহ যাতে সুস্থ সবল থাকে, এবং জ্ঞানানন্দে যাতে তার

পুষ্টিসাধন হয়, দেহের মনের স্বাভাবিক দাবির যাতে চরিতার্থতা হয়—কতদিন হ'তে তার জন্য কত অক্লান্ত চেষ্টা হইতেছে, এমন কি, মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার আকাঙ্ক্ষাও তাকে উদ্বোধিত করিতে ছাড়ে নাই। সব জিনিষই সে হাতে কলমে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন কি, মনোরাজ্য, যে দিকে নাকি আমাদের পূর্ব্বাপর সূক্ষ্ম ও অতুল্য দৃষ্টি, তাও দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ভৌতিক জগৎ, মৃত্যু-অন্তে যেখানে নাকি আমাদের বাস, তার দিকেও তো বিজ্ঞানের আলো নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। Psychical Research, Psyco-Analysis, Telepathy, Hypnotism ইত্যাদির কথা যখন পড়ি, তখনই দেখিতে পাই, মনোরাজ্য-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীকেও Mechanical Lawsএর মধ্য দিয়া বুঝিবার কেমন চেষ্টা হইতেছে।

কে ঠিক পথে চলিয়াছে—ইয়ুরোপ না ভারতবর্ষ? ভারতবর্ষ! সে তো মৃত!

নিজ-দেশের কথা মনে হ'তেই, সেই প্রাচীন-পরিচিত ছবিটাই চোখের কাছে ভাসিয়া উঠিতেছে—হিমালয়, ও তার শৃঙ্গে গুহায় স্থাপিত তীর্থ দর্শনের অভিলাষী যাত্রীর দল। কত যুগযুগান্তর ধরিয়া, কত কত অসংখ্য নরনারী সংসার-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া, হিমালয়-বক্ষে—গহ্বরে, বনে, আশ্রমে যাইয়া স্থান লইতেছে। এমন যে চাক্‌চক্যময় এত সুবিধা-সম্পদ-সম্পন্ন পাশ্চাত্য-সভ্যতা এতদিন ধরিয়া বিরাজ করিতেছে—কই সেও তো মনকে, ভারতীয় নিগূঢ় আত্মাকে সে দিক হ'তে আকর্ষণ করিয়া সংসারে বসাইতে পারিতেছে না! এখনো, কত সহস্র, লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী—হিমালয়, বিন্ধ্য, আরাবলীর গহ্বরে গুহায়, গঙ্গার তটে কাশী হরিদ্বার কত স্থানে, পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্বালায় দগ্ধচিত্ত হইয়া শান্তি লাভের আশায় সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, একমাত্র ভগবানের

সেবায় মজিয়া আছে। সে ছাড়া সংসারের আর সবই—রেল, ষ্টীমার, মোটরকার, বিদ্যুৎ বিজ্ঞান-বলে প্রাপ্ত কত কি,—সবই যে মিথ্যা। কিন্তু সত্যই কি তাঁর সন্ধান তারা পাইয়াছে, কেউ কি এ পর্য্যন্ত পাইয়াছে? সত্যই কি প্রাণে অনাবিল শান্তি দেখা দিয়াছে, সত্যই কি বিমল আনন্দে তারা তন্ময় হইয়া আছে, মনুষ্য-জীবন-যাপন কি তাদের স্বার্থক হইয়াছে? আমারও প্রাণ-পাখী এখন হ'তে খাঁচার ভিতর মাঝে মাঝে কেন ডানা আছড়াইয়া মরে? কি চায় সে? হিমালয়ের শান্তি, মুক্তি, স্বাধীনতার ডাক্, আমারও কাণে যে আসিয়া লাগিতেছে! তার পাহাড় পর্ব্বতে আমি নিজেকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতে পাইতেছি; প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যালোকে পাহাড়ের গাছ লতা শৃঙ্গ সব হাসিয়া উঠিতেছে—সেই নির্ম্মল আকাশের নীচে—কে? একাকী দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে—সে?

ইয়ুরোপের দৃষ্টি এ-জগতের দিকে আকৃষ্ট,—আমাদের পর-জগতের। পর-জগৎ কি আছে? তবে কেন এ-জগৎ লইয়াই মজিয়া থাকি না? কেমন সুন্দর ইয়ুরোপীয়দের বাড়ীঘর, কেমন তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, ফুট্‌ফুটে ধপ্‌ধপে, কেমন স্বাধীন স্বচ্ছন্দগতি—কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব, ষ্টিম্, বিদ্যুৎ, ফটোগ্রাফি, মটোরকার, এরিওপ্লেন, টেলিগ্রাফ—বিজ্ঞানের কত কি আবিষ্কারের ফলে কেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ তাদের জীবন! কেমন উৎসাহ, উদ্যম,—ফূর্ত্তি! বৃদ্ধ তাদের মাঝে নাই। কেন তাদের অনুসরণ করি না আমরা?

কিন্তু তা কি হইবে? শান্তিধাম হিমালয়—তার তুলনা কোথায়? ইয়ুরোপীয় সভ্যতার কোলাহলের ভিতর ভগবান্ কোথায়? জীবনের কতটা অংশ সেই সভ্যতার সঙ্গে জড়িত হইয়া কাটানো যায়? প্রেম, পবিত্রতা, শ্রদ্ধা, নির্ম্মলতা, মুক্তি, নির্ব্বাণ,—তার ভিতর কোথায়?

কোন্ পথে যাইবে ভারত?

২১-১১-২২।—কলিকাতার Art Collegeএর প্রিন্সিপ্যাল Percy Brownএর লেখা Indian Painting নামে ক্ষুদ্র বইখানা কয়েকদিন হইল পাঠ শেষ করিয়াছি। বেশ বই, ভারতের চিত্রকলার বেশ একটা ধারাবাহিক ইতিহাস; মোটামুটি অল্পের ভিতর সব কথাই জানা যায়। ইংরাজদের এটা একটা প্রধান গুণ, যে, সকল বিষয়ের ভিতরই শৃঙ্খলা আনিতে পারে এবং অল্প পরিসরের মধ্যে সব কথা বেশ গোছাইয়া বলিতে পারে। ইহা তাদের অনেকদিনের ধারাবাহিক জ্ঞানচর্চ্চার ফল, সমস্তই অল্পেতে তারা বুঝিয়া লইতে পারে ও assimilate আয়ত্ত করিতে পারে। তাদের General level of intellectual culture সাধারণ জ্ঞানের সীমা আমাদের অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে। এ-দেশের লেখকও চিত্রকলা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখেন, তাতে কেবল বিদ্যার দৌড় ফলানই থাকে—কেবল শাস্ত্রের কচ্‌কচানি, সাহিত্য-দর্শন ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ, এবং Ruskin হ'তে quotation উদ্ধৃত-অংশে ভরা, অর্থাৎ undigested অজীর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ।

Brownএর বই পড়িয়া দেখা গেল, প্রাচীন ভারতের চিত্রের সংখ্যা এক্ষণে নিতান্তই কম। ভারতের আর্দ্র হাওয়া ও মুসলমানদের দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া যে খানকয়েক কালের আক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখনো বিরাজমান—তাদের মধ্যে অজন্তা গিরিগুহার চিত্রাবলী, লঙ্কাদ্বীপের সিজিরিয়া পর্ব্বতের ভিতরকার গহ্বরের গায়ে অঙ্কিত এবং গোয়ালিয়ার রাজ্যের বাগ্ নামক স্থানের চিত্রসমূহই শ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য। অজন্তার চিত্রাবলীকে Brown চিত্রকলা-ক্ষেত্রে প্রতীচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস The greatest record of painting in the East—বলিয়াছেন। বুদ্ধদেব, তাঁর জীবন এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ব্যাপার লইয়াই এ-সকল চিত্র

অঙ্কিত। বৌদ্ধেরা যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁদের অনুপম চিত্র ও অঙ্কন-সম্ভার লইয়া গিয়াছেন; সৌন্দর্য্য-রসে প্রাণ ভিজাইয়া, ধর্ম্ম-গুরুর অতুল্য জীবনকাহিনী অঙ্কিত করিয়া তাঁর অনুকরণে তাঁরা লোক-হিতার্থে নিজ নিজকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধধর্ম্মের কল্যাণে, এক সময় ভারতীয় সভ্যতা সমস্ত এশিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; অজন্তা গুহার অনুকরণে রচিত চিত্র মধ্য-এশিয়ার খোটানে পাওয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে, প্রাচীন ভারত সকল বিষয়েই নিজ নির্দ্দিষ্ট পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিল এবং সমস্তক্ষেত্রেই সে অসাধারণ কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব দেখাইয়া গিয়াছে। সে যেমন গূঢ়তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছিল এবং যে ভাবে ও রূপে তা প্রকাশ করিয়াছিল—ইয়ুরোপ, এত শিক্ষা-বিজ্ঞান-মদগর্ব্বিত ইয়ুরোপও, তা পারিতেছে না। কর্ম্মমত্ত ইয়ুরোপের মোটা কর্কশ হাতে মোটা জিনিষেরই রচনা হয়—সেখানে মসলিন তৈয়ার হয় না, তেমন ধৈর্য্যশীলা নারীর কোমল অঙ্গুলি কোথায়? সূক্ষ্মকে হৃদয়ঙ্গম ও প্রকাশ করিবার তাদের তেমন শক্তি নাই, সময় নাই, অথচ এই সূক্ষ্মের বিকাশ ও সমাবেশই সমস্ত ললিতকলার প্রাণ—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ভাবে যা তাদের লাবণ্য দান করিয়া আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। প্রাচীন ভারতের কথা যখনি ভাবি—তার কাব্য, নাটক, দর্শন, ব্যাকরণ, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, আরো কত কি, তখনই বিস্ময় শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া পড়ি; এত খরচ করিয়া, এত গলদ্ঘর্ম্ম করিয়া যে আমরা এখন লেখা পড়া করিতেছি—ইহাই কি জ্ঞান-চর্চ্চার প্রকৃত পথ, প্রাচীনের তুলনায় বর্ত্তমান ভারত কি অধিকতর জ্ঞানী? উইর ঢিপীর রচনা যথেষ্ট হইতেছে—কিন্তু সমুন্নত পর্ব্বত,—কোথায়? বাল্মীকি, ব্যাস, পাণিনির সমকক্ষ কোথায় পাওয়া যাইবে? ইহাও মনে হয়, শিক্ষার মূলসূত্র, আমাদের জাতির

ধারার যা অনুকূল, তা বুঝি হারাইয়া ফেলিতেছি এবং কতকগুলি বড় বড় কথা ও বিজাতীয় ভাবের বোঝা পিঠে চাপাইয়া—মিছা নিজেদের মহাজ্ঞানী জ্ঞানে মহাগর্ব্বে লম্বা লম্বা পা ফেলাইয়া বেড়াইতেছি। পূর্ব্বের সে সরলতা, একাগ্রতা, সাধনায় শ্রদ্ধা ভক্তি তন্ময়তা এবং সকল বিষয়ে সহজ অনাড়ম্বর স্বাভাবিক 'আপনাতে আপনি বিকাশের' ভাব নাই,—সমস্তের উপরই অনাবশ্যক জটিলতার স্তর, আড়ম্বর।

ভারতে আবার নূতন করিয়া প্রাচীন চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। অবনীন্দ্রনাথ এ-জাগরণের নেতা। কিন্তু তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রের ভিতর প্রাণ-পরিচয় অতি কম, অনেক সময়ই চিত্রগুলি কেমন অস্বাভাবিক—অজন্তার চিত্রকরের তুলনায় কত নীচে তাঁরা ; তাও, বিলাতী অনুকরণের ছবি অপেক্ষা অনেক ভাল। কবে যে ভারতের চিত্ররাজ্যে আবার মহাচিত্রকরের অবির্ভাব হইবে—যাঁর চিত্রের মধ্য দিয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সম্মিলনে-গঠিত আশা-পুষ্ট দুঃখ-দীর্ণ বর্ত্তমান ভারতের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইবে ?

২৬.১১.২২।—আমি চাই,—শান্তি, নিরাবিল শান্তি। কিন্তু তা কি পাওয়ার উপায় আছে ?

অল্পেতেই আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ি, ঘাবড়াইয়া যাই। কেন এমন হয় ? আমার জন্ম হ'তে প্রাপ্ত দেহের ধর্ম্ম, আর দোষ শিক্ষার।

হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষায় যে মানুষকে ক্রমে দুর্ব্বল ও ভীরু করিয়া তোলে এর প্রমাণ, এমন কোটী কোটী লোকের বাসস্থান—এতকাল ধরিয়া পরাধীন। জগতের অন্যত্র কোথাও এ দৃশ্যের তুলনা নাই।

আমাদেরই দেশের মুসলমান—যাদের প্রায় সমস্তই এই হিন্দুজাতিরই এক সময় একাঙ্গ ছিল—আমাদের অপেক্ষা কত সাহসী, কঠিনমনা।

তাদের ধর্ম্ম, সাধারণ লোকমত ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—অত 'আত্মা' 'পরমাত্মার' সূক্ষ্ম কূটবিচার নাই; মার খাইলে মারিতে হয়—আত্মসম্মান বজায় রাখিবার ইহাই একমাত্র সহজ প্রকৃষ্ট উপায়—ইহা তাদের অস্থিমজ্জাগত ধর্ম্ম। মরাকে তারা ভয় করে না, অর্থনাশের ভয় করে না—নিজ অধিকার পরহস্তগত করিয়া দিতে তারা অনিচ্ছুক। ধর্ম্মই, তাদের বাল্যকালাবধি মহা সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তোলে। ধর্ম্মের অনুশাসনে আমরা প্রায় নিরামিষাশী। নিরামিষ আহারী ও মাংসাহারী—বলবীর্য্যে কে শ্রেষ্ঠ, তার প্রমাণ পশুরাজ ব্যাঘ্র সিংহ ও বিশালকায় গণ্ডার, মহিষ; তার প্রমাণ ইয়ুরোপীয়েরা ও আমরা, মুসলমান ও হিন্দু। মানুষ হ'তে পশুত্বের ভাবটা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া, দয়া, ভালবাসা, বিনয়, ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণে তাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে যাইয়া—আমরা অপদার্থ ভীরু অ-মানুষে পরিণত হইয়াছি এবং এত লোকের লাথিগুঁতা খাইয়াও আপনাদের ভগবানের মহা অনুগৃহীত বলিয়া মনে করিতেছি। উপদেশ লইয়া, বই পড়িয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া, সভা-সমিতিতে Resolution প্রস্তাব পাশ করিয়া সাহসী হওয়া যায় না; সাহসিকতা-যে দেহের ধর্ম্ম, হঠাৎ বাহির হ'তে দেহে ভরিয়া দেওয়া অসম্ভব।

প্রকৃত মানুষ হ'তে হ'লে—এই কুধর্ম্ম অনেকাংশে ভুলিতে হইবে; আহারের বিশেষরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি জীবনাদর্শ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, বাল্যকাল হ'তে ছেলে মেয়েকে নূতন আদর্শে গঠিত করিতে হইবে।

অত অ-কাজে ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকে গলা বাড়াইয়া চোখ বুজিয়া গভীর চিন্তার দরকার নাই। সুমুখে যখন যে কাজটা পড়ে, তাই ভাল করিয়া কর। পশুর মত, চিন্তার মাত্রাটাও যত কম হয়,

ততই ভাল এবং যে আহারে—মাছ মাংস—শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট না করিয়া, এ ভাবটা বজায় রাখে, তার দিকেই ঝোঁক দাও। ভীরু, কাপুরুষ, কাছা-খুন্ত, নিরামিষাশী সাধুর দরকার নাই—অকর্ম্মার দল! এত যুগ ধরিয়া সাধুর চাষ করিতে করিতে এদেশে মানুষের অভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—আর যে সব সাধু পূজা পাইয়া আসিতেছেন, তারা কি সত্যই সাধু?

১.১২.২২।—সুবিখ্যাত সংবাদপত্র-পরিচালক Lord Northcliffe-এর কথা পড়িতেছিলাম। সংবাদপত্র-মহলে তিনি Napoleon আখ্যা পাইয়াছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন Notesএর কথা পড়িতেছিলাম। তাঁর মত ছিল, লেখা—Bright, Brief, ও Accurate উজ্জ্বল, আকারে ক্ষুদ্র, ও সঠিক হইবে। আমারও এই মত। তা ছাড়া, যাতে লেখার ভিতর দর্শন philosophyর ভাব মাখা থাকে, ভাবে-ভরা থাকে, এবং যাতে তা যতদূর সম্ভব Particular হ'তে Usriversalএর দিকে মনকে লইয়া যায়, এমন কিছুর সমাবেশ যাতে থাকে, দেখিতে হইবে; তা হ'লেই লেখা সরস ও চিত্তাকর্ষক হইবে। Brightness ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে Strength শক্তি ও সহজগতির সমাবেশ দরকার।

২.১২.২২।—কাল প্রাতে বাসার সুমুখের ক্ষুদ্র মাঠের ভিতর ঘুরিতে-ছিলাম, হঠাৎ মনে হইল—আমার এই 'হৃদয়-বাণীর' নাম বদলাইয়া 'যুগ-মানব' Man of the Century রাখিলে হয় না। আমাকে বুঝিবার জন্য, আমাকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, আমি কে, কি জানিবার জন্য—কতদিন হ'তে একটা আকাঙ্ক্ষা আকাশবক্ষে চাঁদের মত সর্ব্বক্ষণ প্রাণে জাগিয়া আছে। কিসে আমার সুখ, কিসে দুঃখ, অশান্তি, কেন

আমার নানা সময়ে নানা ভাব, এই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও সংস্কারে মানুষ কি ভাবে চালিত হইতেছে, কেমন 'আমি' গঠিত হইয়া উঠিতেছি—সব দেখিব। Idea ভাবটা নেহাৎ মন্দ বোধ হইতেছে না। কিন্তু আমি কি সত্যই বর্ত্তমান যুগের Representative man? প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মের ছাপ বক্ষে ধারণ করিয়া, তার সংস্কার এবং ইংরাজী ও প্রাচীন শিক্ষায় গঠিত, নব্য-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত-চিত্ত 'আমি'—কে? এই যে সংশয়-বাদী, আদর্শ-অনুসরণ-প্রয়াসী, অব্যবস্থিতচিত্ত, বিশ্বাস-ভক্তিহারা লোকটা,—কে এ? এই কি ভবিষ্যতের পূর্ব্ববংশধর?

৪.১২.২২।—অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। ধীরে শীত-প্রকোপ বাড়িতেছে, সূর্য্যতেজ কমিতেছে। এখনকার প্রাতঃকালটা বেশ আনন্দদায়ক—মিষ্টি রৌদ্র, মিষ্টি বাতাসের হিল্লোল—বেড়াইতে গেলে রৌদ্র ও বাতাস মুখে চোখে লাগিয়া বেশ একটা প্রফুল্লতা ও স্বাস্থ্যের ভাব আনে। বর্ষার শেষ দিক্‌টায় প্রকৃতি যেন যুদ্ধে শেষটায় জলের সঙ্গে পরাস্ত হইয়া তার হাতে হাল ছাড়িয়া সব সঁপিয়া দিয়াছিল। কত গাছ, সতেজ লতা, কত রকমের কত ফুল—জলের নীচে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল! তখন চারিদিকে জলেরই শোভা ছিল—স্ফটিকের মত নির্ম্মল। শেষদিকে বহুদিন ব্যাপী বলিয়া তাহাও কিন্তু আর আনন্দ দিতে ছিল না। তাই বুঝি পট-পরিবর্ত্তনের পালা আসিল, ঝড়বাত্যা-বারি-সঙ্কুল বর্ষা চলিয়া গেল, সুনীল শুভ্র আকাশ লইয়া শরৎ-লক্ষ্মী দেখা দিল। শরতের প্রভাত—তুলনা নাই তার; তার সোনালি আলো যেন আমার প্রাণের প্রতি কণায় কণায় প্রবেশ করিয়া তাকে সরস উজ্জ্বল করিয়া তোলে। এখন বর্ষার চিহ্নটাও যেন নাই; এত জল, কোথায় যাইয়া সব লুকাইল? এতদিন পরে গুপ্ত-সম্ভার ব্যক্ত করিয়া প্রকৃতি যেন আবার নূতন বেশে

দেখা দিতেছে, চারিদিকে গেঁদা অতসী প্রভৃতি নানারঙ্গের কত সব নূতন ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে, নূতন শাক সব্জীতে বাগান ভরিয়া উঠিতেছে। নূতন সব পাখীও দৃষ্ট হইতেছে। বর্ষা গিয়াছে, কিন্তু শীত নিকটে, তাই প্রকৃতি আবার যেন ধীরে ধীরে নিজ কলেবর গুটাইতেছে। এখন মাঠ শস্যশূন্য, ধানকাটা সারা হইয়াছে, মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে কেবল সরিষা-ফুলে ক্ষেত হলুদ হইয়া উঠিতেছে।

কই প্রাণে কিছুতেই আনন্দ পাইতেছি না। প্রাণের ভিতরকার আনন্দ-পাত্রটাই যেন চিরকালের জন্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—শূন্য!

১৩.১২.২২।—এ'বার লইয়া জলধর সেনের 'হিমালয়' চারিবার পড়া হইল। এমন মধুর, চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাঙ্গালা-ভাষায় আর নাই, অন্য ভাষাতে আছে কিনা জানি না, অন্ততঃ আমার চোখে পড়ে নাই।

ভাল বই বার বাঁর পড়া যায়। গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতা এই মাপ-কাঠি দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমি কতবার পড়িতেছি—প্রতিবারেই নূতন, সুন্দর, 'মন-মনোহর'; কিন্তু হেমচন্দ্র,—একবার শেষ করিতেই হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। বিদ্যাপতি চিরচিত্ত-নন্দন, কিন্তু চণ্ডীদাস শেষ পর্য্যন্ত পাঠ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়; চণ্ডীদাস তাও পড়া যায়, গোবিন্দদাস ব্যতীত তাঁর পরে যে সকল পদকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁরা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ভাণ্ডার হ'তে চুরি করিয়া নিজেদের ঘর কিছু সাজাইয়াছেন, কিন্তু প্রতিভার স্ফূরণের অভাবে সে সব লেখা প্রাণহীন, রসশূন্য, পাঠ করা এক কঠিন ব্যাপার।

'বর্ত্তমান জগৎ' অবশ্য খুব ভাল বই, তাহা ব্যতীত 'ভারত-ভ্রমণ', 'ভূ-প্রদক্ষিণ' প্রভৃতি অনেক ভ্রমণবৃত্তান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের কলেবরে স্থান পাইয়াছে। শেষোক্ত সকল বইতে নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক আজগুবি

সংবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হ'তে পারে, কিন্তু বইর যা মূল—কোনও personality বিশেষত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তির বা idealism আদর্শ-অনুসরণরূপ ভাবের সঙ্গে দেখা হয় না। 'হিমালয়ে'-লেখকের নিজ মূর্ত্তিটী—মৃত পিতা মাতা স্ত্রী কন্যার শোকে দগ্ধপ্রাণ, সংসার-জ্বালায় দগ্ধ, হিমালয়ের শান্তিময় বুকে আশ্রয় লইয়া ক্ষত জুড়াইবার জন্য একান্ত অভিলাষী—যা ফুটিয়াছে, তা একাধারে শোকোদ্দীপক ও মধুর! কোনও বাগাড়ম্বর নাই, বাড়াইয়া বলিবার ইচ্ছা নাই, আমাদেরই মত নিতান্ত সাধারণ লোক, নিত্যনৈমিত্তিক দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া, আমাদেরই মত হিমালয়ের বুকে মাথা গুঁজিয়া শোক নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত। কোনও কথার ঘোর-প্যাঁচ নাই, প্রাণ খুলিয়া সব শোক সুখের কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা—তার উপর কেমন একটু সরস মিষ্টি রসিকতা সমস্ত লেখা আবরণ করিয়া রাখিয়াছে! লেখকের সঙ্গী যে দুটী সন্ন্যাসীর উল্লেখ বইতে আছে—একটী জ্ঞানবৃদ্ধ স্নেহপূর্ণ স্বামিজী, আর একজন সংশয়বাদী, সদা-সুখাদ্য-ভোজনলোলুপ, সাধারণ সকল ব্যাপারে কঠোরপ্রকৃতি ও স্বার্থলিপ্ত, কিন্তু বিপদকালে নিজ প্রাণ দিয়াও পরকে বাঁচাইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত 'বৈদান্তিক ভায়া'—উভয়েই মনের উপর কেমন দাগ রাখিয়া যায়! এখনো যেন আমি পর্ব্বতের চড়াই উতরাইর উপর দিয়া দণ্ড-হস্তে তিন তীর্থযাত্রীকে বদরিকাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইতেছি। মাত্র মাসদুই-ব্যাপী সময় লইয়া এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচিত, গন্তব্যস্থল—দেরাদুন হ'তে বদরিকাশ্রম, বেশী হ'লে দু'শ মাইলের রাস্তা—কিন্তু লিখিবার ভঙ্গীতে, সরসতায়, শব্দ-সম্পদে ও বর্ণনার মাধুর্য্যে বইখানা কেমন না উপাদেয় হইয়াছে! ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্ব হ'তে ভাবিয়া চিন্তিয়া এমন বই লেখা যায় না, লেখকের প্রাণ হ'তে একপ্রকার তাঁর অলক্ষিতে কথা-সব বাহির হইয়া আসিয়াছে! শান্তিপ্রয়াসী ভক্তিপূর্ণ চিত্তের প্রতিবিম্বটী যা গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে—কেমন করুণ-রসোদ্রেক, সুন্দর!

গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন, 'আমার এই সামান্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প'ড়ে যদি কারো প্রাণে "হিমালয়"-দর্শন-ইচ্ছা প্রবল হয়, তাহা হোলেই—আমার এসব লেখা সার্থক হবে, এবং সেই হিমালয়ের দেবতা ভগবানের চরণে যদি কেহ অগ্রসর হোতে পারেন, তা হ'লে আমার জীবন সার্থক হবে।' সত্যই, 'হিমালয়' লিখিয়া তিনি সার্থকজীবনই হইয়াছেন। এই বইতে তিনি চিরশান্ত চিরমধুর হিমালয়ের অপরূপ গম্ভীর ও মহান্ সৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তা' পাঠে কোন্ বাঙ্গালীর প্রাণ না তার কোলে যাইয়া মাথা পাতিবার জন্য পাগল হইবে? যখনি আমি 'হিমালয়' পড়িয়াছি, তখনি হিমালয়-দর্শনের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই 'যোশীমঠ', সেই 'বদরিকাশ্রম', 'রুদ্রপ্রয়াগ', 'দেবপ্রয়াগ' 'চটীর' সেই বন্ধনমুক্ত পান্থজীবন, সরল স্বাস্থ্যপূর্ণ পাহাড়িয়াদের সরল ঘরকন্না—কত কি চিত্র একসঙ্গে উত্থিত হইয়া আমার মনকে অভিভূত করিয়াছে এবং এই সংসারের রজ্জু ছিন্ন করিয়া তাদের দিকে দৌড়াইয়া যাইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছে। আমার জীবনের এ-আকাঙ্ক্ষা, এ-মহাসাধ কখনো মিটিবে কি?

বাঙ্গালাভাষার অমূল্য সম্পদ এই 'হিমালয়'।

গ্রন্থে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কথাটী বড়ই ভাল লাগিল,

"ইয়ে রসনা বশ কর, ধর গরবি বেশ,
শীতল বুলি লেকে চলো, সবহি তোমার দেশ।

এই 'শীতল বুলি' এই মিষ্ট কথাতেই সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চ'লে এসেছি।'

১৪-১২-২২।—সকল সময়েই একটী ভাব—সমস্তই নশ্বর, মনে

জাগিয়া আছে। এর তাড়নায় খাইতে বসিতে চলিতে ফিরিতে কোন অবস্থাতেই আমার সুখ নাই। মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী পুত্র কন্যা, মা,—যখনি যার কথা ভাবি, কেবলই মনে হয়—কিছু না, কিছুই না—ক'দিনের? একশ' বছর পরে, এই যে আমরা পৃথিবীর একান্ত এককোণে পীঁপড়ার মত ঘুরিয়া ফিরিতেছি—কোথায় সকলে অদৃশ্য হইয়া যাইব? ইতিহাসের উপর যখন চোখ পড়ে, তখনও এ-সকল কথাই কেবল স্পষ্ট করিয়া মনে হয়! কত যুগ, কত যুগান্তরের পূর্ব্বে—নীহারিকা Nebula দেখা দিয়াছিল, কত প্রলয়, কত বিদ্যুৎমণ্ডিত ঝড়-ঝঞ্ঝা সংঘটিত হইয়া গেল, সূর্য্য আঁধারের ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিল, ক্রমে ক্রমে সেই সূচিভেদ্য ভয়াবহ অন্ধকারের ভিতর পৃথিবী, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি কত গ্রহ উপগ্রহ দেখা দিতে লাগিল—আরো কত অনন্ত কোটী কোটী বছর চলিয়া গেল, কত জীব জন্তুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আবির্ভাব হইল,—আরো কতকাল, অসভ্য উলঙ্গ মানুষ সভ্যতার পরিচ্ছদে ভূষিত হইতে লাগিল,—আরো কতকাল, ঐতিহাসিক যুগের আবির্ভাব হইল, মিশর, এসিরিয়া, বেবিলন, চীন, ভারতবর্ষ, নানাস্থান সভ্যতার অরুণ কিরণে আলোকিত হইয়া উঠিল,—কোথায়, কোথায় গেল সে সকল মহিমান্বিত ফেরোর দল, কোথায় সার্ডনেপেলাস, নেবুচাডেনজর, সুদাস, বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনক? এ জগতের বক্ষে কিছুই থাকে না! স্মৃতি, তাই বা কদিনের জন্য?

তবে কেন, কেন বাঁচিবার জন্য এমন প্রয়াস, কেন কা'র অন্বেষণে এমন ছট্‌ফট্ করিয়া ডানা আছড়াইয়া মরা? কিন্তু, কিন্তু—পারা যায় কৈ? সকলেই কা'র তাড়নায়, কিসের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এ অনন্ত-যাত্রার বিরাম নাই, হাঁটিতে হাঁটিতে ক্ষতবিক্ষতপদে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে একদিন পথের পাশে লুটাইয়া পড়িয়া জন্মের মত অদৃশ্য

হইয়া যাওয়া—ইহাই সকলের ইতিহাস। Mosesএর ভাগ্যে নাকি Promised Land দেখার সুযোগ হইয়াছিল; সত্যই এ-জগতে তেমন ভাগ্য কারো হয় কি? কার দিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইব? কলার মোচা—পাতার নীচে পাতা, তার নীচে ছোট পাতা, আরো ছোট পাতা, আরো ছোট—মনে হয়, এই বুঝি সার বীজে আসিয়া হাত পড়িল, কিন্তু কৈ—না, শূন্য, মহাশূন্য! শেষটায় সবই এমন—শূন্য! কোথায় অস্তিত্ব, কোথায় সত্বা, কোথায় আত্মা? আমি তো কিছুই দেখিতেছি না। এই আমার মাথা, আমার দুখানা হাত, পা, বুক, গহ্বরযুক্ত পেট, মেরুদণ্ড—এদের ভিতর কোথায় 'আমার' বসতি, কোন্ স্থানে আমার আত্মা,—'আমি'? 'আমি'! 'আমি'! 'আমি'—কি? স্ত্রীর সাথে কথা বলিতে যাইয়া, ছেলের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে, আমি অনেক সময়েই চুপ্ করিয়া ভাবি—কে এমন কথা বলিল, কিসে কথা বলিল? গাছের দিকে তাকাইলে মনে হয়—কোন্ স্থানে, কোথায় তার প্রাণ? গরু বাছুর, ভেড়া, ছাগল—কোথায় তাদের প্রাণ? তাদের কি মানুষের মত 'আত্মা' নাই? কেন? আমি তো কোথাও প্রাণকে একস্থানে পুঞ্জীভূত দেখিতেছি না—'আত্মা' বলিয়া কোন একটী বিশেষ গুণধারী কিছু দেখিতেছি না, অথচ সকল স্থানেই, মানুষে, গাছে, লতায়, তৃণদলে, মাটীতে—সর্ব্বত্রই প্রাণ ও তার লীলা দেখিতেছি। মানুষের পক্ষে এই প্রাণের ক্রিয়া বোঝা—অসম্ভব।

কি করিব তা হ'লে! পাশ্চাত্য-দেশবাসীর মত কাজে ডুবিয়া থাকিব? কিন্তু কাজ যে করিতে ইচ্ছা করে না। তাদের দিকে চাহিলে মনে হয়, নির্ব্বোধ বালক, এই সামান্য ক'টা দিনের জন্য এমন বৃথা খাটিয়া মরিতেছে! দেশ-সেবা, সমাজ-সেবা, জগৎ-সেবা—কি, কি এ-সকল? সব ভুয়া, সব মিছা! ভারতবাসী ইচ্ছা করিলেও আর সংসারে

তেমন মন বসাইতে পারিতেছে না। তার মনের ভিতরের আলো যে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; বুঝিয়াছে সে, ধন-দৌলত, শৌর্য্য-বীর্য্য কিছু নয়, কিছু নয় তা'। ইয়ুরোপীয়দের জয়-ডঙ্কার উচ্চ কলরবে আজ জগৎ মুখরিত, নিক্ তারাই বাহাদুরী। কিন্তু ক'দিন ? একশ', দুশ', হাজার বছর—তার পর ? তার পর ?

আমি কি করিব—কিছুই যে আমার ভাল লাগে না।

নিষ্ফল জীবন ! সফল জীবনই বা কি ? এই নশ্বরতার মাঠে কোনও ফসল ফলে কি ?

না ;—কিছুই করিব না আমি। আমি পড়িব, লিখিব, আর চুপ্ করিয়া থাকিব,—দেখিব।

১৭.১২.২২।—কয়েক বছর যাবৎই প্রায় প্রতিরাত্রিতেই রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছি। পদ্য এবং উপন্যাস দুই-ই পড়িতেছি, দিন দিনই ভাল লাগিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয় যে খুব বেশী, তা নয়—সেই-'জীবন-দেবতা', সেই ভগবানের চরণে নিবেদন আবেদন, সেই বর্ষ-বসন্ত-শরতে প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশের বর্ণনা, কিন্তু কেমনই যে বলিবার ভঙ্গী, কি যে কি একটু সকল লেখার ভিতরই নিহিত, ভাষার লালিত্য ও সমাবেশ—মনে হয়, সবই নূতন, বিভিন্ন। এ যেন অফুরন্ত ভাব-সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার।

এ'ক'দিন 'চিত্রা', 'নৈবেদ্য' এবং 'খেয়া' আবার পড়া গেল।

অনেকের মতে 'চিত্রা'তে তাঁর কবিত্ব-শক্তির পূর্ণ বিকাশ। এতেই বিচিত্র-শব্দসম্পদপূর্ণ, ভাব-ভাষার সমন্বয়ে গম্ভীর-মধুর 'উর্ব্বশী' স্থান পাইয়াছে। টম্সন্ ইহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা বলিয়াছেন এবং সৌন্দর্য্য-পূজা-বিষয়ক জগতের সমস্ত সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

কবিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে এমন গীতিকবিতা নাই। Wordsworthএর Ode to Immortality of the Soul—সে তো কেবল অসার শব্দাড়ম্বরপূর্ণ প্রলাপোক্তি; Browningএর Rabbi Ben Ezraও তদ্রূপ—না আছে সে সবে কোন Philosophy, অথচ Philosophy ফুটাইবার চেষ্টা আছে—দুটাই শেষ পর্য্যন্ত অর্থশূন্য, অসার।

'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসি,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!'
'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশি!
'ঊষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।'
'যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশি!'
'সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি!
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্য শীর্ষে কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হ'তে নভস্থলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।'

যে বর্ণনা কবিবর 'উর্ব্বশীর' দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। যে সৌন্দর্য্য, জগতের মাঝে নানারূপে বিকশিত হইয়া আছে ও পলে পলে

ফুটিতেছে, যার চিত্র মানবপ্রাণকে আবাল্য আকর্ষণ করিতেছে, প্রেম যার মধ্যমণি—'উর্ব্বশী' সেই আদি-সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। সুরেন্দ্রবন্দিতা মানবের চির-আকাঙ্ক্ষিত অপ্সরা 'উর্ব্বশীর' তুলনা নাই, রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশীও' জগতে অতুল্য।

'জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।'

যুগ যুগ ধরিয়া কত মানব-পতঙ্গ 'উর্ব্বশীর' সৌন্দর্য্য-অনলে পক্ষ পোড়াইয়া নিঃশেষ হইয়া নিজেদের ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার কাহিনীর সঙ্গে কত রক্তধারা জড়িত! বিশ্ব-প্রেয়সী অপূর্ব্বশোভনা উর্ব্বশী!

'উর্ব্বশী' সুন্দর, ভাবোদ্দীপক, কেমন যেন প্রাণের মাঝে সৌন্দর্য্য-ব্যাকুলতা জাগাইয়া তোলে। কিন্তু ঠিক বলিতে গেলে সমস্ত কবিতাটী প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত তেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া যেন আমার কাছে ধরা দেয় না—কেমন যেন একটু খাপছাড়া বোধ হয়।

'চিত্রা' নামে গ্রন্থের প্রথম কবিতাটী—চমৎকার! ইহা একটী কবির মূলভাব-বিষয়ক কবিতা—key বিশেষ। গ্রন্থের অন্যান্য প্রায় সমস্ত কবিতাই এই 'চিত্রার' উদ্দেশ্যেই মূলতঃ রচিত, 'জীবন-দেবতা—এরই অংশবিশেষ।

দুই মূর্ত্তি এই 'চিত্রার'—

বাহিরে,

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।

অন্তরে,

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন-মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি
তুমি অচপল দামিনী।

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

এই 'বিচিত্ররূপিণীকে' নানাভাবের, জগতের নানা প্রকাশের ভিতর দিয়া পাইতেই কবির আজন্ম প্রয়াস।

'জ্যোৎস্না-রাত্রে' তাই উদ্‌ভ্রান্ত-বাসনায়-পীড়িত কবি একে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তিমাঝে! অসীম সুন্দর
ত্রিলোকনন্দন মূর্ত্তি! আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চির রাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর-মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি,—বাসনার তীরে
একা ব'সে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে, নাহি তার সীমা।
আজি মোরে কর দয়া, এস তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব, হে রহস্যময়ী,
খুলে ফেল—আজি ছিন্ন ক'রে ফেল ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।
মহামৌন অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হ'তে উঠে এস ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মত হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে।

একে উদ্দেশ করিয়াই 'প্রেমের অভিষেকে' লিখিত হইয়াছে—

অয়ি মহীয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্! আজি

এই যে আমারে ঠেলে চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধাপানে
অঙ্গ মোর হ'য়েছে অমর ?...
হে মহিমাময়ী মোরে ক'রেছে সম্রাট !

ইহারই অভিসারে,—'জীবন-দেবতার', 'জীবন-রম্যের' সন্দর্শন-আশায়, জীবন-আস্পৃষ্টি তীর্থযাত্রীর দল চলিয়াছে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটীতে এ-ভাবটী কি অপূর্ব্বরূপেই না ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে—রসসম্পদে ও ভাববেগ-ব্যাকুলতায় এ-স্থান অতুলনীয় !

মৃত্যুর করি না শঙ্কা ! দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে,—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি ! কে সে ? জানি না কে ! চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি ! শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান-গীত—ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন ল'য়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত !... .....
সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন

চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।

* * *

শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন-কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক!

* * *

তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইয়াছে দেশে দেশে।—শুধু জানি তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চল-প্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জন মুখে! শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবন কণ্টক-পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি।...

'মৃত্যুর পর' কবিতায় এই 'বিচিত্ররূপিণীকেই' যেন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—

অস্তিত্বের পদতলে
একবার বাঁধা পলে
পায় কি নিস্তার ?

'অন্তর্যামী'তে একে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,

একি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !

*   *   *

কেগো তুমি কোথায় রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

*   *   *

চিনি না যে পথ, সে পথের পরে
চ'লেছি পাগল বেশে।
কেগো তুমি চালাইছ মোরে
আমি যে তোমারে খুঁজি।

*   *   *

কিসের লাগিয়া বিশ্ব-বেদনা
মোর বেদনায় বাজে ?

*   *   *

আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা
আমার বিশ্বরূপী।

হায় কবি ! তুমি তো সুখী নও, কা'র, কোন্ অজানা সুন্দরীর উদ্দেশ্যে তুমি আজীবন ধরিয়া এমন কবিতা-গুচ্ছ, তোমার প্রাণ-রক্তে-মাখা মানস-কমল উপহার প্রদান করিলে ?

ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই তুমি বলিয়াছিলে,

> 'তবু রহিয়াছ কঠিন কামনা
> দিবস নিশি।'

এই তোমার 'সাধনা'। এই 'ব্যর্থ-সাধন'খানি (আজও কি ব্যর্থ বলিবে?) ইহার চরণতলে রাখিয়া কি তুমি সার্থক-জীবন হইয়াছ?

কত উদ্ধৃত করিব? এ যে আমারই মর্ম্ম হ'তে উত্থিত সব কথা—কেমন নির্ম্মল, তীব্র, উজ্জ্বলভাষায় লিখিত হইয়াছে!

'নগর-সঙ্গীতে,' 'বিচিত্ররূপিণীর' ভিন্ন রুদ্র প্রকাশ—

> 'লুপ্ত করিছে সূর্য্যে চন্দ্রে
> বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।'

> ইহারই তাড়নায়,
> 'শুধু সম্মুখে চ'লেছি লক্ষ্যি
> আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী
> তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী
> আলেয়া হাস্তে ধাঁধিয়া।
>
> *　　*　　*
>
> আমি নির্ম্মম, আমি নৃশংস
> সবাতে বসাব নিজের অংশ
> পরমুখ হ'তে করিয়া ভ্রংশ
> তুলিব আপন কবলে।'

বর্ত্তমানের স্বার্থ-লীন জ্বালাময়ী সভ্যতার কেমন জীবন্ত চিত্র!

'পূর্ণিমাতে' আবার শিরীষ-কোমল স্নিগ্ধ প্রেয়সীর মধুর সাক্ষাৎ—

'হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তরশায়িনী। নাহি সীমা
তব রহস্যের।...
কখন দুয়ারে এসে
মুখখানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, একপ্রান্তে, সুররাণী,
সুদূর নক্ষত্র হ'তে সাথে করি আনি
বিশ্বভরা নীরবতা।'

'আবেদনে'—এই হৃদয়-রাণীকে উদ্দেশ করিয়াই ভৃত্যরূপে পূজা করিবার জন্য প্রেমিক উন্মুখ। 'উর্ব্বশী'—এই 'বিচিত্ররূপিণী' 'মহিমাময়ীরই' অকলঙ্ক-সৌন্দর্য্যসম্ভার দেহে ধারণ করিয়া, সৃষ্টির প্রাক্কাল হ'তে তাকে নানাভাবে ছড়াইতেছে, ফুটাইতেছে; তার দেহ-সঞ্চালনে 'শস্তশীর্ষ' শিহরিয়া উঠিতেছে, নভস্থল হ'তে নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে; জগৎ, বিচিত্র-বেশিনী 'উর্ব্বশীকে' বক্ষে ধরিয়া চিত্ত জুড়াইবার জন্য পাগল, কিন্তু নিষ্ঠুরা বধিরা 'উর্ব্বশী'—বিদ্যুতের মত চকিতে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়! তাই তো বসন্ত-পূর্ণিমা-নিশীথে 'আনন্দ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশি বহে আসে।'

'মরীচিকা' ও 'উৎসব'—'বিচিত্ররূপিণীর' উদ্দেশ্যেই বিরচিত।

'আমি যে তৃষিত তোমা চেয়ে
আমি চিরদিন থাকি এ মরু শ্মশানে
সঙ্গীহারা।'

'ওগো, যে তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন
সদা আছ নিশিদিন
তুমি কি ব'সেছ আজি
নব বরবেশে সাজি
কুন্তলে কুসুমরাজি
অঙ্কে ল'য়ে বীণ।'

কবি কখনো প্রেয়সী, কখনো 'জীবন-দেবতা', কখনো আরাধ্য দেবী-রূপে—'বিচিত্ররূপিণীর' পূজা করিয়া আসিতেছেন। এ-ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ একাকী, নিঃসঙ্গ, শুধু তিনি আর তার আরাধনার বস্তু; আর যা কিছু জগতে, শুধু তাকে দেখিবার পাইবার উপায় মাত্র।

এই 'বিচিত্ররূপিণী,' এই 'জীবন দেবতার' জন্য,

'গলায়ে গলায়ে বাসনার সোণা
প্রতিদিন আমি ক'রেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্য নব।'

তাও তাকে উদ্দেশ করিয়া সংশয়চিত্ত কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

'ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?'

এরই কাছে সোৎসুক-কণ্ঠে জানিতে চাহিতেছেন,

জীবনকুঞ্জে অভিসার নেশা
আজি কি হ'য়েছে ভোর?

আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে জানিতে ইচ্ছা করে, কবিবর! তোমার আজীবনের পিপাসা মিটেছে কি? যার ধ্যানে, পূজায়, প্রেমে, অন্বেষণে দিবা-যামিনী এমন ব্যাকুলভাবে সারাজীবন কাটাইলে, সেই জীবনসর্ব্বস্ব সৌন্দর্য্যপ্রতিমা, সেই 'বিচিত্ররূপিণীর' দর্শনলাভে জন্ম কৃতার্থ হ'য়েছে কি? কেউ কি তার দর্শন পেয়েছে? 'মরীচিকার' মত সেই চিরসুন্দর, লোকের হাতে ধরা দিয়াছে কি? আঁধার রজনীর বক্ষ ভেদিয়া দামিনীর মুখে, বসন্ত-পূর্ণিমার রজত-বক্ষে, ঝড়ের রাত্রিতে কে ফুটিয়া উঠিয়া বুকের মাঝে চকিতে দেখা দিয়া প্রাণ আলোড়ন করিয়া চলিয়া যায়? কিন্তু কৈ, সে তো কারো হাতের মুঠার ভিতর ধরা দিল না!

তাই তো কবি সর্ব্বশেষের 'সিন্ধুপারে' দুঃখার্দ্রস্বরে বলিয়াছেন,

> 'সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি সেই সুধাভরা আঁখি,—
> চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।'

'নৈবেদ্যের' সুর ইহা অপেক্ষা অনেক নীচু। 'জীবন-দেবতা' এখানে প্রেমিক বা প্রেয়সী নন—তিনি জীবন-স্বামী, ভগবান্। গ্রন্থখানি কবির ভগবদ্ভক্ত পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। কাব্য-দেবী এখানে স্বর্গপুর হ'তে নামিয়া ভক্তের সহায়রূপে তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'নৈবেদ্যের' ভাষা মধুর, নির্ম্মল। রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখাই বা নয়? কিন্তু 'চিত্রায়' যে ব্যাকুলতা সমস্ত কবিতাগুলিকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাদের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানযুগের যুগপীড়ায় পীড়িত শিক্ষিত মানবের অন্তরের যে নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ও কামনা প্রকাশিত হইয়াছে, তা এতে তেমন নাই। রবীন্দ্রনাথ ভক্ত ন'ন, "রামপ্রসাদের" কালী যেমন তাঁর একান্ত আত্মীয় ও ভাগ্য-বিধায়িত্রী, রবীন্দ্রনাথের ভগবান্ তাঁর পক্ষে তেমন ন'ন। বিজ্ঞানের ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরিপুষ্ট রবীন্দ্রনাথের

কাছে ভগবান্ কাব্যের সামগ্রী, কিন্তু তেমন প্রাণের সামগ্রী ন'ন। তাই, 'বিচিত্ররূপিণী' 'জীবন-দেবতা' তার যতটা অন্তরঙ্গ, সান্নিধ্যে, আপনার-জন,—'জীবন-স্বামী' তেমন নয়।

তাও, রবীন্দ্রনাথের ভগবানের চরণ-উদ্দেশ্যে অর্পিত এই একশত 'নৈবেদ্যের' ফুলের সুঘ্রাণে কার না মন পুলকিত হইবে, শান্তি আনন্দে ভরিয়া না যাইবে? বইর যেখানে খোলা যায়, সেখানেই মল্লিকার মত শুভ্র কবিতার গুচ্ছ ফুটিয়া রহিয়াছে—ইচ্ছা হয় সবগুলিকে দিয়া দেহ-প্রাণ সাজাইয়া তুলি।

'সন্ধ্যাবেলায় ভাবি বসি ঘরে
তোমার নিশীথ-বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী!'

'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!'

'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি!
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি!'

'শুনিতেছি তৃণে তৃণে, ধূলায় ধূলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে

গ্রহে সূর্য্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে'
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোলে,—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল !'

এই ফুলে-ভরা সাজি হ'তে যেটী তুলিয়া দেখিবে, সেটীই নবীন, সুন্দর !

একটী কথা আমারই প্রাণের অন্তরতম কথা—

আগে ভাই সকলের সব সেবা প্রভু,
শেষ ক'রে দিতে দিতে কেটে যায় কাল,
শূন্য প'ড়ে থাকে হায় তব পূজা-থাল !

যার যা কাম্য, তাতেই তাকে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বস্বপণ হইতে হইবে—তা না হ'লে, পূজাও হইবে না, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুও লাভ হইবে না। লোকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া অস্থির, নূতন ধর্ম্মালোকের জন্য বিশ্ব উন্মুখ। এই বিজ্ঞান-যুগে, যখন জ্ঞানের ছুরিতে সমস্ত কুসংস্কার কাটিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছে, ভগবানে বিশ্বাস রাখা কি সম্ভবপর? এই জীবনাদর্শের, 'জীবন-দেবতার' সেবা—যার পক্ষে তা যে-ভাবে দেখা দিক্ না কেন, ইহাই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এবং ইহার বক্তা, ঋষি—রবীন্দ্রনাথ। জীবনকে পুষ্টতা দান করিতে, গভীরতার খাদের দিকে লইয়া যাইতে, তাকে পবিত্র ও নির্ম্মল করিয়া তুলিতে—তাঁর লেখার মত সহায় কে?

'নৈবেদ্যে' বর্ত্তমানে দেশবাসীর দীনতা-পূর্ণ জীবনের এবং অতীতের বস্তুভারহীন সরল সবল জীবনের যে সকল চিত্র দেওয়া হইয়াছে, কেমন মনোরম! তারপর, কবিবর বাহ্য-চাক্‌চিক্য-পূর্ণ জগৎজয়ী বিকট পাশ্চাত্য সভ্যতার যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় গত মহা-যুদ্ধের সম্পর্কে তা' কেমন বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে! ঋষি-কবি যে ভবিষ্যৎ-দর্শী।

'এই পশ্চিমের কোণে রাগরক্ত রেখা
নহে কভু সৌম্য-রশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের ! এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয় দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতীরে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে ল'য়ে শেষ অগ্নিকণা !'

'চিত্রায়' কবি যৌবনের শেষসীমায় আগত ; 'খেয়া' জীবন-সায়াহ্নের অভিব্যক্তি—যখন কবি ওপারে যাইবার জন্য ব্যাকুল। 'জীবনদেবতাকে' তাঁর এ সংসারে লাভ হইয়াও হইল না, তাই অপর কূলে যাইয়া তার সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা।

'ও পারেতে সোণার কূলে, আঁধার মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।
নামায়ে মুখ চুকায়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরিয়েও না চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘর-ছাড়া,
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়।'

'ফুলের বাহার নাইক যাহার, ফসল যাহার ফল্‌ল না,
অশ্রু যাহার ফেল্‌তে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁজের আলো জ্বল্‌ল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়!'

হায়! এমন বিশ্বজোড়া-জয় কবিরও ফসল যদি না ফলিল, তা হ'লে কার বা ফলিল? কারো ফলে কি?

পূর্ব্ববার যখন 'খেয়া' পড়িয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল, আসন্ন-বার্দ্ধক্য কবির কতকগুলি ছাড়াছাড়া অর্থশূন্য উক্তি—অনেক খুঁজিলে দু একটী সোণার কণা মিলিলেও মিলা সম্ভব। এবার পাঠ-শেষে সে ধারণা সম্পূর্ণরূপে বদলিয়া গেল—মনে হইল, কবি আর এক ধাপ উপরে উঠিয়াছেন। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে আমার অনেক সময় লাগে, দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা-হেতু তিনি চলেন আমাদের মত সাধারণ লোকের অনেক আগে। 'প্রভাত-সঙ্গীতের' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' সঙ্গে সঙ্গে বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতপক্ষে কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। তখন তাঁর যৌবন-প্রারম্ভ। 'মানসীতে'ও যৌবনের প্রথম অবস্থা সূচিত—সুমিষ্ট নূতন-ভাবে-ভরা কবিতার সমষ্টি, নানারূপে প্রেমে-বাসনায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 'সোণার তরী'পূর্ণ যৌবন-উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, ভাব-বন্যায় টলমল্, ভাষার কি তীব্র চঞ্চল গতি! এ-লেখা অনেকটা sensuous স্থূল-দেহের সংস্পর্শ যেন ইহার পদে পদে জড়িত হইয়া আছে। 'ক্ষণিকা', 'চৈতালী', 'চিত্রায়'—সংসারের আবিলতা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, ভাষা সংযত ও নির্ম্মলতর হইয়া উঠিয়াছে। 'খেয়ার' ভাষা আরও নির্ম্মল, উজ্জ্বল, অলঙ্কার-বর্জ্জিত, ভাব আরও গভীর—যৌবনের সে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা নাই, যার তার পিছনে ছুটিয়া যাওয়ার ইচ্ছা নাই; যে 'জীবন-দেবতার' পশ্চাতে কবি আজীবন ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন, তাকে

পূর্ণরূপে লাভ হয় নাই সত্য, কিন্তু তাও মাঝে মাঝে নির্ম্মলবায় স্নিগ্ধ প্রভাতে 'সবার'সম্মিলনের মাঝে তার সাক্ষাৎলাভ করিয়া কবি আনন্দিত হইতেছেন—এক বিমল বাহুল্যবর্জ্জিত নিবিড় সুখের ভাবে কবি-চিত্ত পরিপূর্ণ।

'আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার
পরাণ কি নিধি কুড়ালো—ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
দেখেছি একেলা আলোকে—দেখেছি
আমার হৃদয়-রাজারে!'

'ভাই, এ গগনভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে'

'আজ ত্রিভুবনজোড়া কাহার বক্ষে
দেহ-মন মোর ফুরালো—যেন রে
নিঃশেষ আজি ফুরালো,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো।'

আমি 'বর্ষা'-ব্যাকুল; সে-ই আমার প্রিয় ঋতু। কবিবরের হস্তে অঙ্কিত বর্ষার চিত্রের তুলনা নাই। কিন্তু 'খেয়াতে' মাঝে মাঝে শরৎ-প্রভাতের যে বর্ণনা রহিয়াছে—মনে হয়, তার তুলনায় 'বর্ষাও' পরাস্ত। কেমন নির্ম্মল, সুন্দর, পবিত্র! সত্যই সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে আমার মনে হয়, শরতের সোণালি-প্রভাতের আলো যেন আমার দেহে প্রবেশ করিয়া

কি এক শুভ্র সৌন্দর্য্যছটায় তাকে হাসাইয়া তোলে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎ, জগৎবাসী কেমন মধুর বলিয়া বোধ হয়! 'বর্ষার' সঙ্গে বুঝি কিছু স্থূলতা জড়িত হইয়া থাকে, 'শরৎ-প্রভাত' পূর্ণ-নির্ম্মল, শুভ্র!

'খেয়ার'-কবি সংসার হ'তে মুখ ফিরাইয়াছেন, পারের জন্য ব্যাকুল।

'রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা গড়া,
মতের লাগি দেশ বিদেশে লড়া;

এ-সব তাঁর শেষ হইয়াছে।

'কাজের পথে আমি ত আর নাই।
* * *
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই'
'অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।'

এখন,

শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা,
গুটিয়ে ফেল সকল মন্দ ভালো।
ফিরিয়ে আন ছাড়িয়ে পড়া মন,
সফল হোক্ রে সকল সমাপন।

এখন হ'তে,

...আমি সুখে রব
কিছুই না নিয়ে,
আপন হ'তে আপন মনে
সুধা ছানিয়ে।

৩০

কিন্তু তা কি কখন সম্ভবপর হইবে? সমস্ত জগৎ যে আসৃষ্টি যে-তারাটী হারাইয়া গিয়াছে, সেই 'হারাধনকে' খুঁজিবার প্রয়াসে ব্যাকুল-ব্যস্ত-চিত্ত।

'সে দিন হ'তে জগৎ আছে
সেই তারাটীর খোঁজে,
তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
চক্ষু নাহি বোজে।'

তাইতো পর-পার-গমন-ব্যাকুল কবির হৃদয়ে এখনো ঝড়ের রজনীতে,

'মেঘের ডাকে কোন্ অশান্ত,
উঠিস্ জেগে জেগে?'

কি লিখিব? আমার ভাষায় কুলাইতেছে না। রবীন্দ্রনাথ পাঠে আমি ধন্য হইলাম!

২১.১২.২২।—সংসারে নানাপ্রকার জ্বালায়, বিশেষতঃ মৃত্যুযন্ত্রণায় যখন অস্থিরচিত্ত হইয়া ওঠা যায়, তখন অবশ্য মনে হয়, এই সংসার হ'তে পলাইয়া বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ত-নিঃসঙ্গ-জীবনগ্রহণই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে-জীবন আমার কাছে চিত্তাকর্ষক বোধ হয় না—অসার, অলস, উদ্দেশ্যবিহীন। সন্ন্যাসীর চরম উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি, ভগবান-লাভ, মুক্তি। ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন কি সম্ভবপর? আর আত্মা? কোথাও তো তাকে খুঁজিয়া পাইলাম না! এই আত্মা একটা Process বিশেষ। গাছ বাড়িতেছে, লতায় ফুল ফুটিতেছে, গাভী চরিতেছে—কোন্ শক্তিতে? সেই এক শক্তিরই বিকাশ, ভিন্ন ভিন্ন দেহীতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে। মানুষের ভিতরও তারই প্রকাশ। কি যে ইহা—

দুর্জ্ঞেয়। কোথা হ'তে এ শক্তির আবির্ভাব—কে বলিবে? বিজ্ঞান এর মূল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পরাস্ত। ভগবান ও আত্মার অন্বেষণে নির্জ্জন হিমালয়ে যাইয়া শীতে-গ্রীষ্মে অনাহারে-অনিদ্রায় অপরিচ্ছন্নতার ভিতর কষ্ট পাওয়া—নির্ব্বোধের কার্য্য নয় কি? এখনকার এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিনে সন্ন্যাসীই বা হয় কে? একদল মূর্খ বা অর্দ্ধশিক্ষিত অর্থ-তাড়নায়-বিব্রত সংসার-পরিচালনে-ফেল-করা যুবক, আর জনকয়েক কুসংস্কারগ্রস্ত প্রাচীন-ভাবাপন্ন প্রৌঢ়। ছাল-কম্বলধারী সন্ন্যাসী সাজিবার দরকার নাই। বাঙ্গালীর ভিতর সন্ন্যাসী হয় ক'জন?

অর্থশালী সবল স্বাস্থ্য-উদ্যমপূর্ণ জ্ঞানান্বেষীর জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়। টাকা চাই, টাকা চাই, সর্ব্বাগ্রে ওটী চাই,—তা' না হ'লে সব বৃথা। সুন্দর একখানা বাড়ী থাকিবে, কোন বড় সহরের প্রান্তদেশে—যেমন কলিকাতা বা ঢাকা, যেন গ্রন্থ-চর্চ্চা, গ্রন্থ-মুদ্রণ এবং মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য সাহিত্যসেবক বা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। জীবনের একটী Hobby খেয়াল থাকিবে—এটী চাই-ই; তা যাতে মন যায়, তাতেই তাকে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। একটী ভাল মনোমত লাইব্রেরী থাকিবে—যথেষ্ট টাকা থাকিবে, যেন যখন যে বই ইচ্ছা, কিনিয়া পড়া যায়। কক্ষটী নির্জ্জন, নিতান্ত নির্জ্জন হইবে, এবং দোতালার উপর অধিষ্ঠিত হইবে—সামান্য গোলমালের শব্দও সেখানে পৌঁছিবে না। তার পাশেই পাঠ-কক্ষ থাকিবে—তেমনি নির্জ্জন, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নানাবিধ মহৎলোক ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বা অন্য রকমের ছবিতে সাজানো। প্রাতে যেন সূর্য্যের প্রথম শুভ্র কিরণ সেখানে পতিত হয়; পূর্ণিমার চাঁদের কিরণ এবং বর্ষায় মেঘ ও ঝড়ের খেলা যেন সেখানে বসিয়া উপভোগ করা যায়। গৃহে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, চাকর-চাকরাণী ছাড়া আর কেউ থাকিবে না।

সবই যেন খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে—খুব পরিষ্কার ; পোষাক পরিচ্ছদ, কাপড়-চোপড়, বাড়ী-ঘর, টেবিল-চেয়ার, সব, সবই যেন চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করে। খাওয়া দাওয়া বেশ ভাল, পুষ্টিকর ও মুখরোচক হইবে। এমনভাবে চলিতে হইবে, যেন ব্যারাম বাড়ীর ত্রিসীমানায় কোন প্রকারে দেখা না দেয় ; 'স্বাস্থ্য', 'স্বাস্থ্য', 'পূর্ণ-স্বাস্থ্য জীবনানন্দের মূল'—গৃহ-পরিচালন-বিষয়ে মূলনীতি হইবে। নিয়মমত গৃহের সকলে জাগিবে, শুইবে, কাজ করিবে, কোনও বৃথা দয়ামায়া থাকিবে না, কিন্তু স্নেহ ভালবাসার অভাব হইবে না। Hobby ব্যতীত, অন্য কোনও কিছু সৎকাজে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে—যেন অলস জীবনের শূন্যতায় কখনও নিপীড়িত হ'তে না হয়। মাঝে মাঝে অতিথি-সৎকারের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে—বন্ধুবান্ধবদের লইয়া আমোদ আহ্লাদে ভোজন করা যাইবে। মোটর গাড়ী থাকিবে—যেন সন্ধ্যায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লইয়া মুক্ত-বাতাসে বেড়াইতে বাহির হওয়া চলে। সঙ্গীত ও চিত্রকলা-চর্চ্চার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে। ঘোড়া থাকিবে, যেন চড়িয়া বেড়ান যায় ; বন্দুক থাকিবে, শীকারের জন্য। কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ থাকিবে না, মনোমালিন্যের কারণ যাতে না দেখা দেয়, তার চেষ্টা করা হইবে। যথাসম্ভব সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিব। গৃহের সম্মুখে ফুলের-বাগান থাকিবে, অন্য পার্শ্বে শাক-সব্জীর বাগান। পাছে এক জায়গায় বাস হেতু প্রাণে মরিচা ধরে, তাই মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যকর ও দর্শনীয় নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি এমন গৃহে বসিয় তন্ময়-চিত্তে দিনের দিন আমার জীবন-সাধনা-সম্পন্নে বিভোর থাকিব। রাজদরবার বা বড়লোকের দরবার—যার সম্পর্কে আসিলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, অথবা তাকে নীচগ্রামের দিকে লইয়া যায়—তার সহিত কোনও সংস্রব থাকিবে না। আমি নিজ-চিত্ত-বিভোর অবস্থায় নিজভাবে বাস করিব।

এ কি ! আমি কি অলক্ষিতে ইংরাজ-গৃহের চিত্রই আঁকিয়া ফেলিলাম ! অনেকটা তাই। আমার মনে হয়, এমন সুন্দর বিধিবদ্ধ আদর্শজীবন আর কেউ যাপন করে না। গৃহগুলি যেন শান্তির মন্দির ; বাগানে, ছবিতে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কেমন নয়নাভিরাম ! আর তাদের জীবন ? কেমন উৎসাহে, আনন্দে, কার্য্য-কুশলতায়, তৎপরতায় ভরা ; যে যার ভাবে বিভোর, যে কাজই করিতে দাও, তাদের হাতে গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। তারাই জানে কেমন করিয়া জীবন কাটাইতে হয় ; আর আমরা ? আমরা শিখিয়াছি, কেমন করিয়া বৃথা হা হুতাশে, নোংরামি, অলসতা, অবসাদের ভিতর দিয়া জীবনটাকে নষ্ট করিতে হয়। যেমন সে-দেশের লোকগুলো পরিশ্রম করে, রোজগার করে, তেমন খায়, পরে—শরীর ও মন যা চায়, তা তাদের দেয়, অথচ অতি-হিসাবী বলিয়া টাকাও জমায় ; তাই তো তাদের এমন সাহস উদ্যম, এমন স্ফূর্ত্তি, এমন জগৎ-জোড়া রাজত্ব। Mere animal শুধু জন্তু-হিসাবেও তারা আমাদের অপেক্ষা কত বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ ! আমরা ! দুটী পয়সা পাইলেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি, খাইও না, পরিও না, অকালে মরিয়া যাই। এ জীবন, জীবনই নয় ; এ-হিসাব হিসাবই নয়—অপব্যয়েরই নামান্তর এই মিতব্যয়িতা। জমানোই যে আমাদের কাজ, কিন্তু টুনি-পাখীর কুড়ানো রাজার পরিত্যক্ত সোণার খড়্‌কে—কটাই বা জমান যায় ?

তাও মনে হয়, পাশ্চাত্যের জীবনযাপন-প্রণালীই যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এমন নয়। এমন সুশোভন গৃহের ভিতরও যেন সুখ নাই। সবই বাইরে চাকৃচিক্যময়—কিন্তু মন্দিরে দেবতা নাই ! এমন পরশ্রীকাতরতা, এমন স্বার্থপরতা, এমন প্রতিদ্বন্দ্বীতা—এ সকলের উপর যে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, তার ভিতর, এত হিংসা বিদ্বেষের মধ্যে, প্রকৃত সুখ থাকিতে পারে কি ? সুখ, প্রকৃত সুখের মূলভিত্তি ভাব-তন্ময়তা, শ্রদ্ধা, পবিত্রতা,

ভালবাসা। পাশ্চাত্য-গৃহে রামচন্দ্রের মত সত্যব্রত সন্তান দেখা দেয় কি, ভ্রাতৃবৎসল ভরত-লক্ষ্মণের সে আবহাওয়ায় জন্মগ্রহণ অসম্ভব, হিন্দুর চরিত্রবতী স্ত্রী—কোথায় জগতে তার সন্দর্শন মিলিবে? এমন প্রকাণ্ড পৃথিবী, ক'টা বা লোক, কিন্তু পাশ্চাত্য-সভ্যতার চাপে পড়িয়া কা'রো শান্তি নাই। পাশ্চাত্যের সুনির্দ্দিষ্ট জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে যখন এ দেশের শ্রদ্ধা, প্রেম, নিঃস্বার্থতা, নির্লিপ্ততা, উদারতা যাইয়া মিলিত হইবে - তখনই জগতে প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ হইবে। কিন্তু তেমন দিন কি কখনো আসিবে? সে জীবনই আমার কাম্য হইবে। পরের অনিষ্ট যেন আমার হাতে হয় না; যে যার মনে চলুক, বাড়ুক,— আমি আমার মনে আমার সাধনা-সেবা করিয়া যাই। কোনও সুবিখ্যাত ফরাসী লেখকের কথায় বলিতেছি,—যদি কি ভাবে কাজ করিতে হয়, শিখিতে হয়, ইয়ুরোপের দিকে দৃষ্টি কর; আর যদি প্রকৃত জীবনতত্ত্বের সন্ধান জানিতে চাও, তা হ'লে ভারত হ'তে শিক্ষা নাও—অমর জীবনের আস্বাদ সেই পাইয়াছে।

২৮.১২.২২।— নিষ্ফল হইব? নিষ্ফল! 'গোরার' কথাই কেবল মনে হইতেছে—'যে আমারই তাহাকে আমি লইব। নহিলে পৃথিবীতে আমি অসম্পূর্ণ আমি ব্যর্থ হইয়া যাইব।' ব্যর্থ তো হইয়াছিই! কেন হইলাম? সঙ্গে সঙ্গে 'বিনয়'-সম্বন্ধীয় কথাও প্রাণে জাগিতেছে—'সে যেন কি একটা করিলে বাঁচে অথচ সেটা করিবার কোনো উপায় নাই, এম্‌নি তাহার মনে হইতে লাগিল। যে একটা পর্দ্দা তাহার সম্মুখে ঝুলিতেছে, যাহা অতি নিকটে, তাহাকে নিরতিশয় দূর করিয়া রাখিয়াছে, সেই পর্দ্দাটাকে কি এক মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার শক্তি বিনয়ের নাই।' কোথায় আছে আমার? তা হ'লে কি আমি এমন নিষ্ফল হইতাম?

আমার কি কোন দিকে কোনও শক্তি ছিল না, আমার প্রাণ কি আগা-গোড়া তাড়না দিয়া আসে নাই—কোথায়, কিসে আমার স্ফূর্ত্তি, শক্তি, মুক্তি; কিন্তু আমি করিয়াছি কি? কখনও অর্থ-অভাবের বিভীষিকায়, কখনও লোকলজ্জার ভয়ে, নিজ কোটর হ'তে মুখ বাড়াইয়াও আর বাড়াইলাম না, হাত গুটাইয়া সারাটী জীবন পঙ্গু হইয়াই রহিলাম। 'বিনয়ের' কথায়, 'তাই তোমার (গোরার) বন্ধুত্বকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে আমি চিরদিনই নিজের প্রকৃতিকে খর্ব্ব ক'রে এসেছি। আজ বুঝ্‌তে পার্‌চি এতে মঙ্গল হয় নি এবং মঙ্গল হ'তে পারেনি।' আমার বাসনা-সকল সারাজীবন ধরিয়া কোন্ বৃহত্তর জগতের ভিতর ছাড়া পাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া উন্মুখ হইয়া আছে- -যে জগতের চন্দ্র-সূর্য্য রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র, কিন্তু আমি তো সে মুখে অগ্রসর হইয়াও হইলাম না। পর্দ্দা কি চিরকাল টাঙ্গানই থাকিবে—একবার জোর করিয়া তাকে ছিঁড়িয়া কি জন্মের মত বাহির হ'তে পারিব না?

আমি নিষ্ফল হবো না, হবো না আমি। আমার ভিতরের যা কিছু লুক্কায়িত শক্তি, তা বিকশিত হইয়া উঠিবে, সফলতার স্বাদে দেহপ্রাণ পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সৃষ্টিতেই মানুষের আনন্দ; সন্তানশূন্য গৃহীর মত দুঃখী কেউ নয়। যার মানসপুত্র সৃষ্ট হয় নাই—তার মতই বা অপদার্থ কে? তার মানব-জন্ম—বৃথা!

আমি তো সফল হইবই; আমার স্ত্রী-পুত্রগণ-কন্যা সকলকেই, সকলকেই সফল হইতে হইবে—হইবেও। 'পরেশ বাবুর'—কথায় 'তোমাদের জীবনের সমস্ত কাজকে বীরত্বের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে—নহিলে তোমরা অত্যন্ত নামিয়া পড়িবে। ......মানুষ ভুল করিবে...কিন্তু বসিয়া থাকিবে না; যাহা উচিত বলিয়া জানিবে তাহার জন্য আত্মসমর্পণ করিবে।'

'গোরা' পড়িতে পড়িতে 'গোরা' ও 'বিনয়' ছাড়া আরো দু'টী চরিত্র হৃদয়ে কেমন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে! ধীর স্থির মৌনী আদর্শ-গৃহী 'পরেশ-বাবু।' 'অনেক দিনের অনেক সাধনা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেখা যায়, দেখ্‌তে পাই অনেক কালের হোমের অগ্নি এখনো ভস্মের মধ্যে জ্বল্‌ছে।' যেখানেই তিনি অবস্থান করেন, সেখানকার আব্‌হাওয়া সব সময়েই কেমন শীতল সংযত শান্তির ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁর দর্শনেই চিত্তের মলিনতা, অপ্রসন্নভাব দূর হইয়া যায়। নিজের কোনও মতের বোঝা গায় পড়িয়া চাপাইতে তিনি ইচ্ছুক নহেন, অথচ কেহ শীলতার গণ্ডী ছাড়িয়া যায়, এমন সাধ্যও কা'রো নাই। তিনি বিনা রজ্জুতে সকলকে যার যার স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; সকলেই স্বাধীন, অথচ প্রত্যেকেই বুঝিতেছে—সে স্বাধীনতারও সীমা আছে। এ কি রজ্জু তা হ'লে? তাঁর পবিত্র চরিত্র, তাঁর স্নেহ, জ্ঞান; তিনি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী, মূর্ত্তিমতী উদারতা, আদর্শ পিতা, গৃহী। কিন্তু এও সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছে, এ-সব চরিত্র পুঁথির পৃষ্ঠাতেই মানায় ভাল, দেখায় ভাল, কিন্তু প্রকৃত জগতে, যেখানে পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করিয়া অহরহ চলিতে হয়, এদের নিতান্তই স্থানাভাব।

আর একজন 'আনন্দময়ী', যিনি 'পরেশকে' নত হইয়া প্রণাম করেন এবং তাঁর দর্শনরূপ-স্নানে নির্ম্মল হইলাম বলিয়া নিজেকে মনে করেন। কি দরকার তাঁর পক্ষে ইহার? গর্ভে ধারণ না করিয়া তিনি 'গোরার' মা, তিনি 'গোরার' বন্ধু মাতৃহীন 'বিনয়ের' মা,—সকলেই যখন বিনয়কে ত্যাগ করিয়া গেল, তখনও তিনি তাকে মায়ের স্নেহে আবরিয়া রাখিলেন; তিনি 'ললিতার' মা, তাকে তার নূতন ঘরে প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়া কেমন করিয়া তিনি স্বগৃহে পুনঃপ্রবেশ করিবেন? তিনি যে জগতের মা—জাতবিচারশূন্য; গোরাকে বুকে ধরিতে যাইয়া এ-সকলের পর্দ্দা তিনি

জন্মের মত ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। 'গোরার' কথায়, 'মা! তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে ব'সেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা।' সংযত-হাসিমুখী, প্রফুল্লতাময়ী, স্নেহশীলা মা 'আনন্দ-ময়ীর' মূর্ত্তি যে আমার সম্মুখে এখনো আমি দেখিতেছি!

২৯·১২·২২।—খ্রীষ্টমাসের বন্ধোপলক্ষ্যে আফিস আদালত স্কুল সব বন্ধ। সহর লোক-বিরল। আলস্য-বিলাসে এ'কটা দিন যাইতেছে বেশ। কোনও বাজে কাজ নাই—প্রাতে উঠিয়া চা-পানের পর কতকক্ষণ একাকী বেড়ানো, মাঝে মাঝে দু'একদিন কারো সঙ্গে রাস্তায় আলাপ-সালাপ হয়, কোন দিন তাও হয় না; তারপর কিছু লেখা, আহার নিশ্চিন্তমনে, একটু বিছানায় গড়াগড়ি ও পত্রিকাদি পাঠ; বিকালের দিকে আবার কিছু লেখা; রাত্রিতে স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের লইয়া কিছুক্ষণ আলাপ-সালাপ, আমোদ, পাঠ (এ'কদিন 'গোরাই' প্রধানতঃ পড়িতে-ছিলাম) ও অবশেষে মোলায়েম লেপের নীচে আশ্রয় গ্রহণ। বেশ একটু সুনির্দ্দিষ্টভাবে দিনগুলি যাইতেছে, কোনও হট্টগোল নাই, খুব যে একটা তীব্র সুখের ঘটা আছে, তাও নয়। নিরিবিলি জীবন। মন হইতে প্রশ্ন উঠিতেছে, এ-জীবনই কি সুখ-জীবন?

আজ প্রাতে মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পৌষের মাঝামাঝি; খুব শীত। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেকদূর চলিয়া যাওয়া গেল। অনেক ক্ষেত চষা হইয়াছে, কোনটা হইতেছে—অনেকগুলিই শস্যশূন্য, দু'একটা দ্রোণফুলের গাছ ও আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে দু'একখানাতে সরিষা ফুল ফুটিয়াছে, দূর হ'তে সেই হরিৎ-শোভা দেখিতে বড় সুন্দর; সরিষার ক্ষেতে সঙ্গে সঙ্গে বুটগাছও গজাইয়াছে, দু'একখানা ক্ষেতে,

সংখ্যায় খুবই কম, কলাই বোনা হইয়াছে—নানা-বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতির শীত-শোভা! এখানে ক্ষেতের মাঝে প্রায়ই খেজুর গাছ দেখা যায়—এ-দেশ খেজুর-রস-গুড়ের দেশ। 'জর্জ্জের' খেলার বন্ধু 'কুলো' এক ভার রস লইয়া মহানন্দে বাড়ী ফিরিতেছিল। আরো কয়েকটী স্কুলের ছেলেও মাঠে জড় হইয়াছিল, রস-পানে আনন্দিত হইয়া মহাস্ফূর্ত্তিতে গৃহে ফিরিতেছে। কোন কোন ক্ষেতে চাষীরা চাষ দিতেছে। বেশ উজ্জ্বল সূর্য্য উঠিয়াছে—চারিদিকে সেই হাস্যময় কিরণছটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের সেই কন্‌কনে শীত ও সূর্য্য-আলোতে-মাখা ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল এবং চারিদিকের হাস্যময়ী প্রকৃতির ছবিখানার দিকে চাহিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথাই মনে হইতেছিল,—সুখ কেমন সহজ! তৎক্ষণাৎই কিন্তু প্রাণের কোন্ গোপন-গুহা হ'তে প্রাচীন-পরিচিত হাড়গুড়-ভাঙ্গা বৃদ্ধটী মাথা ঈষৎ বাহির করিয়া কোটরগত চোখে চাহিয়া যেন বলিতেছিল, কি দেখ্‌ছ? কিছু নয়, কিছু নয় এসব সৌন্দর্য্য, কোন মূল্য নাই এদের, এ-সুখ—দু'দিনের! এমনই ভাবে যুগ যুগ ধরিয়া এই মাঠে এমনই ফুল ফুটিয়াছে, সূর্য্য হাসিয়াছে, মধুর বাতাস বহিয়াছে, লোকে গরু চরাইয়াছে, ছেলেপুলেরা আনন্দে রস খাইয়াছে,—সেই সূর্য্য আছে, সেই বাতাস, মাঠ এখনো আছে, কিন্তু যারা এ-সব উপভোগ করিয়াছিল—তারা কোথায়? চাহিয়া দেখো—সকলেই যাইয়া মাটিতে মিশিয়াছে—কেউ নাই! কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—দুঃখের দিকে আর পা বাড়াইব না, সুখকে আমার করায়ত্ত করিতে হইবেই, জীবন নশ্বর, দুঃখবাদ, এ-সকলের চর্চ্চায় মনকে আর পঙ্গু করিতে দেওয়া নাই কিছুতেই। সংসারকে ভোগ করিতে হইবে,—হাসিতে হইবে, খেলিতে হইবে, নানা কাজে গা ঢালিয়া দিতে হইবে, যা কিছু একটা মত্ততার ভিতর মজিয়া থাকিতে হইবে। বৃহত্তর জগৎ-প্রাণের সঙ্গে আমার মিশিতে

হইবে—যে জগৎ জগদীশ, রবীন্দ্র, ডারুইন্, ক্যাণ্ট, টলষ্টয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, হিউগো প্রভৃতি মহাজ্যোতিষ্কদের আলোকে আলোকিত, স্বার্থকজীবন হইতে হইবে, পূর্ণ-জীবনের স্বাদ আমি ভোগ করিবই, করিবই। সুন্দর নীলাকাশ, উপরে অতি দূরে পাখী উড়িতেছে, নীচে গাছে পাতার শোভা, মাঠে ফুলের শোভা—চারিদিকে রৌদ্র হাসিতেছে। শীত-প্রভাতে আজ পৃথিবী কেমন সুন্দর দেখাইতেছে!

*

৩০.১২.২২।—ইংরাজীতে কথা আছে—Give the dog a bad name and kill it, কুকুরকে বদ্‌নাম দিয়া মারিয়া ফেল। শত্রুকে নিপাত করিতে অনেক সময়ই এ-নীতি অনুসৃত হয়। নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমিক তাই Rebel, Boxer, Agitator বদ্‌নামে কলঙ্কিত ও লোক-চোখে হেয় বিবেচিত হইয়া নিপাত যাইতেছে। ব্রাহ্মণেরা এ-নীতি যেমন চালাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় আর কোথায় কেউ করে নাই। দৈত্য, দানব, রাক্ষস—এ-সব বিশেষণ কা'দের ধ্বংসের জন্য রচিত হইয়াছিল?

ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারত চিরকালই উদার। তার বোধ হয় অনেকটা কারণ, ধর্ম্মগুরু ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক দুর্ব্বল ব্রাহ্মণের শৌর্য্যবীর্য্যের অভাব; পরকে জোরে পরাস্ত করিয়া নিজ-মত চালাইবার ক্ষমতা তার ছিল না,—বাহাদুরী নিবার তেমন কিছুই নাই। আচার মানিয়া যে যে-ভাবে চলো, কোনও আপত্তি নাই। এই স্বাধীনতার ফলে, এ-দেশে দর্শন সম্বন্ধে যত আলোচনা হইয়াছে এবং নূতন নূতন মতের প্রচার হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। এমনই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে চার্ব্বাক-দর্শনের জন্ম। বর্ত্তমান কালের Materialistic Philosophy, বা Rationalism, যাই কেন না বলো, তার প্রত্যেকটীই দুই হাজার বছরেরও পূর্ব্বে মহামুনি চার্ব্বাক কর্ত্তৃক এ-দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। কি সে মত?

চার্ব্বাক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে পুর্ণজন্ম স্বর্গ ইত্যাদি নাই; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়—স্বর্গ-নরক কবির কল্পনা। সুখই স্বর্গ, আর দুঃখই নরক; পৃথিবীতে জীবিতাবস্থাতেই স্বর্গ-নরক মানুষ ভোগ করিয়া থাকে। পান সুপারি খয়ের চূণের সংমিশ্রণে যেমন অপূর্ব্বস্বাদ উপাদানের সৃষ্টি হয়, তেমন মাটী ইত্যাদির মিশ্রণে অপূর্ব্ব দেহ ও বুদ্ধির সৃষ্টি হয়। যখন এই ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌ব্যোম পঞ্চ উপকরণের বিনাশ হয়, তখনই বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। এই পাঁচটীকেই চার্ব্বাক আদি-সত্ত্বা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই পাঁচটী হ'তে যাবতীয় পদার্থ ও জীব গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁর মতে দেহ ও বুদ্ধির পশ্চাতে কোনও 'আত্মা' নাই; এই দেহই 'আত্মা', আর এই দেহের একটী গুণ হইতেছে বুদ্ধি। চার্ব্বাক বলেন, এই 'আত্মার' কোনও প্রমাণ নাই, যদি থাকিত তবে তা' প্রত্যক্ষ করা যাইত। যদি মৃত্যুর পরও 'আত্মা' বাঁচিয়া থাকে, যেমন উপনিষদ বলে, তাহ'লে সে একবার ভুল করিয়াও তার প্রেমাস্পদ ও স্নেহাস্পদদের নিকট ফিরিয়া আসে না কেন? মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মোক্ষ বা মুক্তি চার্ব্বাক স্বীকার করেন না। চার্ব্বাক কেবল প্রত্যক্ষ সত্যই স্বীকার করেন, আনুমানিক সত্য অগ্রাহ্য করেন। ব্রাহ্মণেরা বলে, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে জীব বলি দিলে, সেই জীবের স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী। তাই যদি হয়, তা'হলে তাদের নিজেদের পিতাকে বলি দেয় না কেন? শ্রাদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তির 'আত্মা' যদি পরিতৃপ্ত হয়, তবে যারা প্রবাসে থাকে, তাদের উদ্দেশ্যে যদি বাড়ীতে বসিয়া শ্রাদ্ধ করা যায়, তবে তারা পরিতৃপ্ত হইবে না কেন? শ্রাদ্ধে পিণ্ড দ্বারা যদি মৃতব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, তবে যারা ঘরের উপরে বসিয়া আছে, তাদের নীচে আহার্য্য রাখিলে তাদের পেট ভরিয়া উঠে না কেন? চার্ব্বাকের জাতি-বর্ণেও আস্থা ছিল না। তাঁর মতে বেদরচয়িতারা

দুনিয়ার যত হীনচরিত্র লোক। বেদে তিনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মণ জীবিকার নিমিত্তই পরস্পর-বিরোধী-মত-বিশিষ্ট বেদ সৃষ্টি করিয়াছে, বেদকে অপৌরষেয় বলা একেবারেই অসঙ্গত। যতদিন বাঁচিয়া থাক, জীবনকে ভোগ কর—ইহাই চার্ব্বাকের মূল শিক্ষা; 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'—চার্ব্বাক-দর্শনের একটী মূল সূত্র।

ওমার খাইয়মের কথাই মনে হইতেছে :—

Come, fill the cup, and in the fire of Spring
Your Winter garment of Repentance fling;
The Bird of Time has but a little way
To flutter—and the Bird is on the Wing.

* * *

Then to this earthen Bowl did I adjourn
My Lip the secret well of life to learn;
And Lip to Lip it murmured—"While you live
Drink!—for once dead you never shall return."

এমন সোজাসুজি-ভাবে চাঁছা-ছোলা-ভাষায় ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কেউ খুলিয়া বলে নাই। চার্ব্বাক নিজে এ জীবন-ব্যাপারের কোনও মূলতত্ত্ব খুঁজিয়া পান নাই, ভগবান বা 'আত্মার' খোঁজ পান নাই, অন্যের কাছে ও কোন বুজরুকির বুলি বলেন নাই। আর সব দর্শনই—কি ভারতে কি অন্যত্র—নানা কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় জড়িত, বড় বড় কথা, বোল চাল; খুঁজিতে গেলে, খুঁদের কণাটীরও সাক্ষাৎ শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সত্য,—শক্তির উৎকর্ষ সাধন করে। সত্যের উপর ধর্ম্ম ও জীবন-ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত হ'লে এ-জাতিও অগ্রসর হ'তে পারিত, কিন্তু

তা তো হইবার নয়। বুঝিবে না, লোকের বোঝার সাধ্য নাই,—তাও অনন্ত সমুদ্রের ওপারে পৌঁছিবার দুরন্ত-আকাঙ্ক্ষা-গ্রস্ত ব্যর্থ-প্রয়াস নাবিকের মত মানুষ চিরকাল সত্যপথ ছাড়িয়া, অসত্যের আশ্রয় লইয়া অনাবশ্যক অসাধ্যকে করায়ত্ব করিতে অশক্ত হইয়া হা হুতাশে জীবন কাটাইতেছে। • অজ্ঞান, মোহগ্রস্ত ব্রাহ্মণের চোখে তাই সত্যসেবী চার্ব্বাক চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইলেন। চার্ব্বাক নাস্তিক—এই মত প্রচারিত হইল, যেন নাস্তিকতা মহাপাপ, এবং তারা, যারা আস্তিক, তারা যেন ভগবানের বাড়ীঘরের পেয়ারের লোক। ক্রমে, তাঁকে রাক্ষস নামেও অভিহত করা হইল। ফলে, বেদবিদ্বেষী, জাতিবর্ণের-বিরোধী, সত্যবাদী, সত্যান্বেষী মহামুনি চার্ব্বাকের দর্শন আর চলিল না। মিথ্যারই জয় হইল—যেমন পূর্ব্বাপর আঁধার আলোকে পরাস্ত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু চিরকালই তো সূর্য্য, মেঘে-ঢাকা থাকিবার নয়; সত্য-সূর্য্য ক্রমে আবার উঁকি-ঝুঁকি দিতেছে। বিজ্ঞানের তীব্র আলোতে বায়ুতে কোথায় উড়িয়া যাইতেছে ভগবান্, 'আত্মা'? সব, সব মিছা! যেমন দিন আসিতেছে, তাতে চার্ব্বাক-দর্শনের মত দর্শনই, কালে সব দর্শনকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। আর সব তো খড় কুটার মত প্রখর জ্ঞান-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

কি সকল মিথ্যা আদর্শের পিছনে এতদিন ধরিয়া ভারত ঘুরিয়া বেড়াইল? আত্মা পরমাত্মার খোঁজে যুগ যুগ ধরিয়া কত দেহের মনের শক্তি বৃথা ব্যয় হইল, কিন্তু আত্মা-দর্শন, ভগবৎ-দর্শন হইল কি? এখনো মুখ ফেরাও, হিমালয় হ'তে দৃষ্টি টানিয়া আনিয়া নিজ গৃহের দিকে তাকে আবদ্ধ কর, তাকে সাজাইয়া তোল,—সেখানেই তোমার উৎকর্ষের ক্রিয়াক্ষেত্র, তাকে চাষ করিয়া নূতন শস্য উৎপাদন কর। সুস্থ বলশালী হইয়া প্রকৃত মানুষ হইয়া বর্ত্তমান জীবন উপভোগ কর—'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং

পিব', এই মহানীতিকে সকল বিষয়ে জীবনের মূল নীতি স্বরূপে গ্রহণ করিয়া সাহসের সহিত অগ্রসর হও—মহাহিসাবী, ভীরু, বকধার্ম্মিকের জগতে স্থান নাই, প্রয়োজন নাই তার।

:·১·২৩।—মহাকবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ইংর নববর্ষে লিখিত চিঠি হ'তে উদ্ধৃত :—

'মানসী', 'সোণার তরীর' দিন হ'তেই আমি আপনার পাঠক। বছর পাঁচেক যাবৎ প্রায়ই আপনার গ্রন্থাদি পড়িতেছি এবং বৎসরেক কাল যাবৎ প্রতি রজনীতেই আপনার কিছু না কিছু লেখার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতেছে। পড়িতে পড়িতে আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই। এ-সব কি মানুষে লিখিতে পারে? আমার মনে হয়, যে আদি-কারণ হ'তে উদ্ভূত হইয়া সূর্য্য তেজোরশ্মি বিকীরণ করিতেছে, চন্দ্র হাসিতেছে, বাতাস বহিতেছে, সেই কারণেরই বিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ—আপনার প্রকাশ। আপনিও একটী প্রাকৃতিক শক্তির পূর্ণ-বিকাশ। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ও ইয়ুরোপীয় অন্যান্য গ্রন্থ অনেক পড়িয়াছি, কিন্তু আপনার লেখার মত এমন কিছু পড়ি নাই। কেমন সুন্দর, কেমন নির্ম্মল, কেমন পবিত্র ভাবোদ্দীপক—যেন উষার আলোর ন্যায় মনের অন্ধকার ধ্বংসকারী, শুভ্র, বিনা-আড়ম্বরে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত! আপনাকে প্রশংসা করিবার জন্যই যে এমনভাবে লিখিতেছি—তা নয়; আমার অন্তরাত্মা আপনার লেখাকে যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই সামান্য আভাস দিলাম মাত্র।'

২৮·১·২৩।—বর্ত্তমান যুগের ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক Tolstoy। উপন্যাস ক্ষেত্রে তাঁর Anna Karenina, War and Peace, Re-

surrectionএর তুলনা নাই। কিন্তু সাহিত্য-জগৎ অপেক্ষাও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অধিক। যুগযুগান্তরব্যাপী অত্যাচারের ফলে যে অসন্তোষের অগ্নিদাহন রুশিয়ার বুকে জমিয়া ছিল, ও তাকে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই করিতেছিল, তার সংঘর্ষে আসিয়া তাঁর লেখার ভিতর দিয়া যে মানব-স্বাধীনতা ও সাম্য-বাণী প্রচারিত হইয়াছিল, তারই কল্যাণে আজ রুশিয়া জারের কবল হ'তে নির্ম্মুক্ত। উপন্যাস ছিল মূলতঃ স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের কাহিনী বর্ণনায় ব্যস্ত; রুশিয়ার লেখকদের—টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, ডষ্টয়ফেস্কি, গোর্কি প্রভৃতি—হাতে ইহার কার্য্যক্ষেত্র এক্ষণে বিস্তৃত হইয়া, ইহা একাধারে কবিত্বের, সমাজতত্ত্বের, সাম্রাজ্যতত্ত্বের, প্রকৃত জীবনতত্ত্বের—সকল বিষয়ের প্রকাশের প্রধান ধারায় পরিণত হইয়াছে। রুশিয়ার ঔপন্যাসিকগণই প্রকৃতপক্ষে তার মুক্তির অগ্রদূত এবং এ-সম্বন্ধে টলষ্টয়ের স্থান সর্ব্বাগ্রে।

সমাজের নামে, ধর্ম্মের নামে, রাজনীতির নামে, রাজ্যশাসনস্বরূপে যে কত প্রকার পাপকার্য্য প্রতিদিন আচরিত হইতেছে—তাদের মূল খুঁজিয়া ভিতরকার কপটতা প্রকাশ করিতে এমনভাবে কেউ বুঝি চেষ্টা করে নাই। মূলতঃ, খ্রীষ্টের Sermon on the Mount এবং New Testamentএর অন্যান্য অংশ হ'তে, তাঁর ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় ভাব সকল গৃহীত। তিনি সকল প্রকারের Governmentএর বিপক্ষপাতী; তাঁর মতে Poperty is the root of all evil সম্পত্তি অর্জ্জন সমস্ত পাপের মূল—ইহা হ'তেই যত যুদ্ধবিগ্রহ। এ বিষয়ে তিনি Proudhonএর মতাবলম্বী। তাঁর মূল মত—Non-Resistence, No-Government, No-Human Law, No-Poperty—এই চারিটী বাক্যে ব্যক্ত। এই Non-Resistence হ'তেই শ্রীযুত গান্ধির Non-Violent Non-Co-operationএর সৃষ্টি। Resist not evil, পাপকে বাধা দিও না—এই

নীতি বুদ্ধদেবের মুখে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, খ্রীষ্টের ধর্ম্মে ইহা একটী মূল মন্ত্র, কিন্তু টলষ্টয়ের চেষ্টাতেই ইহা বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছে। ভাব-তরঙ্গ কোথা হ'তে উত্থিত হইয়া কোথায় যাইয়া যে শেষ হইবে— কা'রও বলা অসম্ভব।

টলষ্টয়ের জীবনী পড়িতে যাইয়া কয়েকটী বিষয়ই বিশেষ চোখে পড়ে— অমানুষিক শক্তি, উৎসাহ, জ্বলন্ত আগুনের মত কা'কে খাইয়া পুড়িয়া শেষ করিবে ঠিক নাই, তাঁর অধৈর্য্য অস্বস্তির ভাব, এবং সর্ব্বশেষে, ভণ্ডামি। সংসারে ডুবিয়া থাকিয়াও তিনি সংসারে সুখ পাইতেছিলেন না, আগাগোড়া সম্পত্তি অর্জ্জন ও রক্ষণের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু নিজে তার লোভ কখনো ত্যাগ করিতে পারেন নাই,—তাই স্ত্রী ও ছেলেদের তা' দান করিয়া তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। কি মহত্ব! এই ভণ্ডামির জন্য জনসাধারণ তাঁকে দেখিতে পারিত না। অবশেষে শেষ-জীবনে সংসার ত্যাগ করিয়া ডাক্তার সহ কোনও রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—ইচ্ছা, সংসারের সম্পর্ক চিরকালের জন্য ছিন্ন করিবেন, সেখানেই দিন-কয়েকের পীড়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এই যে সংসার-ত্যাগ, যা হিন্দুর পক্ষে অতি সহজ ও একপ্রকার স্বাভাবিক ব্যাপার, ইয়ুরোপের ভোগপুষ্ট, সাধারণ ঘরকন্না ও ধনদৌলত লইয়া ব্যাপৃত লোকের পক্ষে কেমন কষ্টসাধ্য! টলষ্টয়ের এ ক্ষেত্রের চেষ্টার দিকে চাহিয়া হাসি পায়, ঘৃণারও উদ্রেক হয়—এ যেন লোক-দেখানো সং-বিশেষ, Don Quixoteএর পুনরাভিনয়—তবে ভিন্ন ক্ষেত্রে।

টলষ্টয়ের লেখার প্রধান গুণ, তিনি কতকগুলি মিথ্যাকে ধরিয়া দিয়াছেন, এবং খাঁটি সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। জাতি-প্রেম, দেশ-প্রেম,—এ সকল যে অর্থশূন্য কথা এবং এদের যজ্ঞে যে কত লোকের ধন প্রাণ সংহার হইতেছে—তা' তিনি বিশেষ করিয়া

বুঝাইয়া দিয়াছেন। টলষ্টয়ের গ্রন্থ পড়িয়া প্রাণে সুখ যতটা না পাওয়া যায়, অশান্তির আন্দোলনই তা অপেক্ষা বেশী আসিয়া দেখা দেয়; কিন্তু এ অশান্তির ভিতরই যে সত্য অধিষ্ঠান করিতেছে, মুক্তির বাণী জাগিয়া আছে।

২২-৩-২৩।—বাঁচিয়া লাভ কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? গাছে, পশুতে, মানুষে পার্থক্য কি? আমার যেন মনে হইতেছে, সব জ্ঞান আমার শিক্ষা হইয়াছে; পড়িতেও আর মন যায় না। কি পড়িব? কি শিখিব? শিখিয়া কি লাভ? সবই যে বৃথা, উদ্দেশ্য-বিহীন! গরু হইল—বড় হইল, বুড়া হইল, মরিয়া গেল; গাছও তদ্রূপ, মানুষও কি তেমন নয়? কা'রো জীবনেরই কোন উদ্দেশ্য নাই। ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়া পড়া—ইহাই জগতের প্রাচীন চিরন্তন নিয়ম। কিসের উদ্দেশ্য? সব ভুয়া জল্পনা কল্পনায় মনকে ভুলাইয়া রাখা মাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা! ভগবান! কোথায়? কে? কিছুই না! সবই মিছা! বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য—কেহই আদি-সত্য কিছু বোঝেন নাই; যে সমস্ত দার্শনিক ভগবান্ ভগবান্ করিয়া অস্থির হইয়াছিলেন—তাঁরাও তেমন। এক এক সময় আভাসে মনে হইত, যেন Law of Gravitation ইত্যাদির ন্যায় Moral Law রূপ একটা কিছু সত্য আছে—যার জন্য সৎকাজ করিলে সৎফল হয়; এখন দেখিতেছি, সেও কিছু নয়। Einsteinএর হাতে এমন যে Newtonএর Law of Gravitation তাও ভুল সাব্যস্ত হইয়াছে। হয় তো কোন দিন Law of Evolutionও এমনিরূপে ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কাজ করিলেই যে ভাল ফল Reward পাওয়া যাইবে, এমন নয়। আর ভাল কাজ মন্দ কাজই বা কি? কোন্ Absolute Standard মাপকাটীদ্বারা ভাল মন্দ নির্দ্ধারণ করিয়া নিব? মূলতঃ,

সবই যেন অনির্দ্দিষ্টভাবে হইতেছে—কেউ কারো কাছে জবাবদিহি নয়। বলীয়ান্ যে, তার কোনও দোষই নাই, কোন অবস্থাতেই পাপ তাকে স্পর্শ করে না। আমার ভুল সংশোধন করিয়া দিবার কেউ নাই, আমাকে ফল দান করিবারও কেউ নাই। সমস্তই এখন সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যবিহীন বোধ হইতেছে। কেবলই মনে হইতেছে, Ignorance is bliss ; It is folly to be wise। জ্ঞানবৃক্ষের ফল—বিষ, অশান্তি, অশান্তি!

বেশী তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিও না; যারা করিয়াছে, তারা ঠকিয়া অপদার্থে পরিণত হইয়াছে। ভুয়া বালির সমষ্টি: রত্ন বলিয়া ভিতরে কিছু নাই, কিছুই নাই! কিছু না পাইয়া শেষে হতাশ হওয়াই সার। চক্ষু বাড়াইয়া বেশী দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাই তো এখন হতাশ হইয়া অসারতার-বিষে জর্জ্জরিত-দেহ হইয়া—অসার উত্তমবিহীন হইয়া আছি। চোখ বুজিয়া গোলমালের ভিতর থাকাতেই যা কিছু শান্তি।

কি করিব? কেন কাজ করিব? কিন্তু চুপ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়াও যে সুখ নাই, কারণ মন তো তার কাজ করিতেছেই, আগুন তো সারাদিনই সেখানে জ্বলিতেছে। জ্বলুক—মরাই ভাল।

১০-৫-২৩।—টমসনের মতে 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতাসমূহের সমষ্টি। পূর্ব্বেও 'বলাকা' একবার পড়িয়াছিলাম, এবার আরও যত্নের সঙ্গে পড়া গেল। অস্পষ্টতা বাড়িয়াছে অনেক, কিন্তু নূতন তেমন কিছুই নাই; ভাষারও তেমন সহজ গতি নাই, প্রৌঢ়ের লেখা, ভাবের বোঝায় পীড়িত, প্রৌঢ়েরই শ্লথগতি। সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্থশূন্য হাহুতাশ, বিলাপ, কাকুতি মিনতি। পুরুষ কেন এমন নিঃসহায় বিধবার মত কান্নাকাটি করিবে? কবি ভগবানে বিশ্বাসী, অনন্ত-জীবনে বিশ্বাসী, এ-জগতের লীলাই তাঁর শেষ জীবন নয়, নানাভাবে তার ভিতর

নিরাকারের বিকাশ হইতেছে—এই অনন্ত চির-নিরুদ্দেশ যাত্রায় জীবনকে ভাসাইয়া দিয়া তাঁর হাতেই আপনাকে সঁপিয়া দিয়া চলিতে হইবে।

'বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চল্‌ছে নিরাকার।'
'প্রাণ-বসন্তে তুই যে দখিন হাওয়া
গৃহ-বাঁধন হারা।'
'এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ,
সন্ধ্যা হ'ল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।'

কবির আশা এখান হ'তে যাবার সময়—

(কিন্তু ওরে) হিয়ার মধ্যে ভরি,
নেব যে তার গান।

তাহাই তিনি তার 'জীবন-দেবতাকে' ভবিষ্য-জীবনে শুনাইবেন। তিনি কে?

'সে গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলিবনের তলে

ফুলের গন্ধে ঘোম্‌টা টেনে চলে
ফাল্গুনে তা'র বরণ মালা খানি
প'রাল মোর শিরে।'
'জোয়ার ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তা'র এই আনাগোনা
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনা শোনা।
তারে নিয়ে হ'ল না ঘর বাঁধা
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা
এমনি ক'রেই আসা যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জালবোনা।'

কবির হস্তে চিত্রিত 'জীবন-দেবতার' লীলামূর্ত্তি চিরমধুর, কিন্তু যখন তিনি তাকে এ-জীবনের অন্তে ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গেও জড়াইয়া তুলিতে চান—তখন যেন স্বপ্ন-জাল ছিন্ন হইয়া যায়। কোথায় জীবন, জীবন-দেবতা? কোথায় অনন্ত, অতীত, ভবিষ্যৎ জীবন? সবই যে দুর্জ্ঞেয়! শুধুই কল্পনা!

'গীতালি'—ভগবানের উদ্দেশে রচিত শতেকের অধিক গীতিকবিতার সমষ্টি। নূতন তেমন কিছুই নাই, তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা, যাতে তুলির স্পর্শ লাগে, তাতেই অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। কবিবরের এ-কালের লেখা পড়িতে যাইয়া একটী কথা প্রায়ই মনে হয়। গীতাঞ্জলি হ'তে আরম্ভ করিয়া এক 'বলাকা' ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব লেখাই যেন স্থূলতা-বর্জ্জিত হইয়া সহজগতি ও নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছে, কেমন এক স্নিগ্ধ শুভ্রজ্যোতিতে প্রফুল্ল-মধুর! মনে হয়, দীর্ঘজীবন ভরিয়া যে-সকল ভাবের

আলোড়ন তিনি অনুভব করিয়াছেন, সমস্তের সার বাইরের বাহুল্যের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া মুক্ত-সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষাও কেমন স্বচ্ছ! এ-সবের তুলনা নাই, কবিত্বের সার—এক একটা কথার ঘ্রাণে প্রাণ ভরিয়া উঠে, শরৎ প্রভাতের আলোর মত তার কাণায় কাণায় প্রবেশ করিয়া কেমন তাকে জ্যোতিঃমণ্ডিত করিয়া তোলে! কাব্যামোদীর পক্ষে, বিশেষ করিয়া যিনি ভগবৎ-ভক্ত, উপভোগের এমন অপূর্ব্ব সামগ্রী আর নাই!

সত্যই কি রবীন্দ্রনাথ ভগবানে পূর্ণ-বিশ্বাসী? ভগবান-ধ্যান, এ যেন এক ব্যারাম-বিশেষ।

'এই কথাটা ধ'রে রাখিস্
মুক্তি তোর পেতেই হবে
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।'
'সুখের আশা আঁকড়ে ল'য়ে
মরিস্ নে তুই ভয়ে ভয়ে
জীবনকে তোর ভরে নিতে
মরণ আঘাত পেতেই হবে।'

মুক্তি! কার মুক্তি? কে বন্ধনাবস্থায় আছে, যে তার মুক্তি পাইতে হইবে? মুক্তি আবার কি? 'পারই' বা কোথায়, 'পথই' বা কোথায়? 'জীবনকে ভরে নিতে' না কি 'মরণ আঘাত পেতে হবে'! মরার পরেও আবার জীবনকে ভরা! নেহাৎ কবির কল্পনার মুল্লুকে যদি সম্ভবপর হয়, :—এ বৈজ্ঞানিক যুগে এ-কথায় ক'জন বিশ্বাস স্থাপন করিবে? আমি

বুঝি মরণ অর্থ সোজা কথায়—এই দেহ, মন, আত্মা, যা কিছু বলো, সব লইয়া নিঃশেষ বিনাশ। তা ছাড়া আবার মুক্তি কোথায়? যতদিন দেহ, ততদিনই আশান্তি, দুঃখ। অনন্ত গ্রহ সূর্য্য চন্দ্র তারা নীহারিকা লইয়া অদ্ভুত সৃষ্টি-লয়-সংহার-বিকাশ-ব্যাপার চলিয়াছে—ক্ষুদ্র মানুষ, একবিন্দু প্রাণ লইয়া ছটফট্ করিতেছে সে, দেখা দিতেছে, অদৃশ্য হইতেছে—মুক্তি কোথায়, কোন্ অংশে এ ব্যাপারের মধ্যে? কোথায় ভগবান্? কে তাঁর সংবাদ পাইয়াছে? যত সব জল্পনা কল্পনা! Comteএর মতে ধর্ম্ম-ইতিহাসের তিন অবস্থা—Theological Stage, Metaphysical Stage ও Positive or Scientific Stage। এখনও জগতের অধিকাংশ লোকই প্রথম দুই Stageএ আবদ্ধ। তাই এ-সকল বাণী এখনো শুনিতে হয়।

'জীবনকে ভরে নিতে হবে।' কোথায়? মরণের ওপারে। জন্ম-গ্রহণের সময় এমন কিছুতে আমি ভরা ছিলাম মনে তো হয় না। Heridity ও Environment লইয়া আমার সৃষ্টি ও বিকাশ—এক পাওয়া বাপ মা বংশ হ'তে কিছু, আর যা, দেশ ও সমাজ হতে গ্রহণ করা; অতীত কোন জীবন হ'তে কিছু ভরিয়া লইয়া ছিপ লাগানো বোতলের মত জন্মগ্রহণ করা—এ তো মানুষের জন্ম-ইতিহাস নয়। Wordsworthএর Ode on the Immortality of the Soulএর অসম্বদ্ধ উক্তি-সকলের কথাই মনে হইতেছে। এখনকার দিনেও এসকল শিক্ষা গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়করূপে গৃহীত হইতেছে! মৃত্যু-তাড়নায় ভীত মানুষ যে চিরশিশু' কত কথাই না বিপদে পড়িয়া তার মুখ হ'তে বাহির হয়! প্রকৃত সত্যের সংসার ছাড়িয়া কবিতার কল্পনার গাওনায় ঘুরিতে আর যেন ইচ্ছা করে না। রবীন্দ্রনাথের লেখা—বিশেষতঃ শেষ-বয়সের—এ-সব অমূলক কল্পনারই সমষ্টি। কিন্তু কেমন মিষ্টি! পুতুল

লইয়া খেলায়-মত্ত ছেলেপুলের মত এরূপ মিথ্যা কল্পনার উপলখণ্ড লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াই যে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আনন্দের আস্বাদ পায়। এ-তার জীবনের একটী ধর্ম্ম।

১২'৫'২৩।—পরের জন্য লেখা? কি দরকার? চাই, অনেক টাকা; চাই, অনুগত লোকজন; চাই, সুন্দর সুশোভন গৃহ, সুস্থ দেহ, সুস্থ সবল স্ত্রী পুত্র কন্যা, মনের ইচ্ছামত বন্ধন-বিমুক্ত চিন্তাশূন্য অবস্থায় যেখানে সেখানে ঘুরিয়া, যা তা ইচ্ছা করিয়া, সুখাদ্য-ভোজনে গল্পগুজবে লেখাপড়ায় মাতিয়া থাকিয়া জীবন কাটাইতে। পরের জন্য লিখিয়া কি হইবে? দেশ-উন্নতি, সমাজ-উন্নতি—ছাই! উন্নতি অবনতি—কি? বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ—ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতের উন্নতি না অবনতি করিয়াছেন, কে বলিবে? মানুষ সব চলিতেছিল—স্বাভাবিক গতিতে একভাবে, তাঁরা তাকে অন্য কত পথে চালাইয়া গেলেন। কারো পরামর্শে লোকে মাথা মুড়াইতেছে, কারো মতে লম্বা লম্বা চুল গোফদাড়ি রাখিয়া কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি হইয়া উঠিতেছে—কত কি! এখন দেখা যাইতেছে, কত সব বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মিথ্যা মত তাঁদের ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া আছে। সে সব কুশিক্ষার প্রভাব হ'তে মুক্ত করিবার জন্য বিজ্ঞানকে এখন কত কষ্ট করিতে হইতেছে। জগৎ চলিতেছে—চলিবে। এমন অনন্ত জগতের উন্নতিসাধন করিব—আমি! উন্নতি, অবনতি—অর্থশূন্য সব-কথা। এই যে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, এখানে একশ' বছর আগে তো কত লোক বাস করিয়া গিয়াছে। নেহাৎ মন্দ কি ছিল তাদের জীবন, আর আমরাই বা রেল, ষ্টীমার, মোটরকার দৌড়াইয়া, পুঁথি ঘাটিয়া, সংবাদপত্র পড়িয়া—কি এমন বেশী সুখে জীবন কাটাইতেছি?

আমি কি, কেমন—তাই আমার জানিতে ইচ্ছা করে; আমার প্রাণের

ভিতর দিয়া যে সকল চিন্তাস্রোত বহিয়া যাইতেছে, তার প্রকৃত স্বরূপ কি তাই দেখিতে—তাই তো লেখা। এই 'হৃদয়-বাণী' আমার অন্তরাত্মার বাহির-প্রকাশ মাত্র। দুঃখ—সমস্ত কথা মন খুলিয়া লিখিবার আমার ক্ষমতা বা সুযোগ নাই; ভাষার-কলেবরে মনের-কথা কেমন ভিন্ন আকার ধারণ করে!

* * * *

কিসের স্বদেশ? এই স্বাদেশিকতা এদেশে ছিল না। যে প্রকৃত মানুষ—'বসুধৈব কুটুম্বকং' তার। সে ভাবেই এদেশ শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছিল। কেমন করিয়া পাশ্চাত্য জাতিসকল আসিয়া patriotismএর ধ্বজপতাকা লইয়া হাজির হইল। এই নূতন বিষের জ্বালায় সমস্ত পৃথিবীর দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে, কত জাতি ইহার মধ্যেই এ-আগুনে পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া গেল—কতগুলি ধ্বংসের পথে বসিয়াছে! Armenianএর সঙ্গে Turkoman এতকাল মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছিল, এখন আর তা হইতেছে না—ফলে Armenianরা দেশছাড়া হইয়া মরিতে বসিয়াছে, Austriaর ধ্বংস হইয়াছে, Russia অশান্তির দাবদাহে জ্বলিতেছে, Germanyও যায় যায়। আমাদের এই ভারতভূমিতেও—বাঙ্গালায়, বেহারে, আসামে, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশে—কত রকমের ছোট খাটো সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা দেখা দিয়াছে—সর্ব্বত্রই হিংসা, কলহ, কত রকমের ছোট বড় ঝগড়া বিবাদ বাঁধিয়া গিয়াছে! সকলেই সকলকে জোরে সরাইয়া আহার কাড়িয়া লইবার চেষ্টায় মত্ত। Patriotism! Civilization! আমাকে এই Civilizationএর হাত হতে মুক্ত কর, আমার প্রাচীন অসভ্য অবস্থাই সহস্রগুণে ভাল। কোথায় প্রাচীনের সরল, নিরহঙ্কার, শান্তিপূর্ণ জীবন? শান্তি ও সন্তোষকে যে আমি কিছুতেই প্রাণের ভিতর বসাইতে পারিলাম না!

২১.৫.২৩।—George Elliotএর Mill on the Floss পড়া গেল। পূর্ব্বে তাঁর Silas Marner, Felix Holt, Adam Bede, ও Middlemarch পড়া গিয়াছে। চমৎকার সব বই! আমার বড়ই ভাল লাগে তাঁর লেখা। George Elliotএর লেখার ভিতর কি যে এক শক্তি-অনুপ্রাণিত সৌন্দর্য্য আছে, যে পাঠে এমন একটা আনন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, যা সাধারণ আনন্দ নয়—বেশ যেন তা সবল, পুষ্ট। এ যেন দৃঢ় পাহাড়ের গায়ের ফোটা ফুল—ধীরে ধীরে বিকাশ এবং বাঁচিয়াও থাকে অনেক দিন। এই গুণের জন্যই George Elliot ইংরাজী সাহিত্যে বাঁচিয়া আছে—থাকিবেও অনেক দিন। লেখার মধ্যে কোন প্রকার কলুষতা নাই, আহ্লাদে-ঢং নাই—গার্হস্থ্য চিত্রগুলি কেমন মনোরম ও সুমিষ্ট এবং অনায়াসেই কেমন চিত্তাকর্ষণ করে! তাঁর লেখা পড়িতে পড়িতে খাঁটি morality নীতি-নিয়মের মধ্যে যে একটা অন্তর্নিহিত সবল সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তার প্রভাব প্রতিপদে অনুভব করা যায়। George Elliotএর প্রধান দোষ, লেখায় তেমন গতি নাই, সবই ধীরে ধীরে গোছাইয়া বলা। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রাণে এমন-ভাবে চিহ্ন রাখিয়া যায়, যে আর ভোলা যায় না।

তাঁর যে ক'খানা বই পড়িয়াছি, তার মধ্যে Adam Bedeই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইংরাজের গ্রাম্য ও পারিবারিক জীবনের মনোরম চিত্র! চরিত্র-সবই বা কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে! Mill on the Floss তেমন প্রধান শ্রেণীর বই নয়, তাও একান্ত মন্দ নয়।

Domestic Novels রচনায় ইংরাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রুশিয় ঔপন্যাসিক-দের মত তারা কোন রাজনৈতিক বা সমাজনীতির চর্চ্চায় ব্যস্ত নয়—সে সব সমস্যায় যে তাদের আপাততঃ উৎপীড়িত হইবার কোন কারণ

নাই। মোটের উপর সুন্দর এবং বোধ হয় অধিককাল স্থায়ী; Politicsএর পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু এ-সকল পারিবারিক সরল জীবন-চিত্র, ভাব—মানুষের চির-জন্মের জন্য, চিরসুন্দর।

২২.৫.২৩।—কাল রাত্রিতে সচীশচন্দ্র (বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র) লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ পড়িয়া শেষ করা গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসম্বন্ধে কতক কতক ঘটনা জানা গেল। বইখানা তেমন কিছুই নয়, ছাড়া ছাড়া লেখা,—বঙ্কিমচন্দ্রের মত অমন অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের জীবনী লেখার মত গ্রন্থকারের ক্ষমতা নাই। ভাষাটা সরল ও আড়ম্বরবিহীন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলির সঙ্গে কোন্ বাঙ্গালী না পরিচিত? জানিতে চাহিয়াছিলাম—তাঁর প্রাণের নিগূঢ় কাহিনী, তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের ইতিহাস, কিন্তু সে কৌতূহল একটুও নিবৃত্ত হইল না। পাঠান্তে শুধু এই মাত্র বুঝিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে আমাদের অজানিত অসাধারণত্ব তেমন কিছুই ছিল না, দশজন রাজকর্ম্মচারীর মত তিনিও একজন ছিলেন, তবে একটু সাহসী ছিলেন,—কিন্তু প্রতিভার উদ্দামলীলার কিছুই দেখা গেল না। বরং নবীনচন্দ্রের জীবনী পড়িলে এ-সব বিষয় সম্বন্ধে অধিক তত্ত্ব পাওয়া যায়।

এও কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না, নিতান্ত সাধারণ লোকের মত ছিলেন। যাঁর হাতে এমন দীনা হীনা বাঙ্গালাভাষা নূতন সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া গড়িয়া উঠিল, একটা সমগ্র জাতির গূঢ় প্রাণ-আকাঙ্ক্ষা যাঁর লেখার ভিতর দিয়া বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁর অন্তর্জীবন যে কোন প্রকারের অসাধারণত্বের স্পর্শ অনুভব করে নাই—মনে তো হয় না। একটা

লোকের বাহির ও ভিতরকে বিশ্লেষণ করিয়া সজীবভাবে লোকের কাছে ধরিয়া দেওয়া—জীবন-চরিতাখ্যায়কের কাজ। অতি কঠিন কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তেমন জীবন-চরিত লেখকের এখনও আবির্ভাব হইল না!

বঙ্কিমচন্দ্র লোকটীর মধ্যে তেমন চিত্তাকর্ষক কিছুই ছিল না। তাঁর মনও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল—অসার ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে ভরা। তাঁর লিখিত বইর মধ্যে এই ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য ফুটাইয়া তিনি বাহাদুরী নিয়াছেন। এমন কি, তাঁর 'আনন্দ-মঠে' যে মাতৃমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন, তাকে হিন্দু ব্যতীত, ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারো পূজা করিবার অধিকার নাই; সে মা ব্রাহ্মণমনোকল্পিত ব্রাহ্মণপূজিত দুর্গামূর্ত্তির রূপান্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়—কি দরিদ্র ভাষাকে সমৃদ্ধশালিনী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাঁর রচিত গ্রন্থাদির দিকে চাহিয়া আর তাঁকে তেমন শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'কপালকুণ্ডলার' প্রথমার্দ্ধ বাদে তাঁর আর কিছু যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসাবে বাঁচিবে বোধ হয় না। 'আনন্দ মঠ' অবশ্য চিরজীবি—সে অন্য কারণে। আর সব তো উপন্যাস নয়—গল্প tales। যে সকল বর্ণনা পড়িয়া এক সময় লোকে এত বাহবা দিয়াছে, তা' এখন নিতান্তই একঘেয়ে ও নভেলিয়ানা বলিয়াই বোধ হইতেছে। তাঁর লেখার প্রধান গুণ—বর্ণনার সরসত্ব, সবই কেমন চোখের কাছে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু তার মধ্যে তেমন কোনও জটিলতত্ত্বের অবতারণা বা বিশ্লেষণ নাই। বাঙ্গালীর সাহিত্যিক-জীবনের দিকে চাহিতে যাইয়া মনে হয়—সবে সে-দিন মাত্র সে স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে, বঙ্কিমের হাতে তার হাতখড়ি শেষ হইয়াছে, এখন বোধ হয় তার কৈশোর যাইয়া যৌবনে পড়িবার অবস্থা। সেই বাল্যকালের অনেকটা উপযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এ-সকল লেখা; এখনকার দিনে পড়িতে যাইয়া অনেক সময়ই বিস্ময় হয়, তখনকার লোকেরা এসব আজগুবি গল্প

পড়িয়া এমন মাতিয়াছিল কি করিয়া ? মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের 'ছোট-গল্প' ও 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরের' ভিতর যে ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখা যায়, যে চরিত্র-চিত্রণ, গভীর তত্ত্বানুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে সকল পড়িতে পড়িতে প্রাণ যেমন আলোড়ন বিলোড়ন অনুভব করে—দুই তিনখানা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বই পাঠে তেমন কিছুই হয় না। বলিতে কি, তাঁর লেখায় আমি আর তেমন আনন্দ পাই না—কেবল নভেলিয়ানা-ঢং, আসল প্রাণের খেলা বড়ই কম।

তাঁর জীবনী পড়িতেছিলাম, আর মনের ভিতর অনিত্যতার একটা ভাব কেমন জাগিয়া উঠিতেছিল। তাঁর মৃত্যুকালে আমি কলিকাতায় কলেজের ছাত্র। বেশ মনে পড়ে, বেলা তখন চারি পাঁচটা—কে যেন আসিয়া মেসে সংবাদ দিল, বঙ্কিমবাবু এই মাত্র মারা গেলেন। শুনিতেই প্রাণের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল ! একবার ইচ্ছা হইল শ্মশানে যাই, শেষে আর যাওয়া হইল না। কিছু পূর্ব্বে Higher Training Societyতে [বর্ত্তমানের University Institute] তাঁকে বেদ-সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে দেখিয়াছিলাম। তা' ছাড়া, আরো একদিন তাঁকে সেখানে দেখিয়াছিলাম। ছোটলাট Sir Charles Elliotএর সভাপতিত্বে Societyর বার্ষিক অধিবেশন হইতেছিল; বঙ্কিমবাবুকে নিয়া Daisএর উপর লাটসাহেবের বামপাশে বসান হইল, ডানপাশে চিফ সেক্রেটারী Mr. Cotton উপবিষ্ট ছিলেন। কতকটুকু পরে 'বন্দেমাতরম্' গান হইল, আনন্দসূচক করতালি-ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে-দিন বঙ্কিমচন্দ্রকে কত ভাগ্যবানই মনে করিয়াছিলাম, বাঙ্গালা ভাষার প্রতিও মনে হইতেছিল কেমন সম্মানই না দেখান হইতেছিল ! মাস-কয়েক পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে General Assembly Collegeএ [বর্ত্তমান Scottish Churches College] রবীন্দ্র-

নাথের পঠিত 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' [খুব সম্ভব] নামক প্রবন্ধ শুনিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখন নবযুবক, দেহের সৌকুমার্য্য ও প্রতিভার আলোক, উভয়ের সমাবেশে সে-রজনীতে তাঁকে কেমন দিব্যশ্রীসম্পন্ন মনে হইতেছিল! প্রবন্ধ-পাঠ-শেষে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজ গলা হ'তে ফুলের মালা লইয়া রবীন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন।

কতদিন হয়, বঙ্কিমচন্দ্র মারা গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বঙ্কিমের লেখা আর নবীন বাঙ্গালীর প্রাণে তেমন আনন্দ দান করিতেছে না। কেমন করিয়া করিবে? চিরসত্য-সুন্দর যা—তার ভিতর তা' আছে কোথায় তেমন? ক্ষণিক আনন্দের জন্য যা' লেখা, লোকের মুখের দিকে চাহিয়া যা' লেখা, গতানুগতিককে অনুসরণ করিয়া যা' চলে, নকল যা'—ক'দিন চলে? তাই বঙ্কিমচন্দ্রও মরিতে বসিয়াছেন। কিন্তু তাঁর 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি? সে যে অমর! যিনি এমন বিশাল দেশের সমগ্র জাতির মুখে এমন জাতীয়-ধ্বনি তুলিয়া দিতে পারেন, তাঁর জীবন ধন্য। তাঁর রচিত 'আনন্দ মঠ'—ভবিষ্যৎকালে একদিকে বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'বেলুড় মঠ' ও অন্য দিকে ভয়াবহ ঘটনাসমূহের সৃষ্টির উৎস-স্বরূপ হইয়া চিরজীবী হইয়া আছে। বর্ত্তমান ভারতে অন্য কোনও গ্রন্থই লোকচিত্তের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের যশ দিন দিন ম্লান হইয়া আসিলেও, বলিতে হইবে বাঙ্গালীর ভিতর যে ক'জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত—চৈতন্য, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, মধুসূদন, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন—তিনিও তাঁদেরই শ্রেণীর একজন।

১৬.৬.২৩।—'হৃদয়-বাণী' লেখা আরম্ভ করার পর দশটা বছর চলিয়া গেল। এই সময়টার ভিতর আমার বাহির ও ভিতরে কি পরিবর্ত্তন হইল—তাহাই বিবেচ্য

সংসারটী ছোট ছেলে ও কন্যার আবির্ভাবে একটু বড় হইয়াছে। সত্যই, প্রকৃতির মধুময়ী সৃষ্টি—কন্যা!

বাহিরের সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইবার তেমন কারণ নাই।

ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি—যে অসারতার ভাব বহু পূর্ব্বে দেখা দিয়াছিল, যার আবির্ভাব না—থাকিতে ১৯০৬ সনে সর্ব্বপ্রথম বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম, তা' এখন পুষ্ট হইয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। এখন, কোন কাজেই মন বসে না, টাকা-পয়সা, মান, যশ, পাইলেই যে খুব একটা আনন্দ পাই, এমনও নয়—সকলের উপরই কি এক অসারতার স্তর পড়িয়া আছে, সবই শূন্য! শূন্য! অথচ, সংসারের কোনও বিষয়সম্বন্ধে অপদস্থ বা অর্থহানি হইলে অস্থির হইয়া পড়ি। কষ্ট-যন্ত্রণা এখন কেমন অনায়াসে প্রাণের ভিতর বিদ্ধ হইয়া যায়, কত ছোটখাটো সত্য এবং কল্পিত কষ্টের চিন্তাতেই না অস্থিরচিত্ত হই, কিন্তু সে-অনুপাতে নির্লিপ্ত হইবার শক্তি বাড়ে নাই। সামান্য দুঃখও এখন প্রাণের মধ্যে মস্ত গহ্বর রাখিয়া যায়—ইহা বোধ হয়, শারীরিক শক্তির দিন দিন হ্রাসবশতঃ হইতেছে, দেহের ধর্ম্ম।

দেখিতেছি, দুটী ভাব আমার ভিতর আগাগোড়া খেলিতেছে। একটা আদর্শ অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক— idealistic। বড় ইচ্ছা করে, কিছু একটা করিয়া যাই, বড় লেখক হই; ছেলেরা বড় বড় পণ্ডিত Savant হোক্, নূতন সব তত্ত্ব আবিষ্কার করুক; জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চ্চায় তাদের সঙ্গে মজিয়া থাকি। আর একটা অর্থোপার্জ্জনের জন্য, পোষাক পরিচ্ছদ, মানসম্ভ্রমের জন্য ব্যাকুল—চাকরিয়াদের সংস্পর্শে আসিলেই বিশেষ করিয়া এ ভাবটী দেখা দেয়। এর তাড়নায় আমার কিছুই হইল না। আমি দোটানার মাঝে পড়িয়া, না পারিলাম টাকা রোজগার করিতে, না অন্য কিছু করিতে। হা-হুতাশেই দিন যাইতেছে। কি করিব আমি? কোন্ পথে যাইব? কোন্ পথে?

ভগবানে আমার এখন একটুকু বিশ্বাস নাই। সামান্য যুক্তিতর্কের সম্মুখেও যে তাঁকে দাঁড়করানো চলে না। তাঁর অস্তিত্ব, শুধু অহেতুকী নির্জ্জলা ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাঁকে একমাত্র সম্বল করিয়া তো আর এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিনে চলা যায় না। এখন আমি পরিষ্কার বুঝিয়া লইয়াছি, এই বিরাট জগতে—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা উপগ্রহের ন্যায় 'আমি'ও কি একটু আলোর বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছি—দু'দিন পরে বিলীন হইয়া যাইব। আমার শোক দুঃখ, যাতনা অতি সামান্য রকমেও জাগতিক কোন নিয়মেরও পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবে না। কেই বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সবই দু'দিনের সম্পর্ক, একটী জলবুদ্বুদের সঙ্গে আর একটী মিশিয়া সূর্য্যালোকে ক্ষণেকের জন্য আলোকিত হইয়া অনন্ত জলরাশির বক্ষে মিশিয়া যাইতেছে! এ-সব ভাবিয়াই মনে হয়,—মনের মতন এই অবোধ্য দু'দিনের খেলা খেলিয়া যাই না কেন, প্রাণ যা' চায়, তাই তাকে দিই [দিবও তা'কে এখন হ'তে]।

এ-ক'বছরের অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাইলাম, মানুষ বেশীর ভাগ খোলসই বদলায়—ভিতর আগাগোড়া প্রায় একই রকম থাকিয়া যায়। কত চেষ্টা করা গেল, কত প্রতিজ্ঞা,—কিন্তু সেই খিট্‌খিটে মেজাজ, সেই রাগ, হিংসা, লোভ, প্রবৃত্তি-তাড়না—সমস্তই তো তেমনি আছে ; কিছু-কাল বাইরের চাপে পড়িয়া পাথরের নীচের দূর্ব্বাদলের মত এরা নির্জ্জীব হইয়া থাকে, সামান্য সুযোগ পাইলেই পূর্ব্ব-স্বরূপ ধারণ করে। এতদিনের চেষ্টায় শুধু এইটুকু লাভ দেখিতেছি, তা'ও নিতান্ত অল্প পরিমাণ—কথা-বলার স্পৃহাটা কিছু কমিয়াছে, নির্জ্জনতা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে, এবং প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য উপভোগ করার শক্তি একটু বাড়িয়াছে। ইহারও কারণ বোধ হয়, এ-সব আমার জন্মগত প্রবৃত্তিসমূহের গতি-অভিমুখী,

Environment পারিপার্শ্বিক সেই গতির সাপেক্ষ। মোটের উপর, যেখানে ছিলাম, প্রায় সেখানেই দাঁড়াইয়া আছি।

পূর্ব্বাপর বড় হইবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া আছে। এই আকাঙ্ক্ষার বিভিন্নতা ও তারতম্যই মানুষকে পূর্ব্বাপর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আসিতেছে—এক শ্রেণী, যারা নবীনের অনুসরণ করিয়া নিজ মনুষ্যত্বের আস্বাদ উপভোগ করে ও সমাজের উন্নতি-সাধন করিয়া যায়; আর এক শ্রেণী, গতানুগতিকের অনুসরণকারী, মাটির ডেলা,—জন-সাধারণ। সাধারণ লোকের ন্যায় শুধু অর্থে আমার প্রাণ ভরে না; পূর্ব্বাপরই মনে হইতেছে, তাদের অপেক্ষা আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে, যা' আমাকে তাদের সঙ্গে মিশিতে দিতে চায় না—আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলাই তার অভিপ্রেত।

এখনো বুঝি সময় আছে—একটা দিকে মন-প্রাণ, অর্থ-সামর্থ্য যা' কিছু আছে—সব লইয়া ঝুঁকিয়া পড়া। ইহাই কাম্যাবস্থা। কিন্তু পারিলাম কৈ মনকে এ-ভাবে গড়িয়া তুলিতে?

১১.৭.২৩।—জীবনের আরো একটী বছর চলিয়া গেল। কোষ্ঠীতে দেখিলাম, ৬০ বছরে আমার—'মরণং ধ্রুবং', অর্থাৎ আমি আর মাত্র বছর বারো তেরো এই পৃথিবীতে আছি। তার পরেও কি অন্য কোনরূপে থাকিব—ভূত প্রেত হইয়া? কোষ্ঠীতে আমার বিশ্বাস নাই; তাও জীবনের দু'একটা ঘটনা মিলিয়া যাওয়ায়-যে একেবারে অবিশ্বাসও করিয়া উঠিতে পারি না। এত যুগের কুসংস্কারের চাপে আমার ভিতর মনুষ্যত্ব বলিয়া কিছু আছে কি? কপালের, নিয়তির চর্চ্চা আর এমন কোন্ দেশে হয়? অসারতার ভাব হ'তে ক্রমে ক্রমে কাজের প্রতি, সব বিষয়ে—এক মহা অনাসক্তি indifferenceএর ভাব আসিয়া পড়িতেছে। না পড়িতে,

না লিখিতে, না অন্য কোন কাজে—কিছুতেই আমি সুখ পাই না ; সর্ব্বত্রই সকল অবস্থাতেই প্রেতাত্মার মত কে আমায় সকল সময় অনুসরণ করিতেছে ! যারা ভগবানভক্ত, বিশ্বাসকে যারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, তাদেরে এখন আমার নিতান্ত অজ্ঞ বালকের মত বোধ হয়। ধর্ম্ম—মস্ত একটা কুসংস্কার, সকল কুসংস্কারের বড় কুসংস্কার—জ্ঞানের বায়ুতে দিন দিন উড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু সমস্ত ছাই কালে উড়িয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

Amielএ পড়িতেছিলাম, The gloom of an enternal mourning enwraps more or less closely every serious and thoughtful soul, as night enwraps the Universe, রাত্রি যেমন জগৎকে আঁধারে ঘিরিয়া রাখে, এক অনন্ত দুঃখ অধিক বা অল্প পরিমাণে প্রত্যেক চিন্তাশীল আত্মাকে আবরিয়া রাখে। আমারই মনের নিগূঢ় অবস্থা। Amielএ যেমন আমার প্রাণ-প্রতিধ্বনি পাই, এমন যেন আর কোথাও নয় ; তাই তো, এই Journal আমার এত প্রিয়, আমার নিত্য-সঙ্গী। সত্যই, সকল সময়ই এক মহাদুঃখে আমি ডুবিয়া আছি ; আর কয়েক দিন, কয়েক বছর পরে আমি এবং যারা ও যা কিছু আমার প্রিয়, সকলের সংশ্রবই বিলীন হইবে, কা'রো অস্তিত্বই থাকিবে না—এ ভাবনা যা'র মনে সব সময় জাগিয়া রহিয়াছে, তার সুখ কোথায় ? পাহাড়ের নীচে ধীরে নিশ্চিতভাবে গড়াইয়া পড়িতেছি—সাধ্য নাই কারো, গতির প্রতিরোধ করা। কি করিব ? চক্ষু বুজিয়া আগে-পাছে কোন দিকে না চাহিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিব ? তাই বা পারা যায় কৈ ? চোখ মেলিতেই হইবে ; কাজ করিতেই হইবে ; রোগে, শোকে, জরায় জর্জ্জরিত হইতে হইবেই—নিষ্কৃতি অসম্ভব ! এই ভয়েই তো কপিলাবস্তুর রাজকুমার সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসের

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; শেষে, অনেক চেষ্টায়, নিজ-মনগড়া সত্যের নাগাল পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন। যার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সম্পর্ক নাই অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ডে নিজেকে পরিণত করিতে পারিয়াছে, তার অবস্থা কথঞ্চিৎ ভাল, আর যে, আমার মত সংসারী, আজীবন তাকে উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেই হইবে।

কি করিব আমি ?

পূর্ব্বাপর ভবিষ্যতের অনির্দ্দিষ্ট সৌভাগ্যের আশার নেশায় মাঝে মাঝে মাতিয়া উঠিয়াছি—না জানি কোন্ সুখের স্বর্গপুরেই বা যাইয়া পৌঁছিব !

'এ পথ গেছে কোন্ খানে গো কোন্ খানে
তা কে জানে তা কে জানে !
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক্ পানে—
তা কে জানে তা কে জানে !'

বড় হইব, খুব রোজগার করিব, বড় লেখক হইব—সমস্ত জীবনের উপর একটা আশা জাগিয়া ছিল। এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছি, সব মোহ ক্রমে ছুটিতেছে। ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা, নূতন কোনও আদর্শের অনুসরণ করা, ভাবিতেই তদ্দণ্ডে মনে হয়—বাতুলতা, ব্যর্থ শ্রম ! মানুষ ! কত দুঃখী জীব তুমি ! হৃদয়-ভরা ইচ্ছা, কাজ করিবার এমন বিপুল বাসনা—কিন্তু পূরণ করিবার সময় কৈ ? শক্তি কৈ ? পূর্ব্বে পশ্চাতে অনন্ত আঁধার, অনন্ত কাল,—মাঝখানে, ষাট কি বেশী হ'লে আশিবছর,—এর মধ্যেই সব শেষ করিয়া লইতে হইবে, য কিছু আকাঙ্ক্ষা, মিটাইয়া লইতে হইবে। জলপাত্রে মুখ না দিতে

দিকেই—পিছন হ'তে সজোরে দড়িতে টানিয়া কে আঁধারে লইয়া ফেলিতেছে!

চো'খ-বোজা—তা ছাড়া উপায়ই বা কি? কিন্তু তাই বা পারা যায় কৈ?

১২.৭.২৩।—কাল রাত্রিতে পড়িতে পড়িতে ভাবিতেছিলাম—'আমি' কে? চো'খ বুজিয়া 'আমাকে' উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। এ-ভাবে ভাবা যেন এখন আমার একটা ব্যারামে দাঁড়াইয়াছে। কোথায় 'আমি'? মাথায়, বুকে, না হাতে-পায়? কোথাও যে তাকে locate স্থাপন করিতে পারিতেছি না। না—সমস্ত দেহটাই 'আমি'? তাই বা কেমন? আমার সমস্ত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ 'আমি'ও আছি। কোথায় আমার 'আমি'?

কে স্ত্রী, কে কন্যা, কা'রা পুত্র? কা'দের লইয়া আদর করিতেছি? কতকগুলি জড়শক্তির combination সমাবেশ—মৃত্যু-অন্তে আকাশে, বাতাসে, মাটীতে আমারই মত মিশিয়া যাইবে! কি সম্পর্ক আমার তাদের সঙ্গে? একের মনের সঙ্গে অন্য মনের মিলন—কিই বা এই মিলন? দু'দিনের জন্য,—তারপর যা' কিছু সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবে, শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া নানা খণ্ড খণ্ড দৃশ্য অদৃশ্য ভিন্নরূপে আবির্ভূত হইতে হইতে এ-অস্তিত্বের অনুরূপ সামান্য চিহ্নাংশও থাকিবে না। কে কা'র? কে 'আমি'? কি 'আমি'?

আজ আঁধার রাত্রি, মেঘে আকাশ স্থানে স্থানে ঢাকা। বাগানের ফুলের মত কত তারা ফুটিয়া রহিয়াছে—কেমন দীপ্তিময়! কত রাত্রিতে অশান্তি-জ্বালায় জ্বলিয়া এমন আকাশের নীচে আসিয়া আমি আশ্রয় লইয়াছি; উপরের স্থির, গম্ভীর নক্ষত্র-লোক হ'তে ধীরে ধীরে শান্তিধারা নামিয়া আসিয়া আমার প্রাণকে সুস্থ সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে! আঁধার

রাত্রের তারায়-ভরা আকাশ—আমার কতদিনের প্রাচীন পরিচিত প্রিয় সঙ্গী! আজ কিন্তু আর আমার প্রাণে কোনও শান্তি-বাণী বহন করিয়া আনিতেছে না সে। কেবলই মনে হইতেছে—কত কোটী কোটী যুগ ধরিয়া ধরণীর বক্ষোপরি এ-সকল প্রতি-রজনীতে এমনি আলো বিস্তার করিয়াছে; এই চিরযুগের প্রহরীদেরই চোখের সম্মুখে তার জন্ম হইল, ক্রমে সে বাল্যাবস্থা ছাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিল—কিছুদিন পরে অদৃশ্য হইয়া যাইবে! আমি কোথাকার একটু আলো-বিন্দু কেমন করিয়া এক কোণে ফুটিয়া উঠিয়াছিলাম, কোন্ দিন আঁধারে মিশিয়া যাইব—তখনও কিন্তু এরা বিদ্যমান থাকিবে। কালে এদেরও অস্তিত্ব লোপ হইবে। কিছুই থাকে না—কিছুই না! কি তাহা, যার নেশায় মাতিয়া মানুষ টাকা-পয়সা, ধনদৌলত, যৌবন লইয়া এমন লাফ ঝাঁপ দিয়া থাকে?

যত দিন যাইতেছে, ততই আমার টাকার নেশা, যশের নেশা, প্রতিপত্তির নেশা—কমিয়া আসিতেছে। কথা হইতেছে—সত্য সত্যই কি হইতেছে? আর, এ-ভাব কি ভাল?

*

৩০.৭.২৩।—আজ ভোর হ'তে বৃষ্টি হইতেছে। চারিদিক ম্লান-শ্যাম ভাব ধারণ করিয়া আছে, আকাশ পাত্‌লা মেঘে ঢাকা, ক্ষীণ বাতাস বহিতেছে। ইহাই আমার আদর্শ মনের মতন দিন। এসব দিনে কোনও কাজ থাকিবে না, শুধু দরজা-বন্ধ ঘরে একা বসিয়া জানালা দিয়া মাঝে মাঝে চাহিব, প্রকৃতিকে ভোগ করিব ও রবীন্দ্র-চর্চ্চা করিব। বর্ষাকাল—কবিতার উৎস, কবির চিরপ্রিয়। এ‍কালে বিরহিণী প্রেমিকার ভালবাসা শেষ-বিন্দুতে যাইয়া পৌঁছে; বিরহীর প্রাণে রাধিকা-অনুরূপী প্রেমিকার মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে। কে এই রাধিকা-মূর্ত্তি গড়িয়াছিল?

কেই বা তাকে বাঙ্গালায় আনিল? এ-যে বাঙ্গালারই বর্ষার বিয়োগ-বিধুরা যুবতী, 'ভরা বাদরে' মেঘ-ম্লান আকাশের দিকে চাহিয়া প্রাণপ্রিয়ের কথা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছে! কোথায় এমন দিনে সে! বর্ষাকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের মধুরতা কত লোপ হইয়া যায়, বিদ্যাপতি থাকে না! আবার আকাশ মেঘে ভরিয়া উঠিয়াছে, গাছের ডালপালা শিহরিয়া উঠিতেছে—কেমন মধুর, মনোহরণ প্রকৃতি!

৩.৮.২৩।—কাল রাত্রিতে রবীন্দ্রনাথের 'গীতিমাল্য' পড়িতেছিলাম—

'জীবনকে আজ তোল্ জাগিয়ে
মাঝে সবার আয় আগিয়ে
চলিস্‌নে পথ মেপে মেপে
আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে;
যে টুক্ দিন বাকী আছে—
কাটাস্‌নে তা ঘুমের ঘোরে।
* * *
কোণে ব'সে দিস্‌নে সাড়া
সব খোয়ালি এম্‌নি ক'রে।'

মাসকয়েক হ'তেই এমনি একটী ভাব চিত্তে আনাগোনা করিতেছে। 'নিজেকে জাগিয়ে তোল'—যা' কিছু শক্তি আছে, তা' লইয়া মাথা তুলিয়া শেষবারের মত দাঁড়াও। ভাল পর, ভাল খাও, ভাল চল, ভাল ভাব; কাজ, কাজ, সকল সময় কাজ—কাজে মজিয়া যাও; সকল বিষয়ে First Class Life প্রথম-শ্রেণীর জীবন যাপন কর। কোন কাজেই

এগিয়ে যাও না, কেবল কোণে বসিয়াই মিন্ মিন্ কর, তাই তো সুখ পাও না। সন্তানদেরও পূর্ণশক্তি-বিকাশের যথাসাধ্য চেষ্টা কর—তার জন্য অর্থব্যয়ের অনর্থক চিন্তা করিও না, যত ভবিষ্যতের কল্পিত বিপদের ভয়ে ভীত হইও না। সামান্য ঘোড়া গরুর জন্য লোকে যে চিন্তা বা অর্থ ব্যয় করে—ছেলেপুলের জন্যও যে তেমন করো না! তুমি এবং তোমাকে ঘিরিয়া যারা আছে, সকলে পূর্ণশক্তিতে ফুটিয়া উঠুক্। এই তো জীবন—মানুষের যে-জীবন যাপন করা উচিত।

বন্ধন, সমস্ত ভয়-বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল—টাকার বন্ধন, লোক-লজ্জার বন্ধন, নিজ অক্ষমতা-চিন্তার বন্ধন—সব, সব। প্রত্যেকটী জিনিষ তোমার পূর্ণ-মনুষ্যত্ব উদ্বোধনে সহায় হইবে—পোষাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান, চালচলন, কাজ, কথা, শিক্ষা। প্রথমে লক্ষ্য ঠিক-করা, তারপর বাহিরে ভিতরে যা' কিছু আছে, সাধনামুখী কর সবকে—বন্দরে পৌঁছিতেই হইবে, পৌঁছান চাই-ই, যেমন করিয়াই হোক্। খুব বড় একটা মানুষ হইতেই হইবে, হইবেই,—মানবজীবনের পূর্ণস্বাদ ভোগ করিয়া যাইতে হইবে।

২৫·১১·২৩।—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র উভয়েরই চিত্ত ভারতের প্রাচীন শাশ্বত অনন্ত-ভাবমুখী।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তো সমস্ত দিক্ হইতে অনন্তের বাণীই উত্থিত হইতেছে।

জগদীশচন্দ্রও 'অনেকের' মধ্যে সেই অনন্ত-'একের' অনুসন্ধানে লিপ্ত। জগৎ Marconiর Wireless Telegraphy বিনা-তারের টেলিগ্রাফের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাঁকেই জয়মাল্য দিতেছে—কারণ বাইরের চাক্‌চিক্যময় জড়ই যে সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সহজে, কিন্তু জগদীশচন্দ্র যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত, তা' যে

মানুষকে কোন্ অজানিত অনন্তপুরে—যেখানে মানুষ, পশু, লতা, প্রস্তর একই প্রাণের কম্পনে কম্পিত হইতেছে, সবে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে—লইয়া যাইতেছে, তার কথা ভাবিতে গেলে মার্কনির আবিষ্কারও আমার চোখে যেন সময়বিশেষে ম্লান হইয়া আসে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের ফলে মানুষের জ্ঞান-ধারা, সভ্যতার স্রোত এক নূতন পথে প্রবাহিত হইবে। প্রাচীন পরিচিত খাদেই তা' এখনো বহিতেছে, বহু-দিনের সংস্কারের হাত এড়ানো যে দুষ্কর, কিন্তু কালে তাদের এই নূতন পথে চলিতেই হইবে। যদি উদ্ভিদও, মানুষেরই মত হর্ষ আনন্দ শোক সুখে একই ভাবে আলোড়িত হয়, তা' হ'লে তা'কে বধ-করাও যে প্রাণী-বধেরই ন্যায় মহাপাপ। বুদ্ধদেবের, বৈষ্ণবধর্ম্মের, খ্রীষ্টধর্ম্মের 'অহিংসা পরমধর্ম্ম'রূপ মূলনীতি, কোথায় যায় তা' হ'লে? 'অহিংসা' সমস্ত ধর্ম্মেরই একটা মূল ভিত্তি। কোথায় থাকে সে ভিত্তি? হিংসা না করিয়া উপায় নাই, হিংসা করিতেই হইবে,—জীবনধারণ করিতে হইলেই অন্যের প্রাণব্যয় অবশ্যম্ভাবী। জীব-জগতের অনলঙ্ঘনীয় নিয়ম ইহাই। দয়াধর্ম্ম, কোন ধর্ম্মই তা হ'লে টেকে না! অহিংসার পরিবর্ত্তে হিংসাকে লইয়াই নূতন ধর্ম্ম মানুষকে গড়িয়া তুলিতে হইবে—মিথ্যা লইয়া আর কতদিন চলিবে সে? সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তির উপর মানবীয় নূতন সভ্যতা, সমাজ গঠিত হইবে। ভারতের প্রাচীন ধারাই জগদীশচন্দ্র অনুসরণ করিতেছেন—বেদান্তে, উপনিষদে, যোগশাস্ত্রে যার নির্দ্দেশ আছে; এতদিন মনের দ্বারা যা'কে পাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, বাইরের যন্ত্রের সাহায্যে সেই 'বহুত্বের' ভিতর 'একত্বের' সঠিক স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা হইতেছে। দেখা যাইতেছে—এক বিরাট বিশাল প্রাণময় জগৎ; কি মানুষ, কি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, কি বৃক্ষলতা প্রস্তরে, সর্ব্বত্রই এই বিরাট প্রাণেরই একই-রূপের খেলা। মহত্তর ভারতের সন্তানেরই অনুরূপ এ চেষ্টা, আবিষ্কার,—

সকলকে মিলাইয়া এক নূতন মানব-জাতি নয়, প্রাণী-জাতির সৃষ্টি করা। এই অনন্ততত্ত্ব-দর্শন ইয়ুরোপের দৃষ্টির ওপারে, বাইরের জগতের ঐশ্বর্য্যসম্পদ লইয়াই সে ব্যস্ত, জগতের অন্তর্নিহিত অনন্ত-তত্ত্বসাগরতীরে পৌঁছিবার যে তার তেমন শক্তি নাই। একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র—তাঁর তুলনা কোথাও দেখি না।

দুই মহাপুরুষই নিজ নিজ কর্ম্ম-সাধনে সর্ব্বস্বপণ। প্রাচীন ভারতের যোগীর, সাধকের আত্মারই যে আমি ভারতের নানাক্ষেত্রে বিকাশ দেখিতেছি।

৯·১২·২৩।—এক করিয়াছিল প্রাচীন মুনি-ঋষি, আর করিয়াছিল বৌদ্ধশ্রামণ ও বৈষ্ণব-সাধু। ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্বপণ এমন কেউ হয় নাই।

কে কখন বলিয়াছিল, আমি 'অমৃতের' সন্ধান পাইয়াছি, তোমরা এস, তার ভাগ গ্রহণ কর। তার পর হ'তে সেই অমৃতের খোঁজে কত পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গলে অনিদ্রায় অনাহারে আর্য্যঋষি কত প্রকারে জীবন-পাত করিয়া গিয়াছে! 'অমৃত'! কোথায় 'অমৃতের' নির্ঝর? খুঁজিতে যাইয়া দেখিতে পাইল শেষে—সিন্ধুপারে নয়, পর্ব্বতশিখরেও নয়, তার নিজ নিভৃত-চিত্তাভ্যন্তরেই তার অধিষ্ঠান; সেখান হ'তেই নির্গত হইয়া সমস্ত চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া আছে। মৃগের ন্যায় নিজ-নাভি-নিঃসৃত সুগন্ধে পাগল হইয়া তার অন্বেষণে কত স্থানে বৃথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে! কিন্তু গৃহে তার তাও থাকা হয় নাই, সে-গোপন-বিহারী যে নির্জ্জনতার ভিতরই বাস করে। নিতান্ত নির্জ্জনে বহু সাধনায় উদ্বোধিত অন্তরদৃষ্টির সম্মুখেই যে সে আলেয়ার মত দেখা দিয়া চকিতে অন্তর্হিত হইয়া যায়! তাই যোগী, তাকে পাইয়া অমর হইবার আশায়, নির্জ্জনে তার সাধনায় নিজেকে নিঃশেষ করিয়া গিয়াছে!

ধনমান, অর্থবিত্ত, রাজ্য, রাজানুগ্রহ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কারো দিকে সে চাহে নাই—নিজ সাধনা-সমাধানে তন্ময় হইয়া অন্য সমস্ত হ'তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছে। অন্য কিসের অনুসরণ করিবে সে? আর সবই তো তার চোখে অসার, অর্থশূন্য!

কবে শ্যামের বাঁশী যমুনাপুলিনে বাজিয়াছিল? গোপীরা আত্মহারা অবস্থায় গৃহত্যাগ করিয়া আকুলা বিবশা হইয়া ছুটিল, রাধিকা রাজবালার আর ঘরে থাকা হইল না। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য কাঁদিয়া মরিয়া তাকে ভালবাসিয়া, পূজা করিয়া—তারা নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাদের সেই অপার-প্রেমের একটী কণা শ্যামলবঙ্গের সরসক্ষেত্রে কেমন করিয়া নিপতিত হইল! চৈতন্যমূর্ত্তিতে শ্যামপ্রেমে-মাতোয়ারা ভুবনমোহিনী রাধিকা আবার দেখা দিল। তাঁর শিষ্যগণ বৃন্দাবনেরই গোপীগণ, যারা লোকলজ্জা মান-ভয় ভুলিয়া, সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁর দর্শন পাইবার আশায় যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়াছিল। তার পর হ'তে বৈষ্ণব-সাধুরা কৃষ্ণ-চন্দ্রের দর্শনলাভের জন্য কি কঠোর তপস্যাই না করিয়াছে! রাজমন্ত্রী ভিখারী হইয়াছে, ধনী-গৃহী সংসার ত্যাগ করিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছে। কৃষ্ণই সর্ব্বস্ব-ধন, একমাত্র ধন, সে ব্যতীত অন্য কিছুই নাই জগতে—কাম্যও নয়।

মানুষের মনের কি যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, কোথায় সে শক্তির উৎস, তার বিশ্লেষণ হইল না, কিন্তু ইহা দেখা যায়, ইস্পাতে যেমন ধার দিতে দিতে তা' এমন গুণ প্রাপ্ত হয়, যে নিতান্ত কঠিন পদার্থের অন্তঃস্থলেও অনায়াসে প্রবেশ করা আর তার পক্ষে অসাধ্য থাকে না, সেই প্রকার মনও উৎকর্ষগুণে অবশেষে এমন শক্তি আহরণ করে, যে নিতান্ত গুহ্য-তত্ত্বও তার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া উঠে। এই প্রকার যুগযুগব্যাপী সাধনার ফলে উপনিষদ্ ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে মন যে গভীর নিগূঢ়-তত্ত্বের

তীরে যাইয়া পৌঁছিয়াছে—এমন আর জগতের কোন্ সাহিত্যে সৃষ্ট হইবে? দুটীর ধারা দুই রকম—একটীতে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মদর্শনের চেষ্টা,—বড়ই কঠিন বন্ধুর শ্রমসাধ্য পথ; আর একটার প্রতি পদবিক্ষেপ প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত—

'যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমকে আয়ুধে কাট॥'

প্রেমমণিকে পাইবার জন্য বৈষ্ণব আত্মহারা। সাধনা কা'রো কম নয়; কি বৈষ্ণব, কি যোগীঋষি,—দুজনকেই সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে; 'আত্মা' রূপেই হোক্ বা 'কৃষ্ণচন্দ্র' মূর্ত্তিতেই হোক্—জগৎ-কাম্য যে, তার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী যে, তাকে ছাড়া আর কারো কাছে দর্শন দেয় না। সত্যই দর্শন দিয়া থাকে কি? দিক্ আর নাই দিক্, তার অনুসরণ করিতে যাইয়া, যে ভাব ও সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তারই ফলে ভারতের উপনিষদ্ ও বাঙ্গালার পদাবলী-সাহিত্য উভয়েই অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে।

আর বৌদ্ধশ্রামণ! তাদের কথা আজ থাক্। ভারতের সে জীবন-ধারার কাহিনী! সে যে অর্দ্ধজগতের জীবন-মরণ কাহিনী।

১০.১২.২৩।—গরীব হওয়ার ভয়েই সব সময় প্রপীড়িত; শরীরের কণায় কণায় যেন ভয়ের সঞ্চার হইয়া আছে। তাই, কোনও বড় কাজই হাতে হইয়া উঠে না, কোনও ভাব-সেবায় নিজেকে সঁপিয়া দিতে পারি না। কি হইল এ-দেশের? যেখানকার লোক দরিদ্রতাকে

তুচ্ছ জ্ঞান করিত, সেখানকার লোক দু-চার-আনা পয়সা হাতে না থাকিলে চারিদিক আঁধার দেখে! তাই তো, যে মাথা স্বর্গের দিকে ঋজু হ'য়ে দাঁড়াইত, সে আজ ধূলাকে বরণ করিয়া নিতেছে। অনন্ত-স্বাদ 'অমৃত' লাভের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা—এক্ষণে সামান্য অর্থসঞ্চয় করিয়া ধনী হইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত! যেখানে যাই—কি বন্ধুমহলে, কি গৃহে, মেয়ে-মজলিসে—সর্ব্বত্রই, একমাত্র টাকার আলাপ—টাকা, টাকা, যেন সংসারে কাম্য আর কিছুই নাই। মোটর-কার, বাড়ী-ঘর, গহনা-পোষাকের কথাবার্ত্তা—শুধু এ-সবে কি আত্মার তৃপ্তি হয়? কিন্তু এ-সব ছাড়া অন্য কথা যে শুনিতে পাই না। আমি অনেক সময়ই ভাবি—শুধু এই টাকার ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া কেমন করিয়া জীবন কাটান যায়? যে জীবন যাপন করা হইতেছে, এ তো জীবন নয়,—শুধু মাত্র অস্তিত্বের বোঝা বহা। পলে পলে যে আমি ক্ষয় হইতেছি—I am perishing by degrees! অনন্তমুখী আত্মা—তাকে সেই খোরাকই দিতে হইবে, যাতে সে-দিকেই সে দিন দিন অগ্রসর হ'তে পারে। তবেই তো প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যাইবে—জীবন-যাপন স্বার্থক হইবে। যা পাইলে আত্মা প্রকৃতপক্ষে সুখী হয়, তা পাইতেই যত্নপর হও—দরিদ্রতাকে ভয় করিও না। মানুষ হও, সর্ব্বস্ব-পণ হও—Live।

২১.১২.২৩।—কয়েক মাস যাবৎ বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চর্চ্চা করিতেছি। আমি এমন লেখা আর কোথাও পাই না। পাঠে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পঙ্কিলতা ধুইয়া কেমন একটী অনাবিল শান্তি Serenity, Repose স্থিরতা, ও পবিত্রতা Puritya ভাবে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! ইহাই তো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষণ, প্রাণকে যা উচ্চতার দিকে লইয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদে যে বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল,

তার প্রতিধ্বনি জাগাইয়া কত বসন্ত-ঊষা-উপভোগের আনন্দে প্রাণ ভরিয়া তোলে! ভাষায়, এ সুখের বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। কাব্য-রসভোগ—কি মহানন্দের জিনিষ রবীন্দ্র-কবিতা পাঠে বুঝিতে পারিতেছি। চিত্ত আমার এ-সব সময় কেমন আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া উঠে!

*

বৈষ্ণব-'পদাবলীও' পড়িতেছি। কেমন মধুর!

'সুন্দরী রাধে আওয়ে বণি।
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি॥
কুঞ্জরগামিনী, মোতিমদামিনী, চমকিনী শ্যাম নেহারিণী রে।
আভরণভারিণী, নব অভিসারিণী, শ্যামক হৃদয়বিহারিণী রে॥
নব অনুরাগিণী, অখিলসোহাগিনী, পঞ্চমরাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিহারিণী, হাসবিকাশিনী. গোবিন্দদাস চিতে সোহনী রে॥'

অখিলসোহাগিনী, 'গোবিন্দ-চিত্তহারিণী' রাধিকার তুল্য চিত্র-কমলের সঙ্গে আর কোন্ সাহিত্যে দর্শন পাওয়া যাইবে?

'তোমার বদন, আমার জীবন, সরবস ধন তুমি।
তোমা ধরি চিতে, খোঁজিতে খোঁজিতে আসিয়া পাইনু আমি॥
রাই হে, কি মোর করমে ভাগী।
ব্রজের জীবন, সভাকার ধন, আসিয়া পাইনু লাগি।'

কিন্তু কৈ আমি তো পাইলাম না এ-পর্য্যন্ত! কার বদন আমার জীবনের সর্ব্বস্ব ধন? কই সে? কাকেও তো খুঁজিয়া পাইলাম না!

দিন যতই যাইতেছে, ভিতরকার লোকটী পরিপক্ক হইতেছে—ততই যেন আমার মন, স্বদেশের সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রের দিকে নোয়াইয়া

পড়িতেছে। ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন ভাব ও বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়, বড়ই মূল্যবান্—বাহির-জগৎ সম্বন্ধেও কত বিস্ময়কর নূতন তত্ত্ব তারা আবিষ্কার করিতেছে, কিন্তু আত্মার নিগূঢ় ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার পক্ষে সে-সব লেখার ভিতর তেমন কিছু যেন নাই। 'বাইবেল'! সেও তো এশিয়ার। তাই বা এমন গভীর-ভাবোদ্দীপক কোথায়? Imitation of Christ, Epictetus, Marcus Aurelius, Senecca—এ তো সব Moral Class Book। আর হইবেই বা কেমন করিয়া? এ-দেশের মত এত যুগ ধরিয়া এমন ধারাবাহিকরূপে কোন্ জাতি এমন আধ্যাত্মিকতার চর্চ্চা করিয়াছে—কোন্ জাতিই বা এমন জ্ঞান-চর্চ্চায় তন্ময়তা দেখাইয়াছে? মাঝে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্য বহির্মুখী জ্বালাময়ী সভ্যতার তীব্র আলোকে চোখে ধাঁধা লাগিয়া বিপথে চলিতেছিল সে। আবার এতদিন পরে প্রাচীন ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে। এ-দেশ আর কিছুই চায় না—শুধু চায় শান্তিময় জীবন, আর সত্যান্বেষণের জন্য বাধাবিঘ্নবিহীন ব্যবস্থা, অবকাশ। সে দিন কি আসিবে? আমার জীবনের সামাজিকতার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, অধিক লোক-সঙ্গ, হৈ চৈ আর ভাল লাগে না। প্রাণ এখন অন্তর্মুখী, অনন্তমুখী হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাই, ভারতীয় সাহিত্য—বেদ, উপনিষদ্, বুদ্ধকথা, ভাগবৎ—যারই ধারা রবীন্দ্রনাথ, যারই ধারা বৈষ্ণব-পদাবলী দিন দিন ভাল লাগিতেছে।

* * * *

Animal জন্তু হিসাবে ইয়ুরোপীয়ানেরা, এমন কি এ-দেশের মুসলমান, যাদের অধিকাংশ হিন্দু হ'তেই উদ্ভূত, হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—বীর্য্যবান্, শক্তিমান্। যে কারণে মাংসাশী ব্যাঘ্র সিংহ, শাকভোজী হাতী [illegible] হ'তে জীবন-সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ—সে কারণে তারাও শ্রেষ্ঠ। আহার পরিচ্ছদের

ব্যবস্থা, ধর্ম্ম, জীবনাদর্শ—তাদের হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলবান্ উৎসাহ-উদ্যমপূর্ণ জন্তুতে তৈয়ের করিয়া তোলে। কিন্তু অন্য হিসাবে ? মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি—এ কি মানুষের ব্যবসা ? এ-সবের সঙ্গে হিন্দুর সম্পর্ক কম, এবং এ-কারণে তারা অনেকাংশে কাপুরুষ। যার দৃষ্টির প্রসার কম, চোখের কাছে যা পড়ে তাকেই যে সব চেয়ে লোভনীয় মনে করে, তার কাছে ও-সকলের খুবই মূল্য আছে, কিন্তু হিন্দু জানে—এ-সব সভ্যতার লক্ষণ নয়। তার শিক্ষা অন্য রকমের। অনিত্য অসার সংসারে—দু-দিনের জন্য থাকা, তার পর কে কোথায় যাইবে। যতদিন থাক, ভালবাস, যাকে যার নিজভাবে থাকিতে দাও, সকলেই বড় হও। ইয়ুরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ-সবের মূল্য নাই ; Survival of the Fittest শক্তিমানের উদ্বর্তন প্রাণীজগতের এই ভয়াবহ নীতিকে মূলসূত্র-রূপে গ্রহণ করিয়া, পরকে পরাস্ত করিয়া নিজের হিতসাধন করিবার চেষ্টায় সে-দেশ ব্যাপৃত—পর-দেশ-জয়, পর-ধন-আহরণ তার রাজনীতির মূল মন্ত্র। পরের দেশের ধনে নিজে ধনী হইব, পরকে জয় করিয়া তার স্কন্ধে চড়িয়া জগৎ-জয়ে বাহির হইব—ইহাই জগতে সর্ব্বত্র কাম্য। শুধু হিন্দুই চিরকাল নিজ-দেশ লইয়া সন্তুষ্ট, পর-দেশ জয়ের দিকে তার দৃষ্টি কখনো যায় নাই। তাই তো তার এ-দুরবস্থা। তাও, আজও সে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু জগৎ-জয়ী সিজার, বিশ্ববিজেতা এ্যালেকজেণ্ডার—কোথায় তাদের বংশধরগণ ? পরের সর্ব্বনাশ করিয়া হিন্দু বড় হইতে চায় না ; তার চেয়ে মরা, তাও বরং ভাল।

২৭.১২.২৩।—৪৯ বৎসর বয়স চলিতেছে। প্রায় বুড়ার অবস্থা। একটা দাঁত নড়িয়াছিল—মাস কয়েক হইল উঠাইয়া কৃত্রিম-দাঁত ব্যবহার করিতেছি। আর একটাও সকল সময়েই বেদনা দিতেছে—আগের

পূর্ব্ব নোটিশ। চোখে চশমা অনেক দিন হ'তেই নিয়াছি, তারও Power বছর বছর বাড়িয়া চলিয়াছে। চুলও মাঝে মাঝে উঠিয়া যাইতেছে—মাঝে মাঝে শাদা চুল দেখা দিতেছে। গোঁফ-দাড়ি পাকিয়া উঠিবার উপক্রম হওয়ায়, অনেকটা বার্দ্ধক্য লুকাইবার ইচ্ছায়, হাল-প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে ফেলিয়া দিয়াছি। আর শরীরে শান্তি নাই—আজ দাঁত-ব্যথা, কাল মাথা-বেদনা, বাতের ব্যথা, পেটের পীড়া, জ্বর—একটা না একটা লাগিয়াই আছে। কিছুই যেন তেমন ভাল লাগে না।

এত বয়স হইল,—কই 'আত্মার' তো দর্শন পাইলাম না, ভগবানেরও কোন প্রকার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কোথায় যে তাঁরা আছেন, আমার দেহচিত্ত-মধ্যে, না বাইরে—তাঁরাই জানেন। আর দেখা হইলেই বা কি হইত? চাহিয়া থাকিতাম কি—বিস্ময়-ভরে? না ভগবানের ভিতর জলের মধ্যে চিনির মত,—মিশাইয়া যাইতাম? তা'তেই বা কি হইত? না অন্য কিছু হইত? কি হইত? আনন্দ ভোগ করিতাম। সে কি রকম? কি? শুধু বসিয়া হি হি করিয়া হাসিতাম, না আফিংখোরের মত চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতাম,—তা'তেই বা কি লাভ? বৈদান্তিক যে কি অর্থশূন্য প্রলাপ বকে, তা'তো আমি বুঝিতে পারি না। সব বুজরুকি! শুধু কথার কাটাকাটি!

কাল রাত্রিতে Dalhker Budhist Essays পড়িতেছিলাম। এই বইখানার মত বই আমার চোখে পড়ে না। আর বুদ্ধদেবই একমাত্র লোক, যাঁর কাছে আমার মাথা আপনা হ'তেই নত হইয়া আসে। সংসার দুঃখময় ও এই দুঃখের হাত হ'তে উদ্ধার পাইতে হইবে—ধ্রুবতারার মত এই লক্ষ্যটীকে চোখের সম্মুখে রাখিয়া সারাটী জীবন তিনি কাটাইয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্মে যেমন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন আর কোন্ ধর্ম্মে? বুদ্ধদেবের মত এমন পণ্ডিত দার্শনিক কোথাও তো আমি

দেখিতে পাই না—কেমন যুক্তিজাল, কেমন বলিবার অপূর্ব্ব মনোহরণ আকার! ত্রিশ বছর প্রায় পূর্ণ হয়, এমন সময় রাজপুত্র গৃহত্যাগী হইয়া যান। তাঁর নিজ কথায়,—ত্রিশ বছরে সবে-মাত্র পা দিয়াছি, সুভদ্রা! যখন আমি সর্ব্বোত্তমের অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া যাই। তার পর সুভদ্রা! একান্ন বছর ধরিয়া আমি সত্য, সততার ক্ষেত্রেই বিচরণ করিয়াছি—কারণ সেখানে, শুধু সেখানেই মুক্তি।

এমন অধ্যবসায়—কোথায় দেখা যাইবে? 'এই আসনে আমার শরীর পাত হইয়া যাক্; অস্থি, মাংস, ত্বকের লোপ হোক্—যা'কে পাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা লাভ না করিয়া এ আসন কিছুতেই ত্যাগ করিব না।'—এমন কঠোর তপস্যার কাছে কি অদেয় থাকে? সিদ্ধার্থ নিজ-ভাবে সফলকাম হইয়াছিলেন, 'বুদ্ধত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ও দুঃখের হাত হ'তে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণের শান্তি-আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

আমারও প্রায়ই মনে হয়, এমন সর্ব্বোত্তমের জন্য জীবন সঁপিয়া দেই। To seek the Highest, সর্ব্বোত্তমের সন্ধান—ইহাতেই তো জীবনানন্দ, এই তো প্রকৃত জীবন। কিন্তু হাত বাড়াইতে না বাড়াইতেই মুঠা শিথিল হইয়া আসে; কার পাছে ছুটিয়া যাইব? সবই যে আলেয়ার মত—আঁধার রজনীতে দেখা দিয়া চকিতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে! সার-সত্তা কোথায়? কোথায়, কি সর্ব্বোত্তম? প্রতি পলে আমি যে মরিতেছি,—দাঁত খসিয়া পড়িতেছে, চক্ষু শক্তি হারাইতেছে, চুল উঠিয়া যাইতেছে, চর্ম্ম লোল হইতেছে—আমার সংসার হ'তে অপসারিত হইবার আর বিলম্ব কত? বেশী দিন দূরে নয়, এ-শরীরের স্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে 'আমি' চিরকালের জন্য অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া যাইব। ভবিষ্যতে থাকিব? যদি একান্তই থাকি,—এই দেহ হ'তে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন সে-'আমি'র সঙ্গে এ-'আমির' সম্পর্ক কি? ভ্রান্ত মানুষের দুরাশা! আমার

দেহ, আত্মীয়-স্বজন আগুনে পুড়িয়া ছাই করিয়া ফেলিবে; আমার হাত, পা, জানু, জঙ্ঘা, চোখ, মুখ—কিছুই, কিছুই থাকিবে না, চিরকালের জন্য 'আমি' লোপ হইয়া যাইব। আমার 'আত্মা' রূপে 'আমি' থাকিব? এও কি সম্ভব? কৈ—স্ত্রী, দাদা, বোঠানরা, ধাইমা, বাবা—যাঁরা চলিয়া গেলেন, কারও তো এ-পর্যান্ত সামান্য সংবাদও পাইলাম না! আমি কিসের, কিসের, কোন্ মহোত্তমের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইব? আমার জীবনের আবার উদ্দেশ্য কি? পশু-জীবনের, বৃক্ষ-জীবনের কি উদ্দেশ্য? তাদের সহিত আমার মূলতঃ পার্থক্যই বা কি? জগতের মধ্যে শুধু 'আমির', মানুষের জন্যই ভিন্ন ব্যবস্থা! Highestই কি, আর Lowest সর্ব্ব-নিকৃষ্টই বা কি? আমি উপরে, না আকাশ উপরে? জীবনের আমি তো কোন উদ্দেশ্যই দেখিতে পাইতেছি না। সব সময়ই মনে হইতেছে—এ সংসারের সঙ্গে আমার বাঁধাবাঁধি কোনও সম্পর্ক নাই, অজানা অচেনা জায়গায় উদ্ভূত হইয়া অপরিচিতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—হঠাৎ একদিন নিঃশেষরূপে অদৃশ্য হইয়া যাইব। বৃক্ষ-লতা, পশু পক্ষী—সব, সকলেরই এক অবস্থা। বুদ্ধদেবের কথায়—সমস্ত Component যৌগিক জিনিষের মধ্যেই ধ্বংস নিহিত। মৃত্যু-রজনীতে তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—যত্নের সহিত নিজ মুক্তি চেষ্টা কর। মুক্তি কি? আমি তো বুঝি না। মরার পূর্ব্বে আর মুক্তি কোথায়?

কোনই ধর্ম্ম বা দর্শনের কথায় আমার মনে ঠিক প্রতিধ্বনি দেয় না—সবই যে, শুধু অন্ধ-বিশ্বাসকে শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া আছে। কেবল ইহাই বুঝিতেছি—আমি মরিতেছি, মরিতেছি, পাহাড়ের নীচে গড়াইয়া পড়িতেছি—কারো সাধ্য নাই যে আমাকে রক্ষা করে।

১·২·২৪।—এ-দেশের গরীব লোকগুলি—কি প্রকার নোংরা, কি

প্রকার ছেঁড়া-কাপড়ে অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় দিন কাটায়! অধিকাংশের দিকে চাহিলে দেখা যায়—যেন না খাইয়া আর বাড়িতে পারে নাই, কেহ হয় তো বাড়িয়াছে, কিন্তু ক্ষীণ, দুর্ব্বল, কারো চক্ষু কোটরাগত, অধিকাংশই পীড়াগ্রস্ত, মাঝে মাঝে, আস্তাকুঁড়ের স্তূপে-জন্মা আগাছার মধ্যে দু-একটা যেমন কাছের ছোট ছোট আগাছাগুলিকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া বিনা সংবাদ দিয়া সকলের উপর মাথা ঠেলিয়া বাড়িয়া ওঠে, সেই রকম দু'একটী—তাদের সংখ্যা খুবই কম—বেশ দীর্ঘকায়, হৃষ্টপুষ্ট। এদের দিকে যখনি দৃষ্টি পড়ে, একটী কথাই বিশেষভাবে আমার মনে জাগিয়া উঠে—কি অপচয়! কি অপচয়! এই কি সভ্যতাভিমানী মানুষের সভ্যতার নিদর্শন! যে সভ্যতার কল্যাণে হাজারের মধ্যে একজনও প্রকৃত Stature আকার পায় কি না সন্দেহ—তাও আবার সভ্যতা? অথচ, ইহা নিশ্চয়—খাইতে পাইলে, পরিতে পাইলে, লেখাপড়ার সুযোগ পাইলে—এদের মধ্যে কত সব শক্তিশালী প্রতিভাবান্ লোকের আবির্ভাব হইত! কত জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—এ-ভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এখনো হইতেছে! বর্ত্তমান সভ্যতা—আর বর্ত্তমানের কেন, এ-পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতা নামে যে জিনিষটী চলিয়া আসিয়াছে—এই দারিদ্র্যসমস্যা-সাধন সম্বন্ধে কি করিয়াছে? Socialism, Individualism, কি অন্য কোনও Ismই বুঝি না; বুঝি, সমাজ-দেহ দারিদ্র্যরূপ মহাক্ষতে পচিতেছে। সকলে খাইয়া পরিয়া সুখে থাক্, বড় হইবার সুযোগ পাক্—যাতে এ-অবস্থায় আসিয়া সমাজ পৌঁছে, তার চেষ্টা হোক্। চারিদিকেই দেখিতেছি, ধনীর সমাজ চালাইতে যাইয়া—দরিদ্র দু'মুঠা ভাতের জন্য কি প্রকার নিষ্পেষিত হইতেছে! সভ্যতা! এও সভ্যতা? তা হ'লে অসভ্যতা কি? বন্য অসভ্যদের সমাজে এমন হয় কি, ধনী-দরিদ্রের এমন বৈষম্য আছে কি? এমন নিকৃষ্ট কি তারা?

১০-২-২৪।—"১৭৬৪ সনের ১৫ই অক্টোবর, যখন আমি রোমের Capitol ক্যাপিটলের মাঝে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, যে সময় নগ্নপদ ধর্ম্ম-যাজকের দল জুপিটারের Jupiterএর মন্দিরে সান্ধ্য-বন্দনা গাহিতেছিলেন, সেই সময়ই প্রথম এই রোম-নগরের Decline and Fall ধ্বংস ও পতনের ইতিহাস লিখিবার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণে জাগে।"

"২৭শে জুন, ১৭৮৭ সনে [অর্থাৎ প্রায় ২৩ বছর পরে] রাত্রি এগার হ'তে বারটার মধ্যে আমি আমার বাগানের গ্রীষ্মাবাসে বসিয়া বইর শেষ-পৃষ্ঠার শেষ-লাইন রচনা করি। কলম রাখিয়া, আমি বার কয়েক বাগানের লতাবিতানের ভিতর ভ্রমণ করি। তখন ঈষদুষ্ণ বায়ু বহিতেছিল, আকাশ নির্ম্মল, জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, সমস্ত প্রকৃতি নীরব। মুক্তি লাভ করিয়া, ও আমার যশ যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল, ভাবিয়া আমার যে সে-মুহূর্ত্তে আনন্দ লাভ হইয়াছিল, তার বিষয় গোপন করিব না। কিন্তু শীঘ্রই আমার সেই অহঙ্কারের ভাব দূরীভূত হইল; মনে হইতে লাগিল, চিরকালের জন্য আমি আমার পুরাতন আনন্দদায়ক বন্ধু হ'তে বিদায় গ্রহণ করিলাম ও আমার লিখিত ইতিহাসের ভবিষ্য জীবন যাই হোক্, ঐতিহাসিকের জীবন নিশ্চয়ই স্বল্পকালব্যাপী ও অনির্দ্দিষ্ট।"

এই দুটী উদ্ধৃত অংশের ভিতর এড্ওয়ার্ড গিবন Edward Gibbonএর জীবন-নাটক লিপিবদ্ধ হইয়া আছে—তাঁরা মহৎ-ধারণা, গঠন-বুদ্ধি, জ্ঞান, জাঁকজমকপূর্ণ রচনা-প্রণালী ও প্রতিদিনের পরিশ্রম।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে Gibbonএর অধ্যবসায়ের মত দৃষ্টান্ত বিরল। এমন সফলতাও বিরল। একশো বছরেরও অধিক কাল তাঁর রচিত গ্রন্থ সমস্ত

ইতিহাসের উপরে সদর্পে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—শীঘ্র যে সে-স্থান হ'তে চ্যুত হইবে, এমন আশঙ্কাও নাই। আদর্শ সাহিত্য-সেবক!

১৭-২-২৪।—কি ইচ্ছা করে? যথেষ্ট অর্থ ও সময়ের সচ্ছলতা থাকে, আর আমি কোন একটা মহৎ কাজে ও সাহিত্য-সাধনায় ডুবিয়া থাকি—বহিতে, পত্রিকায়, চিত্রে, সঙ্গীতে, ললিতকলার-চর্চায় মজিয়া থাকি। এ আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইবে না?

৩-৩-২৪।—যতই ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা করিতেছি, ততই ইয়ুরোপের ক্ষুদ্রতা চোখের কাছে ধরা দিতেছে। এশিয়া যেমন আকারে বড়, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও গভীরতায়ও তেমন।

একই সময়ে, রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কিট্‌স, শেলী, বাইরণ প্রভৃতি ইংরাজ-কবিদের লেখা পড়িতেছি—কত পার্থক্য! ইংরাজ-কবি অল্প-জলের মীন, বাহির লইয়া যতটা ব্যাপৃত, ভিতর লইয়া তেমন নয়; লেখার ভিতরও প্রতি পদে পদে চেষ্টার দাগ, লোক দেখাইবার আকাঙ্ক্ষা। তেমন তন্ময়তা, ভাব-ব্যাকুলতা কোথায়? সংসার হ'তে 'সুদূরের' দিকে লইয়া যাইবার সে-লেখার তেমন ক্ষমতা কোথায়? চিত্ত-মাঝে কোথায় একটা স্থান আছে, যেথানে সৌন্দর্য্যসম্ভোগ শক্তি বাস করে। ইংরাজ-কবিদের লেখা প্রাণের অতটা নিম্নস্তর পর্য্যন্ত যেন পৌঁছায় না; এমন কি, মনে হয়, তার তীর পর্য্যন্তও ভাল করিয়া পৌঁছায় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের তুলনাই হয় না। তাঁদের ভিতর যা' আছে—মিষ্টি-ভাষা, মধুর-ভাব—তা'তো, তাঁতে আছেই, তা' ছাড়া আরো অনেক আছে—যা' ইংরাজী-সাহিত্য বা জগতের অন্য সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন—Idealism, পবিত্রতা, শান্তি, নির্ম্মলতা ও অপার সৌন্দর্য্য যার গায় মাখিয়া

আছে। যেমন ভাব, তেমন ভাষা—যেন মুক্তার মত লেখার সঙ্গে বিমল আনন্দ-ধারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে! . . .

* * * *

কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাপতি—ভারত-কাব্য-সরোবরের ত্রিপদ্ম—এঁদের সমকক্ষ কবি জগতে কোথায় পাইবে?

আজ বিশেষ করিয়া শেষের দুজনের কথাই মনে হইতেছে। কৃষ্ণ-রাধিকা, নর-নারী—এ-দুজনের প্রেমভাব প্রকাশ করিতে বাঙ্গালী সাতশ' বছরেরও অধিককাল ধরিয়া কি তন্ময়তা না দেখাইয়াছে! যা'কে বলে ভালবাসা, তা'রে বলি পূজা—ভালবাসাই যে ধর্ম্ম, এ-ভাবটী বাঙ্গালী যেমন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, এমন বুঝি আর কেউ করে নাই। সৌন্দর্য্য-পথে প্রেমের পূজা করিয়া ভগবানকে পাইবার চেষ্টা—এমন আর কোন দেশে হইয়াছে কি? সুন্দরী রাধিকার কৃষ্ণ-সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, তাকে পাইবার জন্ত ঘর-বাড়ী-লজ্জা-সম্ভ্রম-মান-সমস্ত-বিসর্জ্জন দেওয়া হৃদয়-আবেগ,—এ যে সাধকেরই ভগবানকে লাভ করিবার তন্ময়তা।

‘বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥’

প্রেম পাগলিনী রাধিকার লজ্জা, সরম, ভয় নাই—সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সে আঁধার রজনীতে প্রেমাস্পদের-দর্শনে একাকিনী বিঘ্নসঙ্কুল ‘ভীমভুজঙ্গম’, বিদ্যুৎ বিদারিত পথে অগ্রসর হইতেছে।

ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা
চকইতে খলই, লখয়ে নাহি পারা॥

সব যোনি পালটি ভুলালি।
আওত মানবি ভাগত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই
প্রেমহি কুলবধূ পরাভব সহই।

এক কৃষ্ণচন্দ্রের আলোকেই রাধিকার জগৎ আলোকিত। সে যখন মথুরায় চলিয়া গেল, তখন—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকিল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জল দেখ বহয়ে হিল্লোল॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নাগরী।
শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥

এমনি প্রেমে মজিয়া অনুক্ষণ মাধব ধ্যান করিতে করিতে—

'অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই।'

এমনিভাবে নিজেকে প্রেমাস্পদের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হইবে, তাতে

নিজেকে পরিণত করিতে হইবে; তবে, শুধু তবেই জীবন ধন্য হইবে, তার দর্শনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে ও মনে হইবে,—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজ মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজ মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয়া করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সো ন যবহুঁ মোরে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

কিন্তু কৈ, প্রিয়তমকে বক্ষে ধারণ করিয়াও তো অনাবিল শান্তি নাই, প্রাণের জ্বালা তো জুড়াইয়াও জুড়ায় না, দিন দিন নূতনের আস্বাদে প্রাণকে প্রলোভিত করিয়া এক মহাতৃষ্ণা তাকে অজানা-কাহার-দিকে লইয়া যায়—কোথায় শেষ? কোথায়?

বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ-জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম, রমণী রতনে॥
নয়ানে নয়ান দোঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥

তখন দু'জনে যেন এক হইয়া গিয়াছে—

দেহক সরবস গেহক সার
* * *
জীবন জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
* * *
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোঁহা হোয়॥

কিন্তু কৈ, এত করিয়াও তো পূর্ণ-তৃপ্তি হয় না—বিচ্ছেদ থাকিয়াই যায়!

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনমি অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

সোই মধুর বোল   শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল ॥
কত মধুযামিনী   রভসে গোঁয়ায়মু
না বুঝমু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ   হিয়ে হিয়ে রাখমু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বিদগধ জন   রসে অনুমগন
অনুভব কাহে নাহি পেখ।
বিদ্যাপতি কহ   প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক ॥

লাখের ভিতর একজনও মিলে না! প্রাণ তো জুড়ায় না! কৃষ্ণ-রাধিকার জুড়ায় নাই, কারো কি জুড়াইয়াছে এ-পর্য্যন্ত? অপার সুখ, অনন্ত জ্বালা! কোথায় এদের মূল উৎস? কে বলিবে? কে এই জীবন-মরণ সুখ-দুঃখের সমস্যা পূরণ করিবে?

কত চতুরানন,   মরি মরি যাওত
না তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন,   তোহে সমাওত,
সাগরী লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি,   শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক,   নাথ কহায়সি,
অবতারণ ভার তোহারা ॥

আদিও নাই, অন্তও নাই! কে বিশ্ববাসনার মাঝে দাঁড়াইয়া, দুই

হাতে প্রেম-সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া, আহুতি তাকে এমন ভাবে উদ্রেক করিতেছে ? সাগরবক্ষে জলবিন্দুর মত অনন্তকাল ধরিয়া জীবন-মরণ উদ্ভূত হইয়া বিলীন হইতেছে ! আর তারই মাঝে দাঁড়াইয়া স্থিরমূর্ত্তি নিখিল-সোহাগিনী অপরূপা মোহিনী শ্রীরাধিকা !

মাধব, কি কহব সুন্দরী রূপে ।
কত না যতনে বিধি আনি মিলায়ল
দেখলু নয়ান স্বরূপে ॥
পল্লব রাজ- চরণযুগ শোভিত
গতি গজরাজক ভানে ।
অধর বিম্বসনে দশন দাড়িম্ববীজু
রবি শশী উভয় পাশ ।
* * *
ভণতি বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
এহন জগৎ নহি আনে ॥

এই বিশ্বপ্রেয়সীর সৌন্দর্য্যানলে নিজেকে পোড়াইয়া অপার জ্বালায় জ্বলিয়া বিদায় লইতে হইবে ! কিন্তু কে, কি — ইহা, কে বলিবে ? কোথায় আদি, কোথায় অন্ত !

সাতশ' বছরেরও অধিককাল কৃষ্ণ-রাধিকার অপরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতে যাইয়া, তাদের প্রাণের অন্তঃস্থলের আকাঙ্ক্ষা নিজ প্রাণেরই রূপান্তর-স্বরূপ মনে করিয়া বিবৃত করিতে যাইয়া—বাঙ্গালী মূর্ত্তি দুটীকে এমন অপূর্ব্ব-সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, যে জগতে আর এমন দুটী মিলা কঠিন—অসম্ভব ।

কোন্ বাঙ্গালী কবি 'বৈষ্ণব-পদাবলীর' মোহে পড়েন নাই ? রবীন্দ্র-

নাথও পড়িয়াছিলেন, এখনো তা'তেই জড়াইয়া আছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থে মাঝে মাঝে যে তরুণী প্রেমিকা অভিসারিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়—এ যে সেই 'কুঞ্জর-গামিনী' 'অপরূপ মূরতি রাধারূপ অপারাই।'

এই অভিসারিকা-মূর্ত্তি এখানকার বাঙ্গালীর গৃহে, সমাজে আর তেমন দৃষ্ট হয় না। যে-দিন অম্বালিকা বা বসন্তসেনার মত রমণী, সমাজে তেমন হেয় বিবেচিত হইত না—সে-দিন আর নাই। অভিসারিকা রাধিকাও আর নাই। কিন্তু, এই অখিলানন্দদায়িনীকে কেউ ভুলিতে পারিতেছে না—চিরযুগ ধরিয়া যে সে নরের প্রাণ মুগ্ধ করিতেছে! রবীন্দ্রনাথএর বর্ণনায় কত সব সুন্দর কবিতা-গুচ্ছ না গাঁথিয়াছেন! তাঁর কাব্যে যে বিরহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—রাধিকারই-যে রূপান্তর সে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা', তাঁর 'বিদেশিনী',—তা'ও এই মধুর-মূর্ত্তি। এই সে সৌন্দর্য্যময়ী, যাকে তিনি 'উর্ব্বশীর' বেশে সুর-সভায় নৃত্য করিতে দেখেন, বিশ্ববাসনার মাঝখানে যে লীলাকমল-হস্তে স্নিগ্ধ হাসিমুখে দণ্ডায়মানা, শিউলিতলায় যার সঙ্গে তাঁর শরৎ-প্রভাতে সাক্ষাৎ হয়, বসন্তে বকুল-বিছানো পথে যার প্রতীক্ষা করেন, নির্ম্মল-বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদীতীরে যার দিকে চাহিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া থাকেন। বৃন্দাবন-সুন্দরী রাধিকাই এ-সকলের মূল-মূর্ত্তি।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কবি হ'তে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপের আস্বাদ পাইয়াছেন, ভাষার পদলালিত্য অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁদের প্রেম-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যে তাঁর লেখার কলেবর সাজাইয়াছেন।

একাধারে এমন প্রেম, সৌন্দর্য্য, ভক্তির সমাবেশ—'পদাবলী' সাহিত্যের মত আর কোথায় পাওয়া যাইবে? অমূল্যনিধি 'বৈষ্ণব-পদাবলী'!

১.৪.২৪।—বন্ধুবর যোগে...বাবুর নিকট লিখিত পত্র হ'তে উদ্ধৃত—

নূতন পড়া আর কিছু হইতেছে না, পড়িতে তেমন ইচ্ছাও করে না। যার বিশ্বাস নাই, সংসার-বাস তার পক্ষে বিড়ম্বনা ; মূল-উপড়ানো গাছের মত দিন দিন শুষ্কতাপ্রাপ্ত হওয়া—এই তার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অথচ নিতান্ত সত্যের উপর তার 'অবিশ্বাস' প্রতিষ্ঠিত। তা হ'তেই বা চোখ্‌কে অন্যদিকে ফেরানো যায় কেমন করিয়া ? অশান্তি, অশান্তিময় এ জীবন !

২৭-৫-২৪।—এতদিন দর্শন Philosophyর নামে এ পর্য্যন্ত যা লেখা হইয়াছে,—বেদের যুগ হ'তে এ-দেশে ও গ্রীকদের সময় হ'তে ইয়ুরোপে—সবই ভুয়া, অর্থশূন্য ! জগৎ-উৎপত্তির, মানব জীবন-উৎপত্তির মূল কারণ ও তার উদ্দেশ্য,—এ-সব সম্বন্ধে কিছু না বুঝিয়া কত না জল্পনা কল্পনাই করা হইয়াছে ! এখন দেখা যাইতেছে, বৃথা পরিশ্রম, সবই অসার। They lead to nothing শূন্যমুখীই তাদের গতি—বিজ্ঞান ইহা বেশ ভালরূপেই বুঝাইয়া দিতেছে। ধর্ম্ম, দর্শন, কু-সংস্কার, অজ্ঞানতা একদিকে, ও অন্যদিকে বিজ্ঞানে মহা সংঘর্ষ চলিয়াছে,—অজ্ঞানতা আর কতদিন টিকিয়া থাকিবে ? কিন্তু ঘুমঘোর এখনো চোখে লাগিয়া আছে, তাই লোকে ধ্যান, ধারণা, ভগবানের প্রার্থনায় ব্যাপৃত। যাইবে ; কালে এ-মোহমেঘও কাটিবে এবং জ্ঞান-সূর্য্যের শাদা-আলোকে তখন দেখা যাইবে—কেমন সব আবর্জ্জনার স্তূপ হ'তে এতদিন ধরিয়া এত সব অবাস্তর অসত্য জল্পনা-কল্পনার বিষাক্ত-বাষ্প উত্থিত হইতেছিল। প্রদীপ যেমন নিজের-দেহ ক্ষয় করিতে করিতে কালে নিজ-অস্তিত্ব লোপ করিয়া থাকে, দর্শনও তেমনি দিনের দিন নিজ-অসারত্ব প্রমাণ করিয়া নিজ-অস্তিত্বের বিনাশ সাধন করিতেছে। তাই তো এখন ইয়ুরোপে, যেখানে বিজ্ঞানের তীব্র উত্তাপের সংঘর্ষে কু-সংস্কারের আবর্জ্জনা জমিয়া থাকিবার পক্ষে দিন-দিন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে—

পূর্ব্বের ন্যায় আর দলে দলে দার্শনিক দেখা দিতেছে না, নূতন মতেরও আর তেমন প্রচার নাই। Eucken ও Bergson এই দুজন মাত্র একণে Philosophy'র চাষ করিয়া যা কিছু খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁদের মতানুসারে চলিতেছে? সকলেই বুঝিতেছে—Intellectual efforts মাত্র, কিছু নূতন, কিন্তু সত্য বলিতে কিছুই তেমন নাই। যেমন দিন আসিতেছে, কালে Philosopherএর নামে লোকে ঘৃণা তাচ্ছিল্য দেখাইবে। যে-দিন হ'তে Evolution Theory বিবর্ত্তনবাদের প্রচার হইয়াছে, সে-দিন হ'তে Philosophyরও নাভিশ্বাস উঠিয়াছে; অত বড় বৈজ্ঞানিক সত্যকে ঠেলিয়া ফেলা কঠিন, অথচ তাকে বজায় রাখিতে গেলে পূর্ব্বকার মনঃপ্রসূত উদ্দাম কল্পনাকেও বজায় রাখা যায় না, ভগবান আত্মা, পরমাত্মার স্থানাভাব হইয়া ওঠে।

আর একদিক হ'তে দেখিতে গেলে বলিতে হয়, প্রকৃত Philosophy প্রকৃত জীবনব্যাখ্যা এখনই হইতেছে, কিন্তু Philosophy দর্শন-মার্কা লইয়া তা' প্রকাশ হইতেছে না। তার বর্ত্তমান নাম ইয়ুরোপে Materialism জড়বাদ। অনেক মিথ্যার সঙ্গে, সত্যও এর মধ্যে মিশ্রিত দেখা যায়; এর প্রচারকেরা পরিষ্কার বুঝিয়াছে,—দর্শন বা ধর্ম্ম নামে যা এতদিন প্রচারিত হইয়াছে, তাহা মিথ্যা, ভগবান্, আত্মা, পরকাল কিছুই নাই, এই দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে এদের বিলোপ; অতএব ভাল খাইয়া, ভাল পরিয়া যাতে জীবনটা সুখে কাটানো যায় এবং সকলেই যাতে সুখে থাকিতে পারে, তাই হওয়া উচিত মানুষের প্রধান লক্ষ্য। যে সকল শাস্ত্রে তাকে এই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে, তাহাই Philosophy, তাহাই দর্শনশাস্ত্র। এই পৃথিবীর জীবন লইয়াই Philosophy গড়িতে হইবে। স্বপ্ন-রাজ্যে ঘুরিয়া শক্তি-ক্ষয়-করা বৃথা—বৃথা! সত্য—কঠিন কর্কশ, কিন্তু তাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

৪-৬-২৪।—শরৎচন্দ্র এক্ষণে বাঙ্গালা উপন্যাস-জগতে সম্রাট-স্বরূপে ঘোষিত হইতেছেন। কিন্তু ভক্তের দল তাঁকে লইয়া যেন তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এ-বছরেও একটা বড় রকমের গুজব মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি Nobel Prize পাইবেন। অসম্ভব কিছু নয়। যে-সকল লেখক, Nobel Prize পাইয়াছেন, তাদের ভিতর যে সবই প্রথম শ্রেণীর লেখক এমন নয়; বোধ হয়, যেমন চাকুরীর যোগাড় চলে, এ ক্ষেত্রেও তাই। এমন কি, এখন এমনও বোধ হইতেছে, রবীন্দ্রনাথকে Prize দিয়া Noble Prizeই বরং ennobled গৌরবান্বিত হইয়াছে।

কথা হইতেছে, শরৎচন্দ্রের কি এমন বিশেষত্ব, যা লইয়া জগৎ-সাহিত্য-সভায় দাঁড়ান যায়। নূতন ভাবের বন্যা, বলিবার অনন্য-সাধারণ পদ্ধতি, প্রাচীন ভারতের জীবন প্রবাহের সঙ্গে বর্ত্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ক্ষুধা মিশ্রিত হইয়া সকলে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে এক মহা-উপভোগের দ্রব্যে পরিণত করিয়াছে। তাঁর বাণী যার কাণে পৌঁছিতেছে—কি ইয়ুরোপের হাল-সভ্যতার লীলানিকেতন ফরাসী-দেশে, কি জনবিরল অষ্ট্রীয়ার পার্ব্বত্য ভূমিতে, বা আমেরিকার নিভৃত পল্লীতে, প্রাচীন চীনে বা নবলোকদীপ্ত শ্যামে—কোথায় না লোকে আকৃষ্ট হইতেছে? এমন পবিত্র মোহন অনিন্দ্যসুন্দর কিছু কারো লেখাতে ফোটে নাই। শরৎ-চন্দ্রের ভিতর এমন কি আছে, যা এখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞান-পুষ্ট লোকের চিত্তের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে?

শরৎচন্দ্রের লেখায় মাঝে মাঝে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনের অতি নিখুঁত চিত্র আছে; অনেক সময়েই তা' কিন্তু অতিরঞ্জিত। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের দিকে তিনি দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইয়াছেন, সেখানেই যে জাতির

প্রকৃত-জীবনের মূলভিত্তি, সুখ-দুঃখের-উৎস, তারদিকে লোকের নজর পড়িয়াছে। এ-সম্পর্কে ইহাও বলিতে হয়, বাঙ্গালী-জীবনের মধ্যে আমার কিছুই তেমন চোখে পড়ে না, যা পরের কাছে ধরিয়া দেওয়া যায়, এবং যার বিষয় ভাবিয়া গৌরব নেওয়া চলে। 'বড়দিদি' 'মেজদিদি', 'জ্যাঠাইমা' 'খুড়ীমা', 'বৌদিদিদের' কাহিনী বাহির হ'তে শুনিতে সুন্দর ও করুণোদ্রেক হইলেও মূলতঃ অন্তঃসারশূন্য। যদি এ-জীবনের ভিতর প্রাণ-বর্দ্ধক তেমন কিছু থাকবেই, তবে চিরকাল ধরিয়া এ-জাতি এমন জগতের সকলের নীচে পড়িয়া থাকিবে কেন?

শরৎচন্দ্র যে ভাষাটী ব্যবহার করেন, তা সহজ, ভাবব্যঞ্জক, সুন্দর, এবং অল্পেতেই চিত্ত আকৃষ্ট করে। বর্ণনাও এমন অনুপম, যে চিত্রগুলি চোখের কাছে ফুটিয়া উঠে—সবই কেমন সজীব, Real stic! আশ্চর্য্য ক্ষমতা!

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। কালো ময়লা পর্দ্দার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর টুকরা patches, কিন্তু মূল Scene দৃশ্যটী তেমন আনন্দ উদ্রেক করে না। অনেক বই লিখিয়াছেন তিনি, এখনো লিখিতেছেন, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত এমন একটী চরিত্রও খাড়া করিতে পারেন নাই, যা সরলা, ভ্রমর, চন্দ্রশেখর বা গোবিন্দলালের মত আমাদেরই ঘরের একজনে পরিণত হইয়াছে। অসার গল্প, অসম্ভাব্য চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ,—প্রকৃত জীবনের সঙ্গে যাদের কোথাও দেখাশুনা হয় না। তা ছাড়া রহিয়াছে কতকগুলি আদুরে ঢেঙ্গা ছেলে। 'রামের সুমতি' বা 'বিন্দুর ছেলে'তে এই প্রকার দুটী আহ্লাদ-গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—একজন বোঠানের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ান, আর একজন কাকী'মার কোলে মাথা গুজিতে ব্যস্ত। বাঙ্গালী পাঠকেরা এদের লইয়া আনন্দে অস্থির। হইবারই কথা—এরা যে তাদেরই প্রতিকৃতি, এ-আবহাওয়ায় এদেরই যে মাত্র

চাষ হয়—মানুষ তৈয়ের হয় কৈ ? সাহস, বীর্য্য, উৎসাহ, উদ্যম, বাঙ্গালী জাতির গুণ নয় ; শরৎচন্দ্রেও নাই। কেবলই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে চিবাইয়া চিবাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা, ঘ্যান্‌ঘ্যানানি, আহ্লাদে-ঢঙ্গে কথা, স্বাস্থ্যের সঙ্গে যে শক্তি প্রফুল্লতা জড়াইয়া থাকে, তা নাই-ই। প্রচারিত হইয়াছে, 'শ্রীকান্ত' নাকি তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ; ইহার ইংরাজী তর্জ্জমাও প্রকাশিত হইয়াছে। এ ক'দিন 'শ্রীকান্ত' পাঠেই ব্যাপৃত ছিলাম—Rubbish, Absolute Rubbish। একে মাথায় লইয়া ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের হাটে হাজির হইবার আস্পর্দ্ধা! আজগুবি অসম্ভাব্য কথায় পরিপূর্ণ, এ বইএর আগাও নাই, শেষও নাই—যত ইচ্ছা লিখিয়া যাও। বাঙ্গালী পাঠকদের intellectual level জ্ঞানের সীমা কি এতই নীচ, নিকৃষ্ট, যে এমন বইও এমন আদর পাইতেছে! তা আর কেমন করিয়া বলি—আমিই নির্ব্বোধ।

সাহিত্যের ইতিহাস অনেক সময়েই এক একটী প্রতিভার অভিব্যক্তি-বিশেষ। কতকদিন বাঙ্গালাভাষায় বঙ্কিম-যুগ গিয়াছে। তখন তাঁর অনুকরণে রচিত 'সন্ন্যাসী' ও 'হঠাৎ প্রেমিক-প্রেমিকার' জ্বালায় ও 'কথায় কথায় আত্মহত্যার' বিবরণে—বাঙ্গালীকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল। সে-দিন যা হোক্ ফুরাইয়াছে। তৎপরে কি কুক্ষণেই না রবীন্দ্রনাথ 'বিনোদিনীকে' আসরে আনিয়া হাজির করাইলেন। এই বেশ্যা-সতী 'বিনোদিনীর' জ্বালায় লোকে অস্থির হইয়া উঠিল। ইহারই অনুকরণ 'কিরণময়ী', 'সাবিত্রী' ; ইহারই সাজে-ঢালা 'শ্রীকান্তের' 'পিয়ারী বাইজী' 'রাজলক্ষ্মী।' ইহারা পুরুষের সঙ্গে যেখানে সেখানে, যেভাবে সেভাবে, যখন-তখন পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মিশেন, কত রসিকতা করিয়া বেড়ান, কিন্তু তাও এমন চরিত্র-দৃঢ়তা, শেষ পর্য্যন্ত সতীই থাকিয়া যান্! 'পিয়ারী' তো বেশ্যাই, কিন্তু শ্রীকান্ত-সম্পর্কে তার Love কেমন ethereal

something স্বর্গীয় কিছু! সত্যই সংসারের ন'ন এঁরা। 'নৌকাডুবির' 'কমলা' ও ইনিই।

বহু বৎসর পূর্ব্বে ভা—থাকিতে বন্ধুবর শ্রীশ...বাবুর সঙ্গে একদিন তর্ক করিতে করিতে তাঁর একটী কথায় আমাকে চুপ্ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি বলিতেছিলেন, সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কেরও একটা সীমা থাকার দরকার, কয়েকটা বিষয়কে জ্যামিতির postulatesএর মত স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ না করিয়া নিলে,—ভাল-মন্দ, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই, কিছুই থাকে না। এদের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত, এরা প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তর্ক যদি করিতে হয়, তা হ'লে বলিতে হয়, বাপ-মা'কে ভক্তি করার কি দরকার, বড় ভাইকেই বা কেন মানিব, খুড়া-জ্যাঠাকেই বা প্রণাম করিব কেন, কিসে তাঁরা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

এ-সব postulatesর দিকে চাহিয়া তর্ক-প্রবৃত্তির আপনা হ'তেই মাথা নত হইয়া আসে; এমনি সব স্বতঃসিদ্ধ—মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ইত্যাদি। মা'কে কেন মানিব, কেন শ্রদ্ধা করিব—এ-তর্ক করিতে কারো প্রাণে ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। তিনি মা,—জীবনদায়িনী, পুণ্যমঙ্গলময়ী, পবিত্রতার আধার, সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁর চরণে সারাজীবন ঢালিয়া দিয়াও হিন্দু আপন কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইল, মনে করিতে পারে না, কেন তাঁকে সে শ্রদ্ধা করিবে, তর্ক করিয়া কা'কে বুঝাইতেও চায় না। তর্ক-প্রবৃত্তিরও ঔৎসুক্যের শেষ সীমা আছে; মা'র পদপ্রান্তে আসিয়া মাথা লুটাইয়া সে আপনাকে শান্ত মনে করে। এই প্রকার, বহু যুগের আচার অনুষ্ঠানের ফলে হিন্দুর গার্হস্থ্যজীবনে বাপ-মাকে ঘিরিয়া আরো কত কি সব পবিত্র-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—যেমন দাদা, ভাই, পুত্র, কন্যা, বোন্ ইত্যাদি। এমন একটী মধুর মূর্ত্তি হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পারিবারিক-জীবনে অহরহ-দৃষ্টা—জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ, 'বৌঠান'। বড়-দিদির মত এ-মায়ের সঙ্গে

কত শ্রদ্ধা, স্নেহ জড়িত! রবীন্দ্রনাথ এ-হেন পবিত্র নামের উপর কলঙ্ক লেপিয়া দিয়াছেন; শরৎচন্দ্রও তাঁকে অনুসরণ করিয়া সে কালিমার উপরে আর এক পোঁচ গাঢ় কালী লাগাইয়াছেন। হিন্দুর প্রাচীর-ঘেরা পারিবারিক-জীবনে, যেখানে অত্যল্পবয়সেই বালিকার বিবাহ হইয়া যায় এবং বালিকা-বধূর সঙ্গে মেলামেশা ততটা সহজ নয়—রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের নায়িকা খুঁজিয়া না পাইয়া, 'বিনোদিনীকে' আসরে নামাইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে ঠাকুর-পো আখ্যাপ্রাপ্ত মহীন্দ্র ও বিহারীর রসিকতা ও অন্যান্য কার্য্যকলাপ নিকৃষ্টতর জন্তুবিশেষের মারামারির কথাই পদে পদে মনে করাইয়া দেয়। ইংরাজীতে যাকে Flirtation বলে, তা'হাও অনেকটা এই শ্রেণীর, কিন্তু এতটা নয়। Flirtationর পরিণতি কোথায়, কে না জানে? কিন্তু এত করিয়াও বিধবা 'বিনোদিনী' মহা সতী! 'চোখের বালি'কে Realistic উপন্যাস আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন্ Real সত্যকার জীবনে এমন অবস্থায় স্ত্রীলোক শেষ পর্য্যন্ত নারী-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে? বিনোদিনীরই দ্বিতীয় সংস্করণ, কিন্তু আরো অধিক জমকালো—'কিরণময়ী'। 'শ্রীকান্তের' ভিতর এই বেশ্যা-লীলারই অভিনয়। 'পিয়ারী বাইজীকে' কেমন ঘুরের কৌটার মত সাজাইবার চেষ্টা! বেশ্যা-'সাবিত্রী' মা-ঠাকরুণ! ঘৃণায় মন ভরিয়া উঠিতেছে!

আজিকার দিনে বাঙ্গালায় যে এক শ্রেণীর তথাকথিত Realistic উপন্যাস দেখা দিয়াছে—তাদের ভিতর Reality যতটা না আছে, অনাবশ্যক অশ্লীলতা প্রচার করিয়া অনায়াসে লোকদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা, তার অপেক্ষা অনেক বেশী। সামাজিক জীবনে নানাপ্রকার বিচিত্র অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু এ-শ্রেণীর লেখকের লেখা-পাঠে মনে হয়, ইহাই যেন জাতির নিত্যনৈমিত্তিক জীবন ও মানব-জীবনের প্রধান অংশ। যত সব কুৎসিত সত্যই যে সাহিত্যের চর্চ্চার বিষয় হইবে,

এমন নয়। ঐ-সব লেখার মধ্যে সৌন্দর্য্য নাই যত, বর্ব্বরতা অশ্লীলতা তার অপেক্ষা অনেক বেশী—তবে এ-সব কুৎসিত বিষয় লোকের দৃষ্টি অনায়াসে আকর্ষণ করে, তাই এদের এমন popularity।

বেশ্যা-গৃহে বসিয়া পড়িবারই উপযুক্ত এ সব লেখা—শিক্ষিত সভ্য ভদ্র-পরিবারের জন্য নয়। স্বাধীনতার নামে এ-সব লেখক আবার তাঁদের অবাধ কলমের জোরের বাহাদুরী নিয়া থাকেন—ইহা নাকি Art! নিন্—কে তাঁদের বাধা দিবে? Art! Artই বটে! Sacred পবিত্র বলিয়া কিছু এদের কলমের মুখে নাই। কেবল দুঃখের সঙ্গে ইহাই দেখিতেছি, এ-সব লেখার প্রভাবে জাতির নীতির ভিত্তি Moral Foundation ক্রমে নড়িয়া যাইতেছে—জাতির উন্নতি নয়, অবনতি Decadenceর লক্ষণ এ সাহিত্যের popularity। পুত্র-কন্যারা এ-সব পড়িয়া নৈতিক অবনতির পথ পরিষ্কার করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অন্য দিকেও দেখিতেছি। তাঁর নিখিলেশেরই অনুকরণ 'গৃহদাহের' 'মহিম'। নিজ স্ত্রীকে পরে ঘরের বাহির করিয়া লইয়া গেলেও এরা নির্ব্বিকার! অবাধ স্বাধীনতা যে সকলকে দিতে হইবে! সব মহাপুরুষ! এরা কি পুরুষ নামের উপযুক্ত, আত্ম-সম্মান জ্ঞান বলিয়া কি এদের কিছু একটা থাকিতে নাই? এ-সবই কি এখন হ'তে আদর্শ-চরিত্র হইবে? মহাভাগ্য, প্রকৃত সংসারে এখনো এদের দেখিতেছি না।

বাঙ্গালার লেখকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হইতে যাইয়া এঁদের কুসংস্কারের দিকে চাহিয়া সকল সময়ই এক ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। মূলতঃ ছোট বড় সকলেই জাতিভেদের পক্ষপাতী, ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রচারে মুখর—বঙ্কিমচন্দ্র হ'তে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র কাকেও বাদ দেওয়া চলে না। এমন যে শ্রীযুত গান্ধি, জগৎ-প্রীতির জন্য নাকি যাঁর জগৎব্যাপী নাম, তিনিও যে বর্ণাশ্রমের পক্ষপাতী! এ মজ্জাগত

কুসংস্কারের হাত এড়ানো মহা কঠিন, তাই নানা কু-যুক্তি অ-যুক্তি দ্বারা একে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টা। সব বুজরুকি, ফাঁকিবাজী। প্রভাতকুমারের 'ছোট গল্প' মহা সুখপাঠ্য জিনিষ, কিন্তু তাঁর 'জীবনের মূল্য' উপন্যাসে ব্রাহ্মণের শাপে লোকের অপমৃত্যুর সব চিত্র দেখিয়া মনে ধিক্কার হইয়াছে— এই আমাদের শিক্ষা! এ-সব কুসংস্কার তো যাইবার নয়, তা' হ'লে যে এ মরা-জাতি আবার নাড়াচাড়া দিয়া উঠিবে! শরৎচন্দ্রে কোনও নূতন ভাবের সমাবেশ নাই, প্রাচীন যা তাই ভাল,—তাঁর জ্ঞানের সীমাও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। এ-সব মেয়েলি-লেখা পুরুষের পাঠের জন্য নয়।

মোটের উপর, রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য কোনও লেখকের লেখাই আমার চিত্ত তেমন আকর্ষণ করে না। যে লেখার মধ্যে কোনও philosophyর স্পর্শ নাই, তা ঠিক আমার জন্য নয়। কিন্তু বিদ্যাপতি! তাঁর বর্ণিত রাধিকা-মূর্ত্তি যে আমাকে সেই সুধা-সমুদ্রের তীরেই লইয়া যায়, যা সকল philoshphyর লক্ষ্য! শরৎচন্দ্রের লেখা, বড় কোন কল্পনা, ধারণা শূন্য—ঠিক্ আমার জন্য নয়।

/

৫.৭.২৬।—প্রচলিত সাহিত্যের দিকে যখনি এখন চাই, কেমন এক মহা ঘৃণার ভাবে মন পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে!

কাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাইয়া উকীল বিজ...বাবুর পরিত্যক্ত বাড়ীর বাইরের ভাঙ্গা-ঘরের বারেন্দায় একটী কুলী-স্ত্রীলোক ও তার স্বামী, ছেলে-পুলেদের শোচনীয় অবস্থা দেখা অবধি আমার মনে কেবলি এ-ভাবটী জাগিয়া উঠিতেছে নিতান্ত দরিদ্রের দল—অতি ময়লা ছেঁড়া কাপড়-চোপড়, সম্পত্তির মধ্যে এরই কয়েকটা পুঁটুলী, তার উপর ব্যারাম, ম্যালেরিয়া জ্বর, খাইবার থাকিবার সংস্থান নাই, আজ এ-গাছের তলায়, কাল ওর ভাঙ্গা ঘরে মাথা পাতিয়া কোন প্রকারে যা কিছু আহারের যোগাড় করিয়া দিন

গুজরাইতেছে এরা। এমনভাবেই সারাটা জীবন যাইতেছে। কৈ, কোন বইতে তো এদের জীবন-কাহিনী, সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হয় না। এত যে সব নভেল-নাটকে প্রেম লইয়া ছড়াছড়ি, এত যে দয়াল ভগবানের গুণকীর্ত্তন—এদের জীবনের সঙ্গে সে-সবের সম্পর্ক কই? প্রেম-চর্চ্চা, ভগবান্-চর্চ্চার এদের সুযোগ নাই, ও-সব ধনীদের জন্য। অথচ এরাই হইতেছে, এই ছেঁড়া-কাপড়ের দলই হইতেছে,—হাজারে নয়শ' নিরানব্বই। এদের বাদ দিয়া,—সাহিত্য, প্রকৃত জীবনকে বাদ দিয়া,—সাহিত্য; তাই তো সাহিত্যের এমন বিবর্ণ চেহারা—প্রকৃত প্রাণ-পরিচয় কৈ, প্রাণ-স্পন্দন কৈ?

রবীন্দ্রনাথ কাব্য লিখিয়া জগৎজোড়া যশ কিনিয়াছেন ও তাঁর স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; এখন এই বৃদ্ধ-বয়সে আবার তিনি তাঁর 'তত্ত্ব' লইয়া চীনে গিয়াছেন। কিসে-ভরা সেই 'তত্ত্ব'? সেই প্রাচীন বেদবেদান্তের কথা, আত্মা পরমাত্মা, সেই ভগবান-সেবায় তন্ময় হইয়া জীবন কাটানো, সংসারের বাইরের ধনদৌলত, হাল বাণিজ্য-ব্যবসা-প্রধান সভ্যতার দিক হ'তে মুখ ফিরাইয়া আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকা, ভালবাসায় জগৎ বশীভূত করা, সেই প্রাচীন ভারতের সরল ভাব, প্রাচীন বস্তুভারশূন্য জীবন। এ তো অতি পুরানো কথা, প্রাচীন ভারতের প্রাচীন বাণী—নূতনত্ব কোথায়? এই যে জগৎ-জোড়া চারিদিকে ছেঁড়া-কাপড়-পরা খালিপেট অভুক্তের দল,—তাদের সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা, তাদের জীবনের কোন্ কাহিনী কোন্ লেখকের লেখায় স্থান পায়? পাইবে কি? তাদের সঙ্গে যে লেখকের পরিচয়ই নাই,—জীবনের সুখ-তরঙ্গের উপরই তার বাস, নীচের প্রকৃত গভীর দুঃখের সংবাদ তো তিনি রাখেন না। বছরে যার লাখ টাকা আয়, দিব্যকান্তি, সুদৃশ্য ত্রিতল বাসগৃহ, খাইবার পরিবার কোনও কষ্ট নাই—তার মুখেই ইজিচেয়ারে ফ্যানের নীচে বসিয়া মনের

মধ্যে অযথা কল্পনা-বলে কিম্ভূত-কিমাকার ভগবানকে সৃষ্টি করিয়া সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে আহ্লাদে-ঢঙ্গে কাঁদাকাটি করা চলে। এমনি ভাবে, প্রেম সৌন্দর্য্য জীবনাদর্শ ইত্যাদি লইয়া নানাফ্যাসনে নানাস্থানে কত কি লেখা হইয়া থাকে! হাঁড়ীতে দুদিন ভাত না থাকিলে, কোথায় ছুটে যায় এ-সব ভগবানের নেশা! মহাকবি Geothe সত্যই বলিয়াছেন,—'The occupation with the ideas of immortality is for people of rank, who have nothing to do. But an able man, who has something regular to do here, leaves the future world to itself, and is active and useful in this'—অনন্ত-জীবনের জল্পনায় ব্যাপৃত থাকা—অকাজা অবস্থাপন্ন লোকের ব্যবসা; কিন্তু সুদক্ষ লোক, যার নিয়মমত এখানে কিছু করিবার আছে, ভবিষ্যৎ-জগতের চিন্তা ভবিষ্যতের হাতে রাখিয়া দেয় এবং এই জগতেই সে কার্য্যশীল ও কার্য্যতৎপর হইয়া থাকে। কথা হইতেছে, ভগবান্ বা আত্মার কেউ কোন সন্ধান পায় না, সবই মনোকল্পিত, নিজের ভাবকে নিজে পূজা করা—এ-যে মানুষের একটা স্বভাব, অথচ এমনভাবে কথাবার্ত্তা চালানো হইয়া থাকে, যে অজ্ঞ লোক কথায় ভুলিয়া তাদেরই মত বলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িলে তো মনেই হয়, ভগবানের সঙ্গে তাঁর সকাল সন্ধ্যায়—আজ বকুলতলায়, কাল শেফালিগাছের নীচে, কোনও দিন বা ঝড়ের বিদ্যুৎ-মাখা আকাশে—নানারূপে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। মূলতঃ এ সকল লেখার মূল্য কি? প্রকৃত সত্যের সঙ্গে,—কতটা সম্পর্ক এদের? তবে কথা হইতেছে—মানুষের জীবনই অধিকাংশ স্বপ্ন দিয়া গড়া; এ-সবও সেই স্বপ্নজালেরই অংশ। কবি-মস্তিষ্কেই এদের স্থান, কোন অস্তিত্ব নাই এদের, মিছার ডালি সব—ভাবিতে গেলে এক এক সময় মনে হয়—রাবিশ, রাবিশ—সব রাবিশ! কি সব মিছার জালে মনকে দিন দিন জড়াইয়াছি!

এমনি সব য়াবিশ জগতের আরো কত সব শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ—মূল মানব-জীবন-প্রবাহের সঙ্গে যাদের সম্পর্কই নাই ; সবই ধনী ও মধ্যবিত্ত রাজামহারাজা, aristocratic and middle class বাবুদের সম্বন্ধে যা কিছু লেখা, তাদের শৌর্য্য বীর্য্য প্রেমের কাহিনী, ধোঁয়ার মত, সত্য-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। সংখ্যায় অসংখ্য কোটী কোটী ছেঁড়া-কাপড়ের দল,—তাদের জীবন-কাহিনী কে বিবৃত করিবে? চামড়াখানার ভিতর ক্ষীণ মাংস পিণ্ডের কোন প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখা—এই যাদের জীবন, দিনরাতের চেষ্টা, তাদের আবার প্রেম, ভগবান্, আত্মা পরমাত্মার চিন্তা! ভগবান্ তাদের দিকে চান্‌না ; মানুষেও চায় না। মানুষের প্রকৃত জীবন, স্বরূপ বর্ণনা করিবে কে? প্রকৃত সাহিত্য লিখিবে কে?

মেদি—১৮.৯.২৪।—আমি সব সময়ই চারিদিকে মৃত্যু-লীলা দেখিতেছি, সকলের উপরই মৃত্যু-ছাপ। লোকজন, বাড়ীঘর, যার দিকে দৃষ্টি করি—ক'দিনের জন্য, সবকেই চলিয়া যাইতে হইবে, কিছুই থাকিবে না, অস্তিত্বের সামান্য চিহ্নটুকও। শুধুমাত্র দিন কয়েকের জন্য হৈ চৈ। তাই তো, কোনও কাজেই আমার মন যায় না। আর হাতে গণা কয়েকটা বছর মাত্র—তার পরেই তো আমার লোপ হইবে। আত্মা থাকিবে? মিছা। যারা জীবনে সফলকাম হইয়াছে, টাকায় মাথা গুজিয়া আছে—তাদের কাকেও আর তেমন হিংসা হয় না। সকলেই তো মরিয়াছে, সকলকেই মরিতে হইবে,—সমস্ত জগৎই মহা-অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে। আমার ছোট ছেলেরা, মেয়েটী বোঝে না, তাই আমোদে-মত্ত। আমার চোখ খুলিয়াছে, সব পরিষ্কার দেখিতেছি, তাই আনন্দ পাইতেছি না। মনে হইতেছে—সমস্ত-বিদ্যা-অর্জ্জন শেষ হইয়াছে, সমস্ত-জ্ঞান আয়ত্ব হইয়াছে ; কি সে বিদ্যা, কি সে জ্ঞান? সবই অসার! আর পড়ার দরকার কি?

সবই বোঝা গিয়াছে। পড়িতে ইচ্ছা করেও না। বুঝিয়াছি এতদিনে, জীবন-সমস্যা কি ? কি তা' ? সে সমস্যা-সাধন মানুষের পক্ষে—অসম্ভব! হার মানিলাম আমি।

জগতের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেবই ঠিক ধরিয়াছিলেন—কেমন করিয়া জন্ম-মৃত্যু-দুঃখের হাত এড়ান যায়, ইহাই সকল সমস্যার সেরা সমস্যা। তাই তো তাঁকে আমি এমন ভক্তি শ্রদ্ধা করি। তাঁর ভাবে তিনি সমস্যা-সাধন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও ভ্রান্ত, সমস্যা পুরণ হয় নাই। এই ভারতবর্ষে এ-সমস্যাসাধনের জন্য পূর্ব্বাপর কত চেষ্টাই না হইয়াছে। গভীর বনের ভিতর ভয়াবহ নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় যুগের পর যুগ কত লোকের হাড় না ইহার জন্য মাটীতে মিশিয়াছে! কত জনেই না বলিয়াছে—'অমৃতের' সন্ধান পাইয়াছি ; লোকে তাদের পিছনে দলে দলে দৌড়াইয়াও গিয়াছে, কিন্তু শেষে দেখিয়াছে, কিছু না—ভুল সংবাদ!

আমার আর কিছু শিখিতেও ইচ্ছা করে না। 'অসারত্বের', মানুষকে অকর্ম্মণ্যে পরিণত করিবার, সংবাদ-প্রচারে কি লাভ ? এদেশে এর প্রচার যথেষ্ট হইয়াছে। দর্শন, কাব্য—সব, সবই দেখিতেছি ভুয়া। এই অসারত্বের বাণী ছাড়া অন্য যা কিছু, সবই যে মিছা কল্পনার বুদ্‌বুদ।

কি করিব আমি ? কিছুই না। চারিদিকেই যে মৃত্যু! আমি বসিয়া বসিয়া এই মৃত্যু-লীলা দেখিতেছি। সুখ আমার ভাগ্যে নাই। লোকে যে-সুখ পাইবার জন্য অস্থির, তাতেও আমার মন ভরিয়া ওঠে না। লোক-চক্ষে অপদার্থ বিবেচিত হইব ? হই,—ক্ষতি নাই। লোকের মতামতের সঙ্গে যেন আমার আর সম্পর্ক না থাকে।

নীরবতা, নির্লিপ্ততা, জ্ঞান-সেবা—ইহাই আমার Philosphy। আর সকল সময় কোন একটা কাজে মজিয়া থাকা—তা' না হইলে 'অসারত্ব'-দৈত্য যে জ্বালাইয়া মারিবে।

জৈন… ; ১.১২.২৪।—কয়েক দিন হয়, পা পিছলাইয়া পড়িয়া, ডান হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম। এখনো ভালরূপে সারিয়া উঠিতে পারি নাই, অতি কষ্টে লিখিতে পারি। ছুটী লইয়া দেশে আছি।

শরীর তাড়াতাড়ি বৃদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে—জরার সঙ্গে যে আর যুদ্ধ করা চলে না। সকল সময়েই মৃত্যুচিন্তায় ক্লিষ্ট হইতেছি, কিছুতেই আর সুখ পাইতেছি না। সে-দিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কোন্ এক খুব উঁচু বাঁধানো স্থান হ'তে আমাকে ধরিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, আমি শূন্য দিয়া দ্রুতগতিতে নীচে পড়িতেছি, আর এক মুহূর্ত্ত পরেই নীচের সমুদ্রজলে ডুবিয়া মৃত্যু সুনিশ্চিত—এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিল ও আমি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, তখনো কিন্তু দুর্ দুর্ করিয়া প্রাণ ভয়ে কাঁপিতেছিল। আমি আজীবন জ্ঞান-সুধা পান করিতে যাইয়া, হৃদয়োত্থিত অসারত্ব-রূপ কি বিষে আমার দেহ মন জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলাম! সকল অবস্থাতেই যে মৃত্যু আমাকে প্রেতাত্মার মত অনুসরণ করিতেছে! কোথায় পলাইলে, এর হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া যাইবে? যদি কেউ কোথাও থাক এর সংবাদ দিবার, দাও তা',—আমাকে বাঁচাও।

তাও দেখিতেছি, এ ক'মাসের বিশ্রামের পর, আবার যেন লেখাপড়ায় মন দিতে ইচ্ছা করিতেছে। কিছুই যে বুঝিতেছে না, কি সে শক্তি, যা একবার সংসারের দিকে টানিতেছে, আবার তা হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছে!

চিরকাল এ কি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল!
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল!

দুলিছ গো, দোলা দিতেছ !
পলকে আলোক তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সমুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল !
চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও,
বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কেবা জানে !
কোথা বসে আছ একেলা !
সব রবি-শশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা !

২৩.১২.২৪।—মাস কয়েক হইল, সুবিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক Anatole Franceএর মৃত্যু হইয়াছে। সংবাদ-পত্র ও মাসিক-পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে প্রায়ই প্রবন্ধ দেখিতেছি। বহুবৎসর পূর্ব্বে তাঁর The Crime of Sylvestre Bonnard পড়িয়াছিলাম, মোটেই ভাল লাগে নাই।
কয়েক দিন হইল, তাঁর Thais পড়িয়াছি। ইহাই নাকি তাঁর

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। খ্রীষ্টীয় আদিম যুগের জীবন ও ঘটনাবলী লইয়া লিখিত Romance বিশেষ; আজগুবি গল্প, অনেকটা আমাদের পুরাণের মত।

গ্রন্থের নায়িকা Thais, ভুবনমোহিনী সুন্দরী,—ইজিপ্টের এ্যালেকজেণ্ড্রিয়া নগরের সুবিখ্যাত নর্ত্তকী। তখনকার যত ধনী-যুবক,—দার্শনিক, কবি, রাজকর্ম্মচারী—তাঁর যৎসামান্য কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিতে পারিলে, নিজেদের সৌভাগ্যশালী মনে করিত। সে ছিল, এ্যালেকজেণ্ড্রিয়া আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র—soft moon কোমল চন্দ্র। বিলাস-বাসনায়, আমোদ-প্রমোদে সে ডুবিয়া ছিল; মধুর সঙ্গীত, হাস্যপরিহাস—কতভাবে সে আপনাকে আনন্দসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছিল, এবং কতরূপে তাকে ঘিরিয়া সেই আনন্দোচ্ছ্বাস ছড়াইয়া পড়িতেছিল। Thaisএর নিজের কথায়,—আমি আমার পদক্ষেপে সুখ ছড়াইয়া যাই, তজ্জন্য আমি ভুবন-বিদিত। জগতের রাজাদের অপেক্ষা আমি ক্ষমতাশালিনী, তারাও আমার পায়ে লুটাইতেছে। আমার দিকে দৃষ্টি কর, আমার ক্ষুদ্র এই পা' দু'খানির দিকে, শত সহস্র লোক নিজরক্ত-বিনিময়ে এতে সামান্য একটী চুম্বন স্থাপন করিতে পারিলে আপনাদের ভাগ্যবান্ মনে করে। আকারে আমি ক্ষুদ্র; Serapeiumএর উপর হ'তে যারা আমার দিকে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় দৃষ্টি করে, তাদের চোখে আমাকে চাউলের কণাটীর মত মনে হয়, কিন্তু এই সামান্য কণাটী মানুষের ভিতর এত শোক, হতাশ্বাস, ঘৃণা ও পাপ উদ্ভূত করিয়াছে, যে Tartarus তাতে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

মহানন্দের মধ্যে তার জীবন চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় Antinoeর সুবিখ্যাত Abbot Paphnutiusএর কৃপাদৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হইল। এ্যালেকজেণ্ড্রিয়া নগরের কোনও অভিজাত-বংশে তাঁর জন্ম। বিশ বছর পর্য্যন্ত সমাজের অন্যান্য যুবকদের ন্যায় নানা কুকার্য্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হইতেছিল—He led a life of dissipation; এমন সময়

খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকদের উপদেশের প্রভাবে পড়িয়া, তাঁর জীবনের এক মহা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তিনি এক নূতন মানুষ হইয়া উঠিলেন। বাইবেলের উপদেশ,-- If thou will be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, যদি তুমি উন্নত হ'তে চাও, তা হ'লে তোমার যা কিছু আছে, বিক্রী করিয়া দরিদ্রকে দান কর। তিনিও তাই করিলেন; সমস্ত সম্পত্তি গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া দরিদ্রতাকে বরণ করিয়া নিলেন এবং খ্রীষ্ট-সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিলেন, embraced the monastic life। তখন হ'তে তিনি নীল নদীর তীরে ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অন্যান্য খ্রীষ্টসেবকের মত নির্জ্জনে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন এবং উপবাস, অর্দ্ধাহার প্রভৃতি নানাপ্রকারে শরীরকে কষ্ট দিয়া ভগবানের আরাধনায় আপনাকে নিমগ্ন করিয়া দিলেন। এই প্রকারে দশ বছর চলিয়া গেল।

একদিন তিনি তাঁর প্রথানুসারে অতীত পাপকাজের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় মনে পড়িল—বহুবৎসর পূর্ব্বে এ্যালেকজেণ্ড্রিয়া নগরের নাট্যশালায় Thais নাম্নী অপূর্ব্বসুন্দরী যে অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হইয়াছিল, কি কুভাবেই না সে জীবন-যাপন করিতেছে, তার নৃত্য-দর্শনে কত কুভাবেরই না উদ্রেক হয়! তাকে পাপের কবল হ'তে উদ্ধার করিয়া অনন্ত-জীবনের পথে লইয়া যাইবার জন্য তিনি তখন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। নানাবিধ কষ্ট যন্ত্রণার ভিতর দিয়া এ্যালেকজেণ্ড্রিয়া নগরে Thaisএর গৃহে অবশেষে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তার প্রতি তাঁর অপার প্রেমের কথা বলিলেন, এবং খ্রীষ্টের নাম করিয়া, তাকে পাপ-পথ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-জীবন বরণ করিয়া নিতে বারংবার উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

Thais তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, ধর্ম্মযাজক! আমাকে যদি ভালবাসিয়া

থাক, মৃত্যু হ'তে কি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে? উত্তর হইল,—হে নারি! যে বাঁচিতে চায়, বাঁচিবে সে। যে ঘৃণ্য আনন্দের মধ্যে তুমি চিরকাল ধরিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া নিতেছ, তা' হ'তে নিজেকে অপসারণ কর; ডেভিল Devilএর হাত হ'তে ভগবানের-সৃষ্ট দেহকে কাড়িয়া নেও; নীরবতার পুণ্য-নির্ঝরে স্নান করিয়া আপনাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোল— আমি তোমার সম্মুখে অনন্ত-জীবন ধরিয়া দিতেছি।

Thaisএর প্রেমাভিলাষীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, Paphnutius তাকে তার ঘৃণ্য-জীবনের সংস্রব পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হইলেন এবং তাকে সঙ্গে লইয়া Albina নামে এক অতি-বৃদ্ধা যীশু-সেবিকার House of Salvation মুক্তি-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। Paphnutiusএর ভাষায়,—'পুষ্পহীন পথপ্রান্তে একটী মৌমাছি হারাইয়া গিয়াছিল; আমি পাইয়া মধুচক্রের-রাণী তোমার নিকট লইয়া আসিয়াছি। আমি আমার হাতের তালুর উপর ধারণ করিয়া, আমার নিশ্বাসে একে নব-জীবন দান করিয়াছি, আমি একে তোমাকে দান করিলাম।' গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার সময় Thais তার আসবাবপত্র, পালঙ্ক, শয্যা, ঝাড়, লণ্ঠন, দেহের অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, মোটের উপর যা কিছু তার আপন বলিতে ছিল, সব আগুনে ভস্মীভূত করিয়া আসিয়াছিল। তার প্রেমিক ও বন্ধু অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক Niciasএর উত্তরে সে বলিয়াছিল, I am weary of all I know, and I am therefore going to seek the unknown—যা কিছু আমি জানি, সকলের প্রতি আমি বিতৃষ্ণ হইয়াছি, তাই আমি অজানিতের অন্বেষণে চলিয়াছি। Albinaর আশ্রমে অন্যান্য যীশু-সেবিকার সঙ্গে, Thaisএর শান্তিময় জীবন যীশু-শিষ্যা-রূপে ভগবানের ধ্যান ও সেবায় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিন্তু Paphnutiusএর প্রাণে আর সুখ শান্তি নাই। Thaisকে

Albinaর আশ্রমে রাখিয়া, তিনি আবার মরুভূমির নির্জ্জন আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং পূর্ব্বেরই মত, এমন কি, তা অপেক্ষা কঠোররূপে ভগবানের সেবায় আপনাকে সঁপিয়া দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মনকে তিনি আর কিছুতেই ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন করাইতে পারিতেছেন না! সর্ব্বক্ষণই Thaisএর মনমোহিনী-মূর্ত্তি তাঁর চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে! বাসনার আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া দিন দিন তিনি ভস্ম হইতে লাগিলেন। কত দীননয়নে, কত কাতরভাবে তিনি ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁকে উদ্ধার করিতে পারিল না। কে উদ্ধার পাইয়াছে এমন অবস্থায়? কেউ কি পাইয়াছে? বিশ্বমোহিনী নারী, বিশ্বপ্রেয়সী হেলেন,—তারই যুগ-মূর্ত্তি Thais। বিশ্ববাসনা-পদ্মের মাঝখানে তার স্থান। পুরুষ-চিত্তকে চিরকাল সে আকর্ষণ করিতেছে; সে আকর্ষণ-স্রোতে যে পড়িয়াছে—কবে উজান বাহিয়া উদ্ধার পাইয়াছে? হতভাগ্য Paphnutiusও পাইল না!

নির্জ্জন-বাস ত্যাগ করিয়া তিনি অন্যত্র গমন করিলেন। বছরের অধিক কাল একটী Column উচ্চ-মঞ্চের উপর আসীন হইয়া রৌদ্র, শীত, বৃষ্টির মধ্যে কাটাইলেন, চারিদিকে মহাসাধু বলিয়া তাঁর নাম প্রচারিত হইতে লাগিল, লোকসমাগম হইতে লাগিল, মঞ্চের চারিদিক ঘিরিয়া ক্রমে ধনজনব্যবসাবাণিজ্য পূর্ণ এক মহানগরী গঠিত হইয়া উঠিল। চারিদিকের কোলাহল ও যশোদুন্দুভির মধ্যে Paphnutius নিজে কিন্তু অন্তরে অন্তরে আগেরই মত জ্বলিতে পুড়িতে লাগিলেন। অবশেষে, উপায়ান্তর না দেখিয়া আগুনের উদ্দেশে পতঙ্গের মত তিনি Thais-দর্শনে চলিলেন।

পথে শিষ্যপরিবৃত বৃদ্ধ সাধু Anthonyর সঙ্গে তাঁর দেখা হইল। তাঁর দর্শনে, Paphnutius তাঁর পায়ে পড়িয়া আশা-ভয়-জর্জ্জরিত-স্বরে বলিতে লাগিলেন, পিতা! আমায় রক্ষা কর, আমি যে [illegible]

হইতেছি! আমি Thaisএর আত্মাকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়াছি, তারপর কত তপশ্চারণ করিয়াছি, শরীরকে কত ক্লেশ দিয়াছি, কিন্তু তাও ভগবান্ আমার নিকট হ'তে আপনাকে অপসারণ করিয়াছেন। Anthony তাঁর কথায় কোনও উত্তর না দিয়া, শিষ্য সরল সাধু Paulকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আকাশের দিকে চাহিয়া বল তো, কি দেখিতেছ? উত্তর হইল,—দেখিতেছি, সোণার জরিকরা বিছানা, পাশে দাঁড়াইয়া তিন জন কুমারী তা'র উপর পাহারা দিতেছে, যেন, যার জন্য এ-বিছানা, সে ছাড়া আর কেউ কাছে আসিতে না পারে। Paphnutius ভাবিলেন, তার জন্যই বুঝি এই শয্যা প্রস্তুত হইয়া আছে, এবং ইহা ভাবিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। Paul আনন্দ-বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিলেন, কুমারী তিনটী আমায় বলিতেছে, শীঘ্রই একজন সাধুব্যক্তি Saint সংসার ত্যাগ করিতেছেন, তাঁরই জন্য এই শয্যা,—এ্যালেকজেণ্ড্রিয়া নগরের Thais মরিতেছেন,—Thais is dying। Anthonyর প্রশ্নে Paul বলিতে লাগিলেন, আরো দেখিতেছি, তিনটী Demon প্রেতাত্মা Paphnutiusকে আক্রমণ করিতেছে,—Pride অহঙ্কার, Lust কাম, Doubt সংশয়। ভগবানের আদেশ তোমরা শুনিলে, তাঁর উদ্দেশে এস নির্ব্বাক্ হইয়া আমরা প্রণাম করি—এই বলিয়া Anthony প্রস্থান করিলেন।

Paphnutiusএর কানে তখন Thais মরিতেছে, চারিদিক হ'তে এই শব্দই ধ্বনিত হইতেছিল—Thais is dying! সে না থাকিলে এই জগৎ কি? তাকে দেখিবার জন্য এক লাফে সে-স্থান তিনি পরিত্যাগ করিলেন। কেবলই মনোমধ্যে ধিক্কার হইতেছিল, বাঁচিয়া থাকিতে কেন সে তাকে ভোগ করিল না; ব্যাকুব সে—মিছামিছি ভগবানের চিন্তা, ...র চিন্তা, অনন্তজীবনের চিন্তায় সে এতদিন ব্যাপৃত ছিল!

God ! Heaven ! what are they ? ভগবান্ ! স্বর্গ ! কি তারা ?—Thais is dying !—Thais মরিতেছে ! জগতের সৌন্দর্য্য,—তার সান্নিধ্যে, তার মাধুর্য্যে কেমন আরো সুন্দর হইয়া উঠিত ! ভগবান্ ! তোমাকে আমি ঘৃণা করি। God ! I hate thee, dost thou hear ? শুনিতেছ কি তুমি, ভগবান্ ?

পরদিন প্রভাতে Albinaর মুক্তি-আশ্রমে তিনি পৌঁছিলেন। Thaisএর মৃত্যু তখন আসন্ন। পবিত্রতার-মূর্ত্তি Thaisএর জীবন অনাবিল শান্তির মধ্যে ভগবৎ-সেবায় এতদিন অতিবাহিত হইয়াছে।

গাছের ছায়ায় বিছানার উপরে Thais শুইয়া আছে। চারিদিকে অবগুণ্ঠনবতী রমণীরা আসন্ন-মৃত্যু বোনের জন্য ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতেছে। Paphnutius, Thaisএর নাম উচ্চারণ করিয়া দু'চার বার ডাক দিতে, সে তার চোখ মেলিয়া বলিল, একি ! আপনি—পিতা ! মনে আছে কি যে-দিন আপনার সঙ্গে ঝরণার জল পান করিয়াছিলাম ; সে-দিনই অনন্ত-জীবনের প্রতি ভালবাসা আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

অকস্মাৎ Thais বিছানায় উঠিয়া বসিল, এবং অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, চাহিয়া দেখ, অনন্তকালব্যাপী প্রভাতের সব গোলাপ ফুল ! Phaphnutius তাঁর কাল বৃহৎ বাহুর দ্বারা তখন তার দেহকে বেষ্টন করিয়া অস্বাভাবিক স্বরে বলিতে লাগিলেন, মরিও না Thais, মরিও না—আমি তোমায় ভালবাসি ! শোন আমার Thais, তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছি। আমি হতভাগা, মূর্খ ! ভগবান, স্বর্গ—কিছু নয় ! এই পৃথিবীর জীবন ও লোক-প্রেম ছাড়া—সব মিছা। আমি তোমায় ভালবাসি ; মরিও না—অমূল্য তুমি ! আমার সঙ্গে এস ; চল, পলাইয়া যাই। আমি তোমাকে আমার বাহুতে তুলিয়া বহুদূরে লইয়া যাইব। এস, আমরা একে অন্যকে ভালবাসি। আমার

প্রিয়া! বল আমি বাঁচিব, বাঁচিতে আমি চাই। ওঠ, ওঠ Thais! সে তাঁর কথা শুনিতে পাইল না, অনন্তের দিকে তার চক্ষু তখন নির্দ্দিষ্ট। মৃদুভাবে সে বলিতে লাগিল, দু'জন দেবদূত আমার কাছে আসিতেছে, আমি ভগবানকে দেখিতেছি। Thais আনন্দ-সূচক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই বালিসের উপর তার মাথা নিশ্চলভাবে পড়িয়া গেল। তার জীবনের অবসান হইল!

Paphnutius আর একবার তাকে শেষ হতাশের আলিঙ্গনে ধারণ করিলেন। আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, প্রেমের দ্বারা তাঁর চক্ষুর্দ্বয় যেন তাকে তখন ভক্ষণ করিতেছিল। Albina তাঁকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, Avaunt! Accursed wretch! দূর হও, ঘৃণ্য হতভাগা! Paphnutius টলিতে টলিতে পিছাইয়া পড়িলেন; তাঁর চক্ষু দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইতেছে, এবং তাঁর মনে হইতেছে—পায়ের নীচে পৃথিবী ধ্বসিয়া যাইতেছে। আশ্রম-কুমারীরা সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া Vampire! Vampire! বলিয়া চীৎকার করিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল।

প্রবৃত্তির সঙ্গে আত্মার চিরকাল ধরিয়া যে সংগ্রাম চলিতেছে—সে ক্ষেত্রে মানুষ সামান্য নিঃসহায় ক্রীড়নক হইয়াও ভুলবশে আপনাকে নিজ ভাগ্য-নিয়ন্তা মনে করে; এই মহাদ্বন্দ্বের মহাকাব্য এই গ্রন্থ। মিষ্টিভাষা, মিষ্টিভাব, অপূর্ব্ব বলিবার ভঙ্গী—চিত্তে চিরকালের জন্য দাগ রাখিয়া যায়। কিন্তু গল্পটা নিতান্ত আজগুবি বলিয়া মনকে তেমন আকর্ষণ করিতে পারে না।

১৩.১.২৫।—কোন দিনই লোকের মাঝে আমার মন খোলে না—ইহাই আমার প্রকৃতি হ'তে প্রাপ্ত স্বভাব। তার উপর, এতটা কাল ধরিয়া দূরে সরিয়া থাকিতে থাকিতে লোকসঙ্গ ক্রমেই কেমন অসহনীয় হইয়া

উঠিতেছে। সকলের মাঝে আমি নিঃসঙ্গ; কারো সহিতই আমার প্রাণের যোগ নাই। তারা ভাবে আমি তাদেরই একজন, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে আমি চাহিয়া দেখিতেছি, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে।

আমি নহি পরিচিত,
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গিহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল!

কি সব ছাই মাথা মুণ্ড লইয়া মজিয়া আছে মানুষ—শুধু টাকা, আরো টাকা, কেবলি টাকা, আর নিত্যকার ঘরকন্নার সামান্য ব্যাপার। একটুকু ও Idealism নাই, পানায়-ভরা নিশ্চল পচা-ডোবা, সামান্য চন্দ্রালোকেও তার বক্ষ উদ্ভাসিত হইবার উপায় নাই। জানি, তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক এ-সব কাজ কর্ম্মের কোনও মূল্য নাই; আমার আকাঙ্ক্ষা উদ্যমেরই কি আছে? নাই, নিশ্চয়ই নাই—সবই যে নশ্বর। তাও কিন্তু মনে হয়—আমার এ জীবন শ্রেষ্ঠ।

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন,—সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার,—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ!

*　　　*　　　*

তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্! আজি
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি

না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে
অঙ্গ মোর হ'য়েছে অমর ? তাহারা কি
পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি
মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে ?
হে মহিমাময়ী মোরে ক'রেছ সম্রাট্ !

লোকসঙ্গ অপেক্ষা অনেক সময়ই একাকী বেড়াইয়া সুখ আছে। এখনকার প্রভাত-ভ্রমণ—কেমন আনন্দদায়ক! প্রায় প্রত্যহই প্রাতে আমি বেড়াইতে যাই। চারিদিক কুয়াসায় ঢাকা, তার জাল ছিন্ন করিতে করিতে রূপার থালার মত সূর্য্য—শুভ্ররশ্মি ছড়াইতে ছড়াইতে ঝক্ ঝক্ করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে দেখা দেয়। সে সময় আমি প্রায়ই ভবা—পুরের হাটের উপরে যাইয়া পৌঁছি, এবং সেই উচ্চভূমির উপর হ'তে তখন চারিদিকের সবুজ-শোভার দিকে চাহিয়া আমার চোখ জুড়াইয়া যায়। গাছলতার ভিতর দিয়া মাঠের শেষে কিছু দূরে দূরে ছোট-বড় পাকা-বাড়ী, চাষাদের খড়ের ঘর, আকাশ-বিলম্বী মঠ, স্মৃতিমন্দির, কত কি দেখা যায়!

মাঠের জল শুকাইয়া আসিয়াছে, ধান কাটা শেষ হইয়াছে; শাদা শাদা বকের দল এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; দূরে জনকয়েক লোক কার্য্যোপলক্ষে কোথায় হাঁটিয়া যাইতেছে; হাটের উপর অশ্বত্থ-গাছের পাতার মাঝে চিকণকালো পাখীগুলি এ ডাল হ'তে ও ডালে বসিতেছে—মাট, ঘাট মধুর সূর্য্যালোকে হাসিতেছে; আমার মনের ভিতর পর্য্যন্তও যেন সেই কিরণ প্রবেশ করিয়া তাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে!

পকেটে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ক্ষুদ্র কাব্য-গ্রন্থ লইয়া আমি এ-সব সময়

হাটের উপরে যাইয়া উপস্থিত হই। প্রতি প্রাতে সেখানে বসিয়া কিছু-কাল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পড়া আমার এখনকার দৈনন্দিন জীবনের অংশ। তাঁর কবিতা যে এ-সকল বিষয় লইয়াই রচিত—বাইরের প্রকৃতি ও তাঁর কবিতা, দুটীতে কেমন খাপ খাইয়া যায়, একে অন্যকে আলোকপাতে কেমন চিত্তাকর্ষণীয় করিয়া তোলে, উভয়েই কেমন আড়ম্বর-বিহীন, সুন্দর! সে-দিন ভগিনী Dorothyর উদ্দেশে রচিত তাঁর 'To My Sister' কবিতা পড়িতেছিলাম—বাইরের হাস্যময়ী প্রকৃতি ও ক্ষুদ্র কবিতাটী, দুটীর সংযোগে আমার প্রাণের মধ্যে কেমন আনন্দ-সুধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল!

There is a blessing in the air,
Which seems a sense of joy to yield
To the bare trees, and mountains bare,
And grass in the green field.

My Sister! ('tis a wish of mine)
Now that our morning meal is done,
Make haste, your morning task resign;
Come forth and feel the sun.

Put on with speed your woodland dress;
And bring no book: for this one day
We'll give to idleness.

Love, now an universal birth,
From heart to heart is stealing,
From earth to man, from man to earth :
—It is the hour of feeling.

One moment now may give us more
Than fifty years of reason :
Our minds shall drink at every pore
The spirit of the season.

সত্যই আমার দেহের প্রতি কণা কেমন আনন্দ-রসে ভরিয়া উঠিয়াছিল! রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথাই মনে হইতেছিল—

আমি জানি না কি হ'ল, শুধু এই জানি
চোখে মোর সুখ মাখালো—কে যেন
সুখ-অঞ্জন মাখালো,—
কার আঁখিভরা হাসি উঠিল প্রকাশি
যে দিকেই আঁখি তাকালো।

আজ মনে হ'ল কারে পেয়েছি—কারে যে
পেয়েছি সে কথা জানি না।
আজ কি লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সারা আকাশের আঙিনা—কিসে যে
পূরেছে শূন্য জানি না।

এই বাতাস আমারে হৃদয়ে ল'য়েছে,
আলোক আমার তনুতে—কেমনে
মিলে গেছে মোর তনুতে ;—
ভাই, এ গগনভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে।

আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
দেহ মন মোর ফুরালো,—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরালো,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলের মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো।

And from the blessed power that rolls
About, below, above,
We'll frame the measure of our souls :
They shall be tuned to love.

সত্যই, এ-সব সময়ই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত—যখন সৌন্দর্য্য-অঞ্জন-মাখা চোখে জগতের দিকে দৃষ্টি করিয়া আমার চিত্ত মুগ্ধ পুলকিত হইয়া উঠে, প্রেমধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পড়িতেছিলাম, এবং পাঠ-শেষে তাঁর সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম—

We from to day, my friend, will date
The opening of the year.

আজ হ'তে আমার জীবনেরও নব-বর্ষ আরম্ভ হইল।

প্রকৃতি নানা সময় নানা মূর্ত্তি লইয়া চির-সুন্দর। শরৎপ্রভাতের সূর্য্যালোক—রঙীন্, শুভ্র, তীব্র; কেমন দেহ মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে! এখনকার প্রভাত ঠিক সে ধরণের ন্যায়, কিন্তু এও মাধুর্য্যময়—নগ্ন-শুভ্রতার মাধুর্য্য, কেমন নির্ম্মল! এও আমাকে কেমন আনন্দমত্ত করিয়া তোলে!

আমি কা'র সঙ্গে যাইয়া প্রাণ মিশাইব? কেহই যে আমাকে আকৃষ্ট করে না! একমাত্র আমিই আমার সঙ্গী, আর,—চারিদিকের নীরব প্রকৃতি। নীরব?

শীতের সময় গ্রাম-লক্ষ্মীর যে মূর্ত্তি দেখা যায়, তা' সংযত, সুন্দর, কোনপ্রকার বাহুল্য নাই। এর সৌন্দর্য্যপ্রভাব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে, আরও নির্জ্জনতার দরকার, নিজের ভিতরে প্রবেশের প্রয়োজন—সেখানেই যে সুখ-উৎস। লোক-সঙ্গ আরো ত্যাগ করিতে হইবে,—সঙ্গী হইবে বই ও প্রকৃতি। প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে, পূর্ণরূপে তার ভিতর ডুবিতে হইবে, ও তার-দেওয়া সৌন্দর্য্য-কাজল চোখে পরিতে হইবে; সে চোখে যার দিকে চাহিব, তাকেই মধুর বোধ হইবে।

১৪-১-২৫।—ইচ্ছা করিয়াছি, বর্ত্তমান ইংরাজী-সাহিত্য ও জগৎ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলি একে একে সব পড়িব। প্রথমেই কিন্তু হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

বর্ত্তমান ইংরাজ-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে Thomas Hardyর স্থান সর্ব্বোচ্চে। Return of the Native তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পড়িলাম,

ভাল লাগিল না। ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! এঁর নীচে যারা, তাঁরা যেন কেমন! H. G. Wellsএর Tono Bungay ও Galsworthyর Forsyte Saga—দু'জন বিশ্ববিদিত ইংরাজ ঔপন্যাসিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তেমন বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাইলাম না। 'অমর' Immortals বর্ত্তমান ইংরাজী-সাহিত্যে নাই।

Return of the Nativeএ মাঝে মাঝে খুব সুন্দর স্থান আছে, মাঝে মাঝে চাষাভুষাদের কথাবার্ত্তা ও তাদের জীবন-কাহিনী অতি দক্ষতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, সর্ব্বোপরি Egdon Heathএর যে বর্ণনা রহিয়াছে, বড়ই হৃদয়গ্রাহী। এই Heathটাই যেন Dominating Spirit of the Scene, প্রথম পৃষ্ঠা হ'তে গ্রন্থ-শেষ পর্য্যন্ত নানারূপে এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়: ইহার বক্ষের ভিতর গ্রন্থের প্রধান প্রধান নর-নারীর জীবন অতিবাহিত দেখা যায় এবং ইহাই যেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের গড়িয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থের নায়ক Clym Yeobrightএর মতে,—'শক্তি, উত্তম, শান্তির উৎস ইহা; পৃথিবীর অন্য কোন স্থান অপেক্ষা এখানে বাসই আমার বাঞ্ছনীয়।' কিন্তু গ্রন্থের নায়িকা, তার প্রেমিকা Eustacia Vyeএর কথায়,—'এই Heath আমার অসহ্য। উঃ! আমার আত্মাকে এই ভয়াবহ Gloom আঁধার ও নির্জ্জনতা হ'তে উদ্ধার কর!' বইর নানাস্থানে এই Heath, তার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা ও ডোবার নানা সময়ের মধুর বর্ণনা আছে—ইহাই বইখানার সাপক্ষে বলিবার বিষয়, Relieving feature। এইভাবে কোনও স্থান-বিশেষের প্রভাবের মধ্য দিয়া লোকচরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা, আর কোনও বইএ দেখি নাই। নায়ক-নায়িকা ও Miss Yeobright, Clymএর ভগ্নীর, চরিত্র কয়টী মিষ্টি—ইংরাজ লেখক যে Domestic novels গার্হস্থ্য-উপন্যাস জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা। কিন্তু গল্পটী মোটের উপর বেখাপ্পা—আজগুবি কথায় পূর্ণ এবং অনাবশ্যকরূপে

দীর্ঘ। এঁকে ভাল বইরূপে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, যদি চ Egdon Heathকে ভোলা কঠিন হইবে।

১৭.১.২৫।—প্রায় দুমাস যাবৎ গ্রামের বাড়ীতে আছি। এত দীর্ঘকাল গত ত্রিশ বছরের মধ্যে দেশে থাকি নাই। অনেক দিনের সাধ ছিল, শীতকাল দেশে কাটানো;—তা মিটিয়াছে। গ্রাম ভাল লাগিল না। এতকাল ধরিয়া বাইরে দিন কাটাইয়া, কুয়োর বেঙের মত সংসারছাড়া হইয়া থাকিতে মন যায় না। আলো, আলো! মহাকবি Goetheএর কথায়—Light! More Light!—আলো, আরো আলো! গ্রামে এই আলোর একান্তই অভাব। কতকগুলি জিনিষ, সহরে বাস-হেতু হাল সভ্যতানুসারে যা নিত্য ব্যবহার্য্য—তার নিতান্তই অভাব; আহার, চালচলন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সুখ তো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু অশান্তি!—যথেষ্ট, যত রকমের ঝগড়া-ঝাঁটি, গোলমাল, দলাদলি। যাদের প্রকৃতিকে ভোগ করার বাঁধা-অভ্যাস আছে, তারা তাও তার চর্চ্চায় একরকম দিন গুজরাইতে পারেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে অর্থাৎ যাদের কবিজন-সুলভ সে-ভাবে দৃষ্টি করিবার তেমন ক্ষমতা নাই—দীর্ঘ গ্রাম্যজীবন একপ্রকার অসহ্য। সকলের অপেক্ষা বড় দোষ—ক্ষুদ্র জায়গার সঙ্কীর্ণ প্রসারের মধ্যে মনও ক্রমে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। ছোট ডোবার জলের মাছের মত, এ-সব ছোট জায়গায় মানুষ ছোট হইয়া পড়ে—বাড়িতে পাইবার সুযোগ পায় না।

কি যে বিশ্রী স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কিছুতেই যেন আমি আর আনন্দের চোখে চাহিতে পারি না। গ্রামের সে-সব বহুদিনের প্রাচীন পরিচিত পাকা-বাড়ী, গাছপালা, পুকুর খাল ডোবা, সবই দেখিতেছি, আর একটী প্রশ্নই মনে জাগিয়া উঠিতেছে—কই, কই তারা? এক-ধ্বনিই গির্জ্জাঘরের সন্ধ্যার ঘণ্টার মত আমার প্রাণে সব-সময় বাজিতেছে—

কিছুই থাকে না, কিছুই না! বহুদিন-পূর্ব্বে যাদের পূর্ণযুবতী দেখিয়া গিয়াছিলাম, সে-সকল গ্রাম-সুন্দরী আজ প্রায়-বৃদ্ধা হইয়া কি কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে, কত জন বা মরিয়া গিয়াছে! আমাদের এই বাড়ী, কত পুরুষের কত জনের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে জড়িত! বাবা, বোঠান দু'জন, ধাইমা, দাদা, প্রভা··, আরো কতজন, কাকেও দেখিতে পাইতেছি না! কোথা হ'তে উদ্ভূত হইয়া সব যাইয়া মিশাইয়া গেল! সকল বাড়ীর গৃহকর্ত্তার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পিতার অন্তর্ধানের পর পুত্র তার স্থান অধিকার করিয়াছে, সেও তো সংসারের গুরুভারের চাপে ব্যতিব্যস্ত, অর্দ্ধবৃদ্ধ। বাড়ীঘর, গাছপালার যে একটু অস্তিত্ব আছে, মানুষের যে তাও নাই! পোকামাকড়ের মত কতসব নূতন ছেলেমেয়ের দলে ঘর ভর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে, কিছুকাল হৈ চৈ করিয়া তারাও যবনিকার অন্তরালে লুকাইবে। আমি দেখিতেছি,—আর কিছুই আমার ভাল লাগিতেছে না।

যৎসামান্য যা আনন্দ-কিছু পড়াতে, আর লিখাতে। ঠিক করা গিয়াছে তাই,—

> 'ফেল্‌ব খেলায় ধনরতন
> যেথায় মোদের আছে যত।
> সর্ব্বনাশা তোমার যে ডাক্
> যায় যদি যাক্, সকলি যাক্।
> শেষ কড়িটী চুকিয়ে দিয়ে
> খেলা মোদের করব সারা।

সর্ব্বস্বপণ হইয়া এতে মজিয়া বৃদ্ধ মৃত্যুর দিকে তাকাইয়া মনকে অবসাদগ্রস্ত করা নাই।

মাঝে মাঝে যখন এমন ভাবে আমি মগ্ন থাকি, তখন আমার অন্তঃস্থল হ'তে কেমন আনন্দ-ধারা নির্গত হইয়া, প্রাণ ভরিয়া তোলে, দেহ মন সমস্তই কেমন মিঠা লাগে, তখন সত্যই—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু মনে হয়, বেকুব! এও কি হয়? কুকুর যখন খাবার আনন্দে গদ্গদ, পিছন হ'তে গলায় বাঁধা দড়ি ধরিয়া তাকে টানিয়া দূরে লইয়া যাইতেছে! শত চেষ্টা করিয়া, মুখ বাড়াইয়াও তার সাধ্য নাই, আহারের সঙ্গে আর সংস্রব স্থাপন করা। মানুষ কি কম দুঃখী!

সে-দিন রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে ছিলাম। এমন সময় মনে হইল, আর বছরকয়েক পরে আমি থাকিব না, আমাকে পোড়াইয়া আথার ছাইয়ে পরিণত করিয়া ফেলিবে। ভাবিতে ভাবিতে আমার কেমন ভয় করিতে লাগিল। আমার যে বড় ইচ্ছা করে, জ্ঞানচর্চ্চায় আরো বছরকয়েক কাটাইব, অনেক বছর, এমনি মহা উৎসাহের সঙ্গে; জগৎ-সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-পাঠ শেষ করিব; প্রধান প্রধান জ্ঞান-ধারার পরিচয় নিব,—কিন্তু আমার ইচ্ছায় কোন্ কাজ এ পর্য্যন্ত হইয়াছে? নদীর কি সাধ্য আছে, সাগর-মধ্যে নিজ অস্তিত্ব লোপ না করা? অনন্তকাল-সাগরের বুদ্বুদ; তার বুকে তাকে মিশাইতে হইবেই।

কি গ্রামে, কি সহরে, লোকমাঝে, কিম্বা নিঃসঙ্গ অবস্থায়—কোথাও, কোথাও আমার স্থান নাই। কিন্তু এই যে অশান্তি,—এই বা কি? এর মূল্যই বা—কি? আর যে এর উত্তাপে জর্জ্জরিত হইতেছে,— সেই ব কে, কি?

আমি ত্যাগ করিলাম! [নিতান্ত নিজজন ছাড়া] সকলের সংস্রব ত্যাগ করিলাম! সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে এখন হ'তে আমার সম্বন্ধ হইবে—পদ্মপত্রের সহিত তার উপরের জলের মত।

জ্ঞান-সেবায় সম্পূর্ণরূপে আমি আমাকে সঁপিয়া দিলাম—আমার সমস্ত

শক্তি, অর্থ-সম্পদ, যা কিছু আমার আছে—সমস্তের সহিত। এখন হ'তে, শেষ-পর্য্যন্ত এ ভাবেই চলিবে। শেষ? আর কতদূর?

১৮·১·২৫।—মোহি—কেমন সুন্দরী, ফুট্‌ফুটে মেয়ে,—সারাদিন হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। পিতা অবস্থাবান্ ব্যক্তি—সংসারে যাকে সুখ বলে, কিছুরই অভাব ছিল না। এমন সময়,—সবে-মাত্র যৌবনে পা দিয়াছে—সে বিধবা হইল। কিছুকাল পরে তার বাবা মারা গেলেন, বোধ হয় মেয়ের অকাল-বৈধব্য তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। তারপর বিধবার বেশে মোহি—কে যখনি দেখিয়াছি, তখনি মনে হইয়াছে, অন্যদেশ কি জাতি হ'লে কি এমন হ'তো! এই অনাবশ্যক ভয়াবহ বৈধব্য-প্রথা সৃষ্টি করিয়া, হিন্দু নিজ-জীবনের মাঝে কতটা গভীর দুঃখ ও অকর্ম্মণ্যতা আনিয়া ফেলিয়াছে! কেমন একটা সুন্দর জীবন, সুন্দর বস্তু, নিবু দ্ধিতার অত্যাচারে পলে পলে নষ্ট হইয়া যাইতেছে! একে কি আবার বিবাহ দেওয়া যাইত না? এই পুরুষ-স্ত্রীর মিলনই, প্রাণী-জীবনের মানব-জীবনের মহা-আনন্দের উৎস, জীবনের মূলাধারই ইহা—ইহা হ'তেই জীবনের বিকাশ! এ যে চিরদিনের জন্য এই আনন্দ হ'তে বঞ্চিত হইয়া রহিল, মানুষের জীবন-প্রবাহের সঙ্গে এর সম্পর্কই নাই, কেবল পাড়ে বসিয়া ওপাড়ের আশায় রঙীন্ সবুজ দৃশ্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগের ভিতরই এর জীবন চলিয়া গেল! মূর্খ কাপুরুষের দল কেমন একটা নিঃসহায়া অবলাকে ধীরে ধীরে খুন করিতেছে! এবার আবার তাকে দেখিলাম। বৈধব্যের পর বছর কুড়ি চলিয়া গিয়াছে! চাহিতেই আমার প্রাণটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! সে মন-ভুলানো সৌন্দর্য্যের সামান্য লেশটুকুও নাই; পীড়ায় ও আমরণ নৈরাশ্যময় দুঃখ-জীবনের ভার দেহের উপর কি পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে! দেখিতেছিলাম, আর মনে

হইতেছিল, আহা! কি অত্যাচারই অসহায়া বালিকাটীর উপর হইয়া গেল! কেন সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এতদিন অস্তিত্বের বোঝা বহন করিয়া কি লাভ হইল তার, জীবনের কোন সুখের আস্বাদই তো সে পাইল না, তার ইচ্ছার-বিরুদ্ধে সকল-বিষয়ে সে বন্ধ্যা হইয়া রহিল! কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথাই মনে জাগিতেছিল, মানুষ, মানুষের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে! যদি পুনর্জ্জন্ম থাকিয়া থাকে, এ-দেশে যেন আর জন্মগ্রহণ না করি। এমন নানাভাবে মানুষ মানুষের উপর কোথায় এত অত্যাচার করে?

২০.১.২৫।—The Four Horsemen of the Apocalypse, স্পেনিশ ঔপন্যাসিক Ibanez লিখিত সুবিখ্যাত উপন্যাস। ইনিই বর্ত্তমান স্পেনিশ-সাহিত্যক্ষেত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং বোধ হয়, এই বই-ই তাঁর সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। স্পেন! মহাভূমি স্পেন! Cervantes, Velasquezএর জন্মস্থান!

মূলতঃ, বিগত মহাযুদ্ধের ঘটনাবলী লইয়া গ্রন্থখানি লিখিত। প্রথমাংশের কার্য্যস্থল দক্ষিণ আমেরিকার Argentine Republicএ স্থাপিত; তার সঙ্গে বাকী অংশের বিশেষ সম্পর্ক নাই। এই ভাগে Spanish Adventurer Madarigaর বর্ণনা আছে; অর্দ্ধ-পশু, অর্দ্ধ-মানুষ সে এবং কতকগুলি এমন গুণের অধিকারী, যেমন কঠিন-মন কার্য্যতৎপরতা, যা সংসারীকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইবেই। চরিত্রটী বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক এবং সম্পূর্ণরূপে নূতন। সে নিজে Fiery, Stubborn character—অগ্নিতেজা দৃঢ়-চরিত্র। Desnoyersকে সে ভালবাসে, কারণ—সে সকল বিষয়ে serious; I like him because he is serious, that is the way I like him। Desnoyersএর কঠিন-চরিত্র, ধৈর্য্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুকুম Brief orders, এবং যেহেতু সে তার সমশ্রেণীর

লোক হ'তে নিজেকে দূরে রাখিয়া চলে এবং নিম্নস্থ লোকের প্রতি দৃঢ় ব্যবহারসম্পন্ন—He kept his distance from his equals and inflexible towards his inferiors—তাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং এ-সব গুণে মুগ্ধ হইয়া সে তার অতুল ঐশ্বর্য্যের সহিত জ্যেষ্ঠা-কন্যাকে অবশেষে তার হস্তে সমর্পণ করে।

বইর অন্যাংশের কার্য্যস্থল Scene, ফরাসীদেশ ও মূলতঃ প্যারিস। গ্রন্থের মূল নায়ক Desnoyersএর পুত্র এবং Madarigaর পৌত্র—যুবক Julio Desnoyers। সে Argentine রাজ্যের প্রজা। বৃদ্ধ Desnoyers ফ্রান্সের অধিবাসী; Franco-German Warএর বিরোধী হইয়া পলাইয়া Argentine চলিয়া গিয়াছিল, এবং সেখানে Madarigaর কন্যা বিবাহ করিয়া ও নিজ ব্যবসা-বুদ্ধির গুণে মহাধনী হইয়া ওঠে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সে সপরিবারে Parisএ প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেখানে পুত্র Julio রমণীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ কুক্রিয়ার জীবন অতিবাহিত করিতেছিল, কিন্তু যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্যারিসের ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ক্রমে ক্রমে সকলেই দেশের জন্য যুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রাণ দিতে লাগিল, তখন Julioও যেন আর নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারিল না। তার ভিতরও মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিল, এবং অবশেষে সেও যুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধ Disnoyers শোকে অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তার মনে হইতেছিল, পূর্ব্ব-বার যে সে কাপুরুষের মত দেশত্যাগ করিয়াছিল, এখন তার কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইল। সে নিজেও নিজ জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া যুদ্ধগামী লোকদের কত ভাবে না অর্থসাহায্য করিয়া উপকার করিতে লাগিল। মোটের উপর মহাযুদ্ধ যেন ফরাসী-জাতিকে কয়েক দিনের মধ্যে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিল; দেশ-সেবা, দেশ-প্রেম সংক্রামক হইয়া উঠিল; এতকাল

পর্য্যন্ত লোকে Lived for themselves শুধু নিজেদের জন্যই বাস করিতেছিল, এখন দেশের জন্য পরের হাতে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে কেহ দ্বিধা বোধ করিতেছিল না। গ্রন্থের নায়িকা সুন্দরী Marguerite, নায়ক Julioএর প্রেমে পড়িয়া, স্বামী Laurierএর সঙ্গে Divorceএর মোকদ্দমা চালাইতেছিল, ইচ্ছা ছিল বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া Julioকে স্বামীরূপে বরণ করিবে। এখন যখন সেই স্বামী, যুদ্ধে এক চক্ষু হারাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন Margueriteর মত স্বামী-প্রেম-বিভোরা স্বামী-সেবাগতপ্রাণা রমণী খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল—Divorce suit আর চলিল না।

গ্রন্থে, যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধের ফলস্বরূপ সমস্ত দেশব্যাপী দুঃখ দৈন্য যাতনা পীড়ার যে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—কেমন ভয়াবহ! The Four Horsemen of the Apocalypse, বাইবেল-বর্ণিত জগতের শেষ দিনের চারি অশ্বারোহী—মহামারী, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু; ইহারা অশ্বারোহণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; অর্দ্ধমৃত, আহত, সর্ব্বস্বলুণ্ঠিত, নানাভাবে অত্যাচারিত দুঃখযন্ত্রণা-পীড়ায়-প্রপীড়িত লোকের ক্রন্দনধ্বনিতে বিশ্ব পূর্ণ হইতেছে!

বইখানাতে জার্ম্মেণদের প্রতি কি ঘৃণাই না প্রকাশ করা হইয়াছে! তারা নাকি Intellectuel Beast জ্ঞানী-পশু; তাদের উচ্ছেদ-সাধন সভ্যতা Civilizationএর নাকি একটী প্রধান কর্ত্তব্য! বোঝা গেল Propaganda Work প্রচার-কার্য্যে কেমন ফল হয়।

বইখানার যেখানে সেখানে Dutyর উল্লেখ দেখা যায়। নিরর্থক যুদ্ধ করিয়া লোকের প্রাণ-সংহার করা—ইহাও Duty! এ-তত্ত্ব আমরা এ-পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিলাম না—তাই তো সকলের পায়ের তলে পড়িয়া লাথি-গুঁতা খাইতেছি। মানুষ ও পশুতে পার্থক্য কোথায় এবং এদের মধ্যে নৈতিক হিসাবে কে শ্রেষ্ঠ?

বইখানা বেশ ভাল, খুব জমকাল লেখা, বর্ণনা সব কেমন জীবন্ত, তবে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে পারি না।

২.২.২৫।—বাড়ীতেই আছি। শরীর ভাল নয়, হাত-ভাঙ্গা এখনো সম্পূর্ণরূপে সারে নাই; মন কিন্তু আছে এখন একরকম বেশ প্রফুল্ল। স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকিত, তা হ'লে বেশ ফূর্ত্তিতেই থাকা যাইত।

এর কারণ কি? কারণ, মন ঠিক যা চায়, তা তাকে এ ক'দিন দিয়া আসিতেছি—ভাল ভাল মনের মতন গ্রন্থ পাঠ, ও সকাল-সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে একাকী ঘুরিয়া বেড়ানো। রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, বাইরণ, কীট্‌স, টেনিসন্ পড়িতেছি; তাঁদের জীবন-চরিত পড়িতেছি, তা ছাড়া অন্য সব বইও পড়িতেছি।

সময়-বিশেষে মনে হইয়াছে—কবির কি দরকার? কি দেয় তাঁরা। শুধু কতকগুলি কথা—ছন্দোবদ্ধ, সুমিষ্ট। কি মূল্য এ-সবের? কিন্তু, ক্ষণিক পরেই এ-ভাব চলিয়া গিয়াছে। শুধু টাকা, শুধু বিজ্ঞান—এ লইয়া তো মানুষ চিরটাকাল চলিতে পারে না। কবি না থাকিলে, এমন সুন্দর পৃথিবীর সৌন্দর্য্য চোখের সম্মুখে, প্রাণের সম্মুখে কে ধরিয়া দিত? তাঁর তুলিকাপাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই তো, সুন্দরকে দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি। মানব-জীবনের মাহাত্ম্যই বা কে এমন মধুরভাবে বিকশিত করিয়া চির-উপভোগ্য করিয়া রাখিত?

'কে শুনিত রাম-সীতা নাম সুধাময়,
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল?
সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব জগৎ নশ্বর,
কবিতা অমৃত, আর কবিরা অমর।'

কবি না হইলে, কে অমৃতের সন্ধান করিয়া দিবে? জীবনকে কেমন করিয়া নিবিড় সুখে ভরিতে হয়, শুধু কবিই তা জানেন। শুধু কবিই পারেন, কেমন করিয়া তাকে বিনাড়ম্বরে 'কল্যাণ-রস-সরসে' শতদল সম ফুটাইয়া তুলিতে। মানুষের সমাজের যে-দিন হ'তে সৃষ্টি হইয়াছে, কবিরও সে-দিন হ'তে আবির্ভাব হইয়াছে। তিনিই সৌন্দর্য্যাস্তীর্ণ আনন্দের-পথে মানুষকে দিনের দিন মহত্ত্বের দিকে, সুধাসমুদ্রের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। সমাজের বাল্যাবস্থায় তিনি শিক্ষা-গুরু, ধর্ম্ম-গুরু—চিরকালই তিনি তা'।

৪.২.২৫।—কতকদিন যাবৎ Psycho-Analysis ও Sex সম্বন্ধে অনেক বই পড়িতেছি। Psycho-Analysis,—ডাক্তার Freudএর কীর্ত্তি। আমরা ভাবি যে, আমাদের ইচ্ছাতেই আমাদের কাজ হইতেছে, কিন্তু আমাদের মনের conscious জ্ঞাত অপেক্ষা unconscious অজ্ঞাত ক্ষেত্রেই পূর্ব্বাপর আমাদের জীবন-পথ নির্ণীত হইতেছে। সারা-জীবন ধরিয়া যা দেখিতেছি বা করিতেছি, মনের তলায় unconscious regionএ যাইয়া স্থান নিতেছে, এবং তাদের সমবায় শক্তির ক্রীড়নক স্বরূপে আমি চালিত হইতেছি, জানা-ইচ্ছার ফল একরকম নাই-ই।

মানুষের কার্য্যের তিনটা উৎস—Hunger, Love, Ego-Urge বা Self-Expression, ক্ষুধা, প্রেম, আত্মবিকাশ-আকাঙ্ক্ষা। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টা আবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। Freudএর মতে এই প্রেম Love বা Lust ভাবই মানবচিত্তের মূলভাব; এই Sex-Libido বা প্রবৃত্তি-তাড়না, তার জীবন-বিকাশের মূলীভূত কারণ। ইহারই নানাভাবে নানা-মূর্ত্তিতে প্রকাশ। বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, সন্তানের প্রতি স্নেহ, স্ত্রী-স্বামীর প্রেম, সবই একই যাদুকরের নানা রূপ। এই Sex-Libidoএর অভাব হইলে—মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না, মানব-সভ্যতার অস্তিত্ব থাকিত না।

কথাটা শুনিতে বিশ্রী এবং অনেক বৈজ্ঞানিক Freudএর বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে মনে হয়—কথাটী মহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংসারে যার প্রেমাস্পদ নাই, তার পক্ষে সংসার অসার, সংসার শূন্য। সংসার-বৃক্ষের শুক্‌নো-বোঁটা ফল সে; কিসের সম্পর্ক তার সংসারের সঙ্গে? Malchowএর মতে, It may be said of humanity that if it lives for any one purpose more than another, that purpose is sexual—মানব-জাতি সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে যদি ইহা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য জীবিত থাকিয়া থাকে, তা হ'লে তা এই Sexual যৌন-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য সাধন। তিনি আবার বলিতেছেন, সুদীর্ঘ কালের জন্য এ সম্বন্ধ হতে বিরত হইয়া থাকিলে, পূর্ণরূপে দৈহিক ও মানসিক উন্নতিলাভ সম্বন্ধে মানুষে অনেক বিষয়ে বামনত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। Loveএর পরেই, কারো মতে বা তার উপরে—Hungerএর স্থান। এই পেটের ক্ষুধা নিবারণ করিতে যাইয়া, মানুষ কত অসাধ্য সাধন করিয়াছে। কিন্তু মানুষ কেবল খাইয়া বা প্রেমলিপ্সা চরিতার্থ করিয়াই তো সম্পূর্ণ সুখী নয়। কি যেন কার এক আহ্বান অব্যক্ত অজ্ঞাতভাবে পূর্ব্বাপর তার প্রাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে; কি যে তা ভাল করিয়া জানে না, বোঝে না সে; কিন্তু তাও তাকে তার দিকে সমস্ত শক্তি লইয়া দৌড়াইতে হইবে। নিজ জীবন-ব্যয়ে পূজা করিয়াও সে তাকে যেন পাইতেছে না, অথচ ইহা বুঝিতেছে সে সব সময়, একে লাভ করিবার উপায় নিজ আত্মাকে, জীবনকে ফুটাইয়া তোলা; একমাত্র এই মুকুলিত জীবনের মাঝেই যে তার সঙ্গে কচিৎ সাক্ষাৎ হয়। এই Self-Expression—আত্মবিকাশের ভাব হ'তেই জগৎ-সভ্যতায় শ্রেষ্ঠাংশের বিকাশ। পশুর ন্যায় মানুষ কেবল খাইয়া, মিলিয়া আপনাকে সুখী মনে করিতে পারে না। সে চায়—নিজ শক্তিকে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া

আপনাকে ভোগ করিতে। Schopenhaueএর Will to Live বাঁচিবার ইচ্ছা, নয়; Nietzcheর Will to Power, অথবা To Express Himself নিজেকে বিকশিত করিয়া তোলার প্রবল ইচ্ছা— তার জীবনের একটা মূলভাব। যাদের ভিতর এ শক্তির যতটা স্ফূর্ত্তি, তারাই মনুষ্যজগতে ততটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

Sex সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পড়িতে যাইয়া দেখিতেছি,—মানুষ এক মহাশক্তির হাতে পুতুলস্বরূপ। ইচ্ছা করিলেই মানুষ Sexএর ভাবকে পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে না। সাধু-সন্ন্যাসী, যাদের আমরা এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি-দমনের জন্য প্রশংসা করিয়া বেড়াই, তারা অনেকে এ বিষয়ে Abnormal Type of Humanity বিকৃত মানুষ, জন্মগতই এ-ভাবের স্থান তাদের দেহ-মধ্যে কম, তাই তাদের পক্ষে এ-সম্বন্ধে জয়ী হওয়া তেমন কষ্টসাধ্য নয়, বাহাদুরী নিবার তাদের তেমন কিছু নাই। কিন্তু যারা তা নয়, তাদেরও লজ্জার কিছু নাই। তবে প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া চলাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক; প্রবৃত্তির দাস হওয়া সকল অবস্থাতেই অবাঞ্ছনীয়।

এ-সব বই পড়িতে যাইয়া, যেন প্রকৃত সত্যের মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সত্যকে জঘন্য কুৎসিত কদাকার জ্ঞানে, তার নিকট হ'তে ইচ্ছায় দূরে সরিয়া নাক সিঁটকাইয়া মনুষ্যত্বের বাহাদুরী নিয়াছি আমরা; তাই আসল জীবনতত্ত্বও এতদিন হাতে ধরা দেয় নাই। এখন দেখা যাইতেছে, প্রবৃত্তি-পরিচালন-সম্বন্ধে মানুষ ও পশুতে বড় বিশেষ পার্থক্য নাই; প্রকৃতির হস্তে দুই-ই পুতুল। কেমন করিয়া এই প্রবৃত্তিকে সম্যক্‌রূপে পরিচালন করিয়া, সঠিক-পথে চালাইয়া তাকে মানব-সভ্যতার উন্নতির সহায়ক স্বরূপে পাওয়া যাইবে, তার চেষ্টা করিতে হইবে। তাই, তার প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে পূর্ণরূপে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন। কেবল কবিতা বা কল্পনার কুয়াশার ভিতর দিয়া দেখিলে চলিবে না, বিজ্ঞান-সম্মত

সত্যের উপর জীবন-যাপন-প্রণালীকে স্থাপন করিতে হইবে। Gallichanএর কথায়—We need more positive teaching, founded upon scientific truth, and not in the sands of ancient phantasy and myth, প্রাচীনের কল্পনা ও পৌরাণিক গল্পের বালুকার উপর স্থাপিত জ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত খাঁটী সত্যের আমাদের প্রয়োজন।

* * * *

ফরাসীদের আদর্শ পরিবারের সন্তান-সংখ্যা—একটী ছেলে, ও একটী মেয়ে। আর আমাদের? ছারপোকার মত নিশ্চিন্তমনে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গালী-বাপ, মরণান্তে পিণ্ডপ্রাপ্তির পাকা বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ফলে কিন্তু, অনেক সময়ই জীবদ্দশাতেই তার পিণ্ডদানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই ভয়াবহ জীবন-সংগ্রামের দিনে, এমন ভাবে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি করা, শুধু অবিবেচকের নয়—মহাপাপেরও কাজ। এ-বিষয়ে বাঙ্গালী-স্ত্রীকে দোষ দেওয়া চলে না—নিরক্ষরা, নিঃসহায়া, স্বামীর চির-দাসী—স্বামীর হাতে Passive যন্ত্র-বিশেষ। কত স্ত্রীলোককে স্বামীর অত্যাচারে অবশেষে প্রাণ হারাইতে দেখিয়াছি! ইংরাজীতে Eternal mother চির-জননী বলিয়া একটা কথা আছে। আমাদের চারিদিকের পরিবারের দিকে দৃষ্টি করিলেই এই সব চিররোগিণী চির-অশান্তিময়-জীবন চির-জননীদের দুঃখের দৃশ্য আমার চোখে জাগিয়া উঠে! যেন শুধু সন্তান-জন্ম দান করিবার জন্যই এদের জন্ম! জীবনে আর কোন বাসনা চরিতার্থ করিবার অবকাশ নাই। ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, সুস্থ বা পীড়িতই হোক্—বলশালী প্রভু স্বামীর প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য দেহকে তার হাতে সঁপিয়া দিতেই হইবে। কে বোঝে দুঃখ, যাতনা? এরা নিজেরা তো বুঝিয়াও বোঝে না—নিরক্ষরা, নিঃসহায়া, স্বাধীনতাশূন্যা!

তা ব্যতীত, যে সব ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাদেরই বা সম্যক্‌রূপে ভরণপোষণ, শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া—তাদের জন্মের পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে ক'জন চিন্তা করে? এ-সকল বাপও কি পুত্রের কাছে পূজা পাইবার উপযুক্ত, এরাও কি 'পরমং তপঃ'—'স্বর্গ', 'ধর্ম্ম'? যাদের তেমন অর্থ-সঞ্চয় নাই, বিবাহ তাদের জন্য নয়; সন্তান পালন-পোষণের যাদের ক্ষমতা নাই, তাদের পক্ষে তাদের জন্মদান করা অনুচিত—দুই-ই মহাপাপ, মহাপাপ! পুরুষ বা রমণী, জন্মগ্রহণ করিলেই যে বিবাহ করিতেই হইবে, এ ব্যবস্থা কবে পরিত্যক্ত হইবে? সুস্থ, সবল, অর্থবান্‌, জীবনযুদ্ধের জন্য সম্যক্‌রূপে তৈয়েরী যুবক,—সুন্দরী, সুস্থা, জীবন-যুদ্ধের জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষাপ্রাপ্তা উপার্জ্জনক্ষমা নারীর সঙ্গে বিবাহে মিলিত হইবে; মাত্র এদেরই পিতৃত্ব-মাতৃত্বের দায় বহন করার, ন্যায়সঙ্গত Privilege অধিকার আছে। অন্যের পক্ষে বিবাহ—পাপ মহাপাপ! সন্তান-সংখ্যারও পরিমাণ, আয় অনুসারে ও অন্যদিক দেখিয়া পূর্ব্ব হ'তে নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে। সমস্ত সভ্যদেশেই Birth Control জন্ম-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে; কত স্থানে কত সমিতি এজন্য স্থাপিত হইতেছে। কত ধনী সে সব দেশে—আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সে! এ-দেশে এ-সব বিষয়ের চর্চ্চাও নাকি মহাপাপ! অ-বিজ্ঞানের দেশে, মূর্খের দেশে এমনি হওয়ার কথা। অথচ, এই গরীবে-ভরা দেশে, যেখানে সন্তান-পালন-পোষণ দিন দিন কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে, এ-সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন। কে একথা বুঝিবে? Birth Control যে সমাজের পক্ষে, স্ত্রী-পুরুষের সুখ, সুবিধা ও ভবিষ্য-উন্নতির পক্ষে কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ—এ শিক্ষা গ্রহণ করিতে, ও সে-প্রকারে জীবন পরিচালন করিতে প্রস্তুত হওয়া—এ-দেশের পক্ষে কি কখনো সম্ভবপর হইবে,—এই প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ অর্দ্ধমূর্খ অশিক্ষিতের দেশে?

৬-২-২৫।—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়িতে যাইয়া, আমার প্রাণ কেমন আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। অতি-মধুর তাঁর লেখা—এস্রাজের তার-নিঃসৃত মিহি সুরের মত কেমন মনের কাণায় কাণায় যাইয়া প্রবেশ করে! চেষ্টার সামান্য চিহ্ন নাই, উপমা বা কোন অলঙ্কারের বাহুল্য নাই—সরলতাই এদের প্রাণ। তাঁর Lucy Grey সম্বন্ধে ক্ষুদ্র কবিতা-গুলির তুলনা নাই!

'A lovelier flower
On earth was never seen.'

'A violet by a mossy stone
Half-hidden from the eye!
—Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.'

এই Lucy যখন চলিয়া গেল, তখন কবির কথায়—

'She lived unknown, and few could know,
When Lucy ceased to be;
But she is in her grave, and, oh,
The difference to me!'

এমনি; যার যায় সেই শুধু জানে কে চলিয়া গিয়াছে এবং তার অন্তর্ধান জীবনে কতটা পার্থক্য আনে!

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাগুচ্ছ হ'তে এমন কত সুন্দর সুন্দর স্থান চয়ন করা যাইতে পারে। তাঁর Lyrical Poems গীতি-কবিতা ভাব ও ভাষার সরলতা সৌন্দর্য্য, নির্ম্মলতায় এক অপূর্ব্ব উপভোগের জিনিষ। জনবিরল

পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বাইরের জগতের সঙ্গে প্রায় নির্লিপ্ত অবস্থায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। Nature প্রকৃতি তাঁর চির-প্রেয়সী His Life-long Mistress ছিল। তাঁর চোখে তার যে দৃশ্যটী, প্রাণীটী যখন পড়িয়াছে—কেমন নিখুঁত তার বর্ণনা তাঁর কোমল তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে! এ ভাবে 'Butterfly' 'Sparrow', 'Red Robbin' 'Daffodils', 'Daisy', 'Cuckoo', 'Sky-lark' প্রভৃতি সম্বন্ধে কত সুন্দর সুন্দর কবিতাই না তিনি রচনা করিয়াছেন! ভাষায় এদের সৌন্দর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা—বিড়ম্বনা বিশেষ; সে ক্ষমতা আমার নাই। পাঠে যে শুধু আনন্দ হয়, তা নয়; মনে হয়, যেন কি এক সৌন্দর্য্যে স্নান করিয়া জীবন মলিনতাশূন্য, প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। John Stuart Mill সত্যই বলিয়াছিলেন—Wordsworths' poems acted as a state of medicine for my life...And I felt myself at once better and happier as I came under their influence—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা আমার জীবনের উপর ঔষধের মত কাজ করিত, তাদের প্রভাবের ভিতরে আসিয়া আমি মুহূর্ত্তে আপনাকে উন্নততর ও অধিকতর সুখী মনে করিতাম। Upon an Evening of Extraordinary Splendour and Beauty নামক কবিতায়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সান্ধ্যকিরণ-সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন,—

Beamy radiance, that imbues
What'er it strikes with gemlike hues!

তাঁর কবিতাসম্বন্ধেও ইহা বলা যাইতে পারে, যাকে স্পর্শ করে, তাকেই রত্নকিরণে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে। তাঁর কবিতা পাঠে, প্রাণে কেমন এক অনাবিল শান্তির ভাবে আসে, অনন্তের দিকে প্রাণ

উন্মুখ হইয়া ওঠে। Lord Morleyর কথায়, By his secret of bringing the infinite into common life, he has the skill to lead us to touch the depth and not the tumult of the soul...to give us settled peace—সাধারণ জীবনের মধ্যে অনন্তকে আনয়ন করিবার ক্ষমতার দরুণ, তিনি আমাদিগকে হৃদয়ের গভীর প্রদেশে—বাইরের হট্টগোলের স্থানে নয়—প্রবেশ করিবার, স্থির-শান্তি অর্জ্জনের শিক্ষা দেন। ইংরাজী-কবিদের মধ্যে আর কারো লেখাতেই মন এমন উন্নত ও পবিত্র হয় না।

তাঁর কবিতা পড়িতে পড়িতে প্রাণ কেমন যেন দুর্ দুর্ কাঁপিতেছিল। কেবলই মনে হইতেছিল, হায়! আমাদের দেশের কবি পরাস্ত হইয়া গেলেন—কত নীচে, কত ছোট তিনি! কিন্তু দিনকয়েক পাঠের পরেই সে ভয় দূর হইয়া গেল। একই সময়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছি। রবীন্দ্রনাথের হাত বুঝি একটু মোটা ধরণের, ভাষায় অনেক সময় অনাবশ্যক বাহুল্য দৃষ্ট হয়, অলঙ্কার-ভরা, অনেকটা স্থূলতা-জড়িত, কিন্তু মোটের উপর কত শ্রেষ্ঠ! তাঁর শেষ-বয়সের কবিতায় এই স্থূলতা, বাহুল্যও নাই, কেমন এক নির্ম্মল সরল প্রফুল্ল পবিত্রভাব গায় মাখা, পাঠে প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেন শুভ্র-উজ্জ্বল হইয়া উঠে! ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ Homely Poet পাড়াগেঁয়ে কবি। তাঁর আয়ত্তাধীনে যে জ্ঞান ছিল, তাঁর অতি সদ্ব্যবহার তিনি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ—Highland Girls, Michael, Ruth, Simon Lee, Margaret প্রভৃতি গ্রামে সচরাচর দৃষ্ট সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের জীবন, ও গ্রামের পাখী, ফুল, প্রজাপতি প্রভৃতির বর্ণনাতেই তাঁর লেখা পূর্ণ। অতি সুন্দর এ সকল বর্ণনা! এক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয়। কিন্তু এই পর্য্যন্তই। কিছুদিন পড়িবার পরই মোহ কাটিয়া গেল। বিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞান-পুষ্ট লোকের

প্রাণ-ক্ষুধা মিটাইবার মত এমন কি আছে তাঁর লেখায় ? Philosophy দর্শন বলিয়া একটা কিছু তাঁর নাই, কোন প্রকার নূতন-আলোকের দিকে লইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই। নিতান্ত রক্ষণশীল, গোঁড়া খ্রীষ্টবিশ্বাসী—কোনও নূতন আশা, উন্নতিমূলক অশান্তির কথা তাঁর লেখায় মিলে না। তাঁর Ode on Immortality, যাকে লইয়া ইংরাজী-সাহিত্যে এত গর্ব্ব নেওয়া হইয়া থাকে, তাতে দর্শনের ভান্ আছে, কিন্তু মূলতঃ দর্শন নাই, কোনও জীবন-সমস্যা-সাধন সম্বন্ধে কথা নাই। বরং এ-বিষয়ে শেলী অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পক্ষে যা আছে, তাই সুন্দর ; প্রকৃতি সুন্দর, তার অঙ্গে—ফুল, লতা পাতা, পাখী সুন্দর, তার মধ্যে বিচরণশীল চাষাভূষা লোকজন সব সুন্দর, মহৎ। কিন্তু প্রকৃত সংসার তো এমন নয়। সুখশান্তিতে অতিবাহিত-জীবন, মানবজীবনের ভাল দিকটাই তিনি দেখিয়াছেন ; মন্দের, কুৎসিতের দিকে দৃষ্টি করিবার তাঁর সুযোগ হয় নাই, সে-সম্বন্ধে তিনি কিছু লেখেন নাই। শেলী বিদ্রোহের কবি, অশান্তির কবি, এবং বলিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কবিতা যেমন প্রাণকে উন্নতির দিকে লইয়া যায়, যেমন তাকে সম্মুখের দিকে চলিবার জন্য দৃঢ় ও বলীয়ান্ করিয়া তোলে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাঠে তেমন কোন ফললাভ হয় না।

যৌবন-প্রারম্ভে এক সময় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেরও ফরাসী-বিদ্রোহের স্বাধীনতার মদ্যপানে উন্মত্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু অল্পেতেই সে-নেশা ভাঙ্গিয়া যায়। তাই Shelley তাঁকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

Deserting these, thou leavest me to grieve,
Thus having been, that thou shouldest cease to be !

তাই কবি Browning তাঁর সম্বন্ধে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,

Just for a handful of silver he left us !

বর্ত্তমানের এই দ্রুত-উন্নতি এবং ভাঙ্গাচুড়ার দিনে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কবিতা আর প্রাণকে তেমন আকর্ষণ করে না। রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকতায় ও প্রাণ-বাসনা-ব্যক্ত করিতে তাঁর অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ! বঙ্গকবি তুলনায় জগতে অতুলনীয়—যেমন ভাষা, তেমন ছন্দ, তেমন বলিবার নিয়ম, জ্ঞান-প্রসরতা, ভাব-সমৃদ্ধি। তাও বলিতে হইবে, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের যেরূপ সহজ-ভাবে সৌন্দর্য্য, শান্তির সঙ্গে পরিচয় করাইবার ক্ষমতা রহিয়াছে, তজ্জন্য তিনি চিরযুগ ধরিয়া নিতান্ত-পাঠ্য হইয়া থাকিবেন। জনবিরল গ্রামে সুখে জীবন অতিবাহিত করিবার পক্ষে তাঁর কাব্যগ্রন্থের মত এমন মধুর সঙ্গীত ও বন্ধু আর নাই।

প্রকৃত কবি-জীবন আদর্শ-জীবন আদর্শগত-জীবন যদি কেউ যাপন করিয়া থাকেন, তবে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থই করিয়াছিলেন। যৌবন-প্রারম্ভেই তাঁর হৃদয়ে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কবি-জীবনই তাঁর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন এবং সে-হ'তে শেষ পর্য্যন্ত ষাট বছরের উপর ধনবিত্ত-মান-প্রতিপত্তির দিক হ'তে মুখ ফিরাইয়া কবিতার সেবাতেই তিনি জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। যৌবন-প্রারম্ভে একদিন সূর্য্যোদয় দেখিয়া তাঁর মনে হইয়াছিল,

'Ah ! need I say, dear Friend ! that to the brim
My heart was full : I made no vows, but vows
Were then made for me : bond unknown to me
Was given, that I should be, else sinning greatly,
A dedicated Spirit.'

সে-দিন হ'তেই বলিতে গেলে তিনি কবিতার সেবায় নিজেকে Dedicate উৎসর্গ করেন, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত একমাত্র তাঁর সেবাতেই লিপ্ত ছিলেন। পাহাড়-পর্ব্বতসঙ্কুল Cumberlandএ তাঁর জন্ম। নানা

আকারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সুশোভন হ্রদ-খচিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এ-সকল স্থান ইংল্যাণ্ডে Lake District নামে পরিচিত। পাহাড়ে পাহাড়ে, কখনো কখনো ভগিনী Dorothyর সঙ্গে, কচিৎ কখনো বা অন্য কা'রো সঙ্গে, অধিক সময়ই একাকী,—তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এ সকল স্থানের লোকজনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাতেই তাঁর লেখা পরিপূর্ণ। তাঁর মত প্রকৃতিকে এমন ভাল বাসিয়াছে খুব কম লোকেই। বই পড়িতেন কিন্তু খুবই কম; প্রকৃতিই তাঁর লাইব্রেরী ছিল, সেখান হ'তেই তাঁর জ্ঞান আহরণ হইত।

যে যা প্রাণের সঙ্গে চায়, তা যেন অনেক সময়ই পায়। কেমন করিয়া যে এমনটী হয়—বলা যায় না, কিন্তু হয়; এ-যেন একটা জাগতিক নিয়ম। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কাব্যরচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কবিতা দেবীও কালে তাঁকে গৌরবমাল্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁর মত এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ সুখ-জীবন কম লোকেরই হইয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল, প্রকৃতির এক নিভৃত কোণে কবিতাদেবীর সেবায় একাগ্রমনে তিনি জীবন কাটাইয়া যাইবেন। তাঁর যক্ষ্মাগ্রস্ত বন্ধু Risley Calvertএর মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বিশেষভাবে সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন; মৃত্যুর পর দেখা গেল, তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব নয়শ' পাউণ্ড ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে দান করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে যদি আর্থিক কষ্টে প্রপীড়িত না হ'তে হয়, তা হ'লে তিনি এমন সব কবিতা রচনা করিতে পারিবেন, যাতে দেশের মহা-উপকার সাধিত হইবে। মূলতঃ এই নয়শ' পাউণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া অতিমিতব্যয়ী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও ভগিনী Dorothy সাত বৎসর সুখে কাটাইয়াছিলেন।

ডরোথি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভালবাসা এক অপূর্ব্ব পবিত্র জিনিষ! দুজনেই পূর্ব্বাপর কেমন করিয়া একে অন্যকে সুখী করিবেন—এ চিন্তায়

বিভোর ছিলেন, একসঙ্গে দুজনে পাহাড়-পর্ব্বতে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। বোন্‌টীও বেশ সুশিক্ষিতা ছিলেন এবং ভাবের সংযোগ করিয়া ভাইর কবি-জীবনের পুষ্টতাসম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। Dorothyর Diary ভাইর প্রতি ভালবাসায়-ভরা; ভাই এরই তম তাঁরও চিত্ত, প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ ছিল। এক স্থানে তাঁর এক বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া লিখিতেছেন—আমি বেড়াইতে বেড়াইতে এক উপত্যকার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—যেখানে বসিয়া পাখীর গান ও সুন্দর গ্রাম্য-সন্ধ্যার নানাবিধ ধ্বনি উপভোগ করিতেছি। কিন্তু হায়! একাকিনী অবস্থায় আমার আনন্দ কেমন অসম্পূর্ণ বোধ হয়! তুমি কেন আমার পাশে উপবিষ্ট নও? উইলিয়াম, সেই বা এখানে এখন নয় কেন? আমি যেন তোমাদের দু'জনকে কল্পনার চোখে সমুখে দেখিতেছি। আমি যেন শুনিতেছি, তুমি একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছ,—এখানে তোমাদের নিজের ক্ষুদ্র একটী কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতে পারিলে, নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মনে করিতে পারিতে। আমি আমার দাদাকে, এমনি একটী নিভৃত-গৃহে বোন্‌কে লইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি। মুহূর্ত্তে আমাদের বসিবার ঘর সাজানো হইল, যাদুবলে ফুল-বাগান রচিত হইল, গোলাপ ফুল, হানিসাক্‌ল honey suckles আমাদের আজ্ঞায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, গৃহের পিছনের বন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং শীতে ও গ্রীষ্মের দুপুরে আমাদের আশ্রয় দান করিতেছে। আমার প্রিয় বন্ধু! আমি কল্পনা ত্যাগ করিয়া সত্যই মনে করিতেছি, শীঘ্রই তুমি আমার ভ্রমণ-সঙ্গিনী হইবে ও উইলিয়াম আমাদের একজন সঙ্গী হইবে।

ভাই-বোনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁরা প্রথমতঃ Race-down, তৎপরে ক্রমান্বয়ে Alfoxden, Grasmereএ Dove Cottage ও সর্ব্বশেষে Rydal Mountএ বাস করেন। এই সকল পল্লীর ভিতরই

তাঁদের আড়ম্বরবিহীন শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়। Grasmereএ বাস-কালীন তিনি বিবাহ করেন। Cumberlandএর, যার চাষাদের প্রশংসায় তাঁর লেখা পরিপূর্ণ, কোনও সাধারণ পরিবারসম্ভূত তাঁর স্ত্রী। তাঁর এই বিবাহ, তাঁর সুখের চরম stroke। স্ত্রীর-বর্ণনাবিষয়ক তাঁর কবিতাটী অমর হইয়া আছে।

She was a phantom of delight
When she burst upon my sight,
*　　*　　*　　*
A dancing shape, an image gay,
To haunt, to startle and waylay.
I saw her upon nearer view,
A spirit, yet a woman too.

স্ত্রী-সম্বন্ধে তিনি মহাসৌভাগ্যশালী ছিলেন। তাঁর ও বোনের সেবা-পরিচর্য্যা ভালবাসায় স্নিগ্ধ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন শান্তি ও সুখে অতিবাহিত হয়। কবিতাদেবীর সেবার সামান্যরূপে ক্ষতি করিয়াও কখনো তিনি অর্থ-মানের সেবা করেন নাই। কবিতাই তাঁর আজীবনের ধ্যান ছিল। তাঁর সেবাতেই তাঁর জীবন ব্যয়িত হইয়াছে। দেবীও ভক্তকে পূর্ণরূপে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেক্সপিয়ার ও মিল্‌টনের পরেই ইংরাজী সাহিত্যের কাব্যজগতে তাঁর স্থান, কিন্তু তাঁদের অপেক্ষাও তাঁর লেখা মধুর ও পবিত্র ভাবোদ্দীপক। Rydal Mountএই তাঁর শেষ-জীবন অতিবাহিত হয়। এই গৃহের বর্ণনার পূর্ব্বাপর যেমন চেষ্টা হইয়াছে, সেক্সপিয়ারের জন্মভূমি ছাড়া ইংল্যাণ্ডের কোন কবির গৃহই এত অধিক-ভাবে বর্ণিত হয় নাই। হইবারই কথা। তাঁর কবিত্বময়, বাগ্দেবীর-সেবার-

ব্যয়িত জীবন সে-স্থানের প্রত্যেক লতাটীকে, বৃক্ষটীকে, পাখীটীকে যে চিরদিনের জন্য সজীব ও কবিত্বভূষিত করিয়া রাখিয়াছে! তাঁর জীবনী পড়িতে পড়িতে আমার প্রাণের ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি হইতেছিল—এই একটী লোক, যিনি প্রকৃত মানুষের জীবন যাপন করিয়া গেলেন, আমার জীবনও কি এমনি পূর্ণরূপে ভাব-সেবায় জ্ঞান-চর্চ্চায় Dedicated উৎসর্গীকৃত হইয়া অতিবাহিত হইতে পারে না?

তিনি সকল সময়ই উত্তেজনা avoid ত্যাগ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন এবং Stoicদের মত সকল বিষয়ে মিতাচারী এবং শান্ত ও গভীর আদর্শ-মূলক শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করিতেন। তাঁর লেখা সম্বন্ধে তাঁর নিজ মত—My poetry will be while it lasts, a help to the cause of virtue and truth, আমার কবিতা যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, সত্য, পবিত্রতা প্রচারের সহায়ক হইবে। ইহাই হইবে সমস্ত লেখার উদ্দেশ্য। তাঁর লেখায় যে শান্তির ভাব সর্ব্বক্ষণ জড়িত দেখা যায়, তা তাঁর চেষ্টায়-অর্জ্জিত জীবন-দর্শনের একাঙ্গ। সুখ-শান্তির ভিতর তাঁর মহৎ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। মহৎ কবি! মহৎ সাধনা!

৫.৫.২৫।—মনের মতন একটী লোকের পরিচয় পাওয়া গেল—Clemenceau। বিগত মহাযুদ্ধে তিনি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, এবং অনেকেরই বিশ্বাস, ফ্রান্সের যুদ্ধে শেষে জয়লাভের কারণ অনেকটা তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকরী শক্তি।

এখন তিনি রাজনীতির সঙ্গে পূর্ণরূপে সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন, এবং Bay of Biscayর উপকূলে নিজ দেশ La Vendeeতে একাকী বাস করিতেছেন। কিন্তু সেখানে তাঁর নিজের কোনও জায়গা জমী নাই। তিনি সেখানে একটী দরিদ্র শ্রমজীবির কুটীর ভাড়া নিয়াছেন।

তাতে দুটী মাত্র কক্ষ, তার একটী রান্নাঘর, ভাড়া বছরে এক'শ' পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্ক, (অনুমান আশি টাকা), তা ছাড়া বাগানের জন্য মাসে দুই ফ্র্যাঙ্ক, অনুমান পাঁচ সিকা, দিতে হয়।

যেখানে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকা শেষ হইয়াছে, তা হ'তে চল্লিশ হাত দূরে গৃহখানা অবস্থিত। নিতান্ত ক্ষুদ্র জনপল্লীও সেখান হ'তে এক মাইল দূরে। বৃদ্ধ মন্ত্রীর এমন কোন প্রতিবেশী নাই, যাকে বন্ধু বলা যাইতে পারে। একটী বৃদ্ধা গ্রাম হ'তে সপ্তাহে দু'দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দু'জন তখন স্থানীয় সংবাদ সম্বন্ধে আলাপ করেন। ইহা ছাড়া, তিনি বাইরের আর কারো সঙ্গে কিছুতেই সেই নিভৃত-আবাসে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। বৃদ্ধা গ্রাম্য-পাচিকাটী তাঁর অদ্ভুত চালচলনে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। Tieaty of Versailles সম্বন্ধে স্মৃতি জাগরুক করিয়া দিবার জন্য এখনো তাঁর Rolls Royce মটোর -কার রহিয়াছে ; একটী মালী, সোফার, এবং বড় গর্দ্দভ একটী—এই তাঁর গৃহের অধিবাসীর পূর্ণসংখ্যা। গ্রীষ্মকালে আহারের জন্য তিনি আর একটী কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, কিন্তু তার মেঝে সমুদ্র-বালুকাস্তীর্ণ এবং তার ছাদ ইতিমধ্যেই ঝড়ে দু'বার উড়াইয়া নিয়াছে। রান্নাঘরেই একখানা সামান্য গরীবানা-ভাবের টেবিল-ক্লথে ঢাকা টেবিলের উপর তাঁর আহারের ব্যবস্থা। একখানা কাঠের তক্তায় খস্‌খসে মাদুরের উপর তিনি ঘুমাইয়া থাকেন। প্রাতঃকালে আটটা হ'তে দুপুরে লাঞ্চ গ্রহণ করা পর্য্যন্ত তিনি লেখায় ব্যস্ত থাকেন, তৎপরে তিনটা পর্য্যন্ত বাগানে ঘুরিয়া বেড়ান এবং তারপর আবার সাতটা পর্য্যন্ত লিখিয়া থাকেন। একজন পত্রিকা-সম্পাদক কোন প্রকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি লিখিতেছেন তিনি, কিন্তু তাঁকে তখনই নিজ কাজে মনোযোগ দিতে বলিয়া বিদায় দেওয়া হয়।

অন্য সম্বন্ধে এই প্রকারে নির্জ্জনে এমন সরল জীবন অতিবাহিত করা—affectation ভড়ং বলা যাইতে পারিত, কিন্তু ক্লেমেন্‌সো সকল সময়েই নিজ মনকে জানেন এবং যা তাঁকে সুখোৎপাদন করে, তাই করিয়া থাকেন। এখনো তিনি তেমনি। মাঝে মাঝে তাঁর প্যারিসের ক্ষুদ্র কক্ষে যাতায়াত ব্যতীত, অন্য সব সময়ই তিনি রাজনীতি ও লোক-সমাগম হ'তে দূরে অবস্থিত—বৃদ্ধ-কৃষকের মত নানাবিধ স্মৃতিপূর্ণ-হৃদয়ে La Vendeeর প্রবল সমুদ্রের বাতাস ঘ্রাণ করিয়া ও চোখের সম্মুখে গভীর নীলসমুদ্র ও বিস্তীর্ণ বালুকাময় তটিনীর দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া—একাকী জীবন কাটাইতেছেন। এই প্রকার সংসারের-সমালোচনা-সম্বন্ধে-সম্পূর্ণ-উদাসীন, নিজ-ভাবে-কাজে-বিভোর আত্মপ্রতিষ্ঠিত লোক আমার চিত্তকে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণ করে। আমার জীবন মধ্যে আমি কেমন করিয়া এরূপ সাধকের Dedicated Spirit আত্মার-উৎসর্গীকৃত-ভাব স্থাপন করিতে পারিব ?

২৯.১২.২৫।—আমি শান্তির দিক্ হ'তে সুখকে পাইবার আশায় এতকাল ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু সুখকে পাইলাম কৈ ? সে তো ধরা দিয়াও দিল না! কারো কাছে দিয়াছে কি এ পর্য্যন্ত ? একই মূর্ত্তি—নানারূপে নানা সময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; এক সময় যাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, দেখিয়াছি শেষে—কিছুই নয়, কিছু নয় তা'। সবই পরিবর্ত্তিত হইতেছে—মুহূর্ত্তেরও বিরাম নাই ; কা'কেও ধারণ করিয়া যে এই পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া সাধিত হইতেছে, তাও তো দেখিতেছি না। অনন্তকাল ধরিয়া এই মহা পরিবর্ত্তন চলিতেছে—কত সূর্য্য চন্দ্র উদয় হইয়া অস্ত হইয়া যাইতেছে, কত মানুষ, কত জাতি উদ্ভূত হইয়া বিলীন হইয়া গেল—এমনি কত কি আরো যাইবে !

তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ-যুগান্ত নাচে।

এই মহা জগৎ-বিবর্ত্তনের বিরতি নাই। এর ভিতর কোথায় অচল স্থিতিশীল ভগবান? তিনিই কি একমাত্র এই পরিবর্ত্তনের স্রোত হ'তে আপনাকে রক্ষা করিয়া দূর হ'তে এই মহালীলা দর্শন করিতেছেন? তা', কি সম্ভব? যাই তিনি হোন্—তিনিও তো এই মহাজগতের অংশ। কোথায় ভগবান্, কোথায় অপরিবর্ত্তনীয় 'কিছু'? সমস্ত জগতই সংযোগ-বিয়োগের ফল—বিনাশ-বীজ ...মান ভাবে সকলের মধ্যে নিহিত। আমাকে মরিতে হইবে—আমার পরমাত্মীয়দের ...কেই মরিতে হইবে।

কেন তবে এই জীবনের গুরুভার বহন করা? 'কে' যে এই বোঝা পিঠে চাপাইয়া দিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু বহন করিতেই হইবেই একে। 'কে' বহন করিতেছে, তাও তো বুঝিতে পারিতেছি না। কে 'আমি'? এই বোঝা-বহন মানুষের অদৃষ্ট-লিপি; ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ নিষ্ফল।

জীবন প্রায় শেষ হইল—পঞ্চাশ বছর ডিঙ্গাইয়াছি। 'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ'—বনে যাইব? কিন্তু কৈ, প্রাণের ভিতর হ'তে এমন কোন তাড়া তো পাইতেছি না। কি করিব বনে যাইয়া, ভগবানের উদ্দেশ্যে? 'কোথায়' ভগবান্? 'কে,' 'কে'—ভগবান্? এতদিনের শিক্ষায় এই বুঝিয়াছি, চোখ-মুখ বুজিয়া এই অর্থশূন্য জীবন-ব্যাপারে মাতিয়া যাওয়াই, কোনপ্রকারে অশান্তির পরিমাণের মাত্রা কম করিয়া রাখার একমাত্র উপায়—ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। নিজ ভাবে পূর্ণমাত্রায় বিভোর থাকিতে

হইবে—মন যা চায়, তাই তাকে দিতে হইবে, মনের মতন ভাবে চলিতে হইবে—লোকে যাই কেন না বলুক্। ইহাই জীবন-সাধনা, যোগীর যোগ-সাধনা,—যার এত গৌরব ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। পরের দিকে চাহিয়া, বাইরের চাপে পড়িয়া কিছুই হইলাম না আমি! কবে আমি পূর্ণ-স্বাধীন, পূর্ণ মুক্ত হইয়া নিজ-ভাবে চলিতে পারিব?

আমার, আমার কি সাধনা? জ্ঞান-চর্চ্চা, সাহিত্য-সেবা। আজীবন ইহাদের মধ্য দিয়াই যে যা কিছু প্রকৃত আনন্দ আমি উপভোগ করিয়াছি। যতই দিন যাইতেছে, ততই এ-আনন্দ অধিকতর মিষ্ট ও উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে। এদের সেবাতেই যেন আমার জীবনের বাকী দিন কয়টী—কটাই বা দিন!—অতিব হিত হয়। আমার লেখা—কেউ পড়ে না! না পড়ুক্; আমার প্রাণ আনন্দ পাইলেই হয়।

সারাটা জীবন, এই জীবন-ব্যাপারটা কি, বুঝিবার একটী তীব্র আকাঙ্ক্ষা মন জুড়িয়া আছে। কেন যে এত লোকের মধ্যে আমারই মনে এ-ভাব জাগিয়া উঠিল, তারও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। একমাত্র আমার পিতামাতার দিকে খুঁজিয়া দেখিতেছি—পিতা ভগবান্ সম্বন্ধে একপ্রকার উদাসীন ছিলেন, মা যদিচ প্রাচীন আচারনিষ্ঠা-পালনে মহাব্রতী, কিন্তু মূলতঃ ভগবান সম্বন্ধে তেমন বিশ্বাসবতী ন'ন। আমার মধ্যে এই যে একটী নাস্তিকতার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, এর মূলে কি Heredity বংশানুক্রম রহিয়াছে? ইহা হ'তেই কি সংশয়ের ভাব দেখা দিয়াছে? কিছুই যে বুঝিতেছি না।

আমি সংশয়ী আত্মা—আমি যুগাত্মা; যুগ-মানব আমি, ভবিষ্যতের পূর্ব্বপুরুষ। বিনা-বৈজ্ঞানিক-প্রমাণে কিছুতেই আমার বিশ্বাস নাই; প্রমাণ-শূন্য ভক্তি বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই আমার কাছে। এজন্যই প্রাচীন ধর্ম্ম-সংস্কার সমস্তে আমি শ্রদ্ধাবান্ নই; ভগবান বা আত্মাতেও

আমার বিশ্বাস নাই, কারণ যুক্তির সম্মুখে তাদের দাঁড়া-করানো যায় না। এ তো গেল আমার অন্তরের কথা। বাইরের জগতে আমার চোখে সব সমান—রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, স্ত্রী, পুরুষ—সকলে সমান; বাঁচিবার, বড় হইবার, মনুষ্যত্বের স্বাদ উপভোগ করিবার সকলেরই সমান অধিকার। সাম্যের ভাব, ন্যায়ের ভাব যাতে সমস্ত সমাজে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে,—ইহাই আমার কাম্য। দরিদ্র যে, তাকে ধনী করিয়া তোল, মূর্খকে জ্ঞানালোকে দীপ্তচিত্ত কর, ক্ষীণ দুর্ব্বলকে সবল স্বাস্থ্যপূর্ণ করিয়া তোল, নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়া ন্যায্য স্থানে লইয়া বসাও, যেন অত্যাচারী স্বামীরূপী শাসকের হাতে তাকে আর প্রপীড়িত না হ'তে হয়—সংসারে যে যেখানে আছে সুখে থাক্, সুখে থাক্ সকলে। জগৎ ভরিয়া ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক্।

দরকার নাই লোকের কাছে বাহবা নিবার, লোকসঙ্গ, হৈ চৈ। কোনও একটা মহৎ কাজ করিয়া যাওয়া, ও জ্ঞান-চর্চ্চাই—গ্রন্থপাঠ, গ্রন্থলেখা, প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি,—যেন আমার একমাত্র লক্ষ্য হয়। যে ক'টা দিন বাকী আছে, জ্ঞান-সেবাতে উৎসর্গী-কৃত জীবন,—এ-ভাবেই যেন অতিবাহিত হয়। জ্ঞানযোগী আমি, তাপস আমি—কিসের দুঃখ, ভয়? জ্ঞানামৃত পানে আমার দেহ-মন অমৃতময় হইয়া উঠিবে; জ্ঞান-পানে বিভোর-চিত্ত হইয়া আমি মৃত্যু-ভয়-জয়ী হইব। বাঙ্গালা! আমার জন্মভূমি! নানাদোষ লইয়াও বাঙ্গালা আমার সর্ব্বপ্রিয় দেশ। এই জ্ঞান-সেবা দ্বারাই তার সেবা করিব আমি।

কাল হ'তে আমার জীবনের নব-পর্য্যায় আরম্ভ হইবে—সকল-বিষয়ে আমি First Class প্রথম-শ্রেণীর জীবন যাপন করিব—স্বাস্থ্য-আনন্দ-

উদ্যমে-ভরা। জ্ঞানযোগী আমি, সাধক আমি, আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমি এক মহা অমৃতভাণ্ডের সুখভাণ্ডের সন্ধান পাইয়াছি— আমাব মত ভাগ্যবান্ কে? সুখ! সুখকে আমি পাইব না?

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

আমার বন্ধুবরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। উপরের লেখার কিছুদিন পরেই হঠাৎ হৃদ্‌রোগে তাঁর প্রাণান্ত হয়! এ'ক'দিন তাঁর কথাই সব সময় ভাবিতেছি, তাঁর লেখাই পড়িতেছি,—আর কি তাঁর সঙ্গে দেখা হইবে?

২। জঞ্জাল

(নূতন উপন্যাস)

৪০৫ পৃঃ।

বর্ত্তমান বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস!

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

Deals primarily with the eternal feminine sex problem but all the grave issues of social inequality, these, and many other things besides, have been described with a masterly touch. The author's wide knowledge, still wider sympathies, his masterly and impartial analysis of the feelings—all command our admiration. He is one of the little band of Bengali writers to whom the future most assuredly belongs. The ideas, sentiments, and active impulses awakened by the writer are of the highest order...charming, and vigorous style. He has a new message to deliver. Story full of pathos and interest. *The author has done a memorable service to Bengali literature*—MODERN REVIEW.

৩। জীবন

(উপন্যাস)

২৯১ পৃঃ।

মূল্য—১৸৵০।

Intersting, with a variety of characters, graceful style—a book of this type is like a balmy breeze, health-giving and refreshing.—MODERN REVIEW.

বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠভাব লইয়া লিখিত, শুধু বঙ্গভাষায় কেন, অন্য সাহিত্যেও যুগভাব-জ্ঞাপক এ ধরণের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী আর নাই। পাঠে নূতন আলোর সন্ধান পাইবেন এবং বিমল আনন্দে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিবে প্রত্যেক গ্রন্থই অতি সুন্দর বাঁধাই ও ছাপান। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ব্যবহারের ও প্রিয়জনকে উপহার দিবার অপূর্ব্ব সামগ্রী।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০৩।১।১ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।